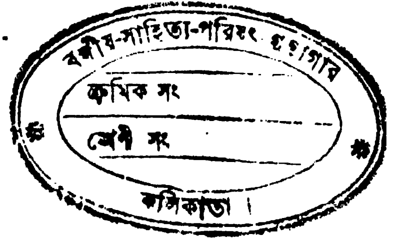
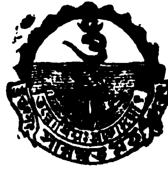
ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

আর্য্যশাস্ত্রগহনার্থদীপক-
শ্চেতসস্তিমিরবারবারকঃ।
স্তোত্তযস্বিজয়তাস্বিপশ্চিতা-
মচ্চিমা হৃদয়মার্য্যদর্পণঃ॥





আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে

তত্রত্য ঋষি-বিদ্যালয় হইতে

ব্রহ্মচারী ছাত্রবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত

—✻—

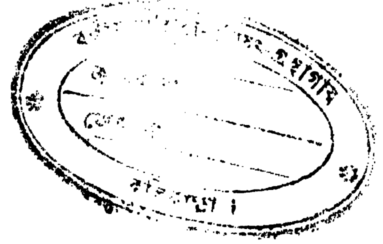
অষ্টাদশ বর্ষ—১৩৩২

······✻······

সম্পাদক—শ্রীবরদা ব্রহ্মচারী

বার্ষিক মূল্য—২৲ প্রতি সংখ্যা—৶০

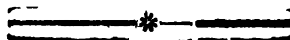
যোরহাট
সারস্বত মঠস্থ "যোগমায়া-যন্ত্র" হইতে
ব্রহ্মচারী শশিভূষণ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত



সূচী

—*—

(বর্ণমালানুসারে)



ওঁ তৎ সৎ



আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৮শ বর্ষ } বৈশাখ { ১ম সংখ্যা

মঙ্গলাচরণম্

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৪।১]

উন্মামমন্দ বৃষভো মরুত্বান্
ত্বক্ষীয়সা বয়সা নাধমানম্।
ঘৃণীবচ্ছায়ামরপা অশীয়া
বিবাসেয়ং রুদ্রস্য সুম্নম্॥

ক্ব স্য তে রুদ্র মৃলয়াকুর্হস্তো
যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ।
অপভর্ত্তা রপসো দৈব্যস্যা
ভী নু মা বৃষভ চক্ষমীথাঃ॥

প্র বভ্রবে বৃষভায় শ্বিতীচে
মহো মহীং সুষ্টুতিমীরয়ামি।
নমস্যা কল্মলীকিনং নমোভি-
র্গৃণীমসি ত্বেষং রুদ্রস্য নাম॥

স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো
বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরেঃ
ন বা উ যোষদ্ রুদ্রাদসূর্য্যম্॥

মরুতের সাথী রুদ্র, দাও সবে কামনার ধন ;
যাচি অন্ন—বীর্য্যে তার চিত্তে মোর আন উন্মাদন।
আতপে তাপিত যথা খুঁজে নেয় ছায়া সুশীতল,
রুদ্রের প্রসাদ ভুঞ্জি, সেবি তাঁয় হয়ে নিরমল।

কোথা সেই হস্ত তব, রুদ্রদেব, সর্ব্বসুখ-খনি,
বিলায় ভেষজ মর্ত্ত্যে, নিখিলের বন্ধু তারে গণি।
দেবতার পায়ে যত অপরাধ, তুমি অপহর,
জান মোর দৈন্য দেব, কল্পতরু, তারে ক্ষমা কর।

শুভ্র ছটা বিকিরিছে অঙ্গ তব বিচিত্র-বরণ,
তোমারি উদ্দেশে স্তুতি সুমহতী করি উচ্চারণ ;—
দিব্যদ্যুতিঝলকিত রুদ্রে সবে করহ প্রণাম,
বীর্য্যশালী জ্যোতির্ম্ময় গাও তাঁর সুমঙ্গল নাম।

অনন্ত তাঁহার রূপ, দৃঢ় অঙ্গে হেরি উগ্র কায়,
বিচিত্র বরণ— তাহে স্বর্ণভূষা শোভে গরিমায়,
বিশ্বের ঈশ্বর তিনি, নিখিলেরে করেন ভরণ,
ধরেন অসুর-বীর্য্য, সাধ্য কার করে তা হরণ।

———✻———

নববর্ষে

—*—

ওম্ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম॥

—হে অগ্নি, তুমি বিশ্বের সমস্ত রহস্য জান, তুমি শোভন পথে আমাদিগকে সম্পদের দিকে লইয়া যাও। কুটিল পাপকে আমাদের নিকট হইতে বিযুক্ত কর, আমরা বহুবার তোমার নমস্কারবচন উচ্চারণ করিব।

মর্ত্য হইয়াও আমাদের মাঝে অমৃতের পিপাসা জাগিয়া রহিয়াছে। এই পৃথিবীর বুকে থাকিয়াও আমরা দ্যুলোকের পানে দুটী হাত বাড়াইয়া রাখিয়াছি। এই তো মানব জীবনের সাধনা। মানুষ কি অসাধ্য কিছু চায়? তাহা নহে। অমৃত সঙ্গোপন, তবুও তাহা আছে স্বীকার করি। নহিলে আমাদের মাঝে অমৃতের পিপাসা কেন? দ্যুলোক-বিহারী দেবতা আমাদেরই হিয়ার মাণিক, নতুবা থাকিয়া থাকিয়া তাঁর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে কেন?

তিনি আছেন, শুধু এইটুকু বিশ্বাসেই প্রাণ জুড়াইয়া যায়, চিত্তে ভরসা জাগে। কিন্তু এখানেই তো নিবৃত্ত হইতে পারি না। তিনি থাকুন—শুধু এই হইলেই চলিবে না। তিনি আমাদের মাঝে আমাদের মত হইয়া থাকুন। ঠিক আমাদের মতই হউন, এমন কথাও বলিতে পারি না। তিনি দ্যুলোকের হইয়াও ভূলোকের হউন—এই দেখিতে আমাদের বড় সাধ। তাঁহাকে দেখিলে চিরপরিচিত সহজ বস্তু বলিয়া যেন চিনিতে পারি—অথচ আমাদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা লইয়া দ্যুলোকের অনির্ব্বচনীয় দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হইয়া তিনি আসুন, এইটুকু চাই। ওপারে-এপারে সন্ধি হউক—ব্রহ্মের আনন্দঘন মূর্ত্ত বিগ্রহ দেখিয়া নয়নমন সার্থক করি এই চাই।

এই মূর্ত্ত বিগ্রহই ঋষির অগ্নি—তিনিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। অগ্নির্গুরুর্দ্বিজাতীনাম্—অগ্নি গুরু। বেদ বলিতেছেন, অগ্নি ত্রিস্থানদেবতা—তিনি দ্যুলোকেও আছেন, অন্তরীক্ষেও আছেন, পৃথিবীতেও আছেন। দ্যুলোকের সঙ্গে ভূলোকের সন্ধি করিয়াছেন—এই অগ্নি; সুতরাং তিনি গুরু। আমাদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, সমস্তই পরম দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিব, জীবনব্যাপী উৎসর্গের যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত হইব। এই উৎসর্গকে, আমাদের জীবনব্যাপী কর্ম্মের হব্যকে গ্রহণ করিবেন কে? গ্রহণ করিয়া পরমদেবতার কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন কে? পরমদেবতার সঙ্গে আমার সাযুজ্য ঘটাইয়া দিবেন কে?—তিনিই অগ্নি—তিনিই গুরু।

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্"—হে অগ্নি, হে গুরু, শোভন পথ দিয়া সম্পদের দিকে আমাদিগকে লইয়া যাও! তুমিই আমাদের নেতা, আমাদের পথের সাথী, আমাদের উৎসর্গের আধার, হব্যের বাহন। পথ অপথ ভুলিয়া যাই—হে গুরো, তুমিই সুপথ দেখাইয়া দাও। সম্পদের সন্ধান বলিয়া দাও। শুধু একা আমার জন্য বলিতেছি না।

—"অস্মান্ নয়"—আমাদিগকে নিয়া যাও—তুমি সুজ্যের নেতা হও

এ প্রার্থনা সন্ন্যাসীর; এ প্রার্থনা গৃহীর। প্রাচীনকালে ব্যবস্থা ছিল, সন্ন্যাসী নিরগ্নি হইতেন। সে কি অগ্নির সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইয়া? তাহা নহে। "আত্মন্যগ্নীন্ সমাধায়"—আত্মাতে অগ্নি সমাহিত করিয়া—বুকের মধ্যে আগুন পুরিয়া লইয়া সন্ন্যাসী ঘর ছাড়িতেন। অগ্নি আছেন, গুরু আছেন, নেতা আছেন—আমার আত্মস্বরূপে আছেন, আমার দেহে-মনে-প্রাণে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া—অণুতে অণুতে প্রদীপ্ত হইয়া আছেন। সন্ন্যাসী মননের সাধক, তাই স্থূল প্রতীক ছাড়িলেন। কিন্তু গৃহী উপাসক—স্থূল মূর্ত্ত প্রত্যক্ষ তাঁহার সাধনার সহায়। তাই অগ্নি তাঁহার "গৃহপতি।" গুরুই যথার্থ গৃহপতি; আমরা শুধু গৃহ-স্থ, গৃহে থাকি মাত্র। গৃহের পতিত্ব আমাদের নয়—পতিত্ব শ্রীগুরুর—আমরা সেবকমাত্র। নিত্য এই গৃহপতি অগ্নিতে, এই ব্রহ্মপ্রতীকে, এই গুরুবিগ্রহে গৃহস্থকে সমস্ত প্রিয় বস্তু আহুতি দিয়া যজ্ঞাবশেষ গ্রহণ করিতে হইবে। এই গৃহস্থের ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মের সহায় বলিয়া স্ত্রী সহধর্ম্মিণী। গৃহপতি অগ্নির পরিচর্য্যায় পুরুষ স্ত্রী উভয়ের তুল্য অধিকার—স্ত্রীর পক্ষে বেদাধিকারসঙ্কোচের কথা এখানে নাই। গুরুসেবায় স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার।

সন্ন্যাসীও অন্তরে এই আগুন জ্বালিয়া রাখিয়াছেন। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন, ইহা সংযমের অগ্নি—যোগী সন্ন্যাসী প্রাণমন ইহাতে আহুতি দিয়া অধ্যাত্ম যজ্ঞ সমাধা করিতেছেন। এই সংযমাগ্নিই গুরুশক্তি। অগ্নির স্থূলে প্রত্যক্ষ হয় না—কার্য্য দেখিয়া কারণস্বরূপে যাহার অনুমান করা যাইতে পারে এবং অন্তরে তাহাকে অপরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। সন্ন্যাসী অধ্যাত্ম রাজ্যের সংসারী—তাই তাঁহার গৃহপতি অগ্নি আত্মসমাহিত। "হে অগ্নি, হে গুরো, আমাদিগকে সুপথে লইয়া যাও"—এ প্রার্থনা সন্ন্যাসীরও, গৃহীরও—স্ত্রীরও, পুরুষেরও। নিখিল মানবমানসকমল হইতে ভ্রমরগুঞ্জনের মত এই প্রার্থনা দ্যুলোকপানে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে—"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্।"

অগ্নিই আমাদের নেতা, কেননা তিনি সমস্ত "বয়ুন" জানেন। কেহ বলেন, "বয়ুন" কর্ম্ম, কেহ বলেন জ্ঞান। অধিকারভেদে অর্থভেদ মাত্র। তাহাতে কিছু আসে যায় না। এই শুধু জানি, আমরা যাই হই না কেন, আমরা সবাই সাধক—সবাই জিজ্ঞাসু। শ্রীগুরু সিদ্ধ, বিশ্বরহস্য তাঁহার করায়ত্ত—তাই তাঁহার কাছে প্রার্থনা, "হে নেতা, পথের খবর তুমিই জান; আমরা নবীন পথিক—অপথ বিপথ চিনি না—তুমি শুভপথ আমাদের দেখাইয়া দাও।"

পথ তো সরল; কিন্তু আমাদের জটিল দৃষ্টিতে তাহা কুটিল হইয়া দেখা দিয়াছে। আবার এই কুটিলতা একদিন দুদিনের তো নয়। জন্মজন্মান্তরের অভ্যাসে ইহা নাড়ীতে নাড়ীতে জড়াইয়া গিয়াছে। তাই জগতে সহজভাবে আর কিছু দেখিতে পাই না—যাহা সুন্দর, তাহাকেও আপন মনের কুটিলতায় বাঁকাচোরা করিয়া কুৎসিৎ করিয়া দেখি। সংস্কারের দাস আমরা—সংস্কারমুক্ত না হইলে মুক্তি কোথায়—জগৎকে সহজ-সুন্দর দেখিবার দৃষ্টি কোথায়? এই কুটিলতা দূর করি, এমন

নিজেরও সাধ্য হইতেছে না। তাই আবার বলি, হে অগ্নি, হে গুরু, তুমি খণ্ডনভববন্ধন, কুটিল গ্রন্থিকে তুমি সহজেই সরল করিতে পার। এই মর্ম্মে জড়ানো কুটিলতা তুমি "যুযোধি"—দূর করিয়া দাও। কেমনে দূর করিবে? তোমার গ্রন্থিমোচনের উপায় বড় সুন্দর—বড় ভীষণ! তুমি নির্ম্মম হইয়া নিঃশেষে গ্রন্থিকে দগ্ধ করিয়া তাহার কুটিলতা দূর করিবে। কুটিলগ্রন্থির অংশুতে অংশুতে সঞ্চরণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্ব তুমি আকর্ষণ করিয়া লইবে—তোমার দাহনান্তে যাহা পড়িয়া থাকিবে, তাহার আকার গ্রন্থির মত বটে; কিন্তু বিবেকী দেখেন, এ গ্রন্থি শুধু ছাই—এক ফুঁতে উহা উড়িয়া যাইবে। গ্রন্থির আকার মাত্র আছে; কিন্তু বাঁধিবার শক্তি ভস্ম হইয়া গেছে। হে অগ্নি, হে গুরো, কঠিন কুটিল-বন্ধনের অন্তরে অন্তরে সঞ্চরণ করিয়া তুমি আমাদের বুঝাইয়া দাও—বন্ধন মিথ্যা—বন্ধন মায়া; এমনি করিয়া কুটিলতা হইতে আমাদিগকে বিযুক্ত কর।

তুমি গুরু,—আমরা শিষ্য; অতএব প্রপন্ন। তাই বারবার তোমাকে নমস্কার করি। বলিয়াছি, তুমি সুপথ দিয়া আমাদিগকে সম্পদের দিকে লইয়া যাও; আবারও বলিয়াছি, আমাদের কুটিলতার পাশ ছিন্ন করিয়া দাও। এ তোমার কাজ—তুমিই করিবে; আমাদের বলার অপেক্ষা না রাখিয়া তুমি করিবে। কিন্তু এখন আমাদের কাজ কি? আমাদের কোন্ সাধনে তোমার কাজের স্ফূর্ত্তি হইবে, তোমার শক্তি আমাদের মাঝে সঞ্চারিত হইবে?—সে সাধনা শরণাগতি; সে কর্ম্ম প্রণতি। "ভূয়িষ্ঠাং তে নমউক্তিং বিধেম"—এই আমাদের পরম কর্ত্তব্য। শুধু দেহের আনতি নয়—আমাদের "নম উক্তি" তুমি গ্রহণ কর—কায়ে এবং বচনে তোমায় প্রণাম জানাইতেছি—তুমি গ্রহণ কর। তোমার সেবাদ্বারা এবং তোমার গুণকীর্ত্তনদ্বারা তোমার "নম উক্তি" বিধান করিব—এই আমাদের সহজ কর্ম্ম। ইহাই যুগধর্ম্ম।

নববর্ষে নূতন উদ্যমে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। শ্রীগুরু ইহাকে জয়যুক্ত করুন। তাঁহারই ইচ্ছার জয় হোক, আমাদের কামনার জয় চাহি না। তাঁহারই প্রেরণায় কর্ম্ম করিতেছি। ভাল হউক, মন্দ হউক, কর্ম্মফল তাঁহার ইচ্ছাতেই প্রসূত—অন্তরে অন্তরে এইটুকু অনুভব করিয়া নিষ্কাম ও নিরভিমান হওয়াই কর্ম্মের সিদ্ধি। এই সিদ্ধি অবারিত সত্যস্বরূপ। অবিদ্যায় আবৃত আছি বলিয়াই তাহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না। অবিদ্যার জাল ছিন্ন হইয়া যাউক, এই যে প্রার্থনা হৃদয়কন্দর হইতে ধ্বনিত হইতেছে—ইহাই মুমুক্ষুত্ব। ইহাও বাসনা বটে, কিন্তু শুদ্ধ বাসনা সংসার বাসনার মত পঙ্কিল নহে, অধঃপাতক নহে। এই মুমুক্ষুত্বই সতী বাসনা—জগদম্বার স্বরূপ। শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী জগজ্জননী আমাদের অন্তরে স্ফুরিত হউন।

চিত্ত উদার হউক—জীবে শিবজ্ঞান হউক—এই চাই। ইহাই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এই শিক্ষা দিবার জন্যই মুমূর্ষু হইয়াও সে বাঁচিয়া আছে। পরস্পর ঈর্ষ্যায় কলহে জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। ঐক্যের সূত্রে ইহাকে গাঁথিবে কে? অন্তর্যামী বলিতেছেন—ভারতবর্ষ। বাহিরের দিকে চাহিয়া মনে হয়—এ ভারতবর্ষের স্পর্দ্ধামাত্র।

বীর্য্যহীন, শক্তিহীন, সহস্রের পদদলিত, আত্মবিচ্ছেদে জর্জ্জরিত ভারতবর্ষ—সে কি করিয়া জগতের গুরু হইবে, স্বয়ং অশক্ত হইয়া কি করিয়া অপরে শক্তির সঞ্চার করিবে? আপাতদৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় কিন্তু আশা বলিতেছে, ইহা অসম্ভব নয়। অন্তর্যামী বলিতেছেন, এই তোমাদের ব্রত। শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর। আত্মসমাহিত হইয়া অন্তরের শক্তিকে অনুভব কর। ভোগের সিদ্ধিতে তোমাদের সার্থকতা নয়, তোমাদের জীবনের সার্থকতা ত্যাগের সিদ্ধিতে। স্পর্দ্ধা দ্বারা কেহ কাহারও গুরু হইতে পারে না—মহৎ হৃদয়ের মমতাই গুরুত্বের নিদর্শন। ভারতবর্ষকে সেই মহত্ত্ব অর্জ্জন করিতে হইবে। অপ্রেম দ্বারা তাহা মিলিবে না—বীর্য্যশালী ঔদার্য্যদ্বারা তাহা সহজলভ্য হইবে। সমষ্টির পক্ষে যাহা নিয়তি—ব্যষ্টির কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে তাহা পূর্ণাঙ্গ হইয়া ফুটিয়া উঠে। অন্তর্য্যামীর প্রেরণাবশতঃ লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়াছি—এইবার পরিপূর্ণ প্রাণে তাহার পানে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

ওঁ শান্তিঃ।

——*——

"নোম্ লে লো!"

—*—

নামের একটা গল্প মনে পড়ল। ভারতবর্ষে একজন বিখ্যাত সাধু ছিলেন সত্যে পূর্ণ, ভগবানে আত্মহারা তিনি। রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে তিনি প্রাণপণে চীৎকার করে বলতেন, "ওরে, তোরা ভগবান কিনবি কে, শিগ্‌গির চলে আয়।" রাস্তায় রাস্তায় তিনি ভগবানের ফেরী করতেন। "ভগবানকে কিনে রাখবি যারা, দিব্য অনুভূতি পেতে চাস যারা—চলে আয়! সংসারভারে আতুর যারা চলে আয়!" কথাগুলো অবশ্য তিনি মাতৃভাষাতেই বলতেন। সে ভাষায় ভগবানকে বলে "নোম।" সাধু রাস্তায় চীৎকার করছেন, "নোম লে লো!" অর্থাৎ "আমি কিছু বেচতে এনেছি। তোমরা কিনে নাও এসে। আমার পণ্য হচ্ছে ভগবান্।" কিন্তু নোম কথাটার দুটো অর্থ। এক হচ্ছে ভগবান্ আর এক হচ্ছে—সুন্দর মণিহার। কিন্তু সাধু নোম বলতে ভগবানকেই লক্ষ্য করে ছিলেন—হারের কথা মনে করে বলেন নি। এক দিন রাস্তায় সাধু "নোম" ফেরী করে বেড়াচ্ছেন, এমন সময়ে এক ভদ্রলোক তাঁর ডাক শুনতে পেয়ে ভাবলেন, আমার তো একটা হারের দরকার ছিল; বোধ হয় এই লোকটা কোনও জহুরীর কর্ম্মচারী—এর কাছে হয়ত হার কিনতে পাব।

ও দেশে বিয়ের সময় বরকে বা কনেকে সাজাবার জন্য দামী দামী অলঙ্কার প্রয়োজন হয়। লোকটী জিজ্ঞাসা করল, সাধু কোথায় থাকেন। তারপর তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সে তো একেবারে অবাক্। ফেরীওয়ালার বাড়ী একেবারে সাধারণ। যে হার বিক্রী করে, তার বাড়ী এমন হয় কি করে?

এই ভেবে সে আশ্চর্য্য হল। বাড়ীতে গিয়ে লোকটী ফেরীওয়ালার দেখা পেল না। ডাকহাঁক করতে একটী ছোট্ট সুন্দর মেয়ে বেরিয়ে এল। বাড়ীর কর্ত্তা কোথায় জিজ্ঞাসা করতে মেয়েটী বলল, "বাবা তো বাড়ী নেই, সন্ধ্যা বেলা আসবেন। তাঁর কাছে আপনার কি দরকার, বলতে কোনও বাধা আছে কি?" মেয়েটির কথাগুলো লোকটার ভারী মিষ্টি লাগল—ইচ্ছে হল তার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলে। তাই আলাপ করবার ছলে বল্‌ল যে, সে তার বাবার কাছে "নোম্" কিনতে এসেছিল। মেয়েটী একটু হেসে বলল, "সে তো সোজা কথা—আমি আপনাকে নোম্ দিতে পারি।" লোকটী বল্‌ল, "আচ্ছা, আমি তাহলে বসলাম।" মেয়েটী ভিতরে চলে গেল, লোকটী বাইরে বসে থাকল।

তারপর সে বসেই আছে, বসেই আছে। কিন্তু মেয়েটী আর বাইরে আসছে না। লোকটার ভারী রাগ ধরে গেল। মাটীর নীচে থেকে হারটা খুঁড়ে তুলতে না হয় বিশ মিনিটই লাগুক! বিরক্ত হয়ে সে ঘরের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে, মেয়েটী একটা মস্ত ছুরীতে ধার দিচ্ছে। লোকটী বলল, "ওকি হচ্ছে? ও কি ছেলেখেলা আরম্ভ করেছ বাছা? ভদ্রলোকের সঙ্গে তামাসা করতে আছে? আমাকে কি বোকা ঠাউরিয়েছ? একি তোমার ছেলেখেলার সময়? একবার এস তো এদিকে—তোমার বাবা হারটা কোথায় পুঁতে রেখেছে বল তো!" মেয়েটী হেসে বলল, "মাপ করবেন—এই একটু অপেক্ষা করুন—আমি এক্ষুনি আসছি।" "তা চলেই আস না কেন! ও ছুরীটায় ধার দিচ্ছ কোন্ কাজে?" "আপনি নোম নিতে এসেছেন না?" "হাঁ। নোম নিতেই তো এসেছি। আগে মালটা আমায় দেখাও, আমি জহুরীদের কাছে যাচাই করে তার দরটা ঠিক করে আনি!" "আমাদের নোম তো এমন জিনিস নয় যে জহুরী দিয়ে বা যার তার কাছে তার যাচাই হবে। আমাদের নোম বহুমূল্য বস্তু; আগেই তার দাম ঠিক হয়ে আছে তার দাম যাচাই হতে পারে না। দাম একেবারে ঠিকঠাক্ হয়েই আছে।" "বটে? আচ্ছা তবে নিয়ে এসে মালটা দেখ। ও ছুরীটা রেখে দাও।" "কিন্তু আপনাকে যে আগে দাম দিতে হবে, তারপর নোম্ পাবেন।" "তবে ছুরীটাতে ধার দিচ্ছ কেন? তুমি আমায় খুন করবে নাকি?" মেয়েটী অতি সহজ সুরে বলল, "নোমের দামই যদি না জানেন, তবে এখানে এসে ছিলেন কেন? জানেন না, নোম্ পেতে হলে জীবন দিতে হয়। জীবন পণে নোম মিলে। যে জীবন আঁকড়ে রাখতে চায়, সে নোম হারায়!"

আরবীতে একটা কবিতা আছে, তার অর্থ এই—"গোরে শোবার আগেই মরে থাক, তাহলে এই জগতই স্বর্গ হবে।" ঠিক এই ভাবের অনুরূপ সংস্কৃতেও অনেক কবিতা আছে।

তোমার সমস্তটা জীবন যখন জগৎ থেকে বিমুখ হবে, যখন জগতে থাকলে দুঃখই পাবে, জগতের মাঝে জীবন্মৃত হয়ে থাকবে, তখনই তুমি বাঁচবে। প্রচারকের ফাঁকা বুলিতে ভুলে যেও না। রাম তোমাদের খাঁটী কথা বলছেন, তোষামোদ করছেন না। বেদে একটী সুন্দর কবিতা আছে, তার তাৎপর্য্য কতকটা এইরকম—

"মানুষের দেহ যেন একটা দুর্গ, আর ইন্দ্রিয়গুলি দুর্গপ্রাচীরের ছিদ্রের মত। এই সব ছিদ্রে বন্দুক, কামান বসিয়ে আমরা ভিতর থেকে গুলি ছুঁড়ি আর সেগুলো বাইরে ছিটকে পড়ে। তেমনি তোমার ভিতর থেকেই দর্শকের উপর দৃষ্টির গোলাগুলি ছিটকে পড়ে; কাণের ছিদ্রপথে চিন্তার জাল ছিটকে পড়ে। দুর্গের কারিগর আত্মা কিন্তু মানুষকে বড় ফাঁকি দিয়েছেন। ভিতর থেকে বাইরে জাল ছুটে যায়, আর মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ে। মানুষ ভাবে, সে জগৎটাকে মুঠোয় এনেছে—তারই জিৎ। ভাবে, তার রাজ্য বাড়ছে, কিন্তু বাস্তবিক সে নিজকে হারাচ্ছে। দুর্গে বসে মানুষ মনে করে, সে জ্ঞান লাভ করছে, জগৎ জয় করছে, কিন্তু বাস্তবিক সে তার আত্মাকে উপবাসে খিন্ন করছে। কঠবল্লীতে আছে—"কামান বন্দুকের মুখ ঘুরিয়ে ভিতরমুখে যে চালাতে পারবে, সেই জগৎ জয় করবে। যার চোখ বাইরের দিকে না তাকিয়ে ভিতরের দিকে তাকায়, সে চোখের কারণকে দেখতে পায়। যার কাণ পরাবৃত্ত হয়ে শ্রবণের কারণরূপে আত্মাকে শুনতে পায়, যার মন অন্তর্মুখী হয়ে মনের নিদানশক্তির সন্ধান পায়, সেই জগজ্জয়ী।"

ভিতরের দিকে তাকাও তো! চোখ দেখে, কাণ শোনে, চুল বাড়ে—কিসের জোরে? আত্মার মহিমায়। এ কথা কত সোজা। মুহূর্তের জন্যও যদি এই ভাবনায় ভাবুক হতে পার, তাহলে দেখবে, তুমি যে শিব ছাড়া আর কিছুই নও! শিবস্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি কর—জগতের কর্তা, ধর্তা, সম্রাট হবে। কিন্তু জীবন ক্ষয়ে যায়, মরণ আসে। বীজ অঙ্কুরিত হতে হলে তার ধ্বংস প্রয়োজন। তেলসলিতা পুড়লে তবে আলো জ্বলে। কাজেই শিবস্বরূপ হয়ে বাঁচতে হলে মিথ্যা আমি, ক্ষুদ্র আমি, বহির্মুখী আমির ধ্বংস করতে হবে।

ও যাঃ—গল্পটা যে ভুলে গেলাম! তার পর সেই মেয়েটী বলল, "আপনি যদি মোম্ চান (মোম্ মানে সে ধরেছে ভগবান্ আর লোকটী ভেবেছে হার), তাহলে এই ছুরী দিয়ে আপনার মাথাটী কেটে ফেলতে হবে। তা না হলে তো মোম্ পাচ্ছেন না।" নির্ভীক ভাবে হেসে হেসে একটুও সঙ্কোচ না করে মেয়েটী কথাগুলো বলে ফেলল। তার কথা শুনে খরিদ্দার তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছে। সে এমন চীৎকার-গণ্ডগোল আরম্ভ করল যে, চারদিকে লোক জড় হয়ে গেল। সকলের কাছে সে বলতে লাগল, "দেখুন মশাই, এই বাড়ীটাতে খুনে ডাকাত থাকে মশাই—খুনে ডাকাত! আর ডাকাতের সর্দ্দার হচ্ছে এই মেয়েটার বাপ। এ ব্যাপার নিয়ে আদালত করা উচিত। এখনি পুলিশে খবর দেওয়া হোক।" সবাই বলল, "ও কথা বলবেন না মশাই, এই মেয়ের বাপের মত ধার্ম্মিক লোক সচরাচর দেখা যায় না" ইত্যাদি। লোকটা বলল, "ও আমি ঢের দেখেছি মশাই—যারা যত ধার্ম্মিক, তারাই তত পাজী হয়। ওরা কোনও কালে ভাল লোক নয়; ধর্ম্মের নামে পাপ করে পেট চালায়।"

সবাই মিলে কথা বলছে, আর গণ্ডগোল করছে, এমন সময় মেয়ের বাপ এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখতে পেয়েই লোকটা একেবারে তাঁর টুঁটি চেপে ধরতে যায় আর কি! সাধু কিন্তু স্থির অচঞ্চল হয়ে রইলেন, আর লোকটা কর্কশ ভাষায় তাঁকে বলতে লাগল,

"ছেলেমেয়েকে শুদ্ধ মানুষ খুন করতে শিখাচ্ছ! নিজে তো গেছই, ছোট থেকে ছেলেমেয়ে-গুলোকে পর্য্যন্ত খুনে করে তুলছ!" সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, মশাই, কি হয়েছে? ব্যাপার কি?" সমস্তটা ব্যাপার শুনে সাধুর হৃদয় আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল, তাঁর মাঝে অনুভূতির দিব্যস্রোত বইতে লাগ্‌ল, তিনি ব্রহ্মভাবে বিভোর হয়ে গেলেন, মুক্তার মত চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগ্‌ল। তিনি বল্‌তে লাগলেন, "হে ভগবান্, হে দেবগণ, হে ঋষিগণ, দেখুন, ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে। আজ কি জগতের এতই দুর্দ্দশা হয়ে গিয়েছে, ভগবানের নাম শিশুর খেলনা হয়েছে—তার বিনিময়ে এই তুচ্ছ জিনিষ পাওয়া যায়?" মেয়ের দিকে দেখিয়ে বললেন, "অবোধ শিশু ভগবৎমহিমা প্রচারের ভার নিয়েছে বলে ভগবান্ আজ এত সস্তায় বিকাচ্ছেন। একটা মাথার দরে বা বুকের দরে অমৃত বিকাচ্ছে—এ কি অমৃতের ন্যায্য দাম? আহা, শিবস্বরূপ—অমৃতস্বরূপ—সে যদি একটা জীবনের পরিবর্ত্তে পাওয়া যায়, তাহলে সেটা কি বড় বেশী দাম হল? সত্যের একটু আভাসের জন্য লক্ষ লক্ষ জীবনের সৃষ্টি প্রলয় হোক্। এক মুহূর্ত্ত ভগবানের সঙ্গ পাওয়ার জন্য অগণিত জীবন ধ্বংস হয়ে যাক—অগণিতবার শিরশ্ছেদ হোক!"

সাধু এমন ভাবে কথাগুলো বললেন যে খরিদ্দারের প্রাণ গলে গেল। লোকে দেখে তাজ্জব মান্‌ল। এতদিন পরে তারা বুঝ্‌তে পারল, মেয়ে আর মেয়ের বাপ নোম বল্‌তে অতি মধুর একটা পরম বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করতেন; আর তাদের বুদ্ধি জড়ের মোহে এত আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে তাঁদের কথার তাৎপর্য্যই তারা ধর্‌তে পারে নি।

অমৃতের আস্বাদ পেতে হলে কি দাম দিতে হবে, এই গল্পটায় তাই শুন্‌লে। সত্যোপলব্ধির এই এক দাম—এর উনিশবিশ নাই।

সংসারসুখ ভোগ করবে, তুচ্ছ, ঘৃণিত, স্থূল ইন্দ্রিয়বাসনায় জর্জ্জরিত হয়ে থাক্‌বে, অথচ শিব হবার দাবী কর্‌বে—এ কিছুতেই হতে পারে না।

এই তো জহুরীর দোকানে এসেছ। জহর কিন্‌তে হলে, জীবনের পরমকাম্য অমৃতের আস্বাদন পেতে হলে শির দিতে হবে, নীচ প্রবৃত্তির বিনাশ করতে হবে। এ দাম যদি না দিতে পার—চলে যাও এখান থেকে! সে পূর্ণ স্বরূপানুভূতি পাচ্ছ না কেন? দাম দিচ্ছ না বলে। দাম ফেলে দাও—আর তখনি অমৃতের পেয়ালায় চুমুক দাও।*

---

* স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, কালিফোর্ণিয়া, —ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩)

অভিভাষণ*

—*—

[শ্রীহরপ্রসাদ রায়চৌধুরী]

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি॥
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি॥

প্রেমাস্পদ ভ্রাতৃগণ! আজ এই পুণ্য মুহূর্ত্তে আপনাদিগকে এই সম্মিলনক্ষেত্রে সাদর আবাহন করিতেছি। আজ যে মহৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া, জগৎ জীবের মঙ্গল ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, আপনারা নানাবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছেন;—আজ যে মহাভাবের প্রেরণায়, যে কর্ম্মের প্রসার কামনায় সমবেত হইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বর্ত্তমান আত্ম সুখ-পরায়ণতার যুগে সুদুর্ল্লভ। কর্ম্মসূত্রে যাহা গ্রথিত, প্রেমে যাহার পুষ্টি, জ্ঞান যাহার জীবনী শক্তি, সেই সেবা ধর্ম্মের সাধক আপনারা। আপনাদিগকে কিরূপ বাক্যে বা ছন্দে অভিনন্দিত করিব, তাহার ভাষা পাইতেছি না, লেখনী ভাব প্রাচুর্য্যে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে।

প্রায় অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের হৃদয়-দেবতা গারো পাহাড়ের অন্তরালে ধ্যানস্তিমিত লোচনে জীবের মঙ্গলচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিয়া যে কর্ম্মপদ্ধতি মানসপটে প্রতিফলিত দেখিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে। আজ সেবাধর্ম্ম, আধুনিক যুগের শিক্ষার পুনঃ প্রবর্ত্তনে ও নারায়ণ জ্ঞানে জীবসেবায় প্রকাশিত হইতেছে। বিশ্ববিজয়ী প্রেমিক সন্ন্যাসী ভারতের গৌরব স্বামী বিবেকানন্দ একদিন জগৎবাসীর নিকট এই সেবাধর্ম্মই মুক্তির একমাত্র সোপান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এইরূপে যুগাবতারগণ দুঃস্থ জীবগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া যুগে যুগে সত্যধর্ম্মেরই প্রচার করিয়া থাকেন। আমাদের গুরু মহারাজ তাঁর একখানি পত্রে সেবাধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বৎস! তোরাই যে আমার সব। তোদের ছাড়িয়া নিজকে ভাবিতে গেলে এক অপদার্থ কৌপীনমাত্রসম্বল সন্ন্যাসী ভিন্ন কিছু থাকে না। তাহা দ্বারা কোন কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। তাই আমি তোমাদের মধ্যে আত্মসংমিশ্রণ করিয়া যতদিন স্থূলদেহে থাকি, ততদিন আমার ন্যায় নিরাশ্রয় দীনহীনের সেবা করি, যাদের ভালবাসি তাদের জোর করিয়াও এই পথে টানিয়া আনি। কারণ ভগবৎ-স্বরূপ্য লাভ করিতে হইলে ভগবানের জগৎ-সেবার আদর্শ সাধকের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা আত্মস্বার্থমূলক তপ, জপ, পূজা লইয়া কেবল ভণ্ডামী করুক; আমার শিষ্যের যেন এরূপ বুদ্ধি না হয়! তাহাদের মূল লক্ষ্য আমিত্বের প্রসার—কীট হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আমিত্বের প্রসার করিতে হইবে। সাধারণের

* রাজসাহী-বিভাগীয় ভক্তসম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতিরূপে লেখকদ্বারা পঠিত।

আমিত্ব যেমন নিজদেহে, বড় জোর স্ত্রী পুত্রের মধ্যে ডুবিয়া আছে, কিন্তু তোমাদের আমিত্বে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া যাইবে। আমার ইহাই আশা ও আশীর্ব্বাদ।”

ধর্ম্মমূলক শিক্ষার অভাবই আমাদের যত প্রকার অভাবের ও দুর্ব্বলতার সৃষ্টি করিয়াছে। এই শিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হইলে ভারতীয়ের অস্তিত্ব রক্ষা করা সুকঠিন। তাই ঋষিগণের আদর্শে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান “ঋষি বিদ্যালয়” নামে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আত্মপর ভুলিয়া জীবসেবার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার সহিত সেবাশ্রম রক্ষিত হইয়াছে। জগৎ হিতকর এই প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠ ও রক্ষা করা এক্ষণে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও সত্যধর্ম্মলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা আজ যাঁহার আবাহনে মিলিত হইয়াছি, যাঁহার নামে প্রাণে প্রাণে সংমিশ্রিত হইয়া সকলের ভিতর একত্ব ও একপ্রাণতা অনুভব করিতেছি, তাঁহার এই মহান্ কার্য্য জগতে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই আমাদের সকলপ্রকার সাধনভজনের ফল লাভ হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় প্রাণে বিবেক বৈরাগ্য আপনি জাগিয়া উঠিবে, হৃদয়ে বল ও মনে উৎসাহ ফুটিয়া উঠিবে, কর্ম্মপ্রবণতা বাড়িয়া যাইবে, আর সত্যস্বরূপ প্রেমের দেবতা প্রকটিত হইয়া আমাদের মোহান্ধকার দূর করিয়া দিবেন। আমরা যে অভয় চরণতরণী আশ্রয় করিয়া কর্ণধারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া আছি। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। এক্ষণে বিশ্বাস ও নির্ভরতার সহিত স্থির থাকিতে পারিলেই যথাসময়ে আমরা ভবনদী পাড়ি দিব সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরমহারাজ বলিয়াছেন, তাঁহার তিন প্রকারের শিষ্য আছে। যথা—

১ম শ্রেণী—গুরুকরণ দরকার মনে করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। দীক্ষার পর আর তাহাদের খোঁজখবর নাই।

২য় শ্রেণী—দীক্ষা গ্রহণ করিয়া খুব জাঁকজমকের সহিত সাধনভজন করিতেছে এবং নানাপ্রকার ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেছে।

৩য় শ্রেণী—দীক্ষার পর, বা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং তাঁহার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া তাঁহার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

ঠাকুরমহারাজ কিন্তু তাঁহার এই তৃতীয় শ্রেণীর ভক্তগণকেই অন্তরঙ্গ প্রেমিক ভক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহাদের উপরেই তাঁহার কার্য্যের জন্য নির্ভর করিতেছেন।

আজ যে সকল ভক্ত তাঁহার কার্য্যের প্রসারবাসনা পরিচালিত হইয়া এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্বোল্লিখিত ৩য় শ্রেণীর ভক্ত সন্দেহ নাই।

আপনারা সকলেই জানেন, “মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং” অর্থাৎ শ্রীগুরুর বাক্য বা আদেশই মন্ত্রের মূল। অর্থাৎ তাঁহার আদেশ পালন করা বা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে আত্মনিয়োগ করাই প্রকৃত সাধন এবং এইরূপ কর্ম্মীই প্রকৃত শিষ্য। যদি ইহাই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য সত্য হয়, তবে তিনি মঠের উদ্দেশ্য প্রচার পুস্তিকায় তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতির যে আভাস দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করাই প্রকৃত গুরুভজন ও সাধনা। তাঁহার ইচ্ছা যে, প্রথমতঃ বিভাগীয় আশ্রমকে আদর্শে পরিণত করা এবং ক্রমে প্রত্যেক জেলায় ও বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রামে আদর্শ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করা।

বগুড়াস্থ কয়েকজন শিষ্য ও ভক্তের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৩২৬ সালের ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কয়েক বৎসরে ইহা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ-বর্ণিত আদর্শে ইহা পরিণত করিতে একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও যথেষ্ট অর্থের আবশ্যক। ঠাকুর মহারাজ বলেন, "জগতে অর্থের অভাব নাই, ঝেঁটিয়ে আনিতে পারিলেই হয়। আমি চাই প্রাণ, এমন লোক চাই, যারা প্রাণ দিয়াও কার্য্য উদ্‌যাপন করিতে পারে।"

আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এই অমূল্য বাণীর সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিতে পারিতেছি। আমরা সকলে মিলিয়া যদি সমবেত ভাবে এই আশ্রমের উন্নতিকল্পে আত্ম-নিয়োগ করি, তবে ইহা পূর্ণ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে কতক্ষণ লাগে ? আমরা প্রত্যেকেই যদি মনে করি যে, আমি না হইলে, আমি না খাটিলে ঠাকুরের এই আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার আর কেহ নাই, তবে ঐরূপ আদর্শ আশ্রম প্রস্তুত করিতে ক'দিন লাগে ? আর যদি পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্যের পরিসমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করি, তবে দুধের পুষ্করিণী জলে ভরা ভিন্ন অন্য সুফলের কোন আশা নাই। তাঁহার ইচ্ছায় কোন কার্য্যই পড়িয়া থাকিবে না। আমরা জন্মান্তরীণ সৌভাগ্যের ফলে কর্ম্মসাধনার এই শুভ অবসর পাইয়া, নিষ্কাম কর্ম্মসাধনার এই মঙ্গল মুহূর্ত্ত লাভ করিয়া, তাহা কি হেলায় হারাইব ? আমরা প্রত্যেকেই প্রাণ পণ করিয়া এই জগৎ-হিতকর সুমহৎ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিব। আসুন, আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প হই, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" —শ্রীগুরুর কার্য্যের উদ্‌যাপন বা দেহের ক্ষয়, এই মহাভাবে আমরা উদ্বুদ্ধ হই। গুরুদেব আমাদেরে আশীর্ব্বাদ করুন।

এক্ষণে এই আশ্রমটীর উন্নতি ও রক্ষাকল্পে কিরূপ অর্থের দরকার, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র অভি-ভাষণের উপসংহার করিব।

আশ্রমে সেবা ও শিক্ষা এই দুইটি বিভাগ। সেবাবিভাগের জন্য বর্ত্তমান-গৃহাদিই যথেষ্ট। কিন্তু এই বিভাগ পরিচালনার জন্য যে অর্থের দরকার, তাহার কোন ব্যবস্থাই নাই। বরং ৬০০৲ ছয় শত টাকার দেনা আছে। অন্ততঃ ১০টী রোগী রাখিয়া চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করিতে গেলে মাসিক গড়ে ১০০৲ টাকা দরকার। এতদ্ব্যতীত ঔষধ ও ডাক্তারের ব্যবস্থার জন্যও ৮০০৲ টাকার দরকার। মোট বার্ষিক ২০০০৲ দুই হাজার টাকা দরকার।

নূতন যে জমি খরিদ করা হইয়াছে, তথায় শিক্ষা বিভাগ ও সেবকগণের গৃহাদি নির্ম্মাণ বাবদ অনূন ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকার আবশ্যক। ১টি বালকের শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা প্রয়োজন। সুতরাং দুই বিভাগে একত্রে বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা ও এককালীন খরচের জন্য দশ হাজার টাকার দরকার

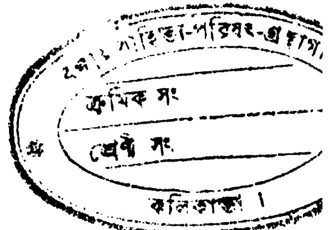
এই অর্থ সংগৃহীত হওয়া সময় ও শ্রম সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এই রাজসাহী বিভাগের প্রায় দুই শত কর্ম্মী প্রত্যেকে যদি গড়ে মাসিক ১৲ টী টাকা আশ্রমের জন্য ব্যয় করি তবে প্রায় আড়াই হাজার টাকা হইতে পারে। এবং প্রত্যেক জেলায় জেলায় যে সকল সদাশয় জমিদারগণ আছেন, তাঁহাদের নিকট মাসিক সাহায্য

সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে এক হাজার টাকা সহজেই সংগৃহীত হইতে পারে। এককালীন খরচের জন্য ভিক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ গ্রামে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন করেন এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দান সংগ্রহ করেন, তবে সম্বৎসরের মধ্যে এই দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইতে পারে। এই সৎকার্য্যে দান করিতে দেশের কোন লোকই —হিন্দু মুসলমান কুণ্ঠিত হইবে না। এই কার্য্যে আবশ্যকীয় অর্থ অবশ্যই সংগৃহীত হইবে। শ্রীগুরুর কার্য্য কখনই পড়িয়া থাকিবে না; কারণ এই আদর্শই বর্ত্তমান যুগে মানুষ গড়ার প্রকৃত উপায়। এক্ষণে চাই প্রাণ, চাই নিষ্ঠা, চাই একপ্রাণতা, প্রেম, প্রীতি এবং ভালবাসা।

ভাই সব, আমরা যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, ইহা জগতের যে কোন বন্ধন অপেক্ষা দৃঢ়তর; ইহা জগতের যে কোন শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আসুন, আমরা সকলে একমনে একপ্রাণে শ্রীগুরুর জয়গান করিয়া তাঁহার কার্য্যে দেহ, মন, প্রাণ, সমর্পণ করি। ভয় নাই! ভয় নাই! তিনি আছেন, তাঁর কার্য্য তিনিই করিবেন, আমরা কেবল তাঁর নিমিত্তমাত্র হই।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ



হিন্দুধর্ম্ম ও অস্পৃশ্যতা

[শ্রীশিশিরকুমার বসু বর্ম্মণ বি. এ.]

হিন্দুধর্ম্মের মূল মন্ত্র "একমেবাদ্বিতীয়ম্" হওয়ায় অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত মূলে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকিলেও, স্থূলে শ্রীভগবান অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিধায় হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি মৌলিক বিশেষত্ব যাহা আছে, তন্মধ্যে জন্মান্তরবাদ প্রধান। জন্মান্তরবাদরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর হিন্দুধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। হিন্দুধর্ম্ম বলিতেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বৈদেশিক ভাবুক সার জন উড্‌রফ্‌ নিম্নলিখিত ভাবে সহজ, সরল ও দৃঢ়রূপে বুঝিয়াছেন—

"সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দেশবাসী জন্মান্তর বিশ্বাস করে না বলিয়া জাতিভেদপ্রথা তাহাদের নিকট কঠোর বলিয়া বোধ হয়। মানুষ শুধু একটা জন্ম লইয়াই আছে, ইহাই তাহাদের ধারণা। কিন্তু হিন্দুর বিশ্বাস, বর্ত্তমান জন্মে মানবাত্মা যে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলরূপে সঞ্চিত পাপ বা পুণ্য দ্বারা নিরূপিত; সুতরাং বিশেষ একটা জন্মে মানুষের জাতি পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। তবে হীনজাতি হইলেও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও আত্মোন্নতি দ্বারা ভবিষ্যতে উচ্চবর্ণে জন্ম গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সে অর্জ্জন করিতে পারে। টাকাপয়সা বা সামাজিক মর্য্যাদা আছে বলিয়াই কোন জাত বড় হয় না। এই সমস্ত তুচ্ছ কারণে

পাশ্চাত্য সমাজে মানুষের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে বটে। কিন্তু ভারতবর্ষে দরিদ্র বলিয়া বা হীনকর্ম্ম করে বলিয়া পাশ্চাত্য দেশের মত কেহ তাহাকেও অবজ্ঞা করে না। বর্ত্তমান জাতি পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পাপপুণ্যের পরিমাণ সূচক রূপেই গৃহীত হইয়া থাকে।"

হিন্দুধর্ম্ম জগতের অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনাকেও দৈব বলিয়া নির্দ্দেশ করে না। প্রত্যেক ঘটনার সহিত একটা কারণের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। জন্মের পশ্চাতে পূর্ব্ব কর্ম্মরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং কর্ম্মানুসারেই জন্মাদি লাভ হয়। কেবলমাত্র স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারাই নিজ নিজ উন্নতিলাভে সিদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু কদাপি স্বধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ উচ্চবর্ণের ধর্ম্মাচরণে অধিকার বা যোগ্যতা লাভ না করিয়া যদি তাহাতে আকৃষ্ট হয়, তবে তাহা "ভয়াবহ।" কারণ সকলেই যদি মস্তিষ্ক চালনা করে বা সকলেই যদি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হয় বা কৃষিকর্ম্ম বা পরিচর্য্যাপরায়ণ হয়, তবে সমাজ কখনই পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম পালনে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে। তবে যাহারা কৃষিকর্ম্ম বা পরিচর্য্যা করিতেছে, তাহারা যদি নিজ কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া উচ্চাঙ্গের ধর্ম্মালোচনাতৎপর হয় এবং তাহাতে যোগ্যতা লাভ করে, তবে তাহাদের আত্মদর্শনের অধিকার হয়। কারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনে ক্রমশঃ আত্মদর্শনের অধিকার আনয়ন করে এবং এই অধিকারের জন্যই স্বধর্ম্মপালন অবশ্য কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে মানবসমাজে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। ব্যাস, বশিষ্ঠ, কণাদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি স্বধর্ম্মপালন করিয়া স্বীয় যোগ্যতায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া ব্রাহ্মণের শীর্ষস্থানীয় হইয়া মানবসমাজ পরিচালনা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও এই শ্রেণীর, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে এবং সে যে বর্ণেরই হউক; এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইবামাত্রই তিনি ব্রাহ্মণ, কারণ "ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ।" এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সমাজশাসন মানবের মঙ্গলেরই নিমিত্ত। বৈদেশিকগণ যদিও বলিয়া থাকেন যে, হিন্দুধর্ম্মের বর্ণবিভাগ অনতিবর্ত্তনীয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতার সহিত অনতিবর্ত্তনীয়তা অন্তর্হিত হয়। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ এবং ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মে অনতিবর্ত্তনীয়তা বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না। সমস্তই গুণ ও কর্ম্মানুসারে শাসিত হইত। তাহার উদাহরণ শ্রীভগবানের জাম্ববতীকে বিবাহ, অর্জ্জুনের উলূপীর, শান্তনুর দাসরাজকন্যার, পরবর্ত্তীকালে বাপ্পারাওর নোশেরার ও চন্দ্রগুপ্তের সেলুকাসের কন্যার পাণিগ্রহণ। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কতকগুলি কারণে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি পর্য্যন্ত মুহুর্মুহুঃ নড়িয়া উঠিতেছিল। তদ্ধেতু হিন্দুসমাজের গণ্ডী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করিতে সমাজপরিচালকগণ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ বিধর্ম্মী বৈদেশিকগণের আক্রমণে, তাহাদের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবার ভয়ে সমাজের গণ্ডী ক্রমশঃ ছোট করিয়া কতকগুলি বিধান অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কারণ যখনই দুইটী ধর্ম্মের ভিতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্ম সজীব থাকে। আর যদি উভয় ধর্ম্মে সংঘর্ষ না হয়, তবে একটা আর একটাকে গ্রাস করে। ধর্ম্মের সজীবতা জাতিগত প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করে। এই জাতিগত প্রতিযোগিতা ভগবদিচ্ছায়ই হইয়া

থাকে; কারণ বিভিন্ন ধর্ম্মে বিভিন্ন ভাব তাঁহারই বিচিত্রতা মাত্র। সময়ের কুটিল প্রবাহে জাতিগত প্রতিযোগিতা পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাওয়ায় ধর্ম্মের গুণগত শ্রেষ্ঠতা বিলুপ্ত হইয়া জন্মগত হইয়া, যাহা অতিবর্ত্তনীয় ছিল, তাহা অনতিবর্ত্তনীয় হইয়া দাঁড়াইল এবং অস্পৃশ্যতার আস্তরণপটের অন্তরালে হিন্দু আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইল। তখন অস্পৃশ্যতার পূর্ব্ব স্নিগ্ধতা হারাইয়া হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণার উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্ব্বে যে অস্পৃশ্যতা হিন্দু-ধর্ম্মে ছিল না, তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে বর্ত্তমানে যে ভাবে অস্পৃশ্যতা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, এরূপভাবে কদাপি ছিল না। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।
সর্ব্বভূতাস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।"

—ইহা সনাতন ধর্ম্মের পূর্ণভাব—ইহার ভিতর অস্পৃশ্যতার ছায়ামাত্র নাই। কিন্তু আত্মজ্ঞান চর্চ্চার সময়মাত্র তিনি অধিকারিভেদ নির্ণয় করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন।

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

অর্থাৎ নিম্নস্তরের অজ্ঞানান্ধ মানব যেরূপ ভাবে সকাম কর্ম্মে আসক্ত হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছায় নিজেকে লইয়াই কেবল ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, তাহাদিগকে যদি শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান বা নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেওয়া যায়, তবে তাহারা এই শ্রেষ্ঠ বিষয়ে অনধিকারী হওয়ায় ধারণা করিতে না পারায় কর্ম্মশূন্যাবস্থায় কাটাইবে—সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে এবং তাহাদের উন্নতি বহুদূর পশ্চাতে পড়িবে। কারণ নিজ নিজ কর্ম্মসাধনায় উচ্চ কর্ম্মসাধনার যোগ্যতা ও অধিকার হয়।

মনু স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন—

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যান্নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতং।
ন চাস্যোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥

এইক্ষণ দেখিতে হইবে যে মনু কি হিংসা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ বলিয়াছেন—কিম্বা ইহার ভিতর কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। "মতি" অর্থে আত্মজ্ঞানে মতি; "ধর্ম্ম" অর্থে যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধারক, তাঁহার জ্ঞান। শূদ্র বা অপর জাতি যেরূপ স্তরের, তাহাতে তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া উচ্চস্তরের উপযুক্ত হইতে পারে মাত্র এবং তখন মাত্র তাহারা আত্মজ্ঞানে মতি দেওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা সাধারণের জন্য কখনও প্রযোজ্য হইতে পারে না এবং বিধান সাধারণের জন্যই বিধি-বদ্ধ হইয়া থাকে।

বেশ, যদি আত্মজ্ঞান শুধু গুণকর্ম্মনিষ্ঠ সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ও আত্মজ্ঞানলিপ্সু ভিন্ন অপরকে না দেওয়া যায় এবং তাহাতে সমাজের উন্নতি বই অবনতি না হয়, তবে মনু

"ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।
মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ॥"

এ কথা পূর্ব্বেই বলিলেন কেন?

এ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে কিসের উপাসনা করেন, কোন গুণোৎকর্ষ করিবার জন্য তাঁহারা সমস্ত জীবনই আত্ম-শাসন করিয়া থাকেন।

মানব সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত, যথা তামসিক, রাজসিক, মলিনসাত্ত্বিক ও শুদ্ধ-সাত্ত্বিক। হিন্দুগণের লক্ষ্যই শুদ্ধ সত্ত্ব বা দেবত্ব। উচ্চবর্ণের হিন্দু সাধারণতঃ মলিন সত্ত্বপ্রধান। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নিম্নলিখিত ভাবে মলিন সত্ত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন—

"মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ
স্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ॥"

অর্থাৎ স্বাভীষ্ট দেবদেবীর পূজার্চ্চনা, যম নিয়মাদি যোগানুষ্ঠান, শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হইয়া মুক্তি ইচ্ছুক হইয়া কুকর্ম্ম হইতে সুকর্ম্মে প্রবৃত্তি, প্রভৃতি মলিন সত্ত্বের লক্ষণ।

এই সমস্ত মলিন সত্ত্বপ্রধান লোকই শুদ্ধ সত্ত্বে পৌঁছিতে চাহিতেছেন অর্থাৎ যে অবস্থায় পৌঁছিলে দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হয়, সেই অবস্থা বা ভাব, যাহাকে ভগবদ্ভাব বলা হয়—সেই ভাবে বিভোর হইয়া সমষ্টি আনন্দে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চাহিতেছেন। সেই অবস্থা লাভ করিতে হিন্দুদের প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কর্ম্মে তাঁহার উপাসনা করা চাই। শয্যাত্যাগ হইতে পুনরায় শয্যা গ্রহণ পর্য্যন্ত হিন্দুর নানা কর্ম্ম, সমস্তই একটানা উপাসনা। হিন্দুর প্রাতের ও মধ্যাহ্নের আন্তর উপাসনার পর স্বহস্তে রন্ধন প্রয়োজন শুধু দেবসেবার জন্য। নিবেদিত অন্নই তিনি গ্রহণ করেন তিনি ভগবানকে নিবেদন করেন শুধু সত্ত্বগুণপ্রবর্দ্ধক দ্রব্য। আবার এই সত্ত্বগুণ-প্রবর্দ্ধক দ্রব্যাহারে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলে চিন্তারাশি ঊর্দ্ধগামী হয়। কারণ রাজসিক বা তামসিক আহারে মানবের মন স্বস্থানচ্যুত হইয়া নিম্নগামী হয়। মানুষের মনের স্থান ললাটে বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে। রাজসিক ও তামসিক আহার্য্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম অণু পরমাণু বা astral matter তৈরী হয়, তাহা খুব অসংস্কৃত ও ভারী হওয়ায় শরীরের নিম্নভাগগামী হয় এবং ক্রমে নাভির নিম্নে স্থিতি লাভ করিয়া শুক্রসঞ্চার করে ও লিঙ্গমূলে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কাজেই মন ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে শরীরের যে কেন্দ্র শক্তিশালী, সেই কেন্দ্রের কার্য্যপ্রবর্ত্তিনী শক্তির স্ফুরণে আনন্দ লাভ করে। সুতরাং মন মস্তিষ্কে শক্তিসঞ্চারের ফলস্বরূপ উচ্চতম আনন্দাস্বাদ হইতে বিচ্যুত হয়

যাঁহাদের সাত্ত্বিক আহার্য্যের ফলে এবং শুক্র ধারণে বা কঠোর ব্রহ্মচর্য্যায় মস্তিষ্ক প্রবল শক্তিসম্পন্ন হয়, তাঁহারা ধ্যানধারণার ফলে অচিরাৎ মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস উপলব্ধি করিয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পার্থিব যাবতীয় পদার্থজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া চিৎসাগরে ভাসমান থাকেন এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করেন।

কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে মলিন সত্ত্বপ্রধান হিন্দুর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকের সহিত বসবাস করা অকর্ত্তব্য। যেহেতু তাহাতে তাহার সংযমের প্রভূত ক্ষতি হয়। নিম্নশ্রেণীর লোক উন্নত হয় বটে, তবে অপর পক্ষের ক্ষতি হয়। শাস্ত্রে আছে—

"লব্ধাতিশয়যোগাদ্বা তদ্বৎ।"

নারদাদি দাসীপুত্র হইয়াও সৎসঙ্গের প্রভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিলেন। এক পক্ষের যেমন উন্নতি হয়, অপর পক্ষের তদ্রূপ ক্ষতিরও সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই শ্রুত হয় যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের সহবাসে শূদ্রত্ব এবং শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। কারণ মানবের চিন্তারাশি এত সংস্কৃত বা

refined, বিশেষতঃ যদি তাহা সৎচিন্তা হয়, তবে তাহা বহু বহু দূরগামী হয়। বর্ত্তমান জগতে গান্ধীজীর ভাবরাশি সমস্ত মানব জাতিকে এক অভিনব ভাবে ভাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। তজ্জন্যই মনু উচ্চ বর্ণের ক্ষতি হরণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত "ন সংবসেচ্চ পতিতৈ" ইত্যাদি বলিয়াছেন। "বস" ধাতু হইতে সংবসেৎ নিষ্পন্ন। বস্ অর্থে একত্রে বাস। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি পতিত ও চণ্ডাল প্রভৃতির সহিত একত্রে আহার, শয়ন ভাব আদানপ্রদান বা সম্বন্ধাবদ্ধ হইয়া বাস করিবে না। "বস্" ধাতু হইতে ইহা কদাপি বুঝা যাইবে না যে, তিনি বর্ত্তমান জগতের আদর্শে গঠিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, এক কূপ হইতে পানীয় গ্রহণ বা তাহাদের ছায়া স্পর্শ বা মন্দিরে দেববিগ্রহ দর্শন নিষেধ করিয়াছেন। যদি আধুনিক এক বিদ্যালয়ে পাঠ নিষিদ্ধ হইত, তবে "উপ+বিশ" ধাতু থাকিত। যদি জীবন্ত নরনারায়ণের মন্দিরে দেববিগ্রহ দর্শন নিষিদ্ধ হইত, তবে এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের আবাহনে প্রয়োজন ছিল কি? যে জড়াবগ্রহ ভগবৎস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া ত্রিলোক পবিত্র করিবে, তাহাকে জীবন্ত নারায়ণের মন্দিরপ্রাঙ্গনে পাদক্ষেপ স্পর্শদুষ্ট করিবে, এ ধারণায় লজ্জিত হইতে হয় যে আমরা কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সনাতন ধর্ম্মে জ্ঞানলাভের সহায়ক বলিয়াই হিন্দুরা ইহার উপর এতটা দৃষ্টি দিয়াছেন। কালক্রমে ধর্ম্মের স্বরূপ হারাইয়া গিয়া বর্ত্তমানে ধর্ম্ম কতকগুলি সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। অস্পৃশ্যতাজ্ঞান সাময়িক—কদাপি চিরস্থায়ী নহে। বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী গান্ধীজী বলিতেছেন—

"সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় হিন্দুধর্ম্মে অস্পৃশ্যতা স্বীকৃত হয় বটে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি, আমার মাতা যখনই কোনও অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিয়াছেন, তখনই অন্ততঃ কিছুকালের জন্য তিনি আমাদের অস্পৃশ্যা হইয়াছেন; তখনও স্নান করিয়া তবে তাঁহাকে শুদ্ধা হইতে হইয়াছে। কোন স্ত্রী বা পুরুষ জন্মদোষে অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, বৈষ্ণব হইয়া এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহা ছাড়া, পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তি অনুযায়ী যে অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজে স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা স্পষ্টতঃই সাময়িক এবং ইহাকে দূর করাও কঠিন নহে। এরূপ স্থলে অস্পৃশ্যতা কর্ম্মেই বর্ত্তায়, কর্ত্তায় নহে।"

সমাজ এইরূপ কুসংস্কারে আবর্জ্জনাময় হওয়ায় বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগমনের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহারা বুঝাইয়া গিয়াছেন যে জগতে মাত্র একটী মনুষ্যজাতি এবং প্রত্যেক মনুষ্যের আত্মোন্নতির অধিকার আছে। অম্বাপালী গণিকা, বেশ্যাপুত্র জীবক, রাজনাপিত উপালী প্রভৃতি শিষ্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, নীচবংশোদ্ভূত হইলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম্মের দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে। চৈতন্যদেব পতিত ও আচণ্ডালে হরিনাম দিয়া বুঝাইয়াছেন যে ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ভগবানের সহিত জীবের জাতিভেদ নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব হিন্দুধর্ম্ম বিধর্ম্মীর নিকটও প্রচারের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

মানুষ যে ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক, একই আত্মা "সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" শরীরের দেশের

কোন এক স্থানে আঘাত লাগিলে তাহা তৎক্ষণাৎ অনুভূত হয়, তদ্রূপ যে জাতিকেই ঘৃণা ও উপেক্ষা করা যায়, তাহা তৎক্ষণাৎ আত্মায় অনুভূত হয় এবং সে ঘৃণা ও উপেক্ষা তাঁহাকেই করা হয়। আমরা প্রকৃত ধর্ম্মকে তাই ভুলিয়া গিয়াছি। সুদূর সাগর পার হইতে বিদুষী সেবী রুবেলী সেই সনাতন ভাব আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—

"দুঃখের প্রতি, পাপের প্রতি অনন্ত করুণার প্রস্রবণ নিত্য উৎসারিত হইতেছে। অনন্তকাল ধরিয়া যিনি গ্রহমণ্ডলীকে সৃষ্টি করিয়া স্ব স্ব কক্ষায় আবর্ত্তিত করিতেছেন, যিনি নিত্য পূর্ণস্বরূপ, তিনি অন্ধ, বধির, অব্যবস্থিতচিত্ত বা নিষ্ঠুর নহেন। তাঁহার নিকটে পৃথিবীপতির মৃত্যু যতখানি গুরুতর, একটী ক্ষুদ্র পক্ষীর মৃত্যুও ততটুকু গুরুতর অথবা উভয়ে সমভাবেই তুচ্ছ। একটা প্রবল জাতির ধ্বংসে তাঁহার প্রাণে যে ব্যথা লাগে, ক্ষণেকের মাঝে একটী ফুল ঝরিয়া পড়িলেও তাঁহার প্রাণে সেই ব্যথাই লাগে। সংস্র পূজকের সম্মিলিত নিবেদন তিনি যতটুকু স্নেহ ও ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করেন, শিশুর প্রথম প্রার্থনাও তিনি ততটুকু মমতা ও ধৈর্য্য নিয়াই শুনিয়া থাকেন। কেননা, সূর্য্যেই হউক বা বালিকণাতেই হউক, সর্ব্বত্রই তাঁহার পূর্ণ স্বরূপের অংশ যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে! তিনি যদি তাঁহার সৃষ্টিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন, তবে তাঁহার যে নিজকেই ঘৃণা করিতে হয়। আর প্রেমস্বরূপ প্রেমকে ঘৃণা করিবেন, ইহা অসম্ভব।"

——*——

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

—*—

[শব্দপ্রমাণ]

[অনুমান প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছি।] শব্দপ্রমাণ অনুমান পূর্ব্বক হইয়া থাকে, এইজন্য কারিকাকার অনুমানের পর শব্দপ্রমাণের লক্ষণ করিয়াছেন। প্রয়োজক বৃদ্ধের শব্দ শ্রবণ করিয়া তদনন্তর প্রয়োজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি দর্শনে তাহার হেতুজ্ঞান অনুমিত হয় এবং তাহাতেই শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ গ্রহণ হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ শব্দ, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধজ্ঞানের সহকারী হইয়াই অর্থের প্রত্যায়ক বা বোধক হইয়া থাকে। [সুতরাং অনুমান আশ্রয় করিয়াই শব্দপ্রমাণ অবতীর্ণ হয় এবং এইজন্যই অনুমানের পর তাহার নির্দ্দেশ যুক্তিযুক্তই হইয়াছে।]

[আচার্য্যের উপরি উক্ত কথাগুলি বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা প্রমাণের তাৎপর্য্য আবার পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। প্রমার যাহা সাধন বা করণ অর্থাৎ যাহা দ্বারা প্রমা উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রমাণ। প্রমা কাহাকে বলে? প্রমাণের ফলস্বরূপ আমাদের যাহা বোধ বা অনুভব, তাহাই প্রমা। এই বোধ চিত্তের যে বৃত্তি-

সহকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাকেই প্রমাণ বলা যাইতে পারে। এই চিত্তবৃত্তির বিষয়টী সন্দেহশূন্য হওয়া চাই, অবাধিত হওয়া চাই এবং অজ্ঞাত হওয়া চাই। (৪র্থ কারিকা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, প্রমাণ সংশয়াদি পরিশূন্য এক প্রকার চিত্তবৃত্তি বিশেষ, যাহার ফলে আমাদের বিষয় সম্বন্ধে যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয়জ্ঞান তিন প্রকারে হইতে পারে, প্রত্যক্ষ সহায়ে, অনুমান বলে, কিম্বা কাহারও নিকট শুনিয়া। প্রত্যক্ষ হইতে হইলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়া প্রয়োজন। আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি যেরূপ পরিমিত, তদুপরি বিষয় বহু বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের গতিশক্তি যেরূপ কুণ্ঠিত, তাহাতে প্রত্যক্ষের সহায়ে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার বড় বেশী পূর্ণ হইতে পারে না। যাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই অনুমানবলে আমরা জ্ঞানের ভাণ্ডার আরও বাড়াইতে পারি বটে, কিন্তু তাহাও সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে; কেননা অনুমান বিস্তার করিতে হইলে যে প্রকার সূক্ষ্মবুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা সকলের নাই। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই, জগতে সর্ব্বসাধারণকে শোনাকথার উপরই নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। আমরা যে শিক্ষার অভিমান করি, জ্ঞান বিজ্ঞানের বড়াই করি, তাহার পনের আনা ভাগই আমাদের প্রত্যক্ষও নয়, যুক্তিদ্বারা উদ্ভাবিতও নয় তাহা কেবল মাত্র আমাদের শোনা কথা। আমরা দেখিয়া সত্য নিরূপণ করি না, অনুমানবলে সত্যনির্ণয় করি না, অপরের মুখে শুনিয়াই সত্যের ধারণা করি।

[এই শোনা কথার উপর সত্যের ধারণাই সাংখ্যাচার্য্যের শব্দপ্রমাণ। কথা শুনিলেই যে সত্য বলিয়া মনে হয়, তাহা নহে; ইহার মাঝে বিশ্বাস অবিশ্বাসের স্থল আছে। যাহার মুখে শুনি, তাহার প্রতি যদি আমার বিশ্বাস থাকে, তবেই তাহার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সুতরাং যিনি কথা বলিবেন, তাঁহার বিশ্বস্ত হওয়া চাই—ইহা শব্দপ্রমাণের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই সম্বন্ধে পরে আমাদিগকে আরও আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু ইহার পরেও আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শুধু শব্দ শুনিয়াই আমাদের কোনও অভিনব সত্য জ্ঞান সঞ্চিত হয় না। ঝড়ের শব্দ শুনি, পশুপক্ষীর বুলি শুনি—কিন্তু তাহাতে শোনার প্রত্যক্ষের বাহিরে বড় বিশেষ কোনও নূতন জ্ঞান লাভ করি না। কিন্তু মানুষের মুখে শব্দ শুনিলে তাহার সঙ্গে আমরা আর একটা নূতন বিষয় সংযোগ করি—তাহা শব্দের অর্থ। শব্দ এবং তাহার অর্থ, এই দুইটী লইয়া শব্দ প্রমাণের পরিপুষ্টি। সুতরাং কি করিয়া শব্দের অর্থবোধ হইয়া থাকে, তাহার অনুসন্ধান করাও শব্দপ্রমাণের আলোচনার পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই প্রসঙ্গেই আমরা দেখিতে পাইব, শব্দ কি করিয়া অনুমানের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে। উপরের অনুচ্ছেদে আচার্য্য সংক্ষেপে তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

[প্রথমতঃ দেখা যাউক, কি করিয়া শাব্দবোধ বা পদার্থজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। আচার্য্যেরা এই জন্য শিশুর উদাহরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শিশু ভাষা জানে না, তবে ভাষা শিখে কি করিয়া? বৃদ্ধ বা বয়স্ক ব্যক্তির নিকট শুনিয়াই শিখে। ভাষা শিখা অর্থে,—এই শব্দের এই অর্থ—এইটুকু নিরূপণ করা এবং নিজেও তাহা প্রয়োগ করা। ভাষা শিক্ষার মধ্যে আপাততঃ শব্দার্থনিরূপণটুকুই

আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রয়োজনীয়। সেইটুকুই কি প্রকারে হয়, তাহা দেখা যাউক। একজন বয়স্ক ব্যক্তি যদি এক জায়গায় বসিয়া কতকগুলি কথা অনর্গল বলিয়া যায়, তাহাতে শিশুর ভাষা শিক্ষার পক্ষে কোনও সহায়তা হয় না। জ্ঞানকে যে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তির সঙ্গে বা কর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত না দেখি, সে পর্য্যন্ত ব্যবহারিকভাবে তাহাতে কোনও ফলোদয় হয় না। এই জন্য শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের অভিনয় দেখিতে পাইলে শিশু সহজে শব্দের অর্থ ধারণা করিতে পারে। সচরাচর ব্যাপারটা হয়ত এইরূপ ঘটিয়া থাকে। একজন বয়স্ক ব্যক্তি আর একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিল, "গরুটা এখানে নিয়া আস তো।" আচার্য্যের ভাষায় বলিতে গেলে ইহাদের মাঝে যে ব্যক্তি আদেশ করিল সে "প্রয়োজক বৃদ্ধ" এবং যাহাকে আদেশ করিল সে "প্রয়োজ্য বৃদ্ধ।" শিশু প্রয়োজকের মুখে শব্দ শুনিল এবং প্রয়োজ্যকে চলিতে দেখিল। এই দুইটী ব্যাপারের মাঝে সে নিশ্চয়ই কার্য্যকারণসম্বন্ধ কল্পনা করিবে। প্রয়োজ্যের চলা একটা চেষ্টামাত্র। প্রবৃত্তি মূলে না থাকিলে চেষ্টা জন্মে না। সুতরাং প্রয়োজ্যের মনে একটা প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে নিশ্চয়ই। এই প্রবৃত্তিরও হেতু আছে—উহাকে প্রবর্ত্তক বলিতে পারি। প্রয়োজ্যের চেষ্টার প্রবর্ত্তক কি, তাহা সে নিশ্চয়ই জানে, নতুবা তাহার চেষ্টা হইবে কেন? কিন্তু এই প্রবর্ত্তক বস্তুটী কি? প্রয়োজকের মুখ হইতে একটা শব্দ শোনা গেল এবং তাহার ফলে প্রয়োজ্যের চেষ্টা জন্মিল—এই দুইটী ব্যাপারের মাঝে অদৃষ্ট একটা কিছু রহিয়াছে, যাহার ফলে একজনের শব্দ হইতে অপরের চেষ্টা জন্মিতেছে। চেষ্টার মূল অনুসন্ধান করিয়া আমরা প্রবর্ত্তকজ্ঞান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলাম। এই প্রবর্ত্তক জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিলেই আমরা পাই—শব্দের অর্থবোধ। অর্থাৎ শব্দের একটা অর্থ আছেই; প্রয়োজ্য ব্যক্তি শব্দ শুনিয়াই তাহার সহিত সম্বদ্ধ অর্থকে ধারণা করিয়াছে এবং এই অর্থে নিহিত শক্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া কর্ম্মে সচেষ্ট হইয়াছে। শব্দ ও কর্ম্মের মাঝে এই যে প্রবর্ত্তকরূপী অর্থের সম্বন্ধ, ইহা অনুমান ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে ধরা যায় না। শিশু পণ্ডিতের মত বিচার না করুক, অস্ফুট আকারেও এই অনুমানের ধারাটা তাহার মনের ভিতর নিশ্চয়ই রহিয়া যায়। নতুবা শব্দের সঙ্গে কর্ম্মের সামঞ্জস্য অন্য কোনও প্রকারে সে সাধন করিতে পারে না। এইরূপেই শব্দের যে অর্থ আছে—এই সম্বন্ধজ্ঞান চিত্তে মুদ্রিত হইয়া শাব্দবোধ জন্মাইতে থাকে।

ইহার মাঝে আর একটা কথা আছে। চেষ্টার মূলে প্রবৃত্তি; প্রবৃত্তির মূলে প্রবর্ত্তক ও তাহার জ্ঞান—এই পর্য্যন্ত অনুমানপরম্পরা বেশ সহজ ভাবেই চলিয়াছে। কিন্তু প্রবর্ত্তকের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া আমরা আকস্মিক ভাবে অর্থের কল্পনা করিতেছি। এই আকস্মিক কল্পনার প্রামাণ্য সম্বন্ধে কেহ সন্দিহান হইতে পারেন। কিন্তু একটু স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে দেখা যায় প্রয়োজকের উচ্চারিত শব্দটাই তো প্রয়োজ্যকে ঠেলিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারে না। শব্দ সাক্ষাৎ ভাবে প্রবর্ত্তক না হউক, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি যে প্রবর্ত্তক হইয়া প্রয়োজ্যকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে কোনও বাধা নাই। কেহ কেহ এই শক্তিকে অদৃষ্ট বলিতে চাহেন। বাস্তবিক শক্তিমাত্রেই

অদৃষ্ট, কার্য্য দেখিয়া কারণরূপে অনুমিত। এই অদৃষ্ট শব্দশক্তিকেই আমরা বলিয়াছি শব্দের অর্থ। শব্দ ও তাহার শক্তিকে নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। বাস্তবিক প্রত্যেক শব্দেরই একটা শক্তি আছে। পূর্ব্বে যে অবোধ্য শব্দের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহারও একটা তাৎপর্য্য আছে। তাহাও চিত্তে একটা না একটা ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাও শক্তিসম্পন্ন। মানবভাষার শব্দের এই ভাবোদ্রেক করিবার ক্ষমতা বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে; এই কথাটাকেই ঘুরাইয়া আমরা অন্য ভাবে বলি, শব্দের অর্থ আছে। এই অর্থ মনুষ্যভাষায় সুস্পষ্ট, অন্যত্র অস্পষ্ট। কিন্তু শব্দের অর্থ আছেই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে—কেননা শব্দমাত্রেরই ভাবোদ্রেক করিবার শক্তি আছে।

[শব্দ ও অর্থের এই নিত্য সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়াই আচার্য্য দ্বিতীয় কল্পে বলিতেছেন, "শব্দ, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধজ্ঞানের সহকারী হইয়াই অর্থের প্রত্যায়ক বা বোধক হইয়া থাকে।" এই পংক্তিটী শব্দ ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধের জ্ঞাপক এবং শাব্দবোধের ইহাও এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। আচার্য্য বলিতে চাহেন যে শব্দমাত্রেই যে অর্থের প্রত্যায়ক বা বোধক—ইহা আমরা স্পষ্টতঃই সর্ব্বত্র অনুভব করিতেছি। যদি শব্দ ও অর্থ, এই দুটাই আমাদের অভিজ্ঞতায় এইরূপ নিত্য পরস্পরিত থাকে, তবে উভয়ের মাঝে নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতেই হয়। শাব্দবোধের সময় এই সম্বন্ধজ্ঞান নিশ্চয়ই অনুস্যূত থাকে। কিন্তু এই সম্বন্ধজ্ঞানের উদ্বোধক কে? আমরা বলিব, শব্দ। কেননা, শব্দ শুনিয়াই তো আমাদের অর্থবোধ হয়। অবশ্য মনঃকল্পিত অর্থ আমরা শব্দের সহায়ে প্রকাশ করি, এও একটা কথা। কিন্তু আমার প্রকাশের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে শ্রোতার তো কোনও সম্পর্ক নাই, সুতরাং শব্দপ্রমাণের পক্ষে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শব্দই যে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধজ্ঞানের উদ্বোধক শাব্দবোধকালে তাহা আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই, আর দেখিতে পাই শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। এই দুইটী বিষয় একত্র ধারণা করিয়া আচার্য্য বলিতেছেন, "শব্দ শব্দার্থসম্বন্ধজ্ঞানের সহকারী হইয়া অর্থের প্রত্যায়ক (শ্ব = শব্দ)।"

[তাহা হইলে ফল কথা এই দাঁড়াইতেছে —প্রয়োজকের শব্দ শুনিয়া প্রযোজ্য ব্যক্তি শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, এই বিষয়টী প্রযোজ্যের কর্ম্মচেষ্টা, তন্মূলা প্রবৃত্তি ও তন্মূল প্রবর্ত্তকজ্ঞানের অনুমানপরম্পরা হইতে অবধারণ করিতে পারি। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য এবং শব্দ উক্ত সম্বন্ধের উদ্বোধক। এই অদৃষ্ট শক্তিকে দ্বার করিয়া আমাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমানপরম্পরা ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। সুতরাং ইহাতেই শব্দপ্রমাণকে অনুমানের কার্য্য, অতএব পরনির্দ্দেশ্য বলিতে পারি।]

শব্দপ্রমাণের লক্ষণ করিতে গিয়া কারিকাকার বলিতেছেন, "আপ্তশ্রুতিঃ আপ্তবচনং তু।" আপ্তবচন কথাটী দ্বারা লক্ষ্যের নির্দ্দেশ করা হইতেছে; বাকীটুকু লক্ষণ। আপ্ত অর্থ প্রাপ্ত কিনা উপযুক্ত সত্য। আপ্তশ্রুতি শব্দটী কর্ম্মধারয়সমাস নিষ্পন্ন। শ্রুতি বলিতে বাক্যজনিত বাক্যার্থজ্ঞান বুঝিতে হইবে। [উপযুক্ত সত্য বাক্যশ্রবণে বাক্যের যে সত্য অর্থজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়, তাহাই আপ্তবচনরূপ শব্দপ্রমাণ।]

স্বামী রামতীর্থ

—❋—

[স্বামী রামতীর্থের সহিত আর্য্যদর্পণের পাঠকপাঠিকারা সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার জীবনী এই পত্রিকাপৃষ্ঠেই আরও দুইবার আলোচিত হইয়াছে। (শ্রাবণ, ১৩২৩ ও বৈশাখ, ৩২৯) কিন্তু প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থের অভাবে এতদিন তাঁহার জীবনকথা বিস্তৃতভাবে বলিবার সুযোগ আমাদের হইয়া উঠে নাই। সম্প্রতি স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত পূরণ সিংহ ইংরেজীতে "The Story of Swami Rama" নামে গুরুদেবের এক সচিত্র জীবনকাহিনী প্রকাশিত করিয়াছেন। এই পুস্তকে স্বামিজীর বহু অপ্রকাশিত রচনা, পত্র, কথোপকথন ইত্যাদি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া পূরণ সিংহ অতি মনোরমভাবে তাঁহার জীবনকথা আলোচনা করিয়াছেন। উত্তরভারতে স্বামী রামতীর্থের অসামান্য প্রভাব দিন দিন যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে তাঁহার ভক্তমাত্রেই যে আগ্রহ ও কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রীযুক্ত পূরণ সিংহের গ্রন্থখানি গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বামী রামতীর্থের বহু বক্তৃতা আর্য্যদর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পবিত্র জীবনকাহিনী নিশ্চয়ই পাঠকগণের প্রীতিকর হইবে মনে করিয়া আমরা ধারাবাহিক প্রবন্ধের আকারে তাহা আর্য্যদর্পণে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত পূরণ সিংহের পুস্তকখানিই এই প্রবন্ধসমূহের ভিত্তি বটে; কিন্তু নানা কারণে তাঁহার অনুসৃত বর্ণনক্রম আমরা সর্ব্বত্র অনুসরণ করিব না, কিম্বা তাঁহার ব্যক্তিগত মন্তব্য ও বাহুল্য-অংশাদিরও কোনও উল্লেখ করিব না।]

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের গুজরাণওয়ালা জেলার অন্তর্গত মুরলীওয়ালা গ্রামে গোস্বামী তুলসীদাসের বংশে স্বামী রামতীর্থ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল তীর্থরাম গোস্বামী। জন্মের কয়েকদিন পরেই তাঁহার মাতা শিশুপুত্রকে রাখিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করেন। তীর্থরামের বড় ভাই গোস্বামী গুরুদাস এবং তাঁহার এক বৃদ্ধা খুড়ীমাতা মাতৃহীন শিশুটীকে প্রতিপালন করেন। তাঁহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বড় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে অন্যান্য বালকের মত ছিলেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও চিন্তাশীলতা সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছিল। দেবমন্দিরে যখন স্তোত্র মন্ত্রাদি পাঠ হইত, তখন মন্দিরে যাইবার জন্য তীর্থরাম তাঁহার শিক্ষকের অনুমতি চাহিতেন, এবং ইহাতে পাঠের সময়ের যে ক্ষতিটুকু হইবে, তাহা তাঁহার খাওয়ার সময় হইতে কাটিয়া রাখিতে অনুরোধ করিতেন। এই সামান্য ঘটনা হইতেই বালকের ধর্ম্মানুরাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি গ্রামে যে মুসলমান মৌলভীর নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। বাড়ীতে একটী দুগ্ধবতী মহিষী ছিল। একদিন বালক আসিয়া পিতার কাছে আবদার ধরিল, "বাবা, মৌলভীসাহেব আমায় যে খাবার দিচ্ছেন, তা সাধারণ খাবারের চেয়ে কত ভাল। আমাদের মহিষটা তুমি তাঁকে দিয়ে দাও না!"

গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ হইলে তীর্থ রাম গুজরাণওয়ালা হাইস্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইলেন। এইখানে ধন্না মল্ নামে এক ব্রহ্মচারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তীর্থরামের পিতাই এই ব্যক্তিকে পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। ধন্না মল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার অন্যান্য গুণের মাঝে পরের মনের কথা বলা একটী; তাহা ছাড়া সাধুত্বের আনুষঙ্গিক আড়ম্বরও যথেষ্ট কিছু ছিল। সে যাহা হউক, কি কারণে জানি না, বালক তীর্থরাম গুজরাণওয়ালায় আসিয়া এই ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তীর্থরাম শিশুকাল হইতেই ভাবপ্রবণ ছিলেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় ধন্না মল তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তীর্থরামের চরিত্রে এই একটী বিশেষত্ব দেখা যাইত যে, তিনি একবার যাহা ধরিতেন, তাহার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িতেন না; তাঁহার কারবারে কোথাও তিনি ফাঁকী চালাইতে পারিতেন না। গুজরাণওয়ালায় আসিয়া তাঁহার প্রাণ যখন একজন অধ্যাত্মসঙ্গী ও সহায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ধন্না মলের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। বালক নির্ব্বিচারে তাঁহাকে আচার্য্যপদে বরণ করিয়া লইয়া দেহ-মন প্রাণ সমস্তই তাঁহার পায়ে সঁপিয়া দিল। তাঁহার এই আত্মসমর্পণ এক অদ্ভুত ব্যাপার। ইহার মাঝে কোথায়ও তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা সঙ্কোচের অবকাশ রাখেন নাই—একবারও বিচার করেন নাই যে, ধন্নামলের আচার্য্য হইবার কোনও যোগ্যতা আছে কি না। ধন্নামল হইতে তাঁহার যে কোনও উপকার হয় নাই, তাহা নহে; তাঁহার বাল্যোচিত পিপাসা মিটাইবার এবং তাঁহার তরুণ জীবনকে একটা বিশিষ্ট লক্ষ্যের পানে নিয়ন্ত্রিত করিবার যোগ্যতা তাঁহার ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তীর্থরাম যে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, ধন্নামল তাহার সন্ধান পান নাই। তিনি নানাপ্রকার অলৌকিক ক্ষমতা অর্জ্জনের দিকেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বশিষ্ঠাশ্রমে অবস্থান করিবার সময় পূরণসিংহের সহিত স্বামীজীর যে আলোচনা হয়, তাহাতে সিদ্ধাই অর্জ্জনের পিপাসা মানুষকে কিরূপে অধঃপতনের দিকে লইয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ধন্নামলের কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয়, জীবনের এই প্রথম ও এই শেষবারই তিনি ধন্নামলকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন।

ধন্নামলের সর্ব্বদাই টাকার প্রয়োজন হইত। তীর্থরামের অবস্থা কোনও দিনই সচ্ছল ছিল না। ছাত্রজীবনে, এমন কি সরকারী চাকুরী লইয়াও তাঁহাকে যে কি নিদারুণ অর্থকষ্টে দিন কাটাইতে হইয়াছে, তাহার কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিব। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, ধন্নামলের টাকা চাওয়ার বিরাম ছিল না এবং তীর্থরামও একটী কথা না বলিয়া অম্লানবদনে যথাসাধ্য তাঁহার দাবী মিটাইয়া আসিয়াছেন। এমন কি মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেও তিনি ধন্নামলের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার কাছে একখানা চিঠি লিখেন এবং পূরণ সিংকে বলিয়া তাঁহাকে কিছু টাকা দেওয়ান।

তীর্থরামের ছাত্রজীবনের অধিকাংশ কাহিনী তাঁহার দিনলিপি হইতে জানা যায়। এই দিনলিপিগুলি আর কিছুই নহে—ধন্নামলকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত কতকগুলি

চিঠিমাত্র। এই চিঠিগুলি পাঠ করিলেই ধন্নামলের সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বোঝা যাইবে। তাঁহার ছাত্রজীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার সময় আমাদিগকে এই দিনলিপি হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠক তাহা হইতেই তীর্থরামের অন্তঃপ্রকৃতির সবিশেষ পরিচয় পাইবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা আমাদের বলিবার আছে। ধন্নামলের কোনও যোগ্যতা থাক্ বা না থাক্, তীর্থরামের একান্ত আত্মসমর্পণ কিন্তু আমাদের কাছে বড় মধুর লাগে। এই আত্মসমর্পণই যে পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার সিদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি। আচার্য্য যেমনই হউক না কেন, শিষ্যকর্ত্তব্য তীর্থরাম কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন নাই এবং তাহার ফলে তিনি গুরু সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। জীবের অভিমানই তাহাকে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ হইতে দূরে রাখে — শিষ্যত্বস্বীকার এই অভিমান নিরসনের সাধনা। যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই হউক, চিত্ত হইতে সমস্ত অভিমানের বাধা যিনি দূর করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে জগদ্গুরু স্ফুরিত হইয়া সিদ্ধির পথে তাঁহাকে পরিচালিত করিবেনই। গুরু শক্তিসঞ্চারে শিষ্যকে উদ্বুদ্ধ করেন—এই হইল একদিকের কথা। কিন্তু শিষ্যও শক্তিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষায় নিজকে রিক্ত করিবেন, নতুবা গুরুকৃপা সর্ব্বত্র সমবর্ষী হইয়াও সকল শিষ্যেরই সমভাবে উন্নতি করে না কেন? বরং আমাদিগকে শিষ্যকর্ত্তব্য সমাপন করিবার জন্যই বিশেষ ভাবে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। কারণ জগতে গুরুর অভাব কখনুই হয় না—অভাব উপযুক্ত শিষ্যের। মর্ম্মস্থানটী অনাবৃত করিতে পারিলে একটী আলপিনের খোঁচাতেও মানুষের প্রাণনাশ হইতে হইতে পারে। জীবের কর্ত্তব্য, অভিমান নিরসনদ্বারা তাহার এই মর্ম্মস্থানটী লক্ষ্যের পানে উন্মুক্ত করা। যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই অভিমান নিরসন হউক না কেন, তাহার ফল আমরা পাইবই— এ জন্য উপলক্ষ্যের গুণদোষ বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। একদিক তৈরী থাকিলে ভগবান্ আর একদিকের অভাব মিটাইয়া লইবেনই। তীর্থরাম অভিমানশূন্য হইয়া সত্যের সাক্ষাৎকার পাইয়াছেন, অভিমান নিরসনের উপলক্ষ্য বিচার করেন নাই, এইটুকুই আমাদের পক্ষে একটি মহৎ শিক্ষা।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তীর্থরাম গুজরাণওয়ালা হাইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন। গুজরাণওয়ালাতে ধন্নামলের আশ্রিত-ভাবেই তাঁহার দিন কাটিয়াছে। বাড়ীর অবস্থা কোনও দিনই সচ্ছল ছিল না; কাজেই বাল্যকাল হইতে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিদ্যার্জ্জন করিতে হইয়াছে। তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা অতি বলবতী ছিল। রাত্রে পড়িবার জন্য একটু তৈল সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে উপবাসী থাকিয়া পর্য্যন্ত পয়সা বাঁচাইতে হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তিনি নিরুৎসাহ হন নাই। স্বাবলম্বন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁহার জীবনে যে একটা বিশেষ লক্ষ্য সাধিত হইবে, এ কথা তিনি অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিতেন। এই জন্য সর্ব্বপ্রকার বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বীর সৈনিকের মত ধীরপদে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া তাঁহার স্বভাব ছিল। বালকমাত্রেই সাধারণতঃ কল্পনাপ্রিয় অথবা চঞ্চল হইয়া

থাকে। কিন্তু বালক তীর্থরামের স্বভাবে এই দুইটী বৃত্তির লেশমাত্র ছিল না। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যেমন অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত আপন সঙ্কল্পিত কার্য্যসাধনে অগ্রসর হয়, বালক তীর্থরামও তেমনি বৃদ্ধোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া যাইতেন। বালকহৃদয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট হইয়া না ফুটিয়া উঠিলেও যেমন তিল তিল করিয়া তিনি তাঁহার জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান অবাবস্থিতচিত্ততার যুগে বাস্তবিকই দুর্লভ।

একবার একমাস ধরিয়া তাঁহার দৈনিক বরাদ্দ ছিল মোটে তিন পয়সা। কিন্তু বালক তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া ভাবিল, "ভয় কি? ভগবান আমার পরীক্ষা করিতেছেন বই তো নয়। এই তিন পয়সাতেই আমার দিন চলিবে।" তার পর হইতে তীর্থরাম এক পাঞ্জাবী রুটীওয়ালার দোকানে যাইয়া দুই পয়সায় দিনের খাবার এবং বাকী এক পয়সায় রাতের খাবার খাইয়া আসিতেন। কয়েকদিন পরে রুটীওয়ালা তাঁহাকে বলিল, "বাছা, তুমি রুটীর দাম বলিয়া তিন পয়সা দিয়া যাও, কিন্তু তোমাকে যে ডাল দিই, তার জন্য তো পয়সা দাও না। পয়সা না দিয়া ডাল খাইবে না কি? যাও, তোমার কাছে আর আমি রুটী বেচিব না।" ইহার পর হইতে ডালের দাম দিতে গিয়া বালককে একবেলা উপবাসী থাকিতে হইত।

এত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, সে শুধু ভবিষ্যতে টাকা রোজগার করিতে পারিবেন বলিয়া নয়। তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহার পিছনে আর কোনও স্বার্থ প্রচ্ছন্ন ছিল না। জ্ঞানের পিপাসাই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার তিতিক্ষার ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিল। বাস্তবিক তাঁহার সমস্ত জীবনটাই একটা সাধনা ছিল। স্বামী রামতীর্থের জীবনে এই একটী বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, তাঁহার সমস্তই যেন স্বভাববশে স্ফুরিত হইয়াছিল, জীবনের কোথায়ও ছেদ বা বিভাগ ছিল না। সাধারণতঃ আমরা দেখি, যাহারা ধর্ম্মের সাধনা করে, তাহারা বাস্তবজীবন হইতে ধর্ম্মকে সরাইয়া আনিয়া একটা বিশিষ্ট আয়োজন ও আড়ম্বরের মাঝে তাহার সাধনা করিয়া থাকে। এইরূপে আমাদের সমাজে সংসারজীবন ও অধ্যাত্মজীবন ভাগাভাগি হইয়া পড়িয়াছে—বাস্তবজীবনের সাধনাও যে আধ্যাত্মিক হইতে পারে, এ ধারণা আমাদের লোপ পাইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বামী রামতীর্থের জীবনে আমরা বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতার সন্ধি দেখিতে পাই। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি সাধন ভজন করিয়াছেন বটে, কিন্তু শুদ্ধ আধ্যাত্মিক সাধন ধরিতে গেলে তিনি অতি অল্পকালের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিতে হয়। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহার সমস্তটা জীবনই তিনি সাধকের ভাবে কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি আবাল্য সংযমী, তপস্বী, জিজ্ঞাসু এবং ভাবুক। প্রতিকর্ম্মে কামনাবর্জ্জন এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিশেষত্ব। তপঃপরায়ণ নিষ্কাম কর্ম্মীর শুদ্ধচিত্তে ভাবের স্ফুরণ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, তাহাতে সংসারজীবনের সহিত কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় না। স্বামী রামতীর্থের জীবনেও তাহাই হইয়াছিল। এই ভাবস্ফূর্ত্তি যখন তাঁহার পক্ষে অসম্বরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তখনই তিনি গৃহত্যাগ করিয়া একান্ত অধ্যাত্মসাধনায় নিযুক্ত হন। কিন্তু গৃহত্যাগে তাঁহার অধ্যাত্মসাধনার আরম্ভ নয়—উহা সাধনার চরম পরিণতি, সিদ্ধির পূর্ব্বাভাস। যেদিন হইতে জ্ঞান জন্মিয়াছে, সেইদিন হইতেই তিনি তপস্বী, সাধক ও ভাবুক।

কর্ম্মকথা

—*—

"মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি"—কর্ম্মবিরতিতে যেন তোমার আসক্তি না হয়, এই গীতার উপদেশ। শুধু ভেবে ভেবে ভগবানকে পাবে না। কর্ম্ম করা চাই। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেয় বুঝে কর্ম্মেরই কল টিপে দিয়েছিলেন। এবারও দেখছি, কর্ম্মযোগই যুগধর্ম্ম। গুরুও তাই কর্ম্ম দিয়ে কর্ম্ম ক্ষয় করিয়ে নিচ্ছেন। তাই দেখছি, সারাদিন কর্ম্মের সাধনা করতেই হবে। না করলেই ঘোর তমোতে এসে ঘিরবে। কর্ম্ম জমা থাকতে সাত্ত্বিকতার ভান করলে কি হবে? লাভ হবে শুধু একটা অস্বস্তি আর অতৃপ্তি। মনে করছ, দূর হোক ছাই—কাজকর্ম্ম ছেড়ে এক জায়গায় চুপচাপ বসি—ধ্যান করবো বলে; তা কর্ম্ম থাকতে ধ্যান তো হবে না—শুধু তন্দ্রাই আসবে। দীপকরাগে ভিতরটা জ্বলে ওঠা—সে কি সোজা কথা? তার আগে সারেগামা সাধতে হবে না?

তা গুরু তো কাজ থেকে ভাব বাদ দিচ্ছেন না। এমন কথা বলছেন না যে, তুমি সংসারীর মত কর্ম্ম কর। বলছেন, তুমি সেবা কর; আমাতে মনটী দিয়ে কাজ কর; হাতে কাজ করবে, আর চিত্তে আমাকে ভাববে, বা নাম করবে, বা স্বরূপের মনন করবে। অভিমান নিয়ে, "আমি কর্ত্তা" এই ভাব নিয়ে কাজ করবে না। কর্ত্তা তো তুমি নও; কেন না তোমার স্বাধীন ইচ্ছা একটুও নাই—তোমার ইচ্ছায় একটী শ্বাসও পড়ছে না। কোথা হতে কর্ম্মের জোয়ার আসছে, আর খড়কুটার মত তোমার দেহ-মন প্রাণ ভাসিয়ে নিচ্ছে। ওই তো প্রকৃতির কাজ—গুণের কাজ। গুণের বশে কাজ হচ্ছে। গুণ বিশ্বজোড়া জাল পেতেছে। তুমি জেলে নও। তুমি জাল ফেলতেও পার না—গুটাতেও পার না। তুমি জানে কেবল জড়াতে। কাজেই তুমি কর্ত্তা—এ কথা বললে ঠকবে। ঈশ্বর কর্ত্তা, তুমি অকর্ত্তা। তুমি যে কর্ত্তা নও, এইকথাটুকু বুঝবার জন্যই কর্ম্ম করছ। কত ঘা পড়ছে এসে—জানিয়ে দিচ্ছে, তুমি কিছুই নও। কিন্তু পাঁকাপুকুরের পানার মত অভিমান সরিয়ে দিতেই আবার কোথা হতে এসে জুটছে। বারবার দেখছ, শুনছ, তবুও যে বুঝছ না—এই তো মোহ। মোহ আমাদের—চিত্তেরও, দেহেরও। দেহের মোহ দূর করবার জন্য কর্ম্ম; আর চিত্তের মোহ দূর করবার জন্য জ্ঞান, ভক্তি।

গুরুরই সংসার; সেই সংসারে সেবাই হচ্ছে সাধন। আত্মসেবা নয়; গুরুসেবা। সেবা তো কর্ম্মই। কিছু না কিছু সেবা সবাই করছে। তবে হয়ত নিজকে লক্ষ্য করে তা করছে। নিজে আর কতটুকু? তা ছাড়া নিজের সম্বন্ধে মোহটা শিগগির জন্মায়। এই জন্য সেব্যের আসন থেকে নিজকে সরিয়ে নিয়ে গুরুকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা। তিনিই সর্ব্বত্র—ঘটে ঘটে; সবার মাঝে থেকে আমার পূজা নিচ্ছেন। আমি সেবক।

গুরো, তোমায় কাজ করব, তাতে বাধা আসে কোথা থেকে? এতো আর কারও

বাধা নয়—আমারই বাধা। আমারই কায়া—তাই আমারই ছায়া—নইলে তুমি যে আলো গো!—"তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া!"

তা হোক গে। আর ভাবব না। ভাবলেই "আমি" এসে পড়ে। যা করছি, তোমারই করছি। ভালমন্দ বিচার করবার আমি কে? এই কাজটা বড়, ওটা ছোট—এ বিচার আমার নয়। যখন যা করাও, তাই তোমার কাজ। এর মাঝে কর্ত্তাবুদ্ধি বলে কিছুই নাই। তুমিই তো গীতায় বলেছ, "কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু নাস্তি পার্থ মে কিঞ্চন—তথাপি বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।" তোমার কর্ত্তব্য নাই—অথচ কর্ম্ম আছে। তোমার সেবকেরও তাই কর্ত্তব্য নাই, কিন্তু কর্ম্ম আছে। তবে কর্ম্মে কর্ত্তব্যের চাপ না থাকলেও বোদ্ধব্য কিছু আছে। তুমিই আবার বলছ—

> কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ
> অকর্ম্মণশ্চাপি বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ

বুঝবার আছে বটে। সেটা কি?—কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা, অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা। করছি বলে যখন সবাই দেখছে, তখন বাস্তবিক কিছুই করছি না; আবার যাঁকে কিছু করতে দেখ্ছি না, তাঁর প্রেরণাতেই সব হচ্ছে দেখছি—এই হলো কর্ম্মে অকর্ম্ম, আর অকর্ম্মে কর্ম্ম

বাসনা গেলে এই দৃষ্টি খুলবে। এই কাজ করে এই ফল পাব—এ ভাবনা কেন? ভাবনায় দুঃখই বাড়ে। কয়টা ভাবনা সত্য হয়? সত্য হলেই বা সুখ কতটুকু? লোকে ভাবে, এই জীবনে যাই চেয়েছে, তাই যে পেয়েছে—সে বুঝি সুখী। কিন্তু বাস্তবিক তার প্রাণে কেবল হাহাকার। সে চেয়েই পাচ্ছে বটে, কিন্তু চাওয়ার মত চাইতেই যে পারছে না। তাই তৃপ্তিও হচ্ছে না। অন্তর্য্যামী তার এ দুঃখ বোঝেন।

যে কিছু চায় না—পেয়েও খুসী না, না পেয়েও দুঃখী না—সেই সুখী। তার আনন্দ কেড়ে নেবে কে? লাভ জুটলে তার আনন্দ বাড়ে না—অলাভেও কমে না। কাজেই সে নিত্যানন্দ।

তা কাজ করবে, নিত্যানন্দকে প্রাণে রেখে। সর্ব্বদা বল, হে প্রভো, এখন যা করাচ্ছ, তাও তোমার কাজ, দু' দণ্ড পরে যা করাবে, তাও তোমারই কাজ। তবে কি ঝড়ের মুখে এঁটো পাতের মত চলবে? হাঁ, অনেকটা তাই বটে। প্রথমটায় নিজকে ছেড়ে দিতেই হবে। তাতে ফল মন্দ হোক্ ক্ষতি নাই। তুমি তো ফলের হিসাব করে বা কারু খুসী অখুসীর বিচার করে কাজ করছ না। কাজের পর আর তাকাতে নাই। যেটার জন্য তাকিয়ে আছ, ওটাই ফল। কাজেই একদম তাকাবে না। একটার পর একটা করে যাও।

বলা সোজা বটে, করা সোজা না। মানুষ বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করে; তাতেই কত গলদ ঘটে। আর সব বিবেচনা ছেড়ে দিয়ে কাজ করতে গেলে গলদ তো আরো বেশীই হবে। সংসারীর পাকা বুদ্ধি তোমায় এই ভয় দেখাবে। বলি, একবার গল্‌তি কাজই করে দেখা যাক্ না। তা হলেই বুঝতে পারবে, বাসনাতে কতখানি শিকড় গেড়েছে। কাজ করে যা পাবে, তাকে যতক্ষণ তোমার লাভ মনে করবে, ততক্ষণই বুদ্ধিবিবেচনার দরকার হয়। আর ওটা যদি তোমার লাভ না হয়ে তাঁর খুসী হয়, তাহলে ভাবনা কি?

যার সকল কাজই আপনার বলে করতে

হয়, তাকেই এই কথা বলি। কিন্তু যে গুরুর সেবা করছে, তাকে বলি এর পরের কথা। তার কিন্তু সঙ্কল্প থাকা চাই। তবে কাম-সঙ্কল্প নয়—"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্প-বর্জ্জিতাঃ।" কামের প্রতিরূপ হলে তুমি। তাঁর কাজ সঙ্কল্পমূলেই হচ্ছে—তিনি সত্য-সঙ্কল্প। আর তোমার বসে যা করতে যাও, তার মূলে সঙ্কল্প থাকলে সেটা হয় কামসঙ্কল্প। সেবা যদি করতে হয়, তাহলে সঙ্কল্প করতে হয়, বিবেচনা করতে হয়; কিন্তু সেবা হয় প্রেম থেকে, কাম থেকে নয়। কাজেই সেবক কর্ম্ম করে কামসঙ্কল্প নিয়ে নয়, প্রেম সঙ্কল্প নিয়ে। গুরুর যা সঙ্কল্প, আমারও তাই। সিদ্ধ সঙ্কল্প মলিনবুদ্ধিতে বোঝা যায় না, তাই চিত্তশুদ্ধি দরকার। তাই কর্ম্মেরও যোজনা আছে।

আর নিজের জন্য যদি কর্ম্ম করতে হয়, তা হলে সঙ্কল্প ছেড়ে দিতেই হবে। তখন,

প্রসাদ বলে বসে আছি
ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা—
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাব,
ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা।

তখন আর বগল টিপে নাচলে চলে না—দু' হাত তুলেই নাচতে হবে।' তাতে বগল থেকে চোরাই মাল যদি বেরিয়ে পড়ে, তা ভালই—আপদ দূরে যাবে।

যাই কর না কেন, ভাব একটাই থাকবে। কাজ বহু। কিন্তু সব এক ভাবের সুতোয় গাঁথা। 'তোমার কাজ করব'—কিন্তু তুমি কি বস্তু, তা যদি স্মরণ না থাকে, তাহলে তোমার কাজ হবে কি করে? কাজ করলেই তো আমি এসে পড়ে। লড়াই এই আমির সঙ্গেই—কাজের সঙ্গে নয়। এই দিকে যার দৃষ্টি নাই—তার কাজ হয় না। হয় বল, 'তুমিই কর্ত্তা,' নয় বল, 'আমি অকর্ত্তা।' কথাটা একই দাঁড়াবে

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সংবাদ

জগদ্গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব এবং অত্রত্য সারস্বত মঠান্তর্গত শান্তি-আশ্রমের ১৮শ বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে ১২ই বৈশাখ হইতে ১৪ই বৈশাখ পর্য্যন্ত আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠে শ্রীশ্রীগুরুব্রহ্মের পূজা, হোম, আরত্রিক, বেদমন্ত্র, গীতা, চণ্ডী ও স্তোত্রাদি পাঠ এবং নাম যজ্ঞাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। দিনাজপুর, ফরিদপুর, বরিশাল ও শ্রীহট্ট হইতে ভক্তদিগের সমাগম হইয়াছিল—যোরহাটের প্রবাসী বাঙ্গালী ও মঠের নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভক্ত মণ্ডলী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পূজা ও যজ্ঞান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দ নির্ম্মাল্য ও যজ্ঞীয় তিলক ধারণ করেন। পরে দৈ, মুল, খেচরান্ন, মিষ্টান্ন ও মিঠাই প্রভৃতি প্রসাদ বিতরিত হয়। দরিদ্রনারায়ণ সেবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উক্ত দিবসত্রয়ে ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমে,

বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমে ও কুমিল্লা ময়নামতী আশ্রমে ভক্তগণ-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

উক্ত অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে কুচবিহার থারিজাবাল্লাডাঙ্গা গ্রামে উৎসব উপলক্ষে একটী ভক্তসম্মিলনীর অধিবেশন হয়। রাজসাহী বিভাগের বিভাগীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন দাস গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মঠের উদ্দেশ্য প্রচার ও বিভাগীয় আশ্রমের উন্নতিকল্পে কয়েকটী মন্তব্য সম্মিলনীতে গৃহীত হয়।

শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামেই আছেন।

সতীর সহমরণ

আহিরীটোলা নিমু গোস্বামী লেননিবাসী গৌরকিশোর চন্দ্র মহাশয়কে গতপূর্ব্ব বৃহস্পতিবার বেলা ১০টার সময় তীরস্থ করা হইলে বেলা দেড়টা হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী অজ্ঞান হইয়া পড়েন। গৌরবাবু বেলা ৫টার সময় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন; এদিকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও বেলা সাড়ে ৫টার সময় স্বর্গলাভ করেন। উভয়কে মহাসমারোহে একই চিতায় দাহ করা হইয়াছে। চন্দ্র মহাশয়ের বয়স ৬৭ বৎসর। এবং তাহার পত্নীর বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। (বসুমতী ২৮শে চৈত্র শনিবার, ১৩৩১।)

গ্রন্থ-পরিচয়

গোসেবা মাহাত্ম্য—শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত, মূল্য ৵০। গুরুগৃহে গোসেবা করিয়া সত্যকাম কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, উপনিষদের মূল সহ সেই কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুর জাতীয়-আচার আবার ফিরিয়া আসুক, ইহাই প্রার্থনা।

সদাচার মাহাত্ম্য—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বিদ্যাশ্রমী সঙ্কলিত। মূল্য ৵০। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য স্কন্দ পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সদাচার হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ। পুস্তকে যে সমস্ত উপদেশ লিখিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাংশও যদি প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুর গৃহে আবার শ্রী, বিজয়, ভূতি ও নীতি ফিরিয়া আসিবে। পুস্তকখানি সকলেরই আলোচ্য।

আউলচাঁদ বাউলের গান—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্ম সঙ্কলিত। মূল্য ৵০। গানগুলি সরল, সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী। ব্যঙ্গগীতিও আছে। ভাবে ও ভাষায় ধোঁয়ার অভাব। এই যুগের কবির পক্ষে ইহা বাহাদুরী বটে।

উপরিউক্ত পুস্তক তিনখানি কাশীধাম ব্রাহ্মণরক্ষা সভার আনুকূল্যে মহামণ্ডল যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সদাচার—শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও ঢাকা ২৩৮ নবাবপুর, হইতে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র। নানাশাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া এবং সরল বাঙ্গালায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া গ্রন্থকার হিন্দুর সদাচারের আদর্শ জনসমাজে উপস্থিত করিয়াছেন। আধুনিক বিকৃত আচারের সহিত সদাচারের কোথায় পার্থক্য, ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাহারও উল্লেখ থাকায় গ্রন্থের কার্য্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাঝে মাঝে যুক্তি তর্কও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—তাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনের খোরাক মিলিবে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

উৎসবে সাহায্যপ্রাপ্তি

সারস্বত মঠে—শ্রীযুক্ত বিন্দুচরণ দাস ২৫৲, " হেমকণ্ঠ শর্ম্মা ১০৲, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর তালুকদার ১০৲, শ্রীযুক্ত তারানাথ দাস মণ্ডল ১০৲, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সাহা ১০৲, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ মাইতি ১০৲, শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন কুণ্ডু ৫৲, উচালন নিগমানন্দ সেবকসংঘ ৫৲, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীযুক্ত গোপী নাথ স্মৃতিভূষণ ৫৲, শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত সাহা ৫৲, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সরকার ৩৲, শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র পালচৌধুরী ৩, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় ৩৲, শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস নন্দী ২৲, শ্রীযুক্ত বি, এল, দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত লালবিহারী ঘোষ ২৲, শ্রীযুক্ত যশোদালাল পোদ্দার ২৲, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার মুখার্জ্জী ২৲, শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ২৲, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় ২৲, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত কাম দেব মহাপাত্র ২৲, শ্রীযুক্ত বনবিহারী আচার্য্য ৪৲, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৪৲, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রদেব রায়চৌধুরী ২৲, শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী দেবী ২৲, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ দালাল ২৲, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় ২৲, শ্রীযুক্ত প্রভাকর চৌধুরী ২৲, শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত রামসন্ন্যাসী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পূততুণ্ড ১৲, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ রায় ১৲, শ্রীযুক্ত জানকীমোহন রায় ১৲, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী গুহ ১৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত ১৲, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র নিয়োগী ১৲, শ্রীযুক্ত শশিকুমার দাসগুপ্ত ১৲, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ভট্ট ১৲, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস ১৲, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ১৲, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন দাস ১৲, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার কর্ম্মকার ১৲, শ্রীযুক্ত নৃসিংহপদ পাল ১৲, শ্রীযুক্ত কালীকুমার কর্ম্মকার ১৲, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত ললিত কুমার দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীযুক্ত হরিনাথ কর ১৲, " বঙ্কিমচন্দ্র বসু ১৲, " মৃগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৲, " জিতেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী ১৲, " অমূল্যচন্দ্র দে ॥০, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত দাস ॥০, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র সরকার ॥০, শ্রীযুক্তা উত্তমাসুন্দরী দেবী ॥০, শ্রীযুক্তা শৈলবালা দেবী ॥০, শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র দাস ॥০, শ্রীযুক্তা যশোদাকুমারী ঘোষ ।০ ।

ভাওয়াল আশ্রমে—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় ২৲, " বঙ্কিমচন্দ্র বসু ২৲, " শ্যামচরণ সিংহ ২৲, " দেবেন্দ্রনাথ দে ৫৲, " হেমচন্দ্র দাস ৫৲, " গিরিশচন্দ্র দে ॥০, " সতীশচন্দ্র সরকার ১৲, " বিশ্বম্ভর ধর ॥০, " দুর্গাচরণ দত্ত ২৲, " আদিনাথ সূত্রধর ১৲, জনৈকা মহিলা ১৲, " জানকীনাথ দাস ১৲ ।

ময়নামতী আশ্রমে—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার বানার্জ্জি সন্দিপ ৫৲ " রাম লাল চক্রবর্ত্তি সার্ভেস্কুল ২৲ " শশিকুমার দাস উকিল কুমিল্লা ১৲ " মণিমোহন সাহা হাজিগঞ্জ ২৲ " সারদাকান্ত চক্রবর্ত্তী কাচারীতলা ২৲, " যামিনীকান্ত দে ২৲ " রামেশ্বর নমঃ ১৲, " বৈকুণ্ঠকুমার নমঃ ১৲, " কৃষ্ণমোহন দাস, সন্দীপ ১৲, " প্রসন্নকুমার সাহা দৌলতগঞ্জ ১৲, " হরেন্দ্রকুমার বণিক ঐ ১৲, " দেবেন্দ্রকুমার

বণিকা ঐ ১৲, " রাইবিনোদ পাল কুমিল্লা ১৲, " বৈকুণ্ঠকুমার দত্ত গণেশপুর ৮৵০, " নগেন্দ্রনাথ রায় ঢাকা ১৲।



বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমের জন্য নিম্নলিখিত সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দলই কর্তৃক কুচবিহারে সংগৃহীত ২৫৲; শ্রীযুক্ত কমলেশ্বর সিংহ কর্ত্তৃক দিনহাটার নিকটবর্ত্তী স্থানে সংগৃহীত ১৬।৫।



আরণ্যক

—※—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

— ঋগ্বেদসংহিতা — ১০।৭১।৩।

আনন্দ হচ্ছে জীবনের একমাত্র সত্য ও লক্ষ্য। জীবনের মাঝে বহু সংস্কার ক্রমে মানসিক দুঃখের কতক ছাপ বসে গিয়েছে, নইলে স্বাভাবিক জীবনে মনের ধর্ম্ম হচ্ছে আনন্দ। তার প্রমাণ শিশুর মন। জীবনে এক এক সময়ে জোর করে ঐ শিশুর মত সাংসারিক সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে আনন্দময় হতে হয়। নইলে শক্তি পাবে কোথা থেকে? কিন্তু এ আনন্দ অজ্ঞানতার নয়। শিশুদের নিঃস্পৃহতার আনন্দই জীবনের কাম্য। সে-ও কত জিনিস চায়, কিন্তু না দিয়ে ভুলিয়ে রাখলে, তার দরুণ বুদ্ধের মত তারা দুঃখের পাকে পুড়ে মরে না।



শক্তি আসে কোথা থেকে? আনন্দ থেকে—দুঃখ থেকে নয়। তাই চেষ্টা করতে হবে আনন্দের সঙ্গে। উৎসাহ জিনিষটা আনন্দেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু সেটা নষ্ট হয়ে যায় বিফলতার মনস্তাপে। তাই আনন্দকে কোনও নিমিত্ত ধরে আসতে দেখলে তার বিপরীত অবস্থায় দুঃখের জন্য আমাদের তৈরী থাকা চাই, নইলে ঠকতে হবে। উপলক্ষ্য নাই অথচ স্বাভাবিক আনন্দময় অবস্থা—সুখে দুঃখে—সফলতায় বিফলতায়—সর্ব্বত্র কেবল আনন্দ—এই তো চাই। এ কি একেবারে অসম্ভব? অসম্ভব বলে দূরে ঠেলে রাখলে তাই বটে। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনেই তেমন একটা সময় আসে। সেটা বয়সের অপেক্ষা রাখে না। সত্যানুভূতির গভীরতা দিয়ে তার পরিমাপ হয়। যতদিন অনুভূতি না আসে, ততদিন অবিশ্বাস স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের চেষ্টার অবিশ্রান্ত বেগ চাই। নিজের অবস্থানুসারে উপায় খুঁজতে হয়। বিশ্বাস আছে, পাব, কেননা দেবার জন্য দয়াল আমার অলক্ষ্যে সাথে সাথে ফিরছেন। যেটুকু দিয়ে দিয়েছেন, তাই সম্বল নিয়ে—হোক না সে খুব কম মূলধন, তবু তাই নিয়েই আরম্ভ হোক। পুঁজি আপনি বেড়ে যাবে। আমি দু' পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন—এ যে ধ্রুব সত্য।



স্মরণ* হচ্ছে ভাব। ভাবনা নয়। ভাবে আসে নীরব নিথর একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভূতি। আর ভাবনায় নিয়ে আসে ছটফটি—অতীতের বিফলতার, বর্ত্তমানের উপায়হীন নিরাশার ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার বিভীষিকা। অতীতের জন্য অনুতাপ ও ভবিষ্যতের আকাশকুসুম কল্পনা—দুইই দূর করতে হবে। আমার ভূত নাই, ভবিষ্যৎ নাই—আছে শুধু বর্ত্তমান। দেশকালপাত্রের অপেক্ষা না রেখে অনন্তসত্তার যে অনুভূতি, তাই "আমি।" আমি সদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। কোন্টা সুখ আর কোন্টাই বা দুঃখ?—তারা তো অনুভূতিরই দুটো দিক। মূলে অনুভূতির সত্তা আনন্দময় বিরাট সত্তাই একমাত্র সত্য। আপাততঃ বুদ্ধি দিয়ে, কল্পনা দিয়ে এই সত্যকে ধারণা করতে হবে। অভ্যাসে ক্রমে প্রত্যক্ষও সহজ হবে।

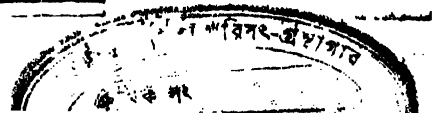
*

অমনি কিছু হয়ে যেতে পারে না—চেষ্টা চাই। আর নিশ্চেষ্ট হয়ে কেউ থাকতেও পারে না—যে শক্তিতে জগতে নেমে এসেছ, সেই শক্তি আবার গিয়ে চরমে না মিশা পর্য্যন্ত তার ক্রিয়া চলবেই। জগতের একটা স্বভাব আছে সত্য, কিন্তু তাকে ঠিকঠিক না বোঝা পর্য্যন্ত তার থাকা না থাকা সমান। সঙ্কীর্ণতার অভিমান যতক্ষণ দূর না হচ্ছে, ততক্ষণ নিজকে কোন অদৃশ্যশক্তির দ্বারা পরিচালিত বলে অনুভব করতে পারবে না, কাজেই স্বভাবকে মানাও হবে না, বোঝাও হবে না; —অধিকন্তু ঊর্দ্ধশক্তির দোহাই দিয়ে নিজের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেই শিখবে। কাজেই অভিমান যে পর্য্যন্ত না যাচ্ছে, যে কোনো বিষয়ে চিত্তের আসক্তি যে পর্য্যন্ত না পরাভূত হচ্ছে, সে পর্য্যন্ত নিজের যতটুকু শক্তি আছে, সদাসর্ব্বদার জন্য তাকে সচেষ্ট রাখাই শ্রেয়ঃ।

কাজে হোক, ভাবে হোক, সকল সময় দেহকে মনকে ব্যাপৃত রাখতে হবে। ইচ্ছা করলেই তো আর বসে থাকতে পারছি না—তবে আর নৈষ্কর্ম্যের ভান করে কি হবে? মন এখন অন্ধ, দেহের প্রবৃত্তিকে বশ করতে পারিনি; এ অবস্থায় কোন অনির্দ্দেশ্য অদৃষ্ট পথে নিজকে ছেড়ে না দেওয়াই ভাল। আত্মবিশ্বাসে হৃদয় জাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তর্দৃষ্টি খোলে না—কাজেই জগতের স্বভাবশক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করাও যায় না। স্বভাবকে না বুঝে তার উপর নির্ভর করায় মনের মাঝে শুধু চঞ্চলতাই বাড়ে।

*

আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে কত বিচিত্র রকমে জগৎকে উপভোগ করছি—এ শুধু সংস্কার-বশে। কয়টা ব্যাপারের কার্য্যকারণ পরম্পরার অনুসন্ধান আমরা রাখি? শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার পর্য্যন্ত গিয়েই একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলা, অথবা সমাহিত হয়ে তার কারণ খুঁজে বের না করা—এতেই তো জগৎকে ভুল বোঝা। দোষাসক্তভাবে বিচার না করে প্রায় অধিকাংশ জায়গাতেই নিজের আপাত সিদ্ধান্তকে চরম মনে করে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি। এই অদূরদর্শিতার ফলে অপরকে ভুল বুঝি—কাজেই কারো সঙ্গে আমাদের অন্তরের সুনিশ্চিত যোগ স্থাপিত হয় না। এতে অপরকে যেমন আঘাত করা হয়, নিজেও তেমনি ক্ষুণ্ণ হতে হয়। অন্তর্জ্জগতের এই ব্যাপারগুলি যখন কাজে পরিণত হয়, তখনই অশান্তি, অতৃপ্তি, বিরোধ, ব্যবহারের জটিলতা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এর ফলে দিন দিন আমরা যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি, আত্মরক্ষার শক্তিও ততই আমাদের কমে আসছে। নিশ্চলা শান্তি লাভ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য; জগৎকে ভুল বুঝলে সে শান্তি কখনই আসতে পারে না। উপরভাসা ধারণা, অস্পষ্টতা প্রভৃতি হতে চিত্তকে মুক্ত করতে হবে, সবিচার বিবেকযুক্ত অন্তর্দর্শী হতে হবে—নইলে তৃপ্তি আসবে না।





ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৮শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ { ২য় সংখ্যা।

দেবঃ সবিতা

—*—

(ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৪।১]

উদুষ্য দেবঃ সবিতা সবায়
শশ্বত্তমং তদপা বহ্নিরস্থাৎ।
নূনং দেবেভ্যো বিহিধাতি রত্ন-
মথাভজদ্বীতিহোত্রং স্বস্তৌ॥

বিশ্বস্য হি শ্রুষ্টয়ে দেব ঊর্দ্ধঃ
প্র বাহবা পৃথুপাণিঃ সিসর্ত্তি।
আপশ্চিদস্য ব্রত আনিমৃগ্রা
অয়ং চিদ্ বাতো রমতে পরিজ্মন্॥

ন যস্যেন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো
ব্রতমর্য্যমা ন মিনন্তি রুদ্রঃ।
নারাতয়স্তমিদং স্বস্তি
হুবে দেবং সবিতারং নমোভিঃ॥

ভগং ধিয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধিং
নরাশংসোগ্নাস্পতির্নো অব্যাঃ।
আয়ে বামস্য সংগথে রয়ীণাং
প্রিয়া দেবস্য সবিতুঃ স্যাম॥

হের ওই সবিতারে, উদিছেন সর্ব্বপ্রাণাধার,
বহেন বিশ্বের ভার নিত্যকাল, এই ব্রত তাঁর।
জ্যোতির্ম্ময় দেবগণে ভূষিছেন বিবিধ রতনে,
করেন কল্যাণ তার, যজ্ঞ যেবা পাতে সযতনে।

বিপুল তাঁহার বাহু প্রসারিয়া দ্যুলোকেরে ছা'ন,
উজলিয়া ধরণীরে নিখিলের আনন্দ বাড়ান।
তাঁহারি নিদেশ লভি, বহে পুণ্য সলিলের ধারা—
পবন শ্বসিয়া ফিরে সর্ব্বঠাঁই বাধাবন্ধহারা।

হোন্ মিত্র, হোন্ রুদ্র, কিম্বা হোন্ বরুণ বাসব,
অথবা অর্য্যমা হোন—সবিতার ব্রতের গৌরব
লঙ্ঘি যায়, হেন শক্তি বল কার? কেবা সেই অরি?
ভকতিপ্রবতকায় স্মরি তাঁয় সর্ব্ববাধা তরি।

পূজ্য, জ্ঞানী, ধ্যানগম্য সবিতার বাড়ায়েছি বল;—
স্তুত্য, দেবশক্তিপতি—সবাকার করুন কুশল।
কল্যাণ-সম্পদ যত অর্জ্জি নিত্য করিব সঞ্চয়—
সবিতা দেবতা সাথে যতদিন রহিবে প্রণয়।

———*———

সংস্কার ও বিচার

—*—

বিচারহীন সংস্কারবশেই আমরা প্রায়শঃ পথ চলি। এই যেমন ধরা যাউক, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মলাভ হয় না, এমন একটা সংস্কার অনেকের মনেই আছে। এর ফলে মানুষের দুই রকম বুদ্ধি হয়। কেউ বলে, আমি ধর্ম্ম চাই; সংসারে থাকিয়া যখন তাহা মিলিবার নয়, তখন আমার পক্ষে সংসার ত্যাগ করাই তো শ্রেয়ঃ। আবার কেউ বলে, সংসারটা আমায় বজায় রাখিতে হইবে; সর্ব্বদা ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়া চলিলে তাহা হইয়া উঠে না—সুতরাং সংসার করিতে গিয়া একটু আধটু অধর্ম্মের আশ্রয় নেওয়াতে হানি কি? এই ভেদবুদ্ধির ফলে দেখি, সংসারী আর বিরাগীর মাঝে বিরোধ দিন দিন বাড়িয়াই উঠিতেছে। সংসারীর বিরুদ্ধে বৈরাগীর অভিসম্পাত তো কত বচন-রচনের আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইদানীন্তন সাহিত্যের আসরেও দেখি, বৈরাগীর বিরুদ্ধে সংসারীর পাল্টা জবাবের পালা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু আসল কথাটা তো দলাদলির নয়। মত নিয়াই দলাদলি হইতে পারে, কিন্তু জীবনের অভিব্যক্তি তো কোনও দলের অপেক্ষা রাখিয়া হয় না। এই জন্যই দেখি, মতের গণ্ডী আঁকিয়া মানুষ মানুষকে দলের মাঝে পুরিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার মাঝেই মতের বিরুদ্ধে স্বভাব ফুটিয়া উঠিয়া বিদ্রোহের সৃষ্টি করিতেছে। এই বিদ্রোহে বিজ্ঞের দল বিরক্ত হইয়া স্বভাবটাকেই গালি দিতেছেন, সেটাকে দমাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে স্বভাব তো নিরস্ত হইতেছে না, বরং আরও বিকৃত আকারেই তাহা ফুটিয়া উঠিতেছে। জগতে সংসারী অনেক, বৈরাগীও কম নয়! কিন্তু বিকারশূন্য অক্ষত জীবন যাপন করিতেছে কয়জনা?

ইহাতেই মনে হয়, জীবনের যেটা মর্ম্ম সত্য, সেটা কখনও মত বা সংস্কারের মুখাপেক্ষী হইয়া বিকশিত হয় না। আর সত্য বলিতে একচোখা যদি কিছু বুঝি, তাহা হইলেও ভুল হইবে। বিরোধের সামঞ্জস্যই সত্যের রূপ। আমাদের কিন্তু বিরোধটাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে, তাই সহজেই পক্ষপাতিত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু পূর্ণের ভূমিকায় বিরোধের সামঞ্জস্য না করিতে পারিলে জীবনে তো স্বস্তি মিলিবে না। সংসার আর বৈরাগ্যের কথাটাই বলি। উভয়ে যে বিরোধ আছে, এ কথাটাই সবাই বোঝে। কিন্তু মনে হয়, এই বোঝাটাই ভুল বোঝা। উভয়ের মাঝে যে মিলনের হেতু রহিয়াছে, এই কথাটা যে বুঝিয়াছে, সেই খাঁটী বুঝিয়াছে, সেই জীবনরহস্যের সন্ধান পাইয়াছে।

আমাদের বুদ্ধি বিশ্লেষণ করিতেই জানে। বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্ব বোঝা সহজ বটে, কিন্তু সংশ্লেষণে সমস্ত তত্ত্ব জড়াইয়া প্রাণের স্ফূর্ত্তি ঘটাইতে ভাবুকের প্রয়োজন, রসিকের প্রয়োজন। জগৎটাকে আমরা অনেক ভাগ করিয়াছি। বহু কর্ম্ম, বহু রুচি—তাহাদের আবার প্রত্যেকের আলাদা এলাকা। ইহাতে কাজের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ভাবের ঘরে

চুরীরও সুবিধা হয়। আসলে কিন্তু জগৎটা ভাগাভাগি করিয়া সৃষ্ট হয় নাই—ইহার সর্ব্বত্র দেখিতেছি পরিণাম বা সংশ্লেষণমূলে পরিবর্ত্তন। রামধনুর সাতটা রঙ কোথায় কাহার সঙ্গে মিশিয়া আছে, আলোর সঙ্গে ছায়ার, দিনের সঙ্গে রাত্রির সন্ধিস্থান যে কোথায়, তাহা কেহ আবিষ্কার করিতে পারিবে না। ঠিক এমনি করিয়া মানুষের জীবনেও সুখ-দুঃখ, ভাল মন্দ, পাপ-পুণ্য জড়াজড়ি হইয়া রহিয়াছে। দুইটা কোটীতে যে ভেদ আছে, এইটুকু সবাই স্পষ্ট দেখিতে পায়, কিন্তু বিধাতা যে ঠিক কোথায় ভেদের রেখাটা টানিয়াছেন, তাহা তো কেহ দেখাইয়া দিতে পারিবে না। ভেদ দেখাটা বুদ্ধির দেখা ; এ দেখারও একটা মূল্য আছে, কিন্তু সেটাই সত্যের সম্পূর্ণ মূল্য নয়। এই অপূর্ণ বুদ্ধি দিয়া বিচার করি বলিয়াই আমরা অবিচারের লাঞ্ছনা এত বেশী করিয়া ভোগ করি। আসলে বলিতে গেলে, একটা মানুষকে সাধু বা অসাধু, সংসারী বা বিরাগী, জ্ঞানী বা প্রেমিক—ইত্যাদির কোনও একটা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আমরা তো তাহা বুঝিতে চাহি না। অসাধুত্ব যে সাধুত্বের মাঝে পরিণতি লাভ করিতেছে, বাসনা যে প্রেমে সার্থক হইবার চেষ্টা করিতেছে—অন্তর্য্যামীর এই বিচিত্র লীলা তো আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা গোড়া হইতেই মানুষকে কোঠায় কোঠায় ভাগ করিয়া লেবেল আঁটিয়া দিয়াছি —এরা সাধু, এরা অসাধু ; এরা সংসারী, এরা বৈরাগী। এর মাঝে একটু নড়চড় হইবার জো নাই। তাহা হইলেই লাঞ্ছনা আছে, শাসন আছে, তিরস্কার আছে। কিন্তু স্বভাবের আইন বুদ্ধির হুকুম মানিবে কেন? তাই এক দল মানুষ আইন করে, আর এক দল মানুষ বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গোপনে গোপনে আইন ভাঙ্গে। জগতের সর্ব্বত্র খুঁজিয়া দেখ, জুয়াচুরির কারবার কেমন তেজের সঙ্গে চলিতেছে।

তুমি হয়ত বলিবে, তাহা হইলে সমস্ত আইনকানুন ভাঙ্গিয়া স্বভাবেরই প্রশ্রয় দেওয়া হউক, এই কি তুমি চাও? জবাবে বলিব, হাঁ তাই চাই বটে, আবার তা চাই-ও না। প্রশ্রয় পাওয়ার জন্যই যে স্বভাবের সৃষ্টি—ছলে হউক, বলে হউক, কারো হুকুম না মানিয়া সে যে আপন বেগে চলিবেই—এ তো জানা কথা। সুতরাং স্বভাবের স্ফূর্ত্তিতে আপত্তি করিবার তো কোনও কারণ দেখিতে পাইতেছি না। এই জন্যই বলি, স্বভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হউক, এ চাই বটে। কিন্তু এ তো একদিককার কথা। আর এক দিকের কথাও তো ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যে বুদ্ধি খণ্ডিত দৃষ্টি দিয়া স্বভাবকে নিষ্পেষণ করিতেছে, তাহারও তো একটা স্বভাব আছে ; সে-ই বা নিরুদ্যম হইবে কাহার হুকুমে? আজ নিষ্পেষিতের স্বভাবকে যদি প্রশ্রয় দিবার আবদার করি, তাহা হইলে নিষ্পেষকের স্বভাবকেও প্রশ্রয় দিতে সঙ্কুচিত হইব কেন? স্বভাবের স্ফূর্ত্তিতে সত্য আছে—মিথ্যাও আছে ; ঠিক তেমনি নিরোধেও সত্য আছে—মিথ্যাও আছে। শুধু এক পক্ষের ওকালতী করা তো চলে না।

বিচারে যখন ব্যাপারটা এইখানে আসিয়া ঠেকে দেখিতে পাই, তখন আর জাতি ধরিয়া বা সমাজ ধরিয়া কথা বলা চলে না। জীবনের সমস্যা তখন ব্যক্তিগত হইয়া দাঁড়ায়। আমি তখন আর বিচারক নই—দ্রষ্টা। স্বভাব আর নিরোধ, দুই-ই তখন তুল্য মমতাদৃষ্টিতে

আমি দেখিতে পারি। পরিণাম সমষ্টিতেও সত্য, ব্যষ্টিতেও সত্য—ইহা অস্বীকার করি না। কিন্তু একটা মানুষের আয়ুষ্কালে সমষ্টিগত পরিণাম কতটুকু দৃষ্টিগোচর হইতে পারে? এক এক সময় সমাজ সংস্কার বা দেশোদ্ধারের ধুয়া উঠে। কিন্তু তাহাতে কতটুকু কাজ হয়? একেবারেই যে কোনও কাজ হয় না, তাহা বলিতে চাহি না, কেননা তাহা হইলে ভগবান্ ধুয়াটাই উঠাইতেন না। কিন্তু কথা হইতেছে যে, এই সমস্ত ধুয়ায় কাজ যতটুকু হয়, ডাকহাঁক তার চেয়ে বেশী হয়—অনধিকারচর্চ্চা বোধ হয় তার চেয়েও বেশী হয়। একজন বা দুইজন মহামনা ব্যক্তির দৃষ্টি হয়ত সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে—সমষ্টির পরিণামচিন্তায় তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু চেলাচামুণ্ডারাও যদি সেই স্পর্দ্ধা করে, তাহারাও যদি উচ্চগ্রামের সুর সাধনা আরম্ভ করে, তাহা হইলে শুধু একটা গণ্ডগোলেরই সৃষ্টি হয় মাত্র। আমার নিজকে উদ্ধার করিবার সামর্থ্য নাই—অথচ দেশ উদ্ধার করিবার জন্য কোমর বাঁধিলে চলিবে কেন? তাহাতে অপরোক্ষভাবে আমারই ক্ষতি, পরোক্ষভাবে ক্ষতিটা দেশের।

জীবনের যে কোনও সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে সমষ্টির দিকে না তাকাইয়া আগে ব্যষ্টির দিকে তাকানো প্রয়োজন। "আত্মানং বিদ্ধি"—আগে নিজকে জানিতে হইবে। আমার জীবন কোনও দলের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়, কোনও ধুয়ায় আমি নাচি না—এই আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাব অর্জ্জন করাই প্রথম কর্ত্তব্য। সমষ্টি সমাজ মহান, উদার; তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যষ্টির ভোগসঙ্কোচ করিতে হইবে—ইহা একটা আদর্শ বটে। কিন্তু ব্যষ্টির সঙ্গে যদি পরিচয়ই না ঘটিল, তাহা হইলে কি করিয়া এই আদর্শ তাহার জীবনে প্রতিফলিত হইবে? ঠিক আমার জীবনের তাৎপর্য্যটি আগাগোড়া ধারণা করিতে হইবে। এইখানে যদি গলদ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে পরের কথায় নাচিলে অহিত ছাড়া হিত কখনই হইবে না। ধর্ম্ম, সমাজ, দেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে উন্নত আদর্শ সকলেরই জানা আছে। বচন দিবার সময় সকলেই একরকমই বচন দেয়। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সবাই আপন আপন বুদ্ধির সংস্কার অনুযায়ী আদর্শকে গ্রহণ করিয়াছে। তাই কথায় সবাই এক হইলেও কাজে এক হইতে পারিতেছে না।

সংসারের পনের আনা কাজ চলিতেছে কেবল বুদ্ধির সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া। কিন্তু এই বুদ্ধিকে নিজের অন্তরের সঙ্গে যাচাই করিয়া লইবার অবসর কাহারও মিলিতেছে না। ইহাতেই নিজের সঙ্গে বিরোধ, পরের সঙ্গে বিরোধ—সমস্তটা জীবন জুড়িয়াই একটা বিরোধের আক্ষেপ। সকল প্রশ্নেরই দুইটা দিক আছে এবং দুইটা দিকই হয়ত কিছু পরিমাণে সত্য। এরূপস্থলে বিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিরোধের সম্ভাবনাই তো প্রমাণ করিতেছে যে মিলনতত্ত্ব তাহার মূলেই রহিয়াছে, নতুবা একটা সাধারণ ভূমি না পাইলে বিরোধ দাঁড়াইবে কিসের উপর? এই সাধারণ ভূমি বাহির হইতে দেখা যায় না, অপর কেহ দেখাইয়াও দিতে পারে না। ইহাকে দেখিতে হইলে বুদ্ধির সম্প্রসারণ প্রয়োজন, আত্মানুসন্ধিৎসু দৃষ্টির প্রয়োজন। যে ফুল আর ফলকে বিভিন্ন দেখিয়া ভেদের গণ্ডী আঁকে, সে শুধু বহিরিন্দ্রিয়ের দর্শনশক্তিটাকেই প্রামাণ্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়বোধের উপরেও বুদ্ধিমানের কাছে ফল ফুলেরই পরিণতিরূপে প্রতিভাত

হয়; উভয়ের মাঝে যে আপাতবিরোধ, তাহা পরিণামতত্ত্বে পর্য্যবসিত হইয়া এক অখণ্ড সত্যের সূচনা করে।

মানুষের অন্তর্জীবন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটা খাটে। বিরোধের মূলে রহিয়াছে শক্তির পরিণাম। একটা গড়ন্ত জিনিষের দুইটা প্রান্তকে ধরিয়া ভাগাভাগি বিচার করিলে তাহা সুবিচার হইবে না এবং সেজন্য বিচারককেই দুঃখ পাইতে হইবে। অপরের সম্বন্ধে আমরা এই ভাগাভাগি বিচারটা সহজেই করিয়া থাকি বলিয়া মানুষকে এত ভুল বুঝি এবং তার জন্যই জগতে এত অত্যাচার, অবিশ্বাস, অধৈর্য্য ও অক্ষমা। আবার পরের মুখে শুনিয়া নিজের জীবনটাকেও এমনি ভাগদৃষ্টিতে দেখি। তাহাতে নিজের উপরও বিশ্বাস দিন দিন কমিয়া যায়; একদিনের স্খলনটাও চির-স্তনের বিভীষিকায় আকুল করিয়া তোলে, মনে হয়, আমার বুঝি আর আশা নাই। অপরের সম্বন্ধে এবং নিজের সম্বন্ধে নৈরাশ্য যে জগতের উন্নতির পথে কতটা কাঁটা দিয়াছে, তাহা বলিবার নয়। সর্ব্বত্রই শুধু চাঞ্চল্য, শুধু অধৈর্য্য, কাজ করিয়াই সদ্য সদ্য ফলা-কাঙ্ক্ষা, ফললাভে বিলম্ব ঘটিলেই অভিযোগের কলরব—এই তো সংসারের অশান্তির মূল। বিচারদৃষ্টি নাই বলিয়া, আত্মকেন্দ্রে দৃষ্টি নাই বলিয়াই না এই অশান্তি।

ভগবান্ নির্ব্বোধ নহেন বা নিষ্ঠুর নহেন যে, বিনা প্রয়োজনে কতকগুলি জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়া আমাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন। অধিকাংশ জঞ্জালই আমাদের কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন, আমাদের অপরিণত অবিবেক দৃষ্টির ফল। জীবনের পরিণতির স্তরগুলি সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। পথের খবর পূর্ব্ব হইতেই জানা থাকিলে, অতর্কিতের আবির্ভাবে বিচলিত হইবার কোনও কারণ থাকে না। আত্মকেন্দ্রে দৃষ্টি ফিরাইলে তবে এইটুকু জানা সম্ভব হয়। তার জন্য অবশ্য অবকাশের প্রয়োজন। এই অবকাশই মানুষের শিক্ষার কাল। শিক্ষার সময় শুধু বাহির হইতে কতকগুলি খবরাখবর জুটাইয়া মনের ভাণ্ডার বোঝাই করিলে কোন লাভ নাই; তাহার চেয়ে মনুষ্যজীবনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আত্মানুসন্ধান দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করা এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সেই জ্ঞানকে প্রতিফলিত করিতে অভ্যাস করা অধিকতর প্রয়োজন। শিক্ষার সময় এই চিন্তাশীলতা-টুকু উদ্বুদ্ধ হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে বহু সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভবপর হয় এবং কুসংস্কারের চসমার ভিতর দিয়া পরচরিত্র দেখার প্রবৃত্তিও কমিয়া যায়। সমষ্টির বিচারের পূর্ব্বে ব্যষ্টির বিচার প্রয়োজন; পরের সংশোধনের পূর্ব্বে নিজের সংশোধন প্রয়োজন—এই দুইটী কথা যেন আমাদের স্মরণে থাকে। জগৎটাকে বিচারকের খণ্ডিত দৃষ্টি দিয়া না দেখিয়া মমতাশালী ভাবুকের দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে; সুখ দুঃখ, ভাল মন্দের বিরোধকে আনন্দব্যঞ্জনায় পর্য্যবসিত অনুভব করিতে হইবে। পরের বেলায় মমতা চাই, কিন্তু নিজের বেলায় চাই নির্ম্মম আত্মশাসন। অথচ আত্ম-অবিশ্বাসে ক্ষুব্ধ হইলেও চলিবে না; আত্মজীবনকেও পরিণামদৃষ্টি দিয়া দেখিয়া আশায়, উৎসাহে এবং বীর্য্যে সঞ্জীবিত হইতে হইবে।

—*—

নূতন সুর

—•—

একটা লোক পড়ে যেতে পায়ে চোট লাগল। অমনি মাধ্যাকর্ষণের ওপর তার রাগ হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, "মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটা ভারী খারাপ, তার জন্যই তো আমি পড়ে গেলাম।" কিন্তু আমরা বলি, মাধ্যাকর্ষণ না থাকার চেয়ে লাখ লাখ লোকের পড়ে পা ভাঙ্গাটাই ভাল। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের সঙ্গে ঝগড়া কেন? হিসাব করে পা ফেলো, তাহলেই আর পড়বে না। তুমি যে পড়ে যাও, আঘাত পাও, ভাবনা-চিন্তায় আকুল হও, সব হচ্ছে তোমার ভিতরের দুর্বলতা। এই দুর্ব্বলতা দূর কর; পরিস্থিতির সঙ্গে ঝগড়া করো না; মানুষকে দোষ দিও না। পরের ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপিও না—নিজের দুর্ব্বলতাটুকু দূর কর দেখি! যখনি তোমার পতন হয়, বা দুঃখ আসে, কি উদ্বেগ জন্মায়, তখনই জানবে ভিতরটা কাঁচা বলেই অমন হচ্ছে। এই কথাটা সব সময় খেয়াল রেখো—মাধ্যাকর্ষণ আইনের সঙ্গে ঝগড়া করো না।

ভিতরের এই দুর্ব্বলতাটা কি? এ হচ্ছে অবিদ্যার গহন আঁধার; সেই তো দেহ বা ইন্দ্রিয়কে "আমি" ভাবতে শেখায়। দূর কর এই জঞ্জাল, ছুঁড়ে ফেল এই মোহ!—তা হলে তুমিই তো শক্তিস্বরূপ হবে। তোমার যে প্লীহা বা যকৃৎ আছে, সেটা টের পাও কখন? যখন ও দুটো যন্ত্রের বিকার ঘটে। ফুসফুস্ আছে বলে কখন মনে হয়? যখন ফুসফুসের ব্যারাম হয়। নাকটা যতক্ষণ খাসা থাকে, ততক্ষণ সেটা আছে বলে মনে হয় না।

তাই বলি, যখন তোমার দেহ আছে বলে মনে হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে দেহের মাঝে নিশ্চয়ই কোনও বিকার আছে। শরীর যখন সুস্থ থাকে, তখন শরীরী মনে স্ফূর্ত্তি বোধ হয়, সাহস বাড়ে; শরীর যে আছে সে বোধটাই থাকে না। দেহ-আমির প্রবঞ্চনা থেকে তোমায় মুক্ত হতে হবে; ক্ষুদ্র দেহের কুসংস্কার ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তাহলে সমস্ত জগৎ হবে তোমার দেহ; আর যেই এই অবস্থায় পৌছাবে, অমনি তোমার মাঝে আনন্দের বান ডাকবে—তখন আর এটা-সেটার জন্য দুঃখ থাকবে না। তোমার মাঝে দুর্ব্বলতা আছে বলেই তো বারবার স্খলন হচ্ছে; এই দুর্ব্বলতা হতে, অবিদ্যা হতেই তো দেহাত্মবোধ জাগে।

একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "খৃষ্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হল, তখন তাঁর ব্যথা লাগল না কেন?" সাধুর কাছে কতকগুলো নারিকেল ছিল। ও দেশে সাধুর সঙ্গে দেখা করতে হলে বা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে গেলে লোকে কিছু ফলফুলুরী সঙ্গে নিয়ে যায়, তাই লোকে সাধুর কাছে নারিকেল নিয়ে এসেছিল। তার মাঝে একটা ছিল ডাব, আর একটা ছিল ঝুনো। সাধু বললেন; "এটা ডাব। আমি যদি মালাটা ভাঙ্গি, তাহলে শাঁসটার কি হবে?" তারা বললে, "তাহলে শাঁসটাও সঙ্গে সঙ্গে কাটা যাবে, ওটা নষ্ট হবে।" "আচ্ছা, এটা ঝুনো। যদি এটার মালাটা ভাঙ্গি, শাঁসটার কি হবে?" "মালা ভাঙ্গলে শাঁসটা নষ্ট হবে না।" "কেন?"

"ঝুনোতে মালা আর শাঁস পৃথক হয়ে যায়; আর ডাবে শাঁসটা মালার গায়ে লেগে থাকে।" "আচ্ছা, খৃষ্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হল, তখন বিঁধল কোনটা?" "দেহটা।" "আচ্ছা ধর, একটা লোকের দেহটা বা বাইরের মালাটা বিঁধল, কিন্তু তিনি যদি শাঁস হতে, নির্বিকার আত্মা হতে বাইরের আবরণটা পৃথক করে থাকেন, তাহলে মালাটা ভাঙ্গলেও শাঁসটা তো অক্ষত থাকবে। তবে আর তার জন্য দুঃখ কিসের? শোক কিসের? সাধারণ লোকের ডাবের মত শাঁসটা মালার সঙ্গে লেগে থাকে; তাই দেহে চোট লাগলে সেটা ভিতরেও লাগে। উভয়ের মাঝে এই হচ্ছে তফাৎ।"

খোসার মায়াই হচ্ছে তোমার দুর্ব্বলতা বা ব্যাধি। খোসার দাসত্ব বা খোসার আসক্তই যত আপদ। আবরণের মায়া বা বন্ধন ছেড়ে দেওয়াই সংসারী লোকের কাছে মৃত্যু। এখন যে ভূমিতে আছ, সেখান থেকে দেখলে এ মৃত্যু বটে। কিন্তু মৃত্যুর ভিতর দিয়ে গিয়ে এই আবরণ হতে বা আবরণের আসক্তি হতে মুক্ত না হতে পারলে, মৃত্যুকে জয় না করতে পারলে দুঃখ, উদ্বেগ, ব্যাধি, অস্বস্তির হাত হতে তো নিস্তার পাবে না। দেহ যেন কোনও দিনই ছিল না—এমনিতর হয়ে যাক। যিনি ব্রহ্মস্বরূপে লীন, তিনিই মুক্ত; তাঁর কাছে দেহের জন্ম-মৃত্যু তো নাই ই।

অনেকের মুখে রাম শুনতে পান, "যদি আমার জন্ম না হত।" সুইফ্ট (Swift) বাইবেলের একটা উক্তি প্রায়ই আওড়াতেন, "যে দিন আমার জন্ম হল, সে দিন অতলে তলিয়ে যাক্।" রাম বলছেন, যে দিনটাতে তুমি জন্মেছিলে, সেদিনটাকে তলিয়ে দেবার তো এটা পথ নয়। দেহ তলিয়ে যাক, বাসনা তলিয়ে যাক্—ব্রহ্মস্বরূপে এমনভাবে তন্ময় হয়ে যাও, যেন তোমার জন্মের দিনই না থাকে, যেন তোমার কোনও দিনই দেহ ছিল না, কোনও দিনই জন্ম হয় নি। সুষুপ্তিতে প্রবেশ করলে জাগ্রতের কোনও স্মৃতিই থাকে না, সব ভুল হয়ে যায়। শিবস্বরূপেও এমনি করে তন্ময় হয়ে যাও যে সমস্তটা অতীত যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। এমনিভাবে মালা হতে শাঁস আলাদা করতে হবে, তা হলেই মৃত্যুঞ্জয় হবে।

সব পুরোণো গানে এই নূতন সুর লাগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে উপলব্ধি। গানের কথাগুলো ঠিকঠিকই থাকবে, কিন্তু তার সুরটা হবে একেবারে নূতন। জগৎকে একেবারে এক নূতন দিক হতে দেখতে হবে। দুটো দিক গুলিয়ে ফেললে চলবে না। কতকগুলো ব্যাপার দেখবে সংসারীর দিক থেকে, আবার কতকগুলো দেখবে নূতন দৃষ্টিতে—এ হলে চলবে না। তোমার প্রেক্ষাবিন্দুর একদম পরিবর্ত্তন হয়ে যাক—সর্ব্বত্র ভগবানকে দেখ। জগতের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হবে ভগবানের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক। একেবারে আমূল পরিবর্ত্তন চাই। গল্প দিয়ে কথাটা বোঝাচ্ছি।

ব্রহ্মবিদ্ ঋষিদের সংঘে একটা লোক এসে বুক চাপড়িয়ে কান্নাকাটী সুরু করে দিল। কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। একজন ঋষির পুত্রের মৃত্যু হয়েছে বলে লোকটা কাঁদছিল। মৃতের সঙ্গে তার একটা সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু কেউ তাকে কোনও কথা বললেন না দেখে লোকটা

বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে ঋষিরা তাকে শান্ত ও সহজভাবে শোকসম্বরণ করে স্থির হতে বললেন। লোকটা বল্‌ল, আত্মজনের বিরহ সে আর সইতে পারছে না। কিন্তু তা'বলে ঋষিদের মাঝে কেউ কাঁদলেন না বা কোনও রকম উদ্বেগের লক্ষণ দেখালেন না, কেননা তখন তাঁরা ব্রহ্মভাবে ভাবিত, সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে তাঁরা দেখছেন। এই অবস্থাতেই পুরাণো গানে নূতন সুর দেওয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। তখন মুখ দিয়ে এই কথাই বেরোয়, "বাতাস বইছে—এমন কথা বলার যেমন কোনও সার্থকতা নেই, তুমি আত্মীয়, আমাদের কাছে এমন কথারও তেমনি কোনও সার্থকতা নেই। ভাই, যদি বাতাস বয়, তার মাঝে এমন কি অস্বাভাবিক আছে, যাতে আমরা বিচলিত হব? নদী বইছে; তাতে আমাদের কি? নদী বওয়া তো স্বাভাবিক, তাতে আমরাই বা বিচলিত হব কেন? এ সমস্ত কথার সঙ্গে অপ্রাকৃত কোনও ব্যাপারের তো সংস্রব নেই। তেমনি তুমি এসে যখন পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ দিচ্ছ, তখন অলৌকিক কোনও কথা তো বলছ না। মৃত্যু তো স্বাভাবিক। জন্মালে মরণ আছেই। তুমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোক, তখন সেখানে চিরকালের বাসা বাঁধবে বলে যাও, না কিছু কালের জন্যই যাও? পরীক্ষার পরও কি নূতন বিদ্যার্থীর মত তুমি সেখানে বসে থাক? নূতন বিদ্যার্থীদের শ্রেণীতে যখন ভর্ত্তি হয়েছিলে, তখন জানতেই যে এখানে চিরকাল থাকবে না, পরের শ্রেণীতে প্রমোশন পাবে বলেই এখানে এসেছ।"

• •

সিঁড়িতে যখন পা দাও, তখন চিরকাল তো সেখানে দাঁড়িয়ে থাক না। ধাপ পার হয়ে সিঁড়ি ছেড়ে যে চলে যেতেই হয়, এ তো জানা কথা। আবার যখন জন্ম হয়, তখন অতীত ছেড়েই তো বর্ত্তমানে আসতে হয়। যখন এই দেহে প্রবেশ করেছ, তখনই যে দেহ ছাড়তে হবে, এ কথা জেনেছ। যে মৃত ব্যক্তিকে তুমি আত্মীয় বলছ, সে যে মরেছে, এ তো সহজ কথা—এর মাঝে আশ্চর্য্য কি আছে, নূতন কি আছে? সুতরাং এতে তোমার বিচলিত হবার কি আছে? আজ নখ কেটেছ বলে কি বিচলিত হও? ছেলে মরে থাকে তো বেশ হয়েছে, এ তো অস্বাভাবিক কিছু হয় নি।

সংসারের দিকে এই দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে হবে, এমনি করে নিজকে মুক্ত রাখতে হবে। সত্যদৃষ্টি নিয়ে তাকাও, আত্মস্বরূপে ব্রহ্মস্বরূপে বিশ্রামলাভ কর, আত্মীয় স্বজনকে সেই ভূমিতে থেকে দেখ। যেমন মানমন্দির থেকে বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করেন, তেমনি আত্মার মানমন্দিরে থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের দূরবীনের ভিতর দিয়ে জগতের দিকে তাকাও। তুমি শিব, তুমি সত্য, তুমি দেবদেব, তুমি জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ। সোঽহং—সোঽহং। দেহ নই, মন নই, কামনাজর্জ্জরিত ক্ষুদ্র আমি নই—আমি শিব। একবার এই সত্য অনুভব কর দেখি, এইভাবে তন্ময় হয়ে যাও দেখি। একবার অনুভব কর যে তুমি ব্রহ্ম। এই অনুভূতিই তো প্রয়োজন। দেহটা যদি কুঁড়ে ঘরেই পড়ে থাকে, তাতে তোমারই কি, আমারই কি, আর কারই বা কি? এই স্বরূপজ্ঞান জাগিয়ে রাখ, তা হলে যেখানে থাকবে, সেখানেই স্বর্গ। দেহের যদি দুঃখ কষ্ট হয়, তাতে তোমার কি? ব্রহ্মানুভূতি শুধু তোমার থাক, তাহলে বিশ্বজগতের

সমস্ত সম্পদ তোমার করায়ত্ত। শুধু এই অনুভূতিটুকু রাখ, আর সব ছুঁড়ে ফেলে দাও!

একবার রামের কাছে একটা লোক এসে বলল, "মশায়, এক রাজা আসছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।" দেখ, এখন কিন্তু কথাটা খুব খেয়াল করতে হবে। রাম কিন্তু বড় সঙ্কট অবস্থার কথা বলবেন। সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজনের এই সমস্ত খোসা-মুদে কথায় মানুষ কিন্তু ভুলে যায়। লোকটা এসে তো বলল, "একজন বড়লোক এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।" রাম তখন ব্রহ্মদৃষ্টিতে সব দেখছেন, তাই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "তাতে রামের কি?" লোকটা বলল, "আপনাকে উপহার দেবেন বলে তিনি কত সুন্দর সুন্দর মূল্যবান জিনিষ কিনে এনেছেন।" রাম বললেন, "তাতে আমার কি? রাজা আমার কাছে কি? আমি শুধু চাই সত্য। তুচ্ছাতিতুচ্ছ মায়ার খেলাতে আমার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। আমার সত্যস্বরূপ; শিবস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, আত্মস্বরূপই আমার সব জুড়ে রয়েছে। এই সব বাজে কথা, সংসারের তুচ্ছ ব্যাপার আমাকে স্পর্শই করতে পারে না। রামের দেহটার কাছে আজ একটা বড় লোকই না হয় এল, কিন্তু রাম যদি ওই সমস্ত দেহপিণ্ডে আসক্ত হন, তাহলে তিনি একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নই হয়ে থাকবেন শুধু। কিন্তু দৃষ্টি যখন বদলে যায়, পুরোনো গানে নূতন সুর লাগানো হয় সর্ব্বোচ্চ ভূমি হতে, যখন জগতের দিকে তাকানো যায়, তখন রাজা, মহারাজা বা সম্রাট আমায় বিচলিত করবে কেন? কেউ তখন আমায় টলাতে পারবে না।

তাই বলি, দৃষ্টি বদলে ফেল। যে দিন থেকে খবরের কাগজের হুজুগে মাতবে না, জানবে, সেই দিন থেকে দেহাত্মবুদ্ধি আলগা হয়ে আসছে, ভগবানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ তুমি। সত্যকে কাজে খাটাবার এই একটা উপায়। নিজকে ক্রুশে বিদ্ধ করতে হবে, তবেই না সত্যজীবন তোমার মাঝে ফুটে উঠবে।

তোমাদের কাছে যে সমস্ত কাহিনী বলি, সেগুলো শুধু নকল করবার জন্য নয়। অমন কাজও করো না। শিবস্বরূপ তোমার অন্তরে উপলব্ধি কর—ভাব তুমিই ব্রহ্ম। এই ভাবনাতে সমস্ত প্রলোভন, ভয় ও উদ্বেগ জয় কর। ওম্—ওম্—ওম্।*

---

* স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, ক্যালিফোর্নিয়া, —ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩)

স্ত্রী ও পুরুষ

—•—

[শ্রীশিশিরকুমার বসু বর্ম্মন্ বি. এ.]

আত্মা স্ত্রীও নন, পুরুষও নন। তিনি স্ত্রীত্ব, পুংত্ব ও ক্লীবত্বের অতীত বস্তু। শ্রুতি বলিতেছেন—

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে॥

স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব সংস্কার বা স্বভাববশে যেরূপ দেহে পূর্ব্ব স্বভাব স্ফূর্ত্তি লাভ করে, আত্মা তদ্রূপ পরিচ্ছদরূপ দেহ ধারণ করেন মাত্র। কি জন্য এই স্ত্রী পুরুষ ভেদ হয়, তাহা সংক্ষেপতঃ বুঝিতে হইলে এইটুকু জানিতে হইবে যে, মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব বা শক্তি ও শক্তিমানের দ্বৈত ও একত্বের উপরই এই জীবলীলা। সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে এই স্ত্রী পুরুষ ভেদ। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের আকর্ষণ শক্তিতে একত্র সংযোজিত হইয়া বা পরস্পরের সাহায্যে ক্রমোন্নতি দ্বারা স্ত্রীত্ব পুংত্ব ভেদজ্ঞানের উপরের অবস্থা বা একত্বের অবস্থায় উপনীত হয় অর্থাৎ নিজের ভিতরেই শক্তি ও শক্তিমানের একত্ব অনুভূতির দ্বারা ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করে। ইহাই জীবলীলার অবসান।

আমরা শক্তি ও শক্তিমানরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া শুধু স্থূল ব্যাপারটা লইয়াই উভয়ের সম্বন্ধ ও তাহার পরিণতি বিচার করিব। আধুনিক অনেক বৈজ্ঞানিকের মত যে, স্ত্রীদেহই ক্রমবিকাশের পথে পুরুষশরীর অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগামী। আমরা সে দিক দিয়াও দেখিব না, কারণ দেহ ত চিন্তার ফল মাত্র; 'চিন্তা অগ্রে, পরে তাহার ফল। চিন্তার ধারা ধরিয়া দেখিব, স্ত্রী পুরুষের ভিতর স্ত্রী অধিকতর উন্নত কি পুরুষ উচ্চতর। পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা নিজকে অধিকতর উন্নত বলিয়া মনে করে—স্ত্রীও পুরুষকে সে উন্নত আসন হইতে নিচ্যুত করিতে প্রয়াসী নহে। কিন্তু একে নিজকে উন্নত বলিয়া মনে করিলে এবং অপরে তাহাকে বড় বলিয়া মানিয়া লইলেও স্বরূপতঃ কে অধিকতর উন্নত, তাহা দেখিতে হইবে।

এ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রথম বিচার্য্য যে, জগতে সুখ বেশী কি দুঃখ বেশী। সুখ দুঃখের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এক দুঃখের হাহাকার ভিন্ন সুখের লেশমাত্রও নাই। জীব প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এক অনন্ত দুঃখের ভিতর দিয়াই যাতায়াত করে। কিন্তু এই দুঃখের পুনর্বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকই বেশী দুঃখ ভোগ করে। তাহাদের সারা জীবনটা একটা দুঃখের দৌড়। প্রথমেই পুরুষ নিয়ন্তা, স্ত্রী নিয়ন্ত্রিত। স্ত্রী সমাজের কেন্দ্র পুরুষ তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ইতস্ততঃ তাহাকে লইয়াই ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তারপর স্ত্রী জননী; প্রতি সন্তান জননে দশ মাস অসহ্য যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণার তুলনা নাই। তারপর সন্তান পালন, সংসারের গুরুভার, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অনশন, অর্দ্ধাশন, ব্যাধি-শোক ইত্যাদি ত আছেই। আর পুরুষের এ সমস্ত জঞ্জাল কিছুই নাই। তাহার

সাধারণতঃ দুঃখ—দারিদ্র্য ও ব্যাধি। কিন্তু তবুও স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের দুঃখের অনুভূতি সহস্রগুণ অধিকতর—স্ত্রীর পুরুষের ন্যায় তীক্ষ্ণ অনুভূতি নাই। তাই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ উচ্চতর। যে প্রজ্ঞানের ফলে আত্মচৈতন্যের অনুভূতি হয়, তাহা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের বহুল পরিমাণে বেশী; আর স্ত্রীর ভিতর আনন্দের আধিক্য থাকিলেও জীবভাব পুরুষ অপেক্ষা বেশী। পুরুষের দুঃখের অনুভূতি বেশী; তাই সে ভুল করিয়া মাঝে মাঝে মাদকতার আশ্রয়ে কিছুক্ষণের জন্য দুঃখের হাত হইতে বাঁচিতে চায়; তাই সে মাঝে মাঝে স্ত্রীর জীবভাবের ভিতর নিজকে ডুবাইয়া দিয়া দুঃখ ভুলিতে চায়। আর স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা সহস্রগুণ দুঃখ ভোগ করিলেও সেই দুঃখ তাহার যেন সহিয়া যায়। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপদগ্ধ দারুণ ভারগ্রস্ত শকটলগ্ন বলীবর্দ্দের যেন ত্বক্ ভেদ করিয়া সূর্য্য তাহার অনুভূতি জাগাইতে পারে না। সে উত্তাপ যেন সহিয়া যায়—নতুবা সে শকট ফেলিয়া দিয়া গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিত। পুরুষ কিন্তু তদ্রূপ নহে। সে দুঃখের অনুভূতির হাত হইতে সাময়িক ভাবেও নিস্তার পাইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পথ ভুলিয়া বিপথে চলিতে থাকে। আর যাহারা এতাদৃশ পুরুষাপেক্ষা উন্নত, তাহারা দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি করিতে এই বিরাট সৌর জগতের বিশালত্বের সহিত নিজের ক্ষুদ্রত্ব ও নশ্বরত্বের অনুভূতিতে "চন্দ্র সূর্য্য যাঁর পায়ের কাছে মালা হয়ে জড়িয়ে আছে," সেই মহান বস্তুর চিন্তায় নিজের ক্ষুদ্রত্ব একেবারে লোপ করিয়া দিয়া দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি করেন। পুরুষের ভিতর এই দুই শ্রেণীর মানব দুই পথ অবলম্বন করে।

স্ত্রী এরূপ কিছু চিন্তা করে না। তাহার মস্তিষ্কের ভিতর বুদ্ধিপ্রকোষ্ঠ পুরুষ অপেক্ষা ছোট, ইহা বৈজ্ঞানিকদিগের অভিমত। তারপর তাহার জীবভাব বেশী। সে দেহাত্মবোধপ্রধান। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বোধ খুব ক্ষীণ। তাহার কাছে। সে দেহকে বহুমূল্য আভরণে ভূষিত করে এবং সিন্ধুকের চাবি তাহার দেহলগ্ন করিয়া ইহসর্ব্বস্বজ্ঞানে কোষাগারের রক্ষক হইয়া আনন্দ অনুভব করে—ভগবদ্দত্ত সৌন্দর্য্য যেন পর্য্যাপ্ত নহে। হায়, রমণীর যদি একটা চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য কি তাহার সে চক্ষু দান করিতে পারে? ভগবদ্দত্ত সৌন্দর্য্যের তুলনায় সামান্য দেহভূষণ কত তুচ্ছ। দেহের উপর যতই দৃষ্টি যায়, দেহাতিরিক্ত বস্তুর অনুভূতি ততই কম হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতি কি চিরদিনই এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিলেন? বেদের অনেক ঋষি ত স্ত্রীই ছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয়া গার্গী মৈত্রেয়ী ত এই দেশেই জন্মিয়াছিলেন। পুরুষের সহিত স্ত্রীও অমৃতের তুল্য অধিকারী। শুধু তাঁহারা তাঁহাদের অধিকার বুঝিয়া লউন। আবার তাঁহার তাঁহাদের পূর্ব্ব গরিমায় মণ্ডিত হইয়া, মায়ের জগতে আদর্শ মাতা হইয়া উপযুক্ত সন্তান গঠন করিয়া তাঁহাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

এই অধিকার বুঝিয়া লইতে হইলে স্ত্রীর প্রথমে দেখিতে হইবে, পুরুষের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কিরূপ। কেন স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি ধাবমান?

পুরুষে চিচ্ছক্তি বা জ্ঞানের বিকাশ বেশী, স্ত্রীতে হ্লাদিনী বা আনন্দশক্তির বিকাশ বেশী। তাই নিজের অভাবের পূরণার্থে এক

অপরের প্রতি ধাবমান। কারণ চিৎ ও আনন্দ উভয়ের মিলন শাশ্বত। তাই ভুল করিয়া স্ত্রী পুরুষ একে অপরের জড়দেহকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মসংমিশ্রণে অভাবের সম্পূর্ত্তি করিয়া জুড়াইতে চায়। কিন্তু কি স্ত্রী, কি পুরুষ প্রত্যেকেই কি সেই সচ্চিদানন্দের অংশ নহে? মূর্খ আমরা, তাই তাহার বিকাশ অনুভবের পন্থা হারাইয়া ফেলিয়াছি। অন্তর্দৃষ্টির অভাবহেতু আমরা "আত্মারাম" অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। সেই অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে স্ত্রী পুরুষের প্রত্যেককেই তাহার অধিকার বুঝিয়া লইতে হইবে—প্রত্যেককেই স্বাধীন হইতে হইবে।

এই অধিকার বুঝিয়া লইতে স্ত্রীর প্রথমেই বুঝিতে হইবে "কোঽহং—কুত আয়াতঃ"—আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি; এবং পুরুষের সহিত বাহ্যিক মিলনের কি গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শরীরধর্ম্ম বা প্রবৃত্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্ফুরিত হয়। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের সাহায্যে এই জীবভাব বা প্রবৃত্তি ভোগদ্বারা ক্ষয় করিয়া নিবৃত্তিতে পৌঁছিয়া স্বাধীন হইয়া নিজে নিজেতেই রমমাণ হইবেন, ইহাই বিধির বিধান। স্ত্রীতে আনন্দের আধিক্যবশতঃ আনন্দলিপ্সু পুরুষ তাহাতে আকৃষ্ট হয়, তাই মানব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং ক্রমে উন্নতি লাভ করে। বড় বড় বিশ্বজয়ী বীর আসুরিক শক্তিদ্বারা বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেও সামান্য রমণীর চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার সমস্ত বীরত্বের অভিমান তিরোহিত হইয়াছে। আনন্দেই সকলকে আকর্ষণ করিতেছে এবং এই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারাই স্ত্রীজাতি একভাবে পুরুষের উপর আধিপত্য করিতেছেন বটে; কিন্তু তবুও তাঁহারা নিজকে চিনিতে না পারায় লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহারা চিরদিন পুরুষের কামানলে ইন্ধন যোগাইয়া দিন দিন হীনবল হওয়ায় তাঁহাদের মানসিক শক্তি ও শারীরিক শক্তির হ্রাস হইতেছে এবং স্বীয় কর্ম্মফলে অতিক্রান্ত দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যহীন হইয়া নানা ভাবে লাঞ্ছিত হইতেছেন।

কিন্তু কি উপায়ে স্ত্রীজাতি তাঁহাদের পূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন?

এ দেশের স্ত্রীজাতির প্রকৃত জীবন আরম্ভ স্বামিগৃহে বা বিবাহের পর। প্রথম প্রশ্ন—এ দেশের বাল্যবিবাহ তাহাদের মানসিক উন্নতির অন্তরায় কি না এবং এ দেশের বিবাহ দেশকালপাত্রভেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিনা। প্রত্যেক দেশেই বিবাহের একটা নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। ডাঃ রাইট্ বলিতেছেন, "বিবাহে সময় প্রকৃতিই নির্দ্দেশ করিয়া দেন। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া এই সময়ের ব্যতিক্রম করিলে তাহার শাস্তি কিছু না কিছু পাইতে হইবে।"

স্ত্রী পুরুষের মিলনের একটা সময় আছে। সর্ব্বদেশের একই নিয়ম হইবে, এরূপ নহে। জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণানুসারে বিভিন্ন দেশের নিয়ম স্বতন্ত্র। এ দেশীয় আচার ব্যবহার বৈদেশিকদের নিকট যতই অসমঞ্জস বলিয়া বোধ হউক না কেন, এ দেশীয় বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলা চলে না। শীতপ্রধান দেশে বালিকার যে বয়সে মাতৃত্বের শক্তি জাগরিত হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহার বহুপূর্ব্বে হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যে দেশ-

কালপাত্রবিচারহীন হইয়া এ দেশের পক্ষে ভুল আদর্শ আনিয়া চলিতে হইবে, এরূপ নহে। রজোদর্শনেই যদি বিবাহের কাল নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে এ দেশের বিবাহকে বাল্য বিবাহ বলা যাইতে পারে না। পুরুষেরও তদ্রূপ একটা সময় আছে। তাহাদের যখন পুত্রোৎপাদনের শক্তি হয় বা গুরুগৃহ হইতে যখন বালক স্বগৃহে ফিরিয়া আইসে, তখনই তাহাদের বিবাহের উপযুক্ত কাল। গুরুগৃহ হইতে ফিরিতে পুরুষের প্রায় ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম হয়। বর্ত্তমানে গুরুগৃহ বলিতে পাঠ্যাবস্থা বুঝিতে হইবে। যদি এই সময় বালকবালিকার বিবাহ না হয়, তবে সমাজ অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতি এ বিষয়ে ফল ভোগ করিয়া এক্ষণে প্রাচ্য আদর্শ গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন।

মানব সমাজের গার্হস্থ্যজীবনই মেরুদণ্ড-স্বরূপ। তজ্জন্য মনু বলিয়াছেন, "জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী।" অন্যান্য আশ্রমে গৃহস্থের উপরই নির্ভর করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করেন। তাই বিবাহ, পাপ ও পাপের ফল ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। বিবাহ সংযম আনয়ন করে। এই সংযমই বিবাহিত জীবনের মূলমন্ত্র ও স্বামী স্ত্রীর ইহপরকালের সুখের সোপান, ইহা মনে করিয়া তদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা মানবজীবনের লক্ষ্য। এই সংযম প্রধানতঃ ত্রিবিধ—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। শারীরিক সংযম বলিতে ব্রহ্মচর্য্য বুঝায়। বাস্তবিকই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। গার্হস্থ্যজীবনে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ঋষিগণ দেখাইয়া গিয়াছেন যে গার্হস্থ্যজীবন সংযম শিক্ষার প্রশস্তক্ষেত্র ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সুগম পথ। দেহধারণ করিলে প্রবৃত্তি থাকিবেই। তবে প্রবৃত্তির প্রবল বন্যায় নিজেকে ছাড়িয়া না দিয়া সংযম অভ্যাসের জন্যই স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এই জন্যই স্ত্রী সহধর্ম্মিণী বা ধর্ম্মরক্ষার সহায়ক। স্ত্রী নিজ প্রবৃত্তি ক্ষয় করিয়া নিবৃত্তিমুখী হইবার জন্য মাসিক দুইবারমাত্র স্বামীর এক শয্যায় শয়ন করিতেন। পূর্ব্বে আর্য্যগণ "অসিধার" ব্রত অর্থাৎ মনকে সর্ব্বদা সতর্ক রাখিবার জন্য স্বামী স্ত্রীর ভিতর তীক্ষ্ণধার অস্ত্র রাখিয়া দিতেন, যাহাতে ভুলক্রমেও একে অন্যের সংস্পর্শে না আইসে। বর্ত্তমানকালে উহার প্রয়োজন নাই—শুধু স্বামী স্ত্রী পৃথক শয্যা ব্যবহার করিলে এবং একজনে নিদ্রিত হইলে কোনক্রমে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিলে এবং মনুর শাসনবাণী অনুসরণ করিলেই অশেষ কল্যাণের অধিকারী হইতে পারিবেন।

এতদ্ব্যতীত দিবসেও স্ত্রীপুরুষের অনুচিত হাস্যপরিহাস পরিত্যাগরূপ বাচনিক ও স্ত্রীপুরুষ চিন্তনত্যাগরূপ মানসিক সংযম আবশ্যক। স্ত্রীর শরীরে বসনপ্রাচুর্য্যও সংযমের অনেক সহায়তা করে।

কিন্তু স্বামী যদি তাহার বিবাহিত জীবনের গুরুত্ব না বুঝে, তবে স্ত্রীকে তাহার দেহ ইন্ধনস্বরূপ স্বামীর কামানলে আহুতি না দিয়া তাহার হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইবে এবং সংযমহীনতা যে পার্থিব ও অপার্থিব উভয় সুখের অন্তরায়, তাহা বুঝাইতে হইবে। অনেক সময় দেখা যায় যে, স্ত্রী স্বামীর হৃদয়ে আধ্যাত্মিকভাব প্রবেশ করাইতে গিয়া অনেক নির্য্যাতন ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রতি স্বামীই বুঝিবেন যে, "বিবাহ করিলেই স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার

করা, বাধাবাধকতায় নিষ্পেষিত করা, প্রহার করা, মূর্খ করিয়া রাখা ও সাধারণ দাসীর মত করিয়া রাখার অধিকার জন্মায় না।"

রমণীর শরীরগঠন কৌশল বিচার করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে তাহারা কখনই উৎকট পরিশ্রমসহনশীল নহে। বিশেষতঃ শীতপ্রধান দেশের রমণীর কর্ম্মকুশলতা ভারতীয় রমণীর নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য সন্তান পালন বা জাতীয়-জীবন গঠন; —পুত্রের সম্মুখে আদর্শ মাতা হইয়া ভবিষ্যতে তাহারা কি প্রকারে রমণীর সম্মান করিবে তাহাই শিক্ষা দেওয়া। পুত্রের সম্মুখে মাতা সংযমগরিমার ও করুণার উজ্জ্বল মূর্ত্তি—যাহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বালক সংযমের মূল্য বুঝিবে ও ভবিষ্যতে স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিতে শিখিবে। এ দেশে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বালকের মাতাই একমাত্র অভিভাবিকা। সুমাতার কি প্রকার পুত্র হয়, তাহা স্বামী বিবেকানন্দে পরিস্ফুট হইয়াছে। মাতার নিকট হইতে যে ধর্ম্মভাবের বীজ বালক নরেন্দ্রের হৃদয়ে নিহিত হইয়াছিল, তাহা উত্তরকালে কি প্রকার মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সমস্ত জগতে ঘোষিত হইয়াছে।

তারপর স্ত্রী জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বহির্বায়ু সেবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক বায়ুকে অবলম্বন করিয়াই জীবগণ বাঁচিয়া রহিয়াছে। মুক্তবায়ুসেবন বলিলে স্ত্রীস্বাধীনতা মনে করিয়া কাহারও যেন আতঙ্ক না হয়। বায়ুসেবন এক কথা আর স্ত্রী স্বাধীনতা বলিতে যে ভাব মনে উদয় হয়, উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে ভারতীয় হিন্দু রমণীর নিকট হইতে তাহাদের ন্যায্য অধিকার—স্বাধীনতা কোন দিনই কাড়িয়া লওয়া হয় নাই। রমণী Indoor বা সংসারের আভ্যন্তরীণ কর্ম্মের কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া যতটা সম্ভব স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বস্বাধীনতা এখনও ভোগ করিতেছেন ইহা পল্লীগ্রামে সম্যক্ দৃষ্ট হয়। হিন্দুগৃহে, কোনদিনই পর্দ্দার ব্যবহার ছিল না বা বর্ত্তমানে নাই। তবে এক সময় উহার প্রয়োজন হইয়াছিল। মোগলদিগের বিজয় বৈজয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে পর্দ্দা আসিয়াছিল। উচ্চ হিন্দু রাজকর্ম্মচারিগণ অতিক্রান্ত আত্মমর্য্যাদাহানি হইবার ভয়ে পর্দ্দার ব্যবহার প্রচলিত করিলেন এবং দরিদ্র হিন্দু পরিবার বিজয়ী মোগল সৈনিকের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য রমণীকে অন্তঃপুরচারিণী করিলেন। হিন্দুরমণী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেও মুসলমানের পর্দ্দা এক, আর হিন্দুর অন্তঃপুর অন্য। এখানে স্ত্রীপুরুষের স্বেচ্ছা বিচরণের বাধা নাই এবং আত্মীয় স্বজন স্বজাতীয় পাড়াপ্রতিবেশীর গৃহে গমনাগমনের নিষেধ নাই। স্ত্রীস্বাধীনতা হিন্দুর মজ্জাগত। ভারতের সমস্ত হিন্দুনারী স্বাধীনভাবেই বিচরণ করিয়া থাকেন। কেবল বঙ্গদেশেই হিন্দুরমণীর দুর্দ্দশা লক্ষিত হয়। ইহার কারণ বঙ্গদেশে বহুদিন পর্য্যন্ত এবং বহু পরিমাণে মুসলমানের শাসন প্রভাব বর্ত্তমান ছিল।

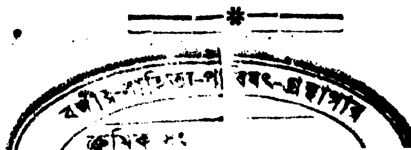
স্ত্রী জানিবেন, তিনি গৃহকর্ম্মের পরিচালিকা। গৃহকে কেন্দ্র রাখিয়া পুরুষের উপর দেশের ও দশের ভার দিয়া তাঁহারা যতটা হয় স্বাধীনতা ভোগ করুন এবং গৃহ হইতেই জাতীয় জীবন গঠন করিবার সহায় হউন। স্ত্রী পুরুষের উদ্দেশ্য এক, স্বার্থও এক, যেন তাহাতে সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, কারণ একই লক্ষ্যে পৌঁছিতে উভয়ের কর্ম্মবিভাগমাত্র।

তারপর শিক্ষাসমস্যা। শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যা। কিন্তু আধুনিক পাঠ্যপুস্তকগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে ভগবানের নাম একবারও পাওয়া যায় না। ১ বাদ দিয়া কতকগুলি শূন্য লিখিয়া রাখিলে তাহার যেরূপ মূল্য, আধুনিক শিক্ষার মূল্যও তদ্রূপ। বর্ত্তমান বিদ্যালয়ে অবিদ্যারই 'সাধনা হয়।' আমরা এক (ভগবান) বাদ দিয়া কতকগুলি শূন্য লিখিতেছি। এরূপ শিক্ষায় মন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—উহাকে পুনরায় কেন্দ্রস্থ করা বড়ই কঠিন। স্ত্রীজাতির পক্ষে এইরূপ অন্তঃসারশূন্য শিক্ষার ব্যবস্থা যদি আমরা না করিতে পারি, তাহাতেও ক্ষোভের কারণ নাই। তাহাদের একমাত্র অবলম্বন—গীতোক্ত আদর্শ। গীতায় জগতের সমস্ত ধর্ম্মভাব সংরক্ষিত আছে। গীতাদর্শিতপথে তাঁহারা অগ্রসর হইবেন। গীতা জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম, এই ত্রিধারার একত্র সম্মিলন। বিভিন্ন রুচি অনুসারে রমণী তাঁহার আপন পথ বাছিয়া লইবেন এবং ত্রিসন্ধ্যায় তাঁহাদের শত বাধাবিঘ্নসত্ত্বেও ভগবানকে স্মরণ ও তদ্বিষয়ে মনন করিবেন। স্ত্রীলোক অনেক সময় সময়াভাবের অভিযোগ করেন। কিন্তু উহা আন্তরিকতার অভাব জ্ঞাপন করে মাত্র। অনেক সময় স্ত্রীলোক কতকগুলি পুত্রকন্যার মায়িক দৃশ্য খুলিয়া লইয়া বসিয়া থাকেন ও সময়াভাবের অভিযোগ করেন। সংযমাভাবে রমণীর এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যই সংযম। সংযমে আত্মবিদ্যা লাভ হয়। আদর্শ সংযমের অভাবে দারিদ্র্য, অকালমৃত্যু, অকালবৈধব্য, ও ব্যাধি আনয়ন করে। সংযমী নারীর সম্মুখে পুরুষের মস্তক সান্ধ্য-পদ্মের ন্যায় হেলিয়া যায়। ঝাঁশীর রাণী লক্ষ্মীবাই এই সংযমের প্রত্যক্ষমূর্ত্তি।

উপরোক্ত অকল্যাণকর অন্তরায় সমূহ স্ত্রী পুরুষের ভিতর হইতে দূরীভূত না হইলে স্ত্রীর মানসিক বিকার লাভ হইতে পারে না এবং স্ত্রী দুঃখের অনুভূতি আনিতে পারিবে না। বিবাহজীবনে সংযমনীতির অনুসরণ করিলে যে জন্য স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দিকে অভাবপূরণের জন্য দ্রুত ধাবিত হয়, সে অভাব আর বোধ হইবে না। তখন ধ্যান-ধারণার ফলে নিজের ভিতরই ভাববস্তুর সন্ধান মিলবে। তখন কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ই পূর্ণমাত্রায় ষড়বিংশতি দৈবী সম্পদের অধিকারী হইবেন।

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষ্বলোলুপত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥"

এই ষড়বিংশতি দৈবীসম্পদের অধিকারী হইয়া পুরুষে যে জ্ঞানশক্তির অধিক স্ফুরণ ও স্ত্রীতে আনন্দশক্তি অধিক থাকায় এক অপরের অভাব মোচনের জন্য পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দেহসুখে মগ্ন থাকতে চেষ্টিত হইত, এখন প্রতি স্ত্রী পুরুষ নিজের ভিতরই চিদানন্দের অনুভব করিয়া দৈহিকসম্পর্কে বীতস্পৃহ হইয়া নিজেতে নিজেই রমমান হইবেন, এবং প্রতি জীবে স্ত্রী পুং অতীত অতীত অবস্থা পাইবেন বা শিবময় হইবেন।



স্বামী রামতীর্থ

—*—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

তীর্থরামের জ্ঞানপিপাসা অতি তীব্র ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল, কলেজে পড়েন। কিন্তু বাটীর অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া এ বিষয়ে তাঁহার পিতার সম্মতি ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তীর্থরাম বাটী হইতে পলাইয়া লাহোরে গেলেন এবং সেখানে ইণ্টারমিডিয়েট পড়িবার জন্য কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। ইহার পর এক বৎসর কাল তিনি আর বাড়ী ফিরিয়া যান নাই। আচার্য্য ধন্নামল ও মাতুল রঘুনাথমল তীর্থরামকে এই আত্মনির্ব্বাসনের সময় সাহায্য করিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে তীর্থরাম তাঁহার মাতুলের কাছে চিঠিতে লেখেন, "পড়বার জন্য একটু নির্জ্জন স্থান আমার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। আর আমার সব চেয়ে গুরুতর অভাব সময়ের। হে ভগবান্, জগতে যেন আমার এই তিনটী বস্তুর কখনও অভাব না হয়—নির্জ্জনতা, অবকাশ আর জ্ঞানস্পৃহা। মামা, এই আমার প্রাণের ঐকান্তিক কামনা; আর সব ভগবানই জানেন।"

এই সময় হইতেই তিনি ধন্নামলের নিকট দিনলিপির আকারে রীতিমত চিঠি লিখিতে থাকেন। তাঁহার ছাত্রজীবনের অনেক কথাই এই দিনলিপি হইতে জানা যায়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তীর্থরাম ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। তাঁহার এই সময়ের অবস্থা নিম্নোদ্ধৃত দিনলিপি হইতেই বোঝা যাইবে।

"১৮ই মে, ১৮৮৮। আজ মিশন কলেজে ভর্ত্তি হলাম। মাস এক টাকা ভাড়ায় একটা বাড়ী পেয়েছি। (ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষায় পাশ হয়েছি—গুণানুসারে ৩৭ জনের নীচে স্থান হয়েছে। কিন্তু বৃত্তি পেলাম না। কলেজে ৪৷৹ টাকা করে মাইনে দিতে হবে।

"১০ই জুন, ১৮৮৮। তুমি জানতে চাইছ, মহারাজ রণজিৎসিংহের সমাধির কাছে আমি বাসা নিলাম না কেন। তার প্রধান কারণই হচ্ছে পড়াশুনার জন্য যে নির্জ্জনতা ও স্বাধীনতা আমি চাই, তা সেখানে পেতাম না।

"১৪ই নবেম্বর, ১৮৮৮। আমার যা কিছু আছে, সবশুদ্ধ নিজকে তোমার পায়ে সঁপে দিলাম। হে ভগবান্, হয়ত একটা বৃত্তি পেতেও পারি।

"২৮শে মার্চ্চ, ১৮৮৯। জয় ভগবান্! বৃত্তি পেয়েছি।"

উপরিউদ্ধৃত দিনলিপিতে বালকসুলভ আকুলতা ও ভগবন্নির্ভরের দ্বন্দ্ব আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। চিত্তের এই ভাব খুব উচ্চ আদর্শ না হউক, ইহা যে সত্য ও স্বাভাবিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাধুর জীবনে স্বভাবের পরিণতি দেখিতে পাইলে তাহা যেমন সর্ব্বসাধারণের চিত্তে

আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকে, কেবল অপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ সেরূপ করে না। তীর্থরামের পাঠ্যাবস্থার দিনলিপিতে আমরা তাঁহার মনের দ্বন্দ্বই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এই দ্বন্দ্ব যে ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ণ পরিণতিরই সূচক, তাহা বলা বাহুল্য। শৈশব হইতে কেবল অসাধারণ ও অলৌকিক শক্তির স্ফুরণ দেখাইয়া সকলকে চমকিত করিয়া তিনি যে সকলের দুরধিগম্য হইয়া রহেন নাই, ইহা আমাদের পক্ষে পরম লাভ বলিয়া মনে করি। আমরা সাধারণ স্তরের জীব। আমাদের মনের দ্বন্দ্ব লাগিয়াই রহিয়াছে। একেবারে মহাপুরুষ হইয়া না জন্মাইলে যদি আমাদের উদ্ধারের আর কোনও উপায় না থাকে, তাহা হইলে আমাদের জীবনের সকল আশাই যে নির্ম্মূল হইয়া যায়। এমন অবস্থায় আজন্ম মহাপুরুষের অলৌকিক ঘটনাবহুল জীবনচরিত্র আলোচনায় বিস্মিত ও চমকিত হইতে পারি, সন্দেহ নাই; কিন্তু এরূপ চরিত্র হইতে সাক্ষাৎভাবে আমাদের জীবন বিবর্ত্তনে কোনও সহায়তাই লাভ করি না। কিন্তু যাঁহাদের জীবনে দ্বন্দ্বযুদ্ধের চিত্র দেখিতে পাই এবং এই যুদ্ধে জয়ী হইবার সঙ্কেতও জানিতে পারি, তাঁহাদের জীবনচরিত্র যে অপরোক্ষভাবে আমাদেরও চরিত্রের উন্মেষক এবং অধ্যাত্মসমরে আশা ও উৎসাহের সঞ্চারক, তাহা বলাই বাহুল্য। এই হিসাবে আমাদের কাছে তীর্থরামের এই দ্বন্দ্ববহুল ছাত্রজীবনের দিনলিপির একটা বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে করি।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে পরীক্ষার ফিস সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে খুবই বেগ পাইতে হয়। ধর্ম্মমত ইতিপূর্ব্বে অধ্যয়ন সম্বন্ধে তাঁহার প্রোৎসাহক হইলেও, সম্ভবতঃ এক্ষণে তাঁহার পূর্ব্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত দিনলিপি হইতে এ বিষয়ের আভাস পাওয়া যাইবে।

" ১ই ফেব্রুয়ারী, ৮৯০। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফিস পাঠাতে হবে। ভগবান দাসের কাছ থেকে এখনও টাকা পাইনি।—আমার চেষ্টা-চরিত্রের উপর আমার আস্থা নাই, আমি শুধু তোমার কৃপার ওপরই নির্ভর করে আছি। তুমি যদি আদেশ কর, তবেই পরীক্ষা দেব। নইলে পরীক্ষাও দেব না, ফিসও পাঠাব না।

"১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০। এ ব্যাপারে আমার কোনও হাত আছে মনে করাটাই ভুল হয়েছিল। কলেজের অধ্যক্ষ আমার নাম পাঠিয়ে দিয়েছেন, কাজেই আমাকে কাগজপত্রে দস্তখত দিতে হল। এখন আমায় পরীক্ষা দিতেই হবে। এ জন্য ভগবানদাসের কাছ থেকে টাকাও পেয়েছি। আমায় ক্ষমা কর—অপরাধ নিও না—আমি তোমার দাসানুদাস।

"১০ই মার্চ্চ, ১৮৯০। শুনেছি, ভগবান দয়াময়, শান্তির আধার, তবে তুমি আমার প্রতি বিরূপ কেন? আমার অপরাধ মার্জ্জনা করছ না কেন? আমার মনে হয়, তুমি সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে জানতে পেরেছ যে আমার মাঝে এমন কোনও খুঁত রয়েছে, যার দরুণ আমি ভগবানের দেখা পাব না। তাই জেনে তুমি এখন আমায় এমন উপেক্ষা করছ। তা নইলে লোকে যে তোমায় অপবাদ দিয়ে বলবে যে তীর্থরাম তোমার হয়েও ভগবানের দেখা পেল না। কিন্তু আমার মনের ভাব এই—ওগো তুমি

আমার দোষত্রুটীর দিকে তাকিও না—আমার অপরাধ ভুলে যাও। 'যদি ঘরের মাঝে আমায় ডাক, আমি শুধু এই দরজাটাই চিনি, যদি ঘরি থেকে বের করে দাও, তবু এই দরজাটাই চিনি। আর কোনও দুয়ার তো আমি চিনি না। শুধু জানি, মাথা পাতবার একটী মাত্র ঠাঁই আছে, সে কেবল তোমারই দ্বারের প্রান্তে।' (ফারসী হইতে)

"২০শে মার্চ্চ, ১৮৯০। ফারসী পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। অঙ্কও হয়ে গেছে। ভারী শক্ত বিষয়। তবে যদি তোমার দয়া থাকে, তাহলে কিছুই শক্ত নয়।

"৬ই জুন, ১৮৯০। তুমি আমার কাছে চিঠি দাও না কেন? আমি যথাসাধ্য খাটি—কিন্তু কাজও বড্ড বেশী। এখন আর তোমার কাছে যেতে পারলাম না। দুদিন কলেজ বন্ধ আছে বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র বন্ধ। কলেজের কাজ এত বেশী, যে দুসপ্তাহেও তা করে ওঠা কঠিন। আমি যে তোমার আদেশমত কাজ করতে পারলাম না—সেটাকে যেন ভুল বুঝো না।"

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তীর্থরাম বি, এ, পড়িবেন মনস্থ করিলেন। এখনও তিনি পিতার নিকট হইতে সাহায্য বা অনুমোদন কিছুই পাইলেন না। কিন্তু তীর্থরামের স্বভাবটী ভারী নরম হইলেও তাঁহার জেদ বড় প্রচণ্ড ছিল। তিনি যাহা ধরিতেন, তাহার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ছাড়িতেন না। তাই পিতার অনুমোদন না পাইয়াও অধ্যয়ন বিষয়ে তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। পিতার কিন্তু ইহা ভাল লাগিল না। তাঁহার ইচ্ছা, পুত্র এখন লেখাপড়া ছাড়িয়া সংসারের ভার গ্রহণ করুক। পুত্রের জ্ঞানস্পৃহাকে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়াই মনে করিতেন। অবশেষে কিছুতেই তীর্থরামকে আঁটিতে না পারিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার এক ফন্দী বাহির করিলেন। শৈশবেই তীর্থরামের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তীর্থরামের পিতা বালিকা পুত্রবধূকে লাহোরে পুত্রের নিকট ফেলিয়া আসিলেন। তীর্থরামের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। এরূপ অবস্থায় পরিবার প্রতিপালনের ভার তাঁহাকে যে কিরূপ বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ইহাতেও তীর্থরাম দমিলেন না বা সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। আমরা আবার তাঁহার দিনলিপি হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"১৯শে জুলাই ১৮৯০।—১লা আগষ্ট আমাদের কলেজ বন্ধ হবে। আজ ১৯শে জুলাই। আমি তোমার আশ্রয় ত্যাগ করেছি—এ কথা মনেও স্থান দিও না। একটা কাজ ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে মানুষ আবার যখন তাকে ধরে, তখন তার সম্বন্ধে তার অন্তর্দৃষ্টি আশ্চর্য্যরকম খুলে যায়। কাজ করতে করতে কর্ম্মী তখন বুঝতে পারে, কেমন করলে কাজটা ভাল হবে। কাজের উপায় ঠাওরাতে তখন তাকে বেশী ভাবতে হয় না। অবশ্য 'কেন, কি বৃত্তান্ত' তা সে বলতে পারে না, কিন্তু সহজ সংস্কারবশেই যেন সে কাজটার ধারা বুঝতে পারে। আমিও তোমায় কারণ দেখাতে পারব না। কার্য্য কারণ দেখানো হচ্ছে দার্শনিকের কাজ। সবাই তো আর দার্শনিক নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারণ না দেখিয়েও আপন আপন কাজ

সবাই বেশ হাঁসিল করতে পারে। ছেলেবেলায় কবিতার ছন্দ ঠিক হল কি না হল, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারতাম। কিন্তু তখন যুক্তি ব্যাখ্যা করিতে পারতাম না। আজ দশ বছর পরে ছন্দঃশাস্ত্র আয়ত্ত করে দেখছি, তখনো ত আমি ভুল করিনি। তখন যুক্তি জানতাম না বলে যে আমার বিচারে ভুল হয়েছে, তা তো নয়। যুক্তি আমার মাঝেই ছিল, যদিও আমি তা ধর্‌তে পারিনি। এতে প্রমাণ হয়, সত্যদর্শী চিত্ত সব সময় যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। কারু সম্বন্ধে যদি জানি যে লোকটা বাস্তবিকই খাঁটী, আর সে তার অন্তঃপ্রজ্ঞারই অনুসরণ করছে, তাহলে সব সময় যুক্তির দাবী না করেও তার সিদ্ধান্ত আমরা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারি।

"আমি কখনও তোমার অবাধ্যতাচরণ করি না। এ ঠিক জেনো, আমি যাই করি না কেন, তোমার প্রতি আমার যথার্থ অনুবর্ত্তিতার ভাব থেকেই তা করে থাকি।

"তুমি বলছ, ছুটীর মাঝে গুজরাণওয়ালাতে তোমার কাছে থাকতে। তুমি যখন বলছ, তখন যেতেই হবে। যেমন করেই হোক, যাবই। কিন্তু সমস্তটা ছুটী সেখানে কাটাতে পারব না। আমার কি মনে হচ্ছে, তা বলছি। ছুটীটা সেখানে কাটানো আমার ইচ্ছা নয়। তার দু' চারটা কারণ তোমায় আমি দেখাতে পারি, কিন্তু এমন করে নিজের ওকালতীতে সময় অপব্যয় করতে আমার মোটেই প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু তবুও আমি কারণ দেখাচ্ছি এই ভেবে যে তুমি তাহলে বুঝতে পারবে, আমি একনিষ্ঠ নই, তোমার প্রতি আমার ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয়নি।

"আমার কারণগুলো এই: লাহোরে থাকা আর জন্মভূমিতে যাওয়ায় পার্থক্য কি, তা আমি এবার বুঝ্‌তে পেরেছি। জন্মভূমিতে গেলেই আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা হবে। এতে যে শুধু নির্জ্জনে অধ্যয়নের বাধা উপস্থিত হয়, তা নয়; আমি দেখেছি, এতে মনের সূক্ষ্মতা কমে যায়, তখন আর কঠিন ও সূক্ষ্ম সমস্যা সমাধানের শক্তি থাকে না। জন্মভূমিতে গেলে চিত্ত স্থূলে নেমে আসে; তখন আর সূক্ষ্ম চিন্তাসূত্রে সূক্ষ্ম ভাব ধারণা করবার শক্তি থাকে না। এর কারণ হচ্ছে, দৈহিক ভোগের সংস্পর্শে মন নীচে নেমে আসে। লাহোর ছেড়ে আমি দেখেছি, যেখানেই এমনি অবাঞ্ছনীয় সংসর্গ করতে হয়েছে, সেখানেই আমার মনটা ছারখার হয়ে গিয়েছে। তুমি বলবে লাহোর তো আর বন নয়, সেখানেও তো মানুষ আছে। তা ঠিক। কিন্তু এখানে যাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে, তারা সবাই অচেনা মানুষ; বাড়ীতে গেলে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যে মমতা নিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করি, এদের সংস্পর্শে তো তা জাগে না। লাহোরেও জনসঙ্গ হয় বটে, কিন্তু আমার ধ্যানতন্ময়তায় তাতে বাধা হয় না—আমার মন তাদের মাঝে ডুবে যায় না। এ দেখা যেন ওপর ওপর দেখা মাত্র। কিন্তু আপন জনের সঙ্গে দেখা হলে মনটা তাঁদের দিয়ে দিতে হয়। তা ছাড়া, লাহোরে শুধু ছাত্রদের সঙ্গেই আমার মেলামেশা হয়, আর তাদের সঙ্গে মেলামেশায় চিত্তে বরং বলই পাই।

"জানতে চাইবে, বাইরে আর কেউ আমার মত লাহোরে ছুটীতে থাকছে কি না। হাঁ, থাকছে। রামদীন, যে গত পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল, সে একদিনের জন্যও বাড়ী যাবে না।

"কঠিন পরিশ্রম না করলে কারু উন্নতি হয় না। আমি তাই করতে চাই। যারা ভাল ছেলে, তারা কেউ কেউ বাড়ী যাবে বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তাদের বাড়ীতে পড়াশুনার সুব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া, তাদের মাঝে অনেকেরই বিয়ে হয়নি, কিন্তু আমি তো বিয়ে করেছি। কেউ কেউ বিয়ে করা সত্ত্বেও তাদের মনের জোর আছে, বাইরের আমোদে-প্রমোদে তাদের মন ছড়িয়ে পড়বে না। কিন্তু আমার এত মনের জোর নাই। বোধ হয় আমার মনটা খারাপ।

"পরিশ্রমে, চর্চ্চায় মস্তিস্কেরও শক্তি বাড়ে। কেউ যদি না খেটে পরীক্ষায় ভাল পাশও করে, তবুও বলব, সে শুধু পাশই করল, পড়ার আনন্দ তো পেল না। ছাত্রজীবনে কঠিন পরিশ্রমই হচ্ছে বাস্তবিক আনন্দ। তোমার মনে নাই, একবার একটা লোক তোমায় একটা কবিতা লিখে দিতে বলেছিল—ভণিতায় তার নিজের নাম দিয়ে? সে কবিতার রচয়িতা বলে জগতের সামনে বড়াই করতে পারে বটে, কিন্তু সে শুধু নামেই রচয়িতা থেকে যাবে, বাস্তবিক রচনার আনন্দ কিন্তু তোমারই ভাগেই পড়বে। নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জ্জন করেনি, পড়ে-পাওয়া টাকায় বড় লোক হয়েছে—এ যেন তেমনি হল। ওতে টাকা হয় বটে, কিন্তু আনন্দ হয় না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে টাকা রোজগার করে, তারই লাভ।

"আমার পড়াশুনায় তুমি বাধা দিও না। মনে কর যেন আমি তোমায় ছেড়ে বিদেশে আছি। আমায় শুধু দু' বছরের ছুটী দাও। ঘরের ছেলে যখন ঘরে ফিরবে, তখন সে তো তোমারই হবে। সিপাই যখন লড়াই করে, তখন তার মোটেই খেয়াল থাকে না, সে কার সিপাই—কোথায় তার রাজা আর রাজার সঙ্গে তার কিসেরই বা সম্পর্ক। কিন্তু তবুও সে রাজারই সিপাই, অপরের নয়। রাজার কথা ভুলে গিয়েই সে তার কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করতে পারে। আমারও ঠিক তাই হয়েছে। গুজরাণওয়ালাতে যেতে পারলাম না বলে মনে করো না যে আমি তোমার অবাধ্য হয়েছি।"



নিরভিমান



শাস্ত্রে আছে আত্মসমর্পণের কথা—অভিমান বলি দেওয়ার কথা। আজকালকার শিক্ষিত লোক ভাববে, ওটা কাপুরুষতা। এখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ কিনা। আপনাকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে, আপনাকে বড় রাখতে হবে, এই হচ্ছে আজকালকার মূলমন্ত্র। তাই যদি গুরুপদে আত্মসমর্পণের কথা ওঠে, তাহলে তরুণ ভারত ঘাড় বাঁকিয়ে বলবে, "কি? এতদূর মানসিক দুর্ব্বলতা? আমরা সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার উপাসক। মাথা নোয়াব কার পায়?"

কিন্তু একটা কথা শোনবামাত্রই তার ওপরভাসা অর্থটা নিয়ে চ্যাঁচামিচি করা তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। যা নিয়ে বিচার

করব, নিজের জীবনে তাকে আচরণ করে পরখ না করলে তার সম্বন্ধে রায় দেওয়াটা শুধু অনধিকারচর্চ্চাই হবে। আমরা বলি, অধীনতা স্বীকার করা না অভিমান বলি দেওয়া দুর্ব্বলের কাজ নয়—অতি সবল হৃদয়ের কাজ। অভিমান বলতে কর্ত্তৃত্বাভিমানই ধরলাম। আমি কর্ত্তা নই—এ কথাটা মুখে বলতে পারলেও মনে আনা বড় সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রে মুখে বলাও সহজ নয়। বুদ্ধির প্রেরণাতেই সবাই কাজ করছে। ভগবান মানুষকে অন্য বিষয়ে বঞ্চিত করেছেন, তা মানতে পারি, কিন্তু বুদ্ধির বরাদ্দ যে কারু বেলায় কম করেছেন, এ কথা কেউ স্বীকার করবে না। কাজে নামলেই এই বুদ্ধিটা সজাগ হয়ে ওঠে, তার মাঝে হাজারটা মত, ছক, হিসাব একেবারে কিল্‌বিল্ করে ওঠে। এইগুলোকে আমল না দিয়ে "যা হচ্ছে, তাতেই রাজী" বলে পরের বুদ্ধিতে সায় দেওয়া সহজ লোকের কর্ম্ম নয়। পরের বুদ্ধিতে চলছে, এমন লোক হয়ত তুমি দেখাতে পার, কিন্তু পরের বুদ্ধিতে চলে খুসী হচ্ছে বা বাস্তবিক মনে-প্রাণে একটা নিষ্কৃতির আনন্দ অনুভব করছে, এমন লোক সহজে পাবে না। পরের বুদ্ধিতে চলে হয় দেখবে তামসিক মোহ, নয়ত রাজসিক দুঃখই সবাই ভোগ করছে, সাত্ত্বিক আনন্দ খুব কম লোকের ভাগ্যেই মিলছে। আর আত্মসমর্পণের বা অভিমান বিসর্জ্জনের মূল নিশানাই তো হচ্ছে আনন্দ—সত্ত্বশুদ্ধির নির্ম্মল ও উজ্জ্বল আনন্দ। এ না হলে বুঝব, সমর্পণের ভাণ চলছে মাত্র—ঠিক ঠিক সমর্পণ হয়নি।

বাস্তবিক অভিমান কি সহজে যায়? মনকে হাজার দমাবার চেষ্টা করলেও কোন্ দিক দিয়ে সে আবার মাথা উঁচু করে তোলে। যেমন শরীরটাকে নিশ্চেষ্ট করা সহজ নয়, নিশ্চেষ্ট নিশ্চল হতে গেলেই একটু না একটু কেঁপে যাবেই, তেমনি মনকে অভিমানশূন্য করাও সহজ কথা নয়। সম্পূর্ণ চিত্তস্থৈর্য না হলে অভিমান যায় না। ও কি সহজ সাধন? আর ওর ফলটাও কি নেহাৎ সস্তা যে তাকে কাপুরুষতা বলে গাল দিলেই খুব বাহাদুরী হবে? রামকৃষ্ণদেব বলতেন, ঈশ্বরদর্শন না হলে অভিমান যায় না। বাস্তবিক; চিত্তস্থৈর্য্য হলেই তো ঈশ্বরদর্শনও হয়।

অভিমান আসে কর্ম্ম থেকে। কর্ম্ম করে নির্ব্বিকার থাকা কি সহজ কথা? করছি সবই, অথচ মনে জানছি কিছুই করছি না—এই বিরোধের সামঞ্জস্য কর্ম্ম অকর্ম্মের পরপারে না গেলে হয় না; আর সেই তো হল গুণের অতীত অবস্থা, সংসারচক্রের বাইরে মুক্তির অবস্থা। তারপর ফলাকাঙ্ক্ষা। কর্ম্ম করলেই ফলের প্রতি লোভ হবেই হবে। [illegible]লটা কল্পনার বস্তু কিনা; আর মনের মাঝে কত সংস্কার পুঁজি হয়ে আছে—তা হতে কল্পনা জাগা তো অসম্ভব কিছু নয়। এই ফলাকাঙ্ক্ষা যে কত সূক্ষ্ম আকার ধরে আসতে পারে, তা বলা যায় না। সব গেলেও হয়ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার লালসাটা থেকে যায়। ওই ধরে আবার অভিমান এসে জোটে। কর্ম্মজনিত যে কোনও চিত্তস্পন্দনই কর্ম্মের ফল—এখন সে সুখই হোক, দুঃখই হোক বা মোহই হোক। তাই বলি, অভিমানশূন্য হয়ে নিষ্কাম কর্ম্ম করা কি সহজ? ফলাফলের পারে যেতে হবে, সুখ দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে যেতে হবে, মোহ দূর হয়ে গিয়ে ভিতরটা প্রকাশের আনন্দে জলজলে হয়ে উঠবে।

এমনটী যার হয়েছে, তার আর জগতে বন্ধন কোথায় ?

গুরুতে আত্মসমর্পণ করে গুরুসেবা করা এই অভিমান দূর করবার সাধনা। একজনের হাতে নিজের সব তুলে দেওয়া সহজে হয় না। নিজের জিনিষের ওপর মমতা সবারই আছে; অপরের হাতে তাকে তুলে দিই কি বিশ্বাসে ? যদি খোয়া যায়! তাই আত্মসমর্পণ করতে হলে দৃঢ় বিশ্বাস চাই—শ্রদ্ধা চাই। আমিত্বের পুঁটুলীটী নিয়ে বসে আছি, তাই তো সত্য স্বরূপের দেখা পাচ্ছি না—চলতে ফিরতে সর্ব্বদা অহংটাই কেবল খচ্ খচ্ করে বিঁধছে। এই অহংটা যদি অপরের হাতে তুলে দিতে পারি, তাহলে আমার যে নিষ্কৃতি, —পরমানন্দ! কিন্তু আমাদের অবিশ্বাস তা করতে দেয় না। মনে হয়, যার হাতে সব দেব, সে যদি আমার মর্য্যাদা না বুঝতে পারে ? অর্থাৎ কিনা আমার আমিটুকু দিয়েও আবার তাকে জীইয়ে রাখা! এমনতর আত্মসমর্পণেই বাস্তবিক হীনতা জন্মে। কিন্তু সে হীনতা কার দোষে ? আমারই দোষে। আমারই অবিশ্বাসের হীনতা। বিশ্বাসে পাথরের বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে ওঠে। সে কার গুণ ? পাথরের গুণ না বিশ্বাসীর গুণ ? বিশ্বাসীর শ্রদ্ধাতেই না ভগবান তার হৃদয়ে ফুটে উঠ্‌লেন—পাথর তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

একটা উদাহরণ দিই। স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে অনেক জায়গায় এমন সব কথা আছে—স্বামী যদি মূর্খ দুশ্চরিত্র হয়, তবুও স্ত্রী তার সেবায় বিমুখ হবে না। কথাটার আজকাল দু' তরফ থেকেই ব্যাখ্যা হচ্ছে। যাঁরা স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী, তাঁরা বলছেন, "কি! অপাত্রে শ্রদ্ধা ? ওতে যে পাপকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। স্বামী যতক্ষণ ভক্তির যোগ্য, ততক্ষণই ভক্তি করব।" এটা হল নব্যা নারীর কথা। আবার এর বিরুদ্ধবাদী পুরুষরাও দেবতার যোগ্যতা থাক বা না থাক, দেবতার পূজাটুকু আদায় করবার জন্য যথেষ্ট ওকালতী করছেন, তাতে তাঁদের লজ্জা হতে দেখা যাচ্ছে না। দু' পক্ষ থেকেই শাস্ত্রবিচার হচ্ছে। তাতে এক পক্ষ শাস্ত্রকে পক্ষপাতী, অন্যায়পোষক বলে গাল দিচ্ছেন, আর এক পক্ষ শাস্ত্র যে দুশ্চরিত্র স্বামীর পক্ষে, তাই প্রমাণের চেষ্টা করছেন।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, উভয়স্থলেই শাস্ত্রবিচারে অনধিকারচর্চ্চা হচ্ছে। শাস্ত্র যখন বলছেন, দুশ্চরিত্র স্বামীকে ভক্তি করবে, তখন স্ত্রীর হৃদয়ের প্রেমের আদর্শটীই লক্ষ্য করছেন। স্বামীর দুশ্চরিত্রতা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন—অভিমান ত্যাগ। যার হৃদয়ে প্রেম নাই, বিশ্বাস নাই, ভগবান নাই, তাকে আত্মবিসর্জ্জন করতে বলা বৃথা। সে অভিমান বলি দিতে গিয়ে বিচার করবেই, তার কাছে হৃদয়ের চেয়ে বুদ্ধিই বড়। বুদ্ধি গুণ দ্বারা পরিচালিত; আর প্রেম গুণের অতীত। দুশ্চরিত্র স্বামী-কেও ভক্তি করতে বলে শাস্ত্র এই গুণাতীত স্বরূপকেই লক্ষ্য করছেন—স্বামী তো উপলক্ষ্য মাত্র। শাস্ত্র তো সুচরিত্র স্বামীকে ভক্তি করতে মানা করেন নি। কাজেই প্রমাণ হয়, যে প্রেমের কাছে সুচরিত্র দুশ্চরিত্র প্রভৃতি উপাধি দূর হয়ে কেবলমাত্র স্বামীর ভাগবতী সত্তা ফুটে ওঠে, সেই প্রেমকেই শাস্ত্র লক্ষ্য করছেন।

আর একটা কথা। স্ত্রীর স্বভাবে যদি প্রেমের এই সহজ স্ফুর্ত্তি শাস্ত্রকার দেখতে

না পেতেন, তবে তার প্রেমের উপর এতটা দাবী করতে পারতেন না। স্ত্রী ভালবাসার বলে তার সমস্ত সত্তা নিয়ে উন্মুখ হয়ে আছে—এই স্বভাবের প্রকাশের সামনে যে দু' একটা বুদ্ধির বাধা, শাস্ত্র শুধু তাই দূর করে দিচ্ছেন। নইলে এত বড় একটা পক্ষপাত আর মিথ্যাচার এতদিন ধরে বজায় থাকত না। যুক্তিবাদী বুদ্ধির চসমা দিয়ে সহজভাবে স্ত্রীর হৃদয়ের এই প্রেমের সত্যটা দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু সহৃদয় কবি তাঁর অন্তদৃষ্টি নিয়ে এই সত্যটা প্রত্যক্ষ করছেন—তাই লাঞ্ছনা সত্ত্বেও নারী ভালবাসছে, শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টদের কলমে এ চিত্র বহু জায়গায় ফুটছে। এর সবটাই ভুল নয়। স্বভাবের বিকৃতি সম্ভব, তা স্বীকার করি, কিন্তু তা বলে স্বভাবকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না।

আপত্তি ওঠে, দুশ্চরিত্রকে ভক্তি করলে পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না ? আমরা বলি, না। যথার্থ প্রেম বা ভক্তি নির্ম্মল জিনিষ। তার ফলে কখনও মলিনতা বাড়বে না। ভক্তির কতকগুলি বাহ্য বিকারই আজকাল আমাদের মনে ভক্তির রূপ ধরে আছে। খাওয়ালাম, পরালাম, আদর করলাম, সোহাগ করলাম—সাধারণতঃ আমরা একেই বলি ভালবাসা। কিন্তু ওতে যদি আত্মার অবনতি হয়, তবে ও তো কাম। যে স্ত্রী স্বামীর যথার্থ মঙ্গল চায়, সে স্বামীর কুপ্রবৃত্তি দেখলে সিংহবাহিনীর মত তেজস্বিনী হয়ে উঠবে। এই তো ভালবাসা। আর বাস্তবিক প্রেম না থাকলে এই শক্তি কিছুতেই জাগতে পারে না। যে নারীর ভিতরে আত্মসুখবাঞ্ছা বা কাম রয়েছে, সে কখনই স্বামীর পাপকে বাধা দিতে পারবে না। যে গুণময়ী বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই পাপের প্রশ্রয় দেয়। শুধু স্পর্দ্ধায় পাপ দূর হয় না, অথচ প্রেমের স্নিগ্ধতায় তার কলঙ্ক মুছে যায়—এটা ভাববার কথা।

তা ছাড়া, আর একটা কথা। কে কার পাপের প্রশ্রয় দেয় ? এমন কোনও কাজ আমরা করতে পারি না, যার ফলে সকলের সবদিক দিয়ে ইষ্ট হবে। এই জন্য প্রথম অবস্থায় জগদ্ধিতের অভিমান না রেখে বরং আত্মহিতের অভিমান রেখেই কাজ করতে হয়। আমার মোক্ষ যেখানে লক্ষ্য, সেখানে যে কাজই করি না কেন, তাতে যদি কারু কোনও বিষয়ে দুঃখ ও হয়, তবু তার চেয়ে বহুজনহিতকর ও সুসমঞ্জস কাজ আমার দ্বারা আর কিছু হতে পারে না। লক্ষ্যভেদ একদিনেই হয় না—তার জন্যও অভ্যাস চাই। প্রথম শিক্ষার্থীর যে লক্ষ্যবিচ্যুতি, আচার্য্য যদি তা সহ্য না করেন, তাহলে শিক্ষাই যে হয় না। কর্ম্মের ফলে ভূতহিতও এমনি করে অভ্যাসের বলেই দিন দিন সুস্পষ্ট ও সত্য হয়ে ওঠে।

তারপর যাকে তোমরা অপাত্র বলছ, তাতে আমি আত্মসমর্পণ করলে তার অত্যাচার যে বেড়েই চলবে, তা নয় ; বরং বিরোধের ক্ষেত্র না পেয়ে কমেই যাবে। অত্যাচারকে বাধা দিতে গিয়েই অনেক সময় তাকে আমরা বাড়িয়ে তুলি ; বাধা না পেলে আপনা আপনি কতক্ষণ আস্ফালন করে তা থেমেই যেত। এ যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি আছে, তা জানি। কিন্তু এই সহিষ্ণুতা নিশ্চেষ্টের সহিষ্ণুতা নয়, স্থিতপ্রজ্ঞের আত্মসংযম—এই কথাটা স্মরণ রাখতে বলি। অশক্তের ক্ষমা নয়, শক্তি আছে জেনেই ক্ষমা করা—এই হল আধ্যাত্মিক দমননীতি।

"অক্রোধেন জিনে ক্রোধং, অসাধুং সাধুনা জিনে"—এই বুদ্ধবচন তারই সূচনা করছে। শেষ কথা, আত্মমুক্তির চেয়ে বড় চেষ্টা আমার আর কিছু হতে পারে না। অভিমান বলি দিলে তাই যদি আমার সিদ্ধ হয়, তা হলে সেই তো আমার পরমপুরুষার্থ। আমার এই আত্মনিবেদনের ফল বাইরে যে আকারেই আজ প্রকাশ হোক্ না কেন, তার পরিণাম যে আত্মহিত ও জগদ্ধিত, এ কথা শুদ্ধ চিত্তের সম্প্রত্যয়জাত।

এই যে অভিমান বিসর্জ্জন সম্বন্ধে স্বামি-স্ত্রীর উপমাটা দিলাম, গুরুসেবার বেলায় এটাকে আরও বিশুদ্ধভাবে গ্রহণ করতে হবে। যেখানে চিত্তশুদ্ধি রয়েছে, ভগবদ্‌বুদ্ধি রয়েছে, সেখানে পাত্রের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচারেরও প্রয়োজন নাই—শ্রদ্ধার, প্রেমের আত্মনিবেদন অন্তঃশক্তির বলেই সার্থক হয়ে উঠ্‌বে, এই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য। উপরন্তু সদ্‌গুরুর সেবাতে বস্তুশক্তিরও একটা প্রভাব ফলে। যাঁর সেবা করছি, তিনি লঘু নন—গুরু; মিথ্যার উপাসনা করছি না, সত্যেরই উপাসনা করছি, কেননা তাঁকে বলছি, সদ্‌গুরু। তাই শুধু আমার চেষ্টাতেই যে সেখানে আত্মসমর্পণ সার্থক হবে তা নয়, তাঁর শক্তিতেই হবে।

গুরু চিন্‌ব কি করে? তা বলা যায় না। সুকৃতি থাকলে, প্রাণে সত্যের জন্য ব্যাকুলতা থাকলে তাঁকে অমনি চেনা যায়। তিনি হাটেবাজারে যাচাই করে নেবার জিনিষ নন। যিনি আপন, তাঁকে "আঁখির কোণে যায় যে চেনা।" এর মাঝে যুক্তিবিচার নাই। সবই কি যুক্তিবিচারে মিলে?

তবে যে এতক্ষণ যুক্তি দিলাম, তা বিরোধীর আপত্তি খণ্ডন করবার জন্য নয়। পেলে পরেও সংশয় আসে; সেই সংশয় দূর করবার জন্য শাস্ত্রে অনুকূল তর্কের ব্যবস্থা আছে। তাতে প্রাপ্তি স্থিরতর হয়। ভগবান্‌কে পাওয়া তো ইটপাটকেল পাওয়ার মত নয় যে হাত মুঠো করলেই সবটা পাওয়া গেল। তাঁকে পাওয়া একটু একটু করে—অনেক দিনে, অনেক বুঝে। শিকড় মাটীতে বসে গেল, তারপর গাছটা একটু একটু করে বড় হল; একেবারেই কিছু বড় হয়ে যায় না। তেমনি গুরুতে মন বসলে পরও একটু একটু করে বুদ্ধিকে দৃঢ় করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রযুক্তি বাস্তবিক তখনই উপকারে আসে। বিশ্বাসীরই শাস্ত্র। অবিশ্বাসীর সঙ্গে কোঁদল করলে আর কি হবে? বস্তুগত্যা কোনও লাভই তাতে নাই।

আসল কথা হল—আমরা সাধক। তাই আমাদের দিকটাই পাকা করে দেখ্‌ছি। তাই বল্‌ছি, গুরুসেবায় আমাদের দিক থেকে ত্রুটী না হয়। আমাদের অভিমান সবটুকু ছাড়্‌তে হবে। অভিমান ছাড়লে ফল হাতে হাতে। অভিমান যার নাই, তার চিত্ত বাসনাশূন্য—নিস্তরঙ্গ। চিত্ত হতে সে আলাদা। সেই তো নির্ব্বাণের অধিকারী।

বেদান্তসার

—*—

[ষষ্ঠ খণ্ড—বিবৃতি—অধ্যাসবাদ]

—*—

পূর্ব্বসংক্ষেপ

অধ্যাস সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপে মীমাংসিত হইল।—ভ্রম সংস্কার হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ভ্রম সিদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বপ্রতীতি মাত্র থাকিলেই যথেষ্ট। পূর্ব্বপ্রতীতের পারমার্থিক সত্তা থাকিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে আমরা কোনও ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না। প্রতীতিকে আশ্রয় করিয়াই ভ্রম—প্রতীত বস্তুর সত্তা আছে কি নাই, সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। ইহার পোষকস্বরূপ এই কথা বলা যাইতে পারে, যেখানে সংশয় বা বিপর্য্যয় দর্শন রহিয়াছে, সেখানেও সংস্কারের কার্য্যস্বরূপ স্মৃতি থাকিয়া যায়। লোকে বলে, "এই উংয়ের চিবিটা দেখিয়া পূর্ব্বে আমার সন্দেহ হইয়াছিল, এটা কি গাছের গুঁড়ি না মানুষ? এই ঝিনুকের টুকরাটায় রূপা বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল।" এই সমস্ত স্থলে দেখিতে পাইতেছি—পূর্ব্বপ্রতীতের পরমার্থ সত্তা না থাকা সত্ত্বেও স্মৃতি রহিয়াছে। এ যে শুধু সংশয় ও বিপর্য্যয়রূপ মনোবৃত্তিরই স্মৃতি, তাহাও বলিতে পারি না। কেননা যদি তাহাদের বিষয়ই না থাকিবে, তাহা হইলে স্মৃতি দাঁড়াইবে কাহাকে লইয়া?

সুতরাং প্রমাণ হয়, যাহার আরোপ করা হইতেছে, তাহা একান্ত অসৎ নহে। ভ্রমবশতঃ পূর্ব্ব পূর্ব্বক্ষণে যাহা দেখিতেছি, তাহাই পরবর্ত্তী ক্ষণে আমরা আরোপ করিতেছি। এইরূপে যে ভ্রমের প্রবাহ সৃষ্ট হইতেছে—তাহাই জগৎ। উহা অনাদি। অতএব এখানে অন্যোন্যাশ্রয় বা অনবস্থা—এই দুইটীর কোনও একটী দোষেরই আশঙ্কা করা যাইতে না। সুতরাং আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, যে বস্তুতে আরোপ হইতেছে, তাহা সত্য এবং যাহার আরোপ হইতেছে, তাহা এক দিক দিয়া সত্য হইলেও আর একদিক দিয়া মিথ্যা—সুতরাং তাহা অনির্ব্বচনীয়। পারমার্থিক সত্যবস্তুতে অনির্ব্বচনীয় সত্যবস্তুর আরোপ হইতেছে—ইহাই জগতের রহস্য।

এই কথাটাই আচার্য্য এইভাবে বলিয়াছেন—বস্তুতে অবস্তুর আরোপ করা হইতেছে। এখানে বুঝিতে হইবে, বস্তু কি এবং অবস্তুই বা কি। আচার্য্য বলিতেছেন, "সচ্চিদানন্দ অনন্ত অদ্বয় ব্রহ্মই বস্তু। অজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জড়ের সমূহই অবস্তু।" স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, আচার্য্য দুইটী ধারা উপস্থিত করিতেছেন। উভয়ই সত্য—একটী পরমার্থরূপে, একটী অনির্ব্বচনীয়রূপে। তবে বস্তু বলিতে কোনও দ্রব্য বুঝাইতেছে না—এ বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্মবস্তু বলিতে অনুভূতিই বুঝিব। তেমনি অজ্ঞানাদি অবস্তু বলিতে অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের অবভাসই বুঝিব। সর্ব্বত্রই প্রতীতির জগতে বিচরণ করিতেছি—বেদান্তী যেন এইটুকু স্মরণ রাখেন। নতুবা অধ্যাসবাদ বোঝা সহজ হইবে না।

ব্রহ্মের বস্তুত্বে অধ্যাসে আপত্তি

ব্রহ্মকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহারই অধ্যক্ষতায় আমরা ভ্রমের উৎপত্তি স্বীকার করিতেছি। এ হইল সমস্ত জগৎ জুড়িয়া যে মূল ভ্রম রহিয়াছে, তাহারই কথা। কিন্তু এখানে একটা তর্ক উঠিতে পারে। মূল ভ্রম ছাড়াও তো আরও ছোটখাট ভ্রমের কথা বিচারে আসে। সেগুলি দাঁড়াইবে কিসের উপর? একমাত্র ব্রহ্মই যদি বস্তু হন, সুতরাং তিনিই যদি একমাত্র অধ্যারোপের অধিষ্ঠান হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া জীব কিম্বা শুক্তি উভয়ই অবস্তু। অথচ এই জীবের সত্তা স্বীকার করিয়া তাহাতে কর্ত্তৃত্বের অধ্যারোপ আমরা করিয়া থাকি। আমরা বলি, জীব ও ব্রহ্ম এক। ব্রহ্ম যেরূপ কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মরহিত, একরস অনুভূতি—জীবও তাই। তবে যে জীবে কর্ত্তৃত্বাদি ভেদ দেখা যাইতেছে, উহা পরমার্থতঃ সত্য নহে, আরোপিত মাত্র। আবার অধ্যাসবাদ বুঝাইবার সময় আমরা দৃষ্টান্ত দিই, শুক্তিতে যেমন রৌপ্যের জ্ঞান আরোপিত হয় ইত্যাদি। কিন্তু জীব ও শুক্তি উভয়ই ব্রহ্মব্যতিরিক্ত হওয়াতে যদি অবস্তুই হইল, তাহা হইলে তাহাদিগকে অধিষ্ঠান মানিয়া কর্ত্তৃত্বাদি কিম্বা রজতাদির অধ্যারোপ আর কি করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে? অবস্তুতে তো আরোপ দাঁড়াইতে পারে না। নৈয়ায়িকের ভাষায় বলিতে পারি, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু হইলে জীব ও শুক্তি প্রভৃতি অবস্তু হইয়া যায়; সুতরাং কর্ত্তৃত্বাদি ও রজতাদির অধ্যারোপে অব্যাপ্তি ঘটে। লক্ষ্যে যদি লক্ষণ না যায়, তবে তাহাকে অব্যাপ্তি বলে।

এখানে প্রথম আশঙ্কার উত্তর আগে দিই। জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক। কিন্তু আপাততঃ উভয়ে ভেদও তো দেখিতেছি। জীবে যেন ব্রহ্মস্বভাবের অতিরিক্ত কিছু আসিয়া জুটিয়াছে—বলিতে পারি, উহা তাহার স্বরূপ নহে, উপাধি। সুতরাং জীব সোপাধিক ব্রহ্ম। বাস্তবিক জীবের পৃথক কোনও সত্তা নাই। উপাধি সহায়ে ব্রহ্মসত্তায় উহা কল্পিত মাত্র। জীবের স্বরূপের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতিকে আমরা ভ্রম বলি। যদি স্বরূপে দৃষ্টি স্থিরই থাকে, তাহা হইলে জীবত্ব কল্পনা কোথায়ও টিকিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বাদির যে অধ্যারোপ, তাহা তো ব্রহ্মবস্তুতেই ঘটিতেছে—জীব বলিয়া কোনও মধ্যস্থ প্রতীতির প্রয়োজনই নাই। যদি তাহাই হয়, তবে অবস্তুতে আরোপের আশঙ্কা তো হইতেই পারে না।

কিন্তু যদি জীবের জীবত্ব অব্যাহত রাখিয়া কর্ত্তৃত্বাদি অধ্যারোপের বিচার করি, তাহা হইলে কিন্তু জীবের উপাধিমত্তা মানিয়াই বিচার করিতে হইবে; নতুবা কর্ত্তৃত্বাদি তো প্রতিভাসতঃ জীবের স্বভাব, উহাতে অধ্যারোপ লক্ষণের সমাবেশ নিষ্প্রয়োজন। যদি জীব সোপাধিক, এই কথার উপরই বিচার দাঁড়ায়, তাহা হইলে অধ্যারোপিত কর্ত্তৃত্বাদি ভ্রমও সোপাধিক বলিতে হয়। তাহা হইলে ভ্রম সিদ্ধ করিবার জন্য নিরুপাধিক ব্রহ্মের অধিষ্ঠান মানিতেই হয়—নতুবা ভ্রমই সিদ্ধ হয় না। ইহাতে কিন্তু কথাটা তাৎপর্য্যতঃ পূর্ব্বের মতই হইল। কেবল বিশেষ এই হইল যে, এইরূপ বিচারে আমরা জীবের উপাধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রাতিভাসিক ভূমি হইতে বিচার করিতেছি। তাহা হইলেও কিন্তু উপাধিতে অনুরক্ত ব্রহ্মেই কর্ত্তৃত্বাদি ভ্রমের অধ্যারোপ হইতেছে বলিতে হয়।

তারপর রজত ও শুক্তির দৃষ্টান্ত। এখানেও যে শুক্তিকে অধিষ্ঠান বলা হইতেছে, তাহা উপচারবশতঃ বুঝিতে হইবে। আসল কথাটা ভ্রম নিয়া। ভ্রম প্রতীতি বা মানস-ব্যাপার। সুতরাং তাহার অধিষ্ঠানও প্রত্যয়-জগতের, স্থূলজগতের নয়। তাহা হইলে শুক্তিতে রজতের আরোপ বলিতে আমরা বাস্তবিক ইহাই বুঝিব যে শুক্তি স্বয়ং অধিষ্ঠান নহে, পরন্তু শুক্তিদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অধ্যারোপের অধিষ্ঠানতত্ত্ব। চৈতন্য সর্ব্বত্রই এক। সুতরাং ব্রহ্মকে একমাত্র বস্তু স্বীকার করায় এই সমস্ত প্রাতিভাসিক জগতের ভ্রম-সিদ্ধিতেও তো কোথায়ও বাধা হইতেছে না। আবার বলি, বেদান্তী যে প্রতীতির জগতে বিচরণ করিতেছেন, এ কথা যেন আমাদের স্মরণ থাকে।

অজ্ঞান জড়াশ্রয় নহে

অধিষ্ঠানতত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটী কথা বুঝিবার আছে। অজ্ঞাত বস্তুই আরোপের অধিষ্ঠান। লৌকিকভাবে এ কথায় কোনও বিশেষত্ব নাই। কিন্তু বিচার করিলে বুঝি, যে বস্তু অজ্ঞাত তাহাতে অজ্ঞাতত্বরূপ ধর্ম্ম থাকা প্রয়োজন। অজ্ঞাতত্ব বা অজ্ঞানরূপ ধর্ম্ম একমাত্র চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়াই থাকিতে পারে। তর্কটা যখন জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়া, তখন উহা প্রতীতি জগতের কথা, বাস্তবজগতের বা জড়জগতের কথা নহে। এই হিসাবে শুক্তিতে অজ্ঞাতত্বধর্ম্ম নিহিত আছে, এ কথা মানিতে পারি না, কেননা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শুক্তি তো জড় পদার্থ। জড়ে চৈতন্যাশ্রিত ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না। বরং এ কথা বলিতে পারি, শুক্তিদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অজ্ঞাতত্বরূপ ধর্ম্ম সন্নিবিষ্ট আছে। এই কথাটাই হুঁসিয়ারের কথা। জড় শুক্তি অজ্ঞাত বস্তু হইয়া ভ্রমের অধিষ্ঠান—এরূপ কথা বলা সমীচীন নয়।

তাহা হইলে অজ্ঞানসম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি, উহা চৈতন্যনিষ্ঠ, না হইলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া উহা দাঁড়াইবে? এবং এ কথাও বলিতে হয়, অজ্ঞান চৈতন্যমাত্রবিষয়, কেননা উভয়ের সম্বন্ধ বাস্তবজগতে নিরূপিত হয় না, প্রতীতি জগতেই নিরূপিত হইয়া থাকে। একটী কারিকা আছে—

> যস্যাজ্ঞানং ভ্রমস্তস্য
> ভ্রান্তঃ সম্যক্ চ বেত্তি সঃ।
> জড়ং ন, বিদ্যাবেদ্যত্বাৎ;
> নাতোঽজ্ঞানং জড়াশ্রয়ম্ ॥"

অর্থাৎ অজ্ঞান যাহার উপাধি, তাহারই ভ্রম; ভ্রান্ত হইলেও সেই আবার সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করে। অজ্ঞান জ্ঞানেরই বেদ্য বা বিষয় অথবা অজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য, সুতরাং উহা জড় নহে। এই জন্য অজ্ঞানকে জড়াশ্রিত বলা যাইতে পারে না।

অধিষ্ঠানতত্ত্ব যদি অজ্ঞাত বস্তু হয়, তাহা হইলে চৈতন্যসত্তাই হইবে, ইহা উপরিলিখিত যুক্তি অনুযায়ী সিদ্ধ হয়। চৈতন্যই বস্তু; সুতরাং কোনও অধ্যারোপের বেলাতেই অবস্তুতে অধ্যারোপের কোনও আশঙ্কা নাই।

শূন্যবাদাশঙ্কার নিরাস

এক্ষণে অধ্যারোপের মোটামুটী লক্ষণ দাঁড়াইল এই—সত্য বস্তু যে মিথ্যাবস্তুর সঙ্গে মিশিয়া অবভাসিত হইতেছে, ইহাই অধ্যারোপ। সত্য বস্তু অবশ্য চৈতন্য এবং মিথ্যা বস্তু জড়। দুইটীতে পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস হইয়াছে। যেমন আত্মা আর দেহ-মন-বুদ্ধি। আত্মা

চৈতন্যস্বরূপ, দেহ মন-বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হওয়ায় দেহ মন-বুদ্ধি যেন চৈতন্যযুক্ত, এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। আবার দেহটা হয়ত কাণা কিম্বা খোঁড়া, মন চঞ্চল, ইত্যাদি। এই সমস্ত ভাব আত্মাতে উপচরিত হওয়ায় আমি কাণা, খোঁড়া, সুখী বা দুঃখী ইত্যাকার ভ্রম জন্মিয়াছে। ইহাই পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস।

এখানে কেহ কেহ বলিতে পারেন, দুইটী বিষয় যদি পরস্পর তদাত্মক হইয়া অধ্যস্ত হয়, তাহা হইলে দুইটীরই বস্তুগত কোনও সত্তা না থাকায় তাহারা পরস্পরের সত্তাবিলোপই সাধন করে। তাদাত্ম্যাধ্যাস যদি জগতের তত্ত্ব হয়, তাহা হইলে উহা তো শূন্যবাদ। কিন্তু আমাদের বিচারে সত্য ও মিথ্যার সংমিশ্রণে যে তাদাত্ম্যাধ্যাস ঘটিয়াছে, তাহাতে শূন্যবাদ সিদ্ধ হয় না। কেননা ভ্রমের সময় যে অংশটী পরিস্ফুরিত হইতেছে, তাহা যদি বা মিথ্যা হয়, তথাপি যে অংশ পরিস্ফুরিত হয় নাই, অধিষ্ঠানরূপে তাহা তো সত্য থাকিয়া যায়। সংক্ষেপশারীরকে এই কথাটাই বুঝাইয়া বলা হইয়াছে।

অধ্যস্তমেব হি পরিস্ফুরতি ভ্রমেষু
নান্যৎ কথঞ্চন হি পরিস্ফুরতি ভ্রমেষু।
রজ্জুশুক্তিশকলত্ব-মরুক্ষিতিত্ব-
চন্দ্রৈকতা-প্রভৃতিকানুপলম্ভনেন ॥
কিঞ্চানৃতদ্বয়মিহাধ্যসিতব্যমিষ্টং
স্যাচ্চেত্তদা ভবতি চোদ্যমিহ ত্বদীয়ম্।
সত্যানৃতাত্মকমিদং মিথুনং মিথশ্চে-
দধ্যস্যতে কিমিতি শূন্যকথাপ্রসঙ্গঃ ॥

—ভ্রমের সময় যাহা অধ্যস্ত হয়, মাত্র তাহাই পরিস্ফুরিত হয়, অন্য কিছু পরিস্ফুরিত হয় না। রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রজত, মরুভূমি-মরীচিকা, দ্বিচন্দ্রদর্শন প্রভৃতি ভ্রমের সময় রজ্জু, শুক্তি, মরুভূমি কিম্বা চন্দ্রের একত্ব তো আমাদের অনুভবগোচর হয় না। যদি দুইটী মিথ্যা বস্তুই পরস্পর অধ্যস্ত হইত, তাহা হইলে শূন্যবাদের আশঙ্কা হইতে পারিত। কিন্তু সত্য ও মিথ্যাত্মক মিথুন যখন পরস্পর অধ্যস্ত হইতেছে, তখন শূন্যবাদের আর অবকাশ কোথায়?

তাহা হইলে অধ্যাসবাদ সম্বন্ধে সার কথা দাঁড়াইল এই যে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মই বস্তু এবং তাঁহাতে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্যরূপ অখিলজড়বস্তুরই অধ্যারোপ হইয়া থাকে। (২৮)

বিনিময়

জীবন ভরে আছে আমার আকুল হয়ে চাওয়া—
আমার সকল বিলিয়ে দিয়ে তোমার সকল পাওয়া।
অঙ্গ আমার অনঙ্গ হোক প্রেমের দহন লাগি,
শিরীষ ফুলের তন্তুর পরশ নিত্য রহুক জাগি;
আমার গভীর নীরবতা করবো তোমায় দান—
কণ্ঠসুধার অঝোর ধারায় ভরবো দুটী কান;
আঁখির প্রদীপ নিভিয়ে দেব ধ্যানের বাসর রাতে—
হানবে তোমার রূপের চিকুর আঁধার নয়নপাতে।
মরণ-বঁধু সোহাগভরে রইবে জীবন চুমি—
আমার আমি টুটবে তখন, ফুটবে আমার তুমি!

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা —১০।৭১।৩

অমৃতময় স্বরূপকে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যেক কাজের মাঝে অনুভব করাই আমাদের সাধনা। আমরা যখন প্রাণকে আনন্দসিক্ত না রেখে কাজ করতে যাই, তখনই কর্ম্ম অসার বলে মনে হয়। সত্য সকলের মাঝেই কিছু না কিছু আছে। সেই সার জিনিষটুকুকে ছেঁকে নেবার জন্যই আমাদের চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বমিশ্রিত কাজ—তার মাঝে সত্য কোন্‌টুকু?—যতটুকু আমরা প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে পাই। দেহের দুখ, মনের অশান্তি, সমস্তেরই কারণ মোহ—সেই প্রাণ দিয়ে অনুভব করবার জিনিষটী ভুলে থাকা। সে জিনিষটী কি?—আনন্দ। নিরঙ্কুশ এবং অকারণ যে তৃপ্তি, তাই আনন্দের প্রকাশ। কর্ম্মে-বিশ্রামে সর্ব্বত্র সেই অকারণ তৃপ্তিটী বজায় রাখাই শ্রেয়ঃ। তাতেই আমরা প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌ব। প্রাণের প্রকাশ শক্তিতে, কর্ম্মে—কিন্তু তার স্থিতি ও পুষ্টি আনন্দে।

*

চারদিকে ধরবার মত কত কিছুই আছে। সবি যে ধরা যায় এমন নয়; সবটাই যে সব সময় ধরতে হবে, বুঝতে হবে, এমন কথাও স্বভাববিরুদ্ধ। যখন যেটা বুঝ্‌বার যোগ্যতা হবে, সেটা আপনা হতেই এসে তোমাকে আশ্রয় করবে। নিজকে কেবল একটা কেন্দ্রে ধরে রাখ্‌তে পারলেই হল। চাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা—যে কোন একটা ব্রতকে আজীবন ধরে রাখা। ভালই হোক মন্দই হোক্—একটা ধরে টান্‌লে দশটা এসে পড়েই। অবিশ্বাস করলেই সব অন্ধকার। বিশ্বাস কর, দৃঢ় হও—সবি আপনা হতে আস্‌বে। আপ্‌না-আপ্‌নি যা কাছে আসে, তাই তাঁর মধুময় দান। তিনি আমাদের জন্য যতখানি ভাবছেন, আমরা তাঁর জন্য ততখানি ভাব্‌লেই তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে। আপ্‌না হতে যা হয়, তাই অকৃত্রিম—কেবল পারিপার্শ্বিকটী গড়ে তুলবার ভার আমাদের উপরে।

*

এই যে দিনরাত আমায় নিয়ে আকুলি-বিকুলি, এর কি অন্ত নাই? এত ছট্‌ফটী, তবুও তো তাঁর নাগাল পাই না। আবার যাঁর দেওয়ার, তিনি দেবেন বলে হাত-পা গুটিয়ে বসেও তো থাকতে পারি না—এর উপায় কি? গুরু বলছেন, কামনা থাকতে নির্ভর হয় না। যাঁর করাবার, তিনি করাচ্ছেন। তুমি শুধু হাত-পাই নাড়্‌ছ। তারও মূলে তিনি। তোমার গতি তাঁর দিকেই। কিন্তু জ্ঞানে নয়—অজ্ঞানে। তবে এবার জেনে শুনে আনন্দের সঙ্গে আরও বেগে ছুটে চল, কর্ম্মক্ষয় হয়ে যাক্। আত্মশক্তি বলতে যা বোঝ, তাই নিয়ে তীব্র পুরুষকার দ্বারা কাজ করলে শীঘ্র কর্ম্মক্ষয় হয়। অন্যান্য জীব হতে এই অতিরিক্ত সম্পদটী মানুষের আছে। তাই

নিয়ে খুব জোরে চল। কর্ম্মের সফলতার দিকে তাকাচ্ছ ? ও তো এখনকার চাওয়া। এর আগে যে চেয়ে রেখেছ, সেগুলি শোধ হয়ে যাক্—এখনকার গুলি নিয়মিত সময়ে পাবে। যে ঢিলটা ছুঁড়েছ, মাটীতে তা পড়বেই। কাজেই ফল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও। কিন্তু ক্রমাগত জাগতিক বাসনার সৃষ্টি ও তার পূরণ হতে থাকলে এ জগতেই যে রয়ে গেলে। ওপারে যদি যেতে চাও, তবে আর নূতন করে কিছু চেয়ো না, সঞ্চিত কর্ম্ম তোমার অনাসক্ত ভোগে ক্ষয় হোক। ভোগের বাসনা বৃহৎ ভোগদ্বারা, সত্যলাভ দ্বারা পূর্ণ হোক, তবেই শান্তি মিলবে।

*

ভাল জিনিষের নকলটাও ভাল হয়ই। তাই সাধুর ভালও চোরের ভালর চেয়ে অনেক ভাল। রাজার পাঠ নিলেই মনে একটা সাময়িক মহান্ ভাব আসে। অন্ততঃ অভিনয় কালে। কিন্তু প্রত্যেকটী দিনে যদি নিমিত্তবিহীন আনন্দময় ভাবের সঙ্গে নিজকে অন্বিত করতে থাকি, তাহলে মৃত্যুর অভিনয় করতে গিয়ে কোন প্রসিদ্ধ অভিনেতার যেমন মৃত্যু হয়েছিল, তেমনি সত্যি সত্যি এক দিন সেই আনন্দময় অবস্থা লাভ হবে। গুরু এং সংস্কার দিবার জন্যই সাধনা করান। তাঁতে বিশ্বাস চাই।

*

রত্ন থাকে সমুদ্রের সুগভীর তলদেশে। প্রাণের আশা ছেড়ে যে সে জলে ডুব দিতে পারে, সেই রত্ন লাভ করতে পারে। তেমনি যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ রত্ন লাভ করতে চায়, তাকে 'প্রাণের আশা' ছেড়ে হৃদয়জলনিধির অতল তলে ডুবে যেতে হয়। যত্ন না করলে রত্ন লাভ করা যায় না। দেবাসুরে সমুদ্রমন্থন করেছিল বলেই তা হতে কৌস্তুভাদি রত্ন ও শেষে অমৃত উঠেছিল। নিজ নিজ হৃদয়সমুদ্র মন্থন করলে প্রত্যেক মানুষই তা লাভ করতে পারে।

*

চরিত্র সংশোধনের মূলমন্ত্র হচ্ছে নিজের চরিত্রকে নিজে দেখিতে শিখা—নিজেই নিজের স্বভাবের সমালোচনা করিতে শিখা। নিজের স্বভাব নিজে দেখিতে শিখিলে তাহার মাঝে যাহা দূষণীয়, তাহা শীঘ্রই চলিয়া যাইবে। একেই বলে আত্মদৃষ্টি বা দ্রষ্টাভাব। এই ভাবের উৎকর্ষ হইলেই ক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।

*

নিজের স্বভাবে দোষ দেখে হতাশ হয়ে পড়লে চলবে না। মানুষের ভিতর পশুভাব দেবভাব দুইই আছে। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা পশুত্বের বিনাশ করিয়া দেবত্বের বিকাশ করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। সাধনক্ষেত্রে এই পশুশক্তি ও দেবশক্তিতে যুদ্ধ হবে। ইন্দ্র অনেকবার স্বর্গরাজ্যচ্যুত হবেন, কিন্তু শেষে বৃত্রাসুর বধ হবে এবং স্বর্গরাজ্য আবার ইন্দ্রের অধিকারে আসবে।

*

মৃত্যুর রহস্য আমরা জানি না বলেই মৃত্যু আমাদের ভয়ের কারণ। মৃত্যুতত্ত্ব যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহারাই অমৃতের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। অমৃত যদি পেতে চাও, তবে আগে মৃত্যুর রহস্য অবগত হয়ে মরণভয় ত্যাগ করে দেহমনকে শিখাইতে উৎসর্গ করে মেরে ফেলতে চেষ্টা কর।

*

"আমার এ জগতে চাইবার কিছুই নাই আমি সমস্ত বাসনা-কামনার ঊর্দ্ধে। কাজে

আমি আমার একমাত্র সেই প্রিয়তমের উপর নির্ভয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করি। আমি যে শুধু তাকেই চাই। জগতের দুটা খেলার জিনিষ দিয়াই সে কি আমায় ভুলাইবে ?” এই হইল যথার্থ নির্ভরশীলের কথা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে আনন্দ, উৎসাহ, ভোগে নিবৃত্তি আপনিই আসিবে। আসল যদি পাই তবে আর নকলে মজে কে ? তিনি আমায় এই দিবেন বলিয়াই তো পদে পদে আমার সমস্ত বাসনার বস্তুগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতেছেন, নইলে তাঁকে তো চাইতাম না।

*

আমার কর্ত্তব্য নাই, অকর্ত্তব্য নাই—আছে কেবল আনন্দের দাবী। প্রশান্ত চিত্তে আনন্দ আমার বজায় থাক, তার পরে আর সব। জগতে কতজনা কত কিছু বড় বড় কাজ করে গিয়েছেন, আজ আমরা তার ফল উপভোগ করছি। কিন্তু তাঁদের এতে কি লাভ হয়েছিল ? তাঁরা আনন্দ পেয়েছিলেন এইমাত্র। এই আনন্দ যাতে পাই, তাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু অশান্ত চিত্তে তা পাওয়া যায় না। যদিও বা কখনও মিলে, তবু স্থায়িভাবে মিলে না। কাজেই “শান্ত উপাসীত” “আত্মনি আত্মতুষ্টঃ”—এই হচ্ছে নিবৃত্তি ও আনন্দের সেতু। এপারে যতই মাতামাতি করি না কেন, ওপারের ছোঁয়াচ গায়ে লাগবে না। হাহাকারভরা বুকে সোয়াস্তি মিলবে না।

*

“ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা” এ কথার অর্থ এই নয় যে জগৎ কিছুই নয় বা জগৎ নাই। এর অর্থ হচ্ছে জগৎ ব্রহ্মের নিত্যস্বরূপ নয়, ইহা তাঁহার মায়াময় রূপ। জগৎ স্থির নয়—নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। কাজেই এই চঞ্চল বস্তুকে দৃঢ়রূপে আঁকড়ে ধরতে গেলে ঠকবে তুমি। তাই শাস্ত্র বলছেন, ব্রহ্মের এই চঞ্চল মায়াময় রূপ ছেড়ে অটল সত্যস্বরূপে নিজকে প্রতিষ্ঠিত কর। তা হলে আর কোনও দিন তোমার পতন হবে না, অনন্তকাল তুমি আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করবে, তুমি অমর হবে।

*

বসন্তের প্রারম্ভে বৃক্ষের পত্রশূন্য শ্রীহীন অবস্থা দেখিলে বাস্তবিকই মনে হয় গাছটা মৃত কিন্তু তাহার পরেই আবার যখন নবকিশলয়ে তরু সুশোভিত হয়, তখন তাহার অবস্থা দেখিয়া আনন্দ হয়। আমাদের মৃত্যুও সেইরূপ পুরাতন জরাজীর্ণ স্থূল দেহটা নষ্ট হইয়া যায়, আবার কামনার বীজ হইতে নূতন দেহবৃক্ষ উদ্ভূত হয়। সুতরাং মৃত্যুতে ভয়ের কোনও কারণ নাই।

আশ্রম-সংবাদ

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের অধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব বর্ত্তমান মাসে পুরীধামেই অবস্থিতি করিবেন।

ওঁ তৎ সৎ



আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৮শ বর্ষ } আষাঢ় { ৩য় সংখ্যা

সোমাপূষণৌ

—*—

(ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৪।৮]

সোমাপূষণা জননা রয়ীণাং
জননা দিবো জননা পৃথিব্যাঃ।
জাতা বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপৌ
দেবা অকৃণ্বন্নমৃতস্য নাভিম্॥

সোমাপূষণা রজসো বিমানং
সপ্তচক্রং রথমবিশ্বমিন্বম্।
বিষূবৃতং মনসা যুজ্যমানং
তং জিন্বথো বৃষণা পঞ্চরশ্মিম্॥

দিব্যন্যঃ সদনং চক্র উচ্চা
পৃথিব্যামন্যো অধ্যন্তরিক্ষে।
তাবস্মভ্যং পুরুবারং পুরুক্ষুং
রায়স্পোষং বিষ্যতাং নাভিমস্মে॥

বিশ্বান্যন্যো ভুবনা জজান
বিশ্বমন্যো অভিচক্ষাণ এতি।
সোমাপূষণাববতং ধিয়ং মে
যুবাভ্যাং বিশ্বাঃ পৃতনা জয়েম ॥

নিখিল বিভবমূলে আছ জানি, হে সোমপূষণ,
দ্যুলোকজনক দোঁহে, ভূলোকেরো করেছ জনন ;
ভুবনশরণ নাম জনমিতে নিয়েছ দুজন—
অমিয়ার মূলাধার করিয়াছে দোঁহে দেবগণ।

হেরি ওই তোমাদের আবরিয়া রয়েছে ভুবন
সপ্তচক্র রথখানি—নারে বিশ্ব করিতে ধারণ ;
জুড়েছে সে সব ঠাঁই কামগতি, কে না তারে জানে ?
পঞ্চরশ্মি ধরি তার ছুটায়েছ আমাদের পানে।

দ্যুলোকের ঊর্দ্ধদেশে একজন নিয়েছ আসন
অপরে ধরায় রহ—অন্তরীক্ষে কর বিচরণ ;
বহুজনবরণীয় বিশ্বময় কীর্ত্তি দুজনার—
নাও নতি, দাও ধন—আমাদের জীবমূলাধার।

এ বিশ্বভুবনখানি একজন করেছ সৃজন,—
মেলিয়া উদার আঁখি দেখে যাও শুধু অন্যজন ;
হে সোমপূষণ দেব, প্রজ্ঞা মম কর নিরমল—
দোঁহারে সহায় করি জয় করি যত রিপুদল।

——————※——————

পথ ও পাথেয়

—*—

যদি জিজ্ঞাসা করি, জীবনের লক্ষ্য কি, তাহা হইলে অধিকাংশস্থলেই কোনও সদুত্তর পাইব না। হয়ত দেখিব, কাহারও লক্ষ্য অদূরবর্ত্তী কোনও ক্ষুদ্র বস্তুতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; যদিও বা কেহ বড় একটা কিছু চাহিতেছে, সেও হয়ত পরের মুখে শুনিয়াই চাহিতেছে, প্রাণের সঙ্গে চাহিতেছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমরা কি চাই, এবং যাহা চাই, তাহা পাওয়ার যোগ্যতা কতটুকু আছে, এ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা যে পর্য্যন্ত চিত্তের মাঝে ফলিয়া না উঠিবে, সে পর্য্যন্ত কোথায়ও সোয়াস্তি পাইব না। এ কথা ঠিক, যে অতৃপ্তি আমাদের জীবনের নিত্য সহচর; বর্ত্তমান অবস্থাই আমার জীবনের চরম বিকাশ, এ কথা মানিয়া কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। অতৃপ্তি আছে বলিয়াই জীবনটা স্থাবর না হইয়া জঙ্গম হইয়াছে; আর জীবনের এই চলার বেগই তো প্রাণের লীলা, আনন্দের বিলাস। কিন্তু এই গতির সঙ্গে সঙ্গেই স্থিরতর একটা প্রাপ্তির আশা সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নতুবা শুধুই চলা—অবিরাম, অবিশ্রাম চলা—এ একটা বিভীষিকা বটে। এই প্রাপ্তিকে যে যেরূপ দিয়াছে, জীবনের লক্ষ্য তাহার কাছে সেইরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর দেখিতে পাই, জীবনের গোড়ার কথাটা হইল গতি; আর তাহার শেষের কথাটা হইল স্থিতি। স্থিতিকে লক্ষ্য করিয়া গতির স্পন্দন ব্যাকুলতা—এই তো জীবন। কেহ হয়ত এই স্থিতিটাকেই গতির মধ্যপথে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে—ভাবিতেছে ওখানেই বুঝি আমার ছুটাছুটির শেষ; কিন্তু সেখানে গিয়াও আবার দেখিতেছে, আকাশের নীলিমার মত স্থিতির পট যতদূরে, ততদূরেই রহিয়াছে—কোথাও প্রাপ্তি চরম স্থিরতায় নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে না।

বাহিরে যখন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা এমনি করিয়া বিফল হইয়া যায়, মানুষ তখন অন্তরের দিকে তাকায়। তখন সে দেখিতে পায়, পাওয়াটা তো বাহিরে নয়, অন্তরে। বাহিরে উপকরণের স্তূপ সঞ্চয় করিয়া পাওয়ার পিপাসা মিটাইতে চাহিয়াছে, কিন্তু পিপাসা মিটে নাই। জীবনে কর্ম্ম পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোথাও চরম সার্থকতায় বিশ্রাম লাভ করে নাই। কিন্তু এ কথাও নিতান্ত স্থূল দৃষ্টির কথা। সূক্ষ্মের দিকে যে দৃষ্টি ফিরাইয়াছে, সে দেখিতেছে, অন্তর্য্যামী প্রত্যেকটী কর্ম্মেরই দাম দিতেছেন; কিন্তু আমরা তাহার দিকে না তাকাইয়া কর্ম্মের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি বলিয়াই অন্তরের সঞ্চয় হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

ভিতরে যিনি বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁর হিসাব বড় সুন্দর। তুমি যাই কর না কেন এক দামে তিনি সকলের পাওনা চুকাইয়া দিতেছেন। সকল কর্ম্মেরই এক মূল্য—সে মূল্য আনন্দ। রাজা হওয়ার সাধনারও মূ[ল্য] আনন্দ, আবার ফকীর হওয়ার সাধনা[রও] মূল্য আনন্দ। সাধনার দিক দিয়া য[খন] আনন্দের বিচার করি, তখন দুইটা আন[ন্দের] মাঝে একটা তারতম্যের আরোপ করিতে চা[ই]।

কিন্তু আরোপ তো মিথ্যা। উপকরণ যাহাই হোক্ না কেন—আনন্দ নির্ম্মল, একরস। তাহার দিকে না তাকাইয়া উপকরণের দিকে তাকাইলে ভালমন্দ বিচার আসে বটে। কিন্তু পাত্র সোণারই হউক, আর মাটীরই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না; মধুটুকু যে পরিবেশন করিয়াছে, তাহার ভাণ্ডে ওই একটী রস ছাড়া আর কোনও রস তো নাই। পাত্রের মূল্যে রসের মূল্য যাচাই হইবে, এটা অবুঝের কথা।

এই আনন্দকেই জীবনে দুই আকারে দেখিতে পাই। আনন্দ কখনও ফোটে জ্ঞানে, কখনও ফোটে প্রেমে। অর্থাৎ জগতেরও মূলে এই দুইটী ভাব আছে কিনা, তাই মানুষের চিত্ত ও প্রকৃতিও দুই রকম। পূর্ব্বে স্থিতি আর গতির কথা বলিয়াছিলাম। দুইটাই জগতের তত্ত্ব। এক কথায় বলিতে পারি স্থিতির নিদান জ্ঞান, আর গতির নিদান প্রেম। কিন্তু দুইয়ে বড় মধুর সম্পর্ক। জীবনে বারবার দেখিতেছি, কোনটাই আনন্দ ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছে না। সাধারণতঃ দেখি, জ্ঞান যেন বর্জ্জনের দিক; যে স্থিতি লাভ করিতে চাহিতেছে, সে গতিকে বর্জ্জন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু এ কথা মানি না; এ কথা অজ্ঞানীর কথা। সবটুকু পাইবে বলিয়াই জ্ঞান বর্জ্জন করিতেছে; অচল অটল হইয়া চঞ্চলাকে নিজের বুকে নৃত্যশীলা দেখিবে বলিয়াই তাহার স্থিতির সাধনা। রঙ্গভূমি যদি নর্ত্তকীর পদবিক্ষেপে টলিয়া উঠে, তাহা হইলে নৃত্যে রসভঙ্গ হইবে না কি? তাই নৃত্যকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্যই স্থিতির সাধনা। আবার, যে লোলুপ, যে অভাবুক, সে বলে, প্রেম কেবল ভোগেরই সন্ধান করে, বৈরাগ্যের প্রতি তার তীব্র বিরাগ; তাই সে ফুলের ভূষণে সাজে, চাঁদের জ্যোৎস্নায় তনুখানি মাজিয়া নেয়। কিন্তু এ বিলাস কাহার জন্য? নিজের জন্য তো নয়। এই সাজসজ্জায় যদি কাহারও মনই না ভুলিল, তবে সজ্জাটাই যে বৃথা। উপকরণটা ভোগের হউক, কিন্তু লক্ষ্যটা যে ত্যাগের, এ কথা বিলাসীর মনস্তত্ত্ব যিনিই বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন।

এই স্থিতি আর গতি—জ্ঞান আর প্রেমের তত্ত্বকেই দর্শনকার নাম দিয়াছেন—পুরুষ ও প্রকৃতি। বলিতেছেন, পুরুষ আর প্রকৃতি উভয়েই অনন্ত। দুইটী অনন্ত—এ এক মজার কথা। কিন্তু উভয়ে উভয়ের মমতায় বাঁধা বলিয়া এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। পুরুষ সব ছাড়িয়াছেন—প্রকৃতির সবটুকু পাইবার জন্য; প্রকৃতি আপন ভাণ্ডারের সবটুকু কুড়াইয়া আনিয়াছেন, পুরুষকে সঁপিবার জন্য। শিবের সব বলিতে গৌরী; গৌরীর সব বলিতে শিব। তাই দুইটী অনন্ত, অথচ মিলনতত্ত্বে দুই-এ এক। শুধু এক নয়—দুই এ এক; তাই বিরহ-মিলনের বীচিভঙ্গে আনন্দের জ্যোতি ঝিকিমিকি করিয়া উঠিতেছে। দুই-এ এক হইয়াছে বলিয়াই মধ্যে কর্ম্মের তরঙ্গ সৃষ্টি; স্থিতি প্রেমের স্পন্দন—তাই জগতে পরিণাম দেখা দিয়াছে।

ব্যষ্টি জীবনে এই দুইটী ধারা বিভক্ত হইয়া দেখা দেয়। জগতে কেহ বা স্থিতির রসিক—সে পরম বৈরাগী; কেহ বা গতির রসিক—সে পরম ভাবুক। কিন্তু একে অপরকে চায়; এই বিরহের আকুলতাই মানুষের জীবনে বুকজোড়া অস্বস্তির আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই আকুলতা হইতেই কর্ম্মের উদ্ভব, সাধনার সৃষ্টি। বিরহের জ্বালায়

অস্থির হইয়া মিলনের পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছি—এই তো জীবনের কর্ম্মরূপ। মিলনের আভাসে মাঝে মাঝে চিত্ত শিহরিয়া উঠিতেছে—তাহাকেই বলি সুখ। মিলন ঘটিলে কিন্তু সুখটাই একমাত্র সত্য। এত যে আকুলতা, এত যে আয়োজন—সমস্ত তখন সার্থক, অতএব তুচ্ছ। তাই মিলনের পিছনে রহিয়াছে আয়োজনের অবসান, কর্ম্মের বিরতি।

এই লক্ষ্যই আবার ব্যষ্টি জীবনে দুইটী সাধনার আকারে ফুটিয়া উঠে। জ্ঞানের সাধনা আত্মপ্রতিষ্ঠা; বিষয়বৈরাগ্য তাহার প্রয়োজক। প্রেমের সাধনা—আত্মসমর্পণ; সেখানেও বিষয়বৈরাগ্য প্রয়োজক। কিন্তু দুইটী বৈরাগ্যে প্রভেদ আছে। একজন না চাহিয়া সোহাগ বাড়ায়, তাই সে সবটুকু পায়—এই জ্ঞানীর বৈরাগ্যের রহস্য। আর একজন সবটুকু কুড়াইয়া আনে, বিলাইয়া দিবে বলিয়াই—এই প্রেমিকের বৈরাগ্য। দুইটী বিপরীত ধারা—তাই মিলনে আনন্দ উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। একজন বাহিরে বৈরাগী—তাই সে বিরূপ; কিন্তু তাহার অন্তরে রূপের অনন্ত প্রস্রবণ। আর একজন অন্তরে বৈরাগী; তাই বাহিরে তাহার এত রূপের ঠাট্; বৈরাগীর অঙ্গই লজ্জা কিনা—তাই কোনও উপকরণই বাদ পড়ে নাই।

এই তো হইল চরম প্রাপ্তির ছবি—আনন্দের অদ্বয় বিলাস। ইহাই জীবনের কাম্য বা লক্ষ্য। জ্ঞান বা প্রেম অথবা উভয়ই জীবের পুরুষার্থ। কিন্তু কর্ম্ম এই জ্ঞান বা প্রেমের চিরন্তন স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাই আমাদের জীবনাদর্শ খণ্ডিত। কর্ম্মের ধাঁধায় অন্ধ হইয়া আছি বলিয়া আমরা কি চাই, তাহা বুঝিতে পারি না। যদি পুরুষস্বভাব হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা চাই আত্মপ্রতিষ্ঠা; যদি প্রকৃতিস্বভাব হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা চাই আত্মসমর্পণ। এই দুইটী ছাড়া আমাদের চাহিবার আর কিছুই নাই। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা বা সমর্পণই কর্ম্মের ভিতর দিয়া কিম্বা উপকরণের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে বলিয়া আমরা বিশুদ্ধরূপে জীবনে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না। আত্মায় প্রতিষ্ঠা লাভ না করিয়া বিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছি—তাই আমরা দুঃখ-নিষ্পিষ্ট খণ্ডিত পুরুষ। আত্মার অমৃতরসায়ন পান না করাইয়া স্থূল ভোগোপকরণের বিকৃত রসই প্রিয়জনকে পান করাইতেছি, তাই আমরা চিরাবমানিত খণ্ডিত নারী।

দৃষ্টিকে উদার করিতে না শিখিলে এই বৈরূপ্য দূর হইবে না। কি করিয়া দৃষ্টি উদার হইবে?—চিত্তশুদ্ধি দ্বারা। চিত্তশুদ্ধি কিসে হইবে? নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা। এই কথাটাই সমগ্র জীবনে কি করিয়া ফুটিয়া উঠিবে, তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

জ্ঞান ও প্রেম লক্ষ্য—কর্ম্মসাধনা তাহার উপায়। এই হইল সার কথা। কি করিয়া সাধন চলিবে, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য। যদি সমগ্র মানবজীবনে এই তত্ত্বটী প্রয়োগ করিতে চাই, তাহা হইলে প্রথমতঃই জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়। এক শিক্ষার কাল; দ্বিতীয়তঃ দীক্ষার কাল। লক্ষ্য সকলেরই এক—কিন্তু সকলে সমানভাবে তাহা ধারণা করিতে পারে না। তাই প্রকৃতি-অনুযায়ী সাধনার তারতম্য করিতে হয়। যে বোঝে না, বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য, তাহার

মতিগতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা। ইহারই নাম শিক্ষা। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষেও জীবনের যাহা লক্ষ্য, একটী শিশুর পক্ষেও তাই। কিন্তু শিশু জ্ঞান প্রেম কি তাহা বুঝে না; অথচ অস্ফুট আকারে জ্ঞান-প্রেমের বীজ তাহার মাঝে আছেই। সকলের মাঝেই বীজ রহিয়াছে, কর্ম্মে তাহার প্রকাশ হয়—শিশুর কর্ম্মেও তাহা প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করাই শিক্ষা। বালক বিচার করিতে জানে না; সে ক্ষেত্রে প্রবীণকে তাহার হইয়া বিচার করিতে হইবে। যখন সে বিচার করিতে শিখিবে, তখন আপনার প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্ম সে আপনা হইতেই বাছিয়া লইবে। তখন তাহার দীক্ষার কাল উপস্থিত হইবে।

শিক্ষার অবস্থায় লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে কর্ম্মের নিয়ন্ত্রণ, তাহাই প্রাচীন যুগের ব্রহ্মচর্য্য সাধনা। ব্রহ্মচর্য্য বলিতে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ পরিপুষ্টি বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় উত্তরজীবনের জন্য বালকবালিকাকে উপযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এই দায়িত্ব পিতামাতার—এই দায়িত্ব আচার্য্যের। সংযম শিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যের মূল। দেহে বা মনে প্রবৃত্তির উত্তেজনা আসিলেই তাহা ক্রিয়ায় অভিব্যক্ত হইবে, ইহা জীবজগতের একটা সাধারণ ধর্ম্ম। এই প্রবৃত্তিকে স্বভাবতঃ রোধ করিবার ক্ষমতা ইতর জীবের নাই, কিন্তু মানুষের আছে। প্রবৃত্তিরোধের শক্তিই সংযম—উহা মনুষ্যত্বের অসাধারণ পরিচায়ক। "আজ আমি খাইব না, কি ঘুমাইব না, কি স্ত্রীতে উপরত হইব না"—ইত্যাকার সঙ্কল্পমূলে প্রবৃত্তির নিরোধ পশুতে করিতে পারে না—মানুষেই পারে; আর পারে বলিয়াই অনন্ত উন্নতির দ্বার মানুষের পক্ষে অবারিত। তাই যদি বলি, একমাত্র সংযমশক্তিকে আয়ত্ত ও বর্দ্ধিত করিয়াই মানুষ জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা বিন্দুমাত্রও অত্যুক্ত হইবে না। ব্রহ্মচর্য্য বলিতে এই সংযমেরই সাধনা বুঝি। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংযমের প্রয়োগ এবং তাহার বলে চিত্তের নিরোধবৃত্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলাই ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য এবং ইহাই শিক্ষার নির্ম্মল আদর্শ।

যখন বালকবালিকা যুবকযুবতী হইবে, তাহাদের মধ্যে স্বাধীন বিচারবুদ্ধির উন্মেষ হইবে, বাল্যে অভ্যস্ত ব্রহ্মচর্য্য জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ হইবে, তখন তাহাদের দীক্ষার কাল। শুধু মন্ত্র নেওয়াকেই দীক্ষা বলে না। জীবনব্যাপী ব্রত উদ্‌যাপনের পবিত্র সঙ্কল্পই দীক্ষা। তাহার পূর্ব্বে শিক্ষা প্রয়োজন। দীক্ষায় জ্ঞান ও প্রেমের আদর্শকে সচেতনভাবে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে। কর্ম্মই তাহার সাধনা। কর্ম্ম সকলেই করে; কিন্তু কর্ম্মের মূলে বাসনা থাকে বলিয়া জ্ঞানের পথে, প্রেমের পথে উহা কাহাকেও অগ্রসর করিয়া দেয় না। বাসনা অসংযম বশতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে আবাল্য সংযমে অভ্যস্ত, বহু বিকৃত বাসনার উত্তেজনা হইতে সে স্বভাবতঃই মুক্ত। নিম্নাভিমুখী বাসনার আকর্ষণ না থাকিলে চিত্তের গতি স্বভাবতঃই উর্দ্ধমুখী হইবে। ইহাই চিত্তশুদ্ধির সূচনা। শুদ্ধচিত্তে কর্ম্মের রূপ নির্ম্মল হইয়া প্রতিভাত হইবে, আত্মসুখ বাঞ্ছা তাহাতে থাকিবে না। আত্মসুখ বলি দিয়া পরহিতার্থে যে কর্ম্মের উদ্‌যাপন—তাহাই

সেবা। সেবাবৃত্তি যেমন চিত্তশুদ্ধির সূচক, তেমনি উহার পরিপোষকও বটে। বাল্যের ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা যখন জীবনে সেবাব্রতের দীক্ষায় রূপান্তরিত হইবে, তখনই জীবনের লক্ষ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। জ্ঞানস্বভাব পুরুষ তখন আত্মস্বরূপ মননে এবং প্রেমস্বভাবা নারী তৎস্বরূপধ্যানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জীবসেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন। ইহাই অধ্যাত্ম সংসারের প্রতিরূপ। ইহার সঞ্চারক আনন্দ, ইহার ধারক আনন্দ এবং ইহার পরিণাম আনন্দ।

অধ্যাত্মসংবাদ

জিজ্ঞাসা করছ, অর্থ না বুঝে শুধু শুধু প্রণব জপ করলে কোনও লাভ আছে কি?

হিমালয়ের নিবিড় জঙ্গলে অনেক সন্ন্যাসী বাস করেন। তাঁরা কোনও একটা বাদ্য-যন্ত্রের সঙ্গে প্রণব বা অন্য কোনও ভজন গান করেন। অনেক সময় জঙ্গল থেকে সাপ, বাঘ বা কোনও হিংস্র জন্তু গান শুনতে তাঁদের কাছে ছুটে আসে। এই সব বুনো জানোয়ার তো সঙ্গীতশাস্ত্রের কিছু জানে না, প্রণবজপের কোনও মাহাত্ম্য বোঝে না, তবুও তাদের ওপর গানের ক্রিয়া হয় কেন? শুধু একটা শব্দ যদি সাপ বাঘের ওপর এমন আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে, উপযুক্ত কালে একটা মন্ত্র যদি অবিশ্রাম কীর্ত্তন করা যায়, তাহলে তোমার জীবনের ওপর তার ক্রিয়া হবে না কেন?

সঙ্গীতের তিনটী দিক রয়েছে।—প্রথমতঃ সঙ্গীতের অর্থ; দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীতের বিধি; তৃতীয়তঃ সঙ্গীতের শব্দ বা ভাষা। একটা গানের তিনটী অঙ্গই যদি তুমি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে থাক, তাহলে গানটী তোমার কাছে ভারী চমৎকার লাগ্‌বে নিশ্চয়ই। কিন্তু যদি একটী অঙ্গের সঙ্গেও তোমার পরিচয় থাকে, তবুও গানের মাধুর্য্য কতকটা উপভোগ করতে পারবে। সাপ বা হরিণ শুধু গানের সুরটাই শোনে। গানের অর্থও তারা বোঝে না, গান গাইবার বিধিও জানে না; কিন্তু তবুও সুরটাই তো তাদের ভাল লাগে। ওস্তাদরা কি বিধিতে সুরের আলাপ করেন, কেউ কেউ শুধু তারই চর্চ্চা করে; তাদের কাছে গানের অর্থটা নিষ্প্রয়োজন। কেউ কেউ হয়ত গানের অর্থ হতেই আনন্দ পায়, গাইবার বিধি সম্বন্ধে তারা হয়ত কিছুই জানে না।

তেমনি প্রণবজপেরও তিনটী অঙ্গ আছে। প্রথম হচ্ছে শব্দ—মুখে যে মন্ত্রটা উচ্চারণ করা হয়, শুধু তাই; দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে মন্ত্রের অর্থ, ভাব দিয়ে যা ধারণা করতে হয়; তৃতীয়তঃ হচ্ছে প্রণবকে তোমার স্বভাবে ফুটিয়ে তোলা, জীবনের কাজে-কর্ম্মে তার ঝঙ্কার তোলা। যিনি নাকি এই তিন অঙ্গ ধরেই প্রণবজপ করেন, অর্থাৎ মুখে গান, হৃদয়ে ভাবনা করেন,

কর্ম্মে তাকে ঝঙ্কৃত করে তোলেন, তিনি তাঁর সমস্তটা জীবনই একটা অবিরাম সঙ্গীত-প্রবাহ করে তোলেন। সবার কাছে তিনি ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি। কিন্তু ভাবে বা কর্ম্মে যদি প্রণব গান নাও করতে পার, তবুও জপ করা ছেড়ো না। শুধু মুখে যে প্রণব উচ্চারণ করবে, তারও একটা ফল আছে। আবার যদি প্রণবের ভাবনাই কর শুধু, বাক্যে বা কর্ম্মে তাকে না ফোটাতে পার, তাতেও একটা ফল পাবে বই কি। আবার যদি কর্ম্মে প্রণব-ঝঙ্কার জাগিয়ে তুলতে পার, ভাবে বা মুখে তার গান না চলে, তাও খুব ভাল বলতে হবে। কিন্তু ভাবে আর কাজে প্রণবগান চললে স্বভাবতঃই দেখবে, মুখ দিয়েও তার জপ সুরু হয়েছে।

কতকগুলো জিনিষ আছে, যার নাম করলেই মুখে জল আসে, যেমন তেঁতুল, কমলা ইত্যাদি। শুধু নামেই যদি একটা ক্রিয়া হয়, তাহলে খেলে যে ক্রিয়াটা সর্ব্বাঙ্গীন হবে, সে তো বলাই বাহুল্য। তেমনি মুখে শুধু প্রণব উচ্চারণ করলেই তার একটা ফল পাবেই; আর যদি জপ সর্ব্বাঙ্গীন হয়, তাহলে ফলটাও সর্ব্বাঙ্গীন হবে। প্রথমতঃ ফলটা হয়ত বুঝতে পারবে না, কিন্তু পরিণামে তা ভাল করেই বুঝতে পারবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।

উদকবিজ্ঞানে আছে, যদি একটা চৌবাচ্চার তলায় একটা ছিপি আঁটা থাকে, আর তাতে আমরা জল ঢালতে থাকি, তাহলে যতই জল ঢালব, ছিপিটার উপর ততই বেশী করে চাপ পড়বে। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একেবারে হিসাব করে বলতে পারি, ঠিক কতটুকু জল চৌবাচ্চায় ঢাললে তার চাপে ছিপিটা ছুটে গিয়ে তলা দিয়ে জল বেরিয়ে পড়বে। তেমনি এই দেহভাণ্ডেও যদি প্রণব-ধারা ঢালতে থাক, তাহলে তার ফলে দেহের মাঝেও একটা চাপ জন্মাতে থাকবে। কিন্তু সর্ব্বসমক্ষে ফলের প্রকাশ একটা কথা, আর ফলের জনন হল আর একটা কথা। তবুও দেখবে এমন একটা সময় এসেছে, যখন তোমার দেহভাণ্ডের ছিপিটা জলের চাপে ছুটে গিয়েছে আর হুড় হুড় করে তোমার ভিতর থেকে জল বেরিয়ে আসছে। কতকটা সময় পর্য্যন্ত হয়ত ফলটা ধরা যায় না, কিন্তু ফলটা যে আছে, এ কথা নিশ্চিত।

ব্যাপারটা কেমন হয় শোন। একটী মেয়ের কিছু দিন হল বিয়ে হয়েছে, মেয়েটী যেন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। তার ছেলে পিলে এখনও হয়নি, তাই প্রসব ব্যথা যে কি, তা সে জানে না। গর্ভের প্রথম মাসে, তার দেহের মাঝে ঈষৎ পরিবর্ত্তন দেখা দিল; কিন্তু মেয়েটী সরল বিশ্বাসে ভাবল যে এর পরে আর নূতন কোনও পরিবর্ত্তন হবে না। ও দেশে বউ শাশুড়ীর কাছেই থাকে, শাশুড়ীই বউকে ছেলেপিলেকে দেখেন শোনেন। মেয়েটী একদিন সরলভাবে শাশুড়ীকে বলছে, "মা, যখন আমার ছেলে হবে, তখন যেন আমায় জাগিয়ে দিও, কি জানি আমি না জানতেই যদি ছেলে হয়ে যায়।" শাশুড়ী বলল, "বাছা, যখন ছেলে হবার সময় হবে, তখন আর তোমায় জাগিয়ে দিতে হবে না; তখন এমন চীৎকার সুরু করবে যে পাড়াপরশীকে তুমিই জাগিয়ে দেবে।" গর্ভাবস্থায় মেয়েটীর মাঝে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হচ্ছিল, কিন্তু সে তার কিছুই জানছে না। ফল আছেই, কিন্তু যখন উপযুক্ত সময় আসবে, তখনই সে প্রকাশ হবে। তেমনি

অবিশ্রাম প্রণবসেবন কর না কেন; প্রণব আত্মার পুষ্টিকর, অবিশ্রাম এই রস পান কর, যখন সময় হবে, ফল তখন আপনা হতেই দেখা দেবে। এখনি অধৈর্য্য হলে চল্‌বে কি করে?

রামের মনে আছে, ছেলেবেলায় খেলার সাথীদের সঙ্গে করে বাগানে বা উঠানে গর্ত্ত করে ধান বা যব পুঁত্‌তেন। একটা গর্ত্তের মাঝে সবগুলি বীজ একত্র পুঁতে দিয়ে তাতে একটু জল দিতাম, দিয়ে মাটী চাপা দিয়ে রাখতাম। এ কাজে আমরা এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে আমাদের খাওয়া ভুল হয়ে যেত। গর্ত্ত থেকে কি গজায়, তাই দেখবার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। দুচার মিনিট আগেই যেখানে ধান বা যব পুঁতেছি, সেখান থেকে কখন চারা বেরিয়ে পড়ে, তার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। আমাদের জায়গা ছেড়ে যেতে ভয় হত, কি জানি, অজান্তে যদি চারা বেরিয়ে আসে। আমাদের ঔৎসুক্যের আর সীমা থাকত না; বীজ পুঁতে ঘণ্টাখানেকের মাঝেই সন্ধান নিতাম, চারা বেরিয়েছে কিনা; কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুই দেখতে পেতাম না। অবশেষে হতাশ হয়ে মাটীটা একটু সরিয়ে দেখতাম—বীজগুলোর কিছু হল কিনা। কিন্তু কিছুই দেখতে পেতাম না। মাটীটা আরও একটু সরিয়ে দেখতাম—কই, অঙ্কুর তো বেরোয়নি। আরও একটু খুঁড়ে দেখতাম, কই, বীজের তো কিছুই হয়নি! তাই বলি, পনের মিনিটে ফল ধরবে আশায় ওই ছেলেদের মত অমন ব্যস্ত হয়ে উঠো না। বীজ পুঁততে পার, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি তো ফসল তুলতে পারবে না। ফল ধরতে কিছু সময় লাগবে বটে, কিন্তু ফলটা যে হবেই, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।

"কেউ কেউ বলে থাকেন, সম্মোহনে যারা রোগ ভাল করে, তারা এমন কর্ম্ম সঞ্চয় করছে, যার ফলে আগামী জন্মে তাদের দারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এ কথা কি সত্য?"

—না। মানস বৈদ্যেরা এমন কিছু করছে না, যার ফলে পরজন্মে তাদের দারুণ রোগ ভোগ করতে হবে। মানস চিকিৎসায় বাস্তবিক এমন কিছু নাই, যার ফলে চিকিৎসকের কোনও রোগ উৎপন্ন হতে পারে। লোকে তো সংসারের কত কাজকর্ম্ম করছে; তার ফলে কি তাদের ভীষণ ভীষণ ব্যাধি জন্মাচ্ছে? তা তো নয়। সাধারণ বৈদ্য যেমন চিকিৎসা করে থাকে, মানস-বৈদ্যেরাও তাই করছে মাত্র। সাধারণ বৈদ্যকে চিকিৎসাব্যবসায়ের ফলে পরজন্মে যদি এমন ভীষণ ফল ভোগ করতে হয়, তাহলে মানস-বৈদ্যকেও অবশ্যি তাই ভুগতে হবে। আর চিকিৎসার ফলে সাধারণ বৈদ্যের যদি তেমন কোনও কর্ম্মসঞ্চয় না হয়, তাহলে মানস-বৈদ্যেরও হবে না। রামকে কে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি মানস চিকিৎসা করেন না কেন? রামের উত্তর হচ্ছে, পার্থিব জীবনটাকে তিনি এত মূল্যবান মনে করেন না যে তার দিকে এতখানি নজর দিতে হবে। খৃষ্টের রোগ আরোগ্যের শক্তি ছিল। তা নিয়ে তিনি ব্যবসা ফাঁদেননি। যখনই তিনি কারু ব্যারাম ভাল করতেন, কিম্বা তাঁর গুণে কারু রোগ আরাম হত, তখনই তিনি বলতেন, "তোমার বিশ্বাসে রোগ আরাম হয়েছে, আমি আরাম করিনি।"

রাম যদি এখন ব্যায়াম ভাল করতে সুরু করেন, তাহলে কি হবে? রামের কাছে সবাই এই সমস্ত ছাই-পাঁশ নিতে ছুটে আসবে। কেউ বলবে, "আমার ছেলের ব্যায়ামটা ভাল কর, কি ও কর, তা কর।" কেউ বলবে, আমাকে "সমাজের চাঁই করে দাও" ইত্যাদি। এর ফলে আসবে শুধু ব্যবসাবুদ্ধি। মানস চিকিৎসা নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করে, মুক্তির অধিকার হতে তারা দূরে সরে যায়।

*

"এই স্থূল দেহে থাকতেই কি আত্মা পূর্ণ বিকশিত হতে পারেন?"

—তাহলে "আত্মা" কথাটা একটু ভাল করে বোঝা দরকার। ধর, একটা সরায় জল রয়েছে, তাতে সূর্য্য প্রতিফলিত হচ্ছে। এখন একটা সরা থেকে আর একটা সরায় জলটা ঢাল। দেখবে, প্রথম সরাটায় সূর্য্য যেমন প্রতিফলিত হচ্ছিল, দ্বিতীয়টাতেও ঠিক তেমন হচ্ছে। দ্বিতীয় পাত্র থেকে তৃতীয় পাত্রে জলটা ঢাল, দেখবে ঠিক একই ভাবে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ছে। তোমার এই স্থূল দেহকে একটা মাটীর সরার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সরাতে যে জল রয়েছে, তার সঙ্গে তোমার সূক্ষ্ম দেহের দিব্য উপমা চলতে পারে। তোমার বাসনা, আবেগ, মনোবৃত্তি—এই সমস্ত দিয়ে সূক্ষ্ম দেহটা তৈরী। মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম দেহটা শুধু একটা মাটীর সরা হতে আর একটা সরাতে ঢালাঢালি করা হয়। কেউ কেউ বলেন, এই সংসারী সূক্ষ্ম দেহটাই আত্মা; কিন্তু বেদান্ত তা বলেন না। বেদান্তের মতে, জ্যোতির্ম্ময় আত্মা প্রতিভান্বিত সূর্য্যের মত প্রথম পাত্রে প্রতিফলিত হওয়ার সময় যেমন ছিলেন, দ্বিতীয় পাত্রে প্রতিফলিত হওয়ার সময়ও তেমন ছিলেন। আত্মা কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই পূর্ণ স্বপ্রকাশ। আত্মা জ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ; তাঁর কোনও বিকার বা পরিণাম নাই। তিনি সর্ব্বদাই পূর্ণ। আত্মা বলতে যদি সূক্ষ্ম শরীর বোঝ, তাহলে বলতে হয়, তাকে বহুবার জন্মান্তর গ্রহণ করতে হয়; অবশেষে এমন অবস্থায় সে পৌঁছায়, যেখানে জন্মান্তর রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই জন্মেই মুক্তিলাভ করব, এমন তীব্র ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, তাহলে সমস্ত বন্ধন হতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে জন্মান্তরের পথ রুদ্ধ করাও তোমার পক্ষে সম্ভব।

মৃত্যু কি? মৃত্যু অর্থ স্থূল দেহরূপ মাটীর সরাটা ভেঙ্গে ফেলা। যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন যেন একটা সরা থেকে আর একটা সরায় জলটা ঢালা হয়। সূক্ষ্মদেহেরই জন্মান্তর হয়েছে, সে আর একটা স্থূল শরীর আশ্রয় করেছে। আর প্রথম স্থূল দেহে আত্মা যেমন প্রতিফলিত হয়েছিলেন, এই দ্বিতীয় দেহেও তিনি তেমন প্রতিফলিত হচ্ছেন। ধর, এই দ্বিতীয় পাত্রটাও তিনকুড়ি দশ বছর টিঁকে থাকল, তার পর ভেঙ্গে গেল। তখন ওই পাত্রে যে জল বা সূক্ষ্ম শরীর ছিল, সেটাকে তৃতীয় একটা পাত্রে রাখা হল। এই হল জন্মান্তর গ্রহণ। আত্মা হলেন যেন সূর্য্যস্বরূপ; সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরে, স্থূল দেহের বিভিন্ন আধারে তিনি একই রূপে প্রতিফলিত হচ্ছেন। আত্মা তাহলে জন্মান্তর হতে মুক্ত। জন্মান্তর শুধু সূক্ষ্ম শরীরেরই, সূর্য্যে নয়, আত্মার নয়। কথাটা আরও একটু বুঝিয়ে বলছি।

(সমাপ্য)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

—*—

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়—যখন প্রধানতঃ রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া দেশের নেতৃপদবাচ্য ব্যক্তিগণ ব্যস্ত এবং তাহাতেই তাঁহাদের শক্তি ব্যয়িত, তখন দেশের প্রকৃত কার্য্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা বৃথা বলিয়াই মনে হয়। তবুও যাঁহারা দেশের মতিগতি ফিরাইবার প্রয়াস করিতেছেন ও প্রকৃত পন্থায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাই নমস্য। অবশ্য তাঁহাদের কার্য্য সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে পড়ায় সম্যক্ ফলপ্রসূ হইতেছে না। কিন্তু যখন দেশের মোহ কাটিয়া যাইবে, তখন তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি অবশ্যই পড়িবে। যাঁহারা কিঞ্চিৎ সত্যের আভাস পাইয়াছেন, প্রকৃতভাবে কার্য্য করা তাঁহাদের দ্বারাই সম্ভব। আর তাঁহাদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছেন, তাঁহারাই এই কার্য্য উদ্‌যাপন করিবেন। শীঘ্র না হইলেও গৌণে অবশ্যই হইবে। কারণ সকল অবস্থাতেই দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা আছে। দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দিনে হঠাৎ সৌভাগ্যসূর্য্যের আবির্ভাব একান্ত অসম্ভব। বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থা, হঠাৎ তদ্বিপরীত অবস্থা কি করিয়া লাভ হইতে পারে? ক্রমশঃ দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শুভ মুহূর্ত্ত আসা অসম্ভব নহে। যোগ্যং যোগেন যোজয়েৎ—সুতরাং দেশ যখন উপযুক্ত হইবে, তখন অনুকূল অবস্থাগুলি আপনিই আসিয়া জুটিবে।

তাই বলিয়া কি আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? না, তাহা নহে। দেশকে এই যোগ্যতার দিকে অগ্রসর করিতে সহায়তা করিতে হইবে। সকল সময়েই কতকগুলি আসুরপ্রকৃতির ও কতকগুলি দেবপ্রকৃতির লোক কার্য্য করেন। এই দ্বৈতভাব সকল সৃষ্টির মূলে। ইহাতেই প্রতিযোগিতামূলে একের উৎকর্ষ হইয়া থাকে। কল্যাণই জয়যুক্ত হইয়া থাকে। দেশেও এই উভয় প্রকৃতি লোকের অসদ্ভাব নাই। আপাতদৃষ্টিতে আসুরপ্রকৃতির লোকেরা দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও প্রকারান্তরে দেবপ্রকৃতির লোকের শক্তিবৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়া দেশেরই কার্য্য করিতেছে। তবে যখন যাহা হইতেছে, ভালর জন্যই হইতেছে বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলে না—আর তাহা পারাও যায় না। যাহার যাহা প্রকৃতি, সে তদনুকূলে কার্য্য করিবেই—তদনুকূলে শক্তি ও লোক সংগ্রহ করিবেই। তবে যাহা আদর্শ, যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাকে তাহার আসন দিতে হইবেই। বর্ত্তমানে যাহাতে আসুরপ্রকৃতির লোক হইতে সত্ত্বপ্রধান লোকের সংখ্যা বেশী হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। তজ্জন্য শিক্ষা ও চরিত্রগঠন আবশ্যক।

এই শিক্ষা ও চরিত্রগঠন দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে হওয়া একান্ত অসম্ভব। তাহা একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে। সকলেই জানেন মহাত্মা গান্ধী আদর্শ-চরিত্রের লোক, কিন্তু কয়জন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরিত্রের অনুসরণ করিয়াছেন? কারণ—দেশের বর্ত্তমান শিক্ষা ও সংস্কার ইহার অনুকূল নহে। এই জন্য, সমাজের শিশু ও

বালকগণকে সমাজের আদর্শের ও সংস্কারের ছাপ লাগিবার পূর্ব্বেই আহরণ করিয়া এমন স্থানে লইতে হইবে, যেখানে উক্তপ্রকার কলুষ প্রবেশ করিতে না পারে। অন্য পক্ষে তাহাদের জন্য যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রস্তুত হইবে, তাহাও যেন সম্পূর্ণ আদর্শের অনুকূল হয়। যেখানে প্রকৃতি তাঁহার অফুরন্ত শোভাভাণ্ডার খুলিয়া বসিয়াছেন, যেখানে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই, এমন স্থানই এতদুদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। তথায় এমন একজন সত্যপ্রতিষ্ঠ ঋষিপদবাচ্য মহাত্মা এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে আচার্য্যস্বরূপে থাকিবেন, যাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব রীতিমত উক্ত বালকগণের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। আবার যাহাতে সেখানে শিক্ষার মূলকেন্দ্র আদর্শ মাতৃহৃদয়ের অভাব না থাকে, সেই জন্য আদর্শ মাতৃহৃদয়া ঋষিপত্নীসদৃশা কোন মহদন্তঃকরণবিশিষ্টা মহিলার প্রয়োজন, যিনি এতগুলি বালকবালিকার মাতৃস্থানীয়া হইয়া এই প্রবাসেও তাহাদের মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করিতে না দেন। ঐ ঋষিতুল্য মহাপুরুষকে যদি পিতৃস্থানীয় ও সেই আদর্শহৃদয়া দেবীকে মাতৃস্থানীয়া ও সতীর্থগণকে ভ্রাতা ও ভগ্নীরূপে লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে এই নির্জ্জন ঋষিআশ্রমে তাহাদের কোনই অভাব অনুভব করিতে হইবে না। পরন্তু তাহারা সেই আদর্শহৃদয় দেবতা ও দেবীর নিকট নিষ্কলুষ অপার্থিব স্নেহমমতা লাভ করিয়া প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবে ও ধন্য হইবে—যাহা সংসারে একান্তই দুর্ঘট। আবার তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া তাহারা বিনা আয়াসে যে শিক্ষাদীক্ষাদি লাভ করিবে ও তাঁহাদের চরিত্রের ছাপ তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে যেরূপ আসিয়া পড়িবে, তাহা স্বতঃই তাহাদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করিবে।

এইরূপে বালকবালিকার মধ্যে যে শিক্ষা ও চরিত্র ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে সেই প্রতিষ্ঠানের পারিপার্শ্বিক এক নূতন উপাদানে গঠিত হইয়া উঠিবে। সেখানে আবার যে সকল বালকবালিকা সৌভাগ্যক্রমে আসিয়া পড়িবে তাহারাও আপনা হইতে তাহাদের ছাঁচেই তৈরী হইয়া উঠিবে। এইরূপে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে তাহার শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকযুবতী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যখন সংসার পাতিবে, আর এইরূপ দম্পতীর সংখ্যা যখন বেশী হইতে থাকিবে, তখন তাহাদের আদর্শে আবার অন্যেও শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে সহায়তা পাইবে। এইরূপে ঘরে ঘরে যখন ঋষি ও ঋষিপত্নীর অভাব হইবে না তখনই আমাদের দেশ আবার ভারতবর্ষ হইবে—যাহার আদর্শ সকলের প্রাণেই জাগিতেছে। এইরূপে ঘরে ঘরে যদি আদর্শ দম্পতীর অভাব না থাকে, তবে তাঁহাদের সন্তানাদির জন্য আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে না। বালকবালিকাগণ পিতামাতা ও প্রতিবেশীর নিকটই সকল শিক্ষা লাভ করিবে। এইরূপে দেশে যতই প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য ব্যক্তির সদ্ভাব হইবে, ততই মনুষ্যত্বের অধিকার আপনিই আসিয়া জুটিবে। দেশ আবার রামায়ণ মহাভারতের যুগের ন্যায় সুখসমৃদ্ধি এবং শৌর্য্যে বীর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাহা হইলেই আমাদের দেশের শিক্ষাদির সংস্কার করিতে গেলে সেই প্রাচীন আদর্শই (প্রকৃতপক্ষে তাহাই আমাদের জাতীয় আদর্শ)—সেই ঋষিযুগের গুরুগৃহ

বাসের কথাই স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধে এতদপেক্ষা সুষ্ঠু চিন্তা ও ব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ কতকটা এই আদর্শেই গঠিত হইয়া উঠিতেছে, অথচ আমরা নিশ্চেষ্ট। আমরা যদি বাজে আন্দোলন ছাড়িয়া এই শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইতাম, তবে দেশের প্রকৃত কার্য্য করিতে সক্ষম হইতাম। শিক্ষা-সংস্কারের উপরই দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি নির্ভর করে। মূলে জল সিঞ্চন না করিয়া শাখাপ্রশাখায় করিলে পণ্ডশ্রম হয় মাত্র।

আর এক কথা। ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ যেমন সত্যান্বেষণ করিতে করিতে বেদান্ত প্রতিপাদিত এক অদ্বৈত ব্রহ্মে আসিয়া পৌছিয়াছেন, অন্যান্য দেশবাসীও ক্রমশঃ এই সত্যে আসিতেছেন ও আসিবেন, তদ্রূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের আদর্শকেই এক দিন সকলকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, আমাদের ইহাই একান্ত বিশ্বাস।

স্বামী রামতীর্থ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তীর্থরাম বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার প্রথম বারে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই এবং ইহার দরুণ নিয়মিত সময়ের এক বৎসর পর তিনি বি এ পাশ করেন। বলা বাহুল্য, এই পরীক্ষাতেও তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। গণিত শাস্ত্রের পরীক্ষায় পরীক্ষক তেরটী সমস্যা উপস্থিত করিয়া পরীক্ষার্থীকে তন্মধ্যে যে কোনও নয়টীর সমাধান করিতে বলেন। তীর্থরামও তেরটী প্রশ্নেরই উত্তর লিখিয়া পরীক্ষককে যে কোনও নয়টী উত্তর পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তীর্থরাম পিতার নিকট লিখিলেন, "আপনার পুত্র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ৩০৲ বৃত্তি পাইয়াছে। এ সমস্তই ভগবৎকৃপা। মানুষের ব্যক্তিগত চেষ্টায় এমন ফল ফলে না।" মামা এতদিন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। তীর্থরাম মামার নিকটও লিখিলেন, "মোটের উপর দুইটা বৃত্তি পাইব, একটা ৩৫৲ আর একটা ২৫৲। এ সমস্তই ভগবানের কৃপা।"

ইহার পর গণিতে এম্ এ পড়িবার জন্ত তীর্থরাম লাহোরের সরকারী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মোটে ১৯॥ বৎসর। ইংলণ্ডে যাইয়া গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছায় তিনি সরকারী বৃত্তির জন্ত দরখাস্ত করেন, কিন্তু সে বৎসরের বৃত্তি অধুনা-

প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত পরাঞ্জাপে পান। পরবর্ত্তী কালে এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পূরণ সিংকে তিনি বলিয়াছিলেন, "রামের ইচ্ছা ছিল, তিনি গণিতে 'সিনিয়র র‍্যাংলার' হন ; কিন্তু তাঁর এই দেহের যদি সে ভাগ্য না হইয়া থাকে তো অন্ত একজনের তো হইয়াছে। কামনাহীনের কামনা এমনি করিয়াই পূর্ণ হইয়া থাকে।"

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তীর্থরাম গণিতে এম্ এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। এইখানেই তাঁহার ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি হইল। ১৮৯১ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর তীর্থরামের কি ভাবে কাটিয়াছে, তাহা তাঁহার দিনলিপি হইতেই সুব্যক্ত হইবে।

*

"২রা ডিসেম্বর, ১৮৯০। আজ কলেজে গিয়েছিলাম। কলেজে ফ্রি পড়তে পাব কিনা সে বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। এতদিন অধ্যাপক গিল্‌বার্টসন্ আমার কলেজের মাইনের অর্দ্ধেক দিতেন, কিন্তু এখন আর তাঁর কাছ থেকেও কোন সাহায্য পাব না। তিনি বলছেন, আমি করে দিতে পারি এমন কোনও কাজ আর এখন কলেজে পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই ভবিষ্যতে তিনি আর আমার কলেজের বেতন দিতে পারবেন না। তবে তিনি সন্ধান করে দেখবেন, আমার করবার মত কোনও কাজ যদি কলেজে থাকে, তাহলে হয়ত বিনা বেতনে পড়বার অনুমতিও পেতে পারি।

"৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯০। তোমার পত্র পেলাম। আমি জানি, তুমিই আমার আশ্রয়। হয় তুমিই আমার কলেজের বেতনটা দিয়ে দাও, নয়ত অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের মনের ভিতর ঢুকে এমন কিছু কর, যাতে তাঁরা এই দয়াটুকু করেন যে আমাকে আর কলেজের মাইনে দিতে না হয়।

"১৮ই জানুয়ারী ১৮৯১। অধ্যক্ষ একটু কাজের বদলে আমায় বিনাবেতনে পড়তে অনুমতি দিয়েছেন। আমাকে তাঁদের বক্তৃতা নকল করে দিতে হবে।

"২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯১। অধ্যক্ষসাহেব ফকন দীনকে বলে দিয়েছেন যে ব্যায়াম না করে যেন কলেজ হতে আমি বাড়ী না যাই, এটা সে লক্ষ্য রাখে। সাহেব বলছেন, আমার শরীর নাকি ভারী দুর্ব্বল ও খারাপ হয়ে পড়েছে।

"২রা এপ্রিল, ১৮৯১। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা ঠিক করেছেন যে, গণিতের নম্বর ১৫০ থেকে ১৩০এ নামিয়ে আনবেন এবং অন্যান্য বিষয়ের নম্বর সেই অনুপাতে বাড়িয়ে দেবেন। অর্থাৎ তাঁদের ইচ্ছা, অন্যান্য বিষয়কেও তাঁরা গণিতের গৌরব দেন। কিন্তু এ যে ভয়ানক কথা—এ যে অপরাধ। এর মানে এই যে, কাজে আর অকাজে যে একটা পার্থক্য রয়েছে, সেটা তাঁরা মুছে ফেলতে চান। আমাদের গণিতের অধ্যাপক বলছেন, এ ব্যবস্থার তিনি প্রতিবাদ করবেন। তার ফল কি হবে, কে জানে ?

"৭ই এপ্রিল, ১৮৯১। আজ সকালে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, ঘরের দরজা খোলা, তালা ভাঙ্গা—ঘরের জিনিষপত্র বলতে যা একটা ঘটী আর একটা বাটী ছিল, তাও চোরে নিয়ে গিয়েছে। আমার বইগুলো যে নিয়ে যায়নি—তাই রক্ষা। চোর তার টুপীটা এখানে ফেলে গিয়েছে।

"৯ই মে, ১৮৯১। লালা অযোধ্যাদাস বলছিলেন যে তিনি আমার জন্য দুটো বাড়ী

দেখে এসেছেন। একটা বাড়ী আমার পছন্দ হয়নি, সে বাড়ীতে হাকিম রায় নামে একজন আর্য্যসমাজী আছেন। এখন যে বাড়ীটাতে আছি, দ্বিতীয় বাড়ীটা এর মতন সুবিধার হবে না। তা ছাড়া বিশেষ আপত্তির কথা এই যে বাড়ীর মালিক আমার কাছ থেকে ভাড়া নেবেন না, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তাঁর ছেলেকে আমার পড়াতে হবে। অর্থাৎ এক টাকা ভাড়ার একটা ঘর তিনি বিনাভাড়ায় আমায় থাকতে দেবেন, আর তার বদলে ধর মাস ২৫৲ টাকার কাজ আমার কাছ থেকে আদায় করে নেবেন—তার ওপর বিনাভাড়ায় তাঁর বাড়ীতে আমায় থাকতে দিচ্ছেন, এ বদান্যতাটুকু তো আছেই। এই জন্যই দ্বিতীয় বাড়ীটাতে যেতে আমার মোটেই ইচ্ছা করছে না।

"১২ই মে, ১৮৯১। আমার চারপাইটা একেবারে গেছে, তার দড়ী টড়ী কিছুই নেই। তাই পাঁচ পয়সা দিয়ে দড়ী লাগিয়ে আনলাম। বেশ মজবুত করে দড়ী লাগানো হয়েছে—দেখে ভারী আনন্দ হচ্ছে!

"১৯শে মে, ১৮৯১। আজ যখন কলেজে গিয়েছি, তখন সতীর্থেরা সব ধরে বসল—'তোমার কলেজ বোর্ডিংএ এসে থাকতে হবে, প্রিন্সিপাল বলে দিয়েছেন।' দু' তিন ঘণ্টা পর কলেজের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল, তিনিও বললেন, 'অধ্যক্ষের নূতন আদেশের কথা কি শোননি?' আমি বললাম, 'বাবাকে জিজ্ঞাসা করে তারপর মত দেব।' অবশ্য বাবা বলতে তোমার কথাই মনে করেছিলাম। ডাক্তার বললেন, 'যাই কর না কেন, অধ্যক্ষের হুকুম তো মানতেই হবে।'

"কলেজ ছুটী হলে পর অধ্যক্ষ আমায় বললেন, 'আমি তোমার জন্য এই ব্যবস্থা করেছি। তুমি এসে বোর্ডিংএ থাক। এতে তোমার ভালই হবে।' আসল কথা হচ্ছে, আমি যে কুঁড়েটাতে থাকি, তা আমার সতীর্থেরা এসে একদিন দেখে গিয়েছে। এখানে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট, রোজ কলেজে যেতে এতখানি করে হাঁটা—এই সব অসুবিধার কথা তারা জেনেছে। তাই সহানুভূতির বশে তারা এই ষড়যন্ত্র পাকিয়ে আমায় বোর্ডিংএ টেনে নিতে চায়। তারা আমাকে কিছুতেই এখানে থাকতে দেবে না। সেখানে খাওয়া-থাকার জন্য সবশুদ্ধ মোটে ৩৷৴০ করে দিতে হবে। আমি জানি, যেমন পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন, মনটাকে একাগ্র করা সম্পূর্ণ আমার শক্তির উপরই নির্ভর করে। পড়াশুনার পক্ষে হোষ্টেল তো খারাপ জায়গা নয়—ওখানে থেকে কতজন পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে।

"বারো আনা দিয়ে খানকতক ইংরেজী বই এনেছি। আর একটা পয়সাও আমার হাতে নেই। একবার অযোধ্যাপ্রসাদের কাছে যেতে হচ্ছে।

"তুমি যদি মনে কর, আমায় হোষ্টেলে যাওয়া উচিত হবে না, তাহলে প্রিন্সিপালকে কি জবাব দেব, তা জানিও।

"২৩শে মে ১৮৯১। আজ কলেজ থেকে এসে যেই ঘরের দরজা খুলেছি, অমনি একটা সাপ আমায় তেড়ে এল। ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ। আমি চীৎকার করে উঠতেই লোকজন এসে সাপটাকে মেরে ফেলল। কলেজের সবাই জেদ করে বসেছে, আমাকে আর সেখানে কিছুতেই থাকতে দেবে না। সবারই ইচ্ছা আমি হোষ্টেলে যাই। তারা বলছে, যেখানে-সেখানে বসে পড়ার জন্য যদি মনঃস্থির করতে না পারি, তাহলে লোক-

সমাজে বাস করা তো আমার কোনও দিন হয়ে উঠ্‌বে না। যে সাঁতার শিখ্‌তে চায়, অথচ জলে নামে না, সে কখনও সাঁতার শিখ্‌তে পারে না।

"তারা আরও বল্‌ছে, যতই বয়স বাড়বে, মানুষের ততই নির্জ্জনস্থানেরও অভাব হবে, শুধু নিজের জন্য প্রচুর অবকাশও থাকবে না। আমার একা একা থাকার অভ্যাসটা তারা ছেড়ে দিতে বল্‌ছে। ডাক্তারবাবুও ভরসা দিচ্ছেন যে ক্রমে মানুষের মধ্যে থেকেও মনঃস্থির করা আমার অভ্যাসগত হয়ে উঠ্‌বে। আমার শুধু এই একটী মাত্র ভয়, নইলে হোষ্টেলে তো আর সব শারীরিক স্বচ্ছন্দতাই মিল্‌ত। ফল কথা, বোধ হয় হোষ্টেলে যাওয়াটা অপরিহার্য্য হয়ে উঠ্‌ল—না গিয়ে বোধ হয় পারব না। তুমি আশীর্ব্বাদ করো, এখানে থেকে আমার যতটা মনঃস্থির হয়, হোষ্টেলে গিয়েও যেন তাই হয়।

"২৫শে মে, ১৮৯১। সব দিক খতিয়ে দেখলাম। যদি হোষ্টেলে যাই, তাহলে, (১) ছুটীর দিনে বাড়ীভাড়া বাবতে কিছুই দিতে হবে না। (২) যতদিন খাব, শুধু সেই কয়দিনেরই টাকা দিতে হবে। যদি আমার কোনও অতিথি আসেন, তবে তাঁর শুধু খাওয়া খরচটা দিলেই চল্‌বে।

"হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলেছি যে বাবা আমার সমস্ত খরচ দিয়ে কুলিয়ে উঠ্‌তে পারবেন না। কিন্তু তিনি হিসাব করে বললেন যে, ওতে এখন আমি যা খরচ করছি, তার চেয়ে মোটে একটাকা বেশী দিতে হবে। তিনি বলছেন, হোষ্টেলে যখন আমি খাব ভাল, তখন অন্য দিক থেকে এক টাকা খরচ কমালেই পারি। আর তিনি কথা দিচ্ছেন যে এখন আমার যা খরচ হচ্ছে, তার চেয়ে বেশী যাতে আমায় না দিতে হয়, তিনি সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। তার পর তিনি আর এক কথা বললেন যে, এখানে থাক্‌লে আমাকে আর বই কিন্‌তে হবে না—ছেলেদের কাছ থেকেই বই এনে পড়্‌তে পারব। তা ছাড়া তিনি এ কথাও বলছেন যে, এখানে যদি আমার কোনও অসুবিধা হয়, তাহলে ছুটীর পর আমি বাসা পরিবর্ত্তন করতে পারি।

"৫ই ডিসেম্বর, ১৮৯১। তোমার কাছে লিখ্‌ব বলে পোষ্টকার্ড এনে রেখেছি। কিন্তু ভারী শক্ত একটা গণিতের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই কার্ডখানা লিখে তোমার কাছে পাঠাবার আর সময় পাইনি। এখনও কলেজের অন্যান্য বিষয়ের কাজ পড়ে আছে। এই চাব্বিশ ঘণ্টা পরে সমস্যাটার মীমাংসা করেছি—এখন অন্যান্য কাজে হাত দেব।

"১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯২। এখনও কলেজ-হোষ্টেলে যেতে পারিনি। খুব সম্ভব আজকে যাব। আবার আমার ঘরে চুরী হয়েছিল। আমার লেপ, বিছানা, মাদুর, আর দু' একটা বাসনপত্র নিয়ে গিয়েছে। বিছানার ওপর এক প্রস্থ কাপড় ছিল, তাও গেছে। কিন্তু আমার বইগুলি ঠিক আছে। লালা জ্বালাপ্রসাদ আর ঝণ্ডুমল বলছেন, তাঁরা আমায় নূতন কাপড় কিনে দেবেন। তাঁরা বলছেন, "গোস্বামিজী, তুমি একটুও ভেবো না—তোমার জন্য আমরা যথাসাধ্য করব।

"১১ই জুন, ১৮৯২। আজকে, এক ভদ্রলোক প্রিন্সিপালের হাতে ৩০৲ দিয়েছেন—আমাকে দিতে। প্রিন্সিপাল আমায় ডেকে

বললেন, "এই নাও।" টাকাটা কে দিলেন জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সাহেব নাম বললেন না। বোধ হয় টাকাটা প্রিন্সিপাল সাহেবই দিলেন। আমি তাঁকে বললাম, "এর অর্দ্ধেকটা কলেজ খাতে জমা রাখুন, বাকী অর্দ্ধেকটা আমায় দিন।' কিন্তু তিনি আমার কথায় রাজী হলেন না; কাজেই টাকাটা নিয়ে লালা অযোধ্যাপ্রসাদকে দিয়েছি।

"৯ই জুলাই, ১৮৯২। কাল রাত্তে দুধ আনতে বাজারে যাওয়ার সময় জুতোর এক পাটী হারিয়ে ফেলেছি। বোধ হয় ওটা নালার মাঝে ঢুকে পড়েছিল। ওটাকে উদ্ধার করবার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। পরদিন কলেজে গেলাম—এক পায়ে আমার জুতোর এক পাটী, আর এক পায়ে এক বুড়ীর জুতোয় পড়ে পাওয়া এক পাটী। আমার জুতোপাটীটা খুব পুরোণো হয়ে গিয়েছে। তাই পৌণে দশ আনা দিয়ে একজোড়া নূতন জুতো কিনে নিয়ে এলাম।

"২রা আগষ্ট ১৮৯২। আবার কলেজে যাচ্ছি। কলেজের হালুইকর ঝণ্ডুমল খুব সহৃদয়তা সহকারে বলছে, রোজই যেন তার ওখানে খেয়ে আসি। বিশেষ জেদ করায় তার আতিথ্য স্বীকার করতে রাজী হয়েছি। দেখতে হবে, এই অন্নের কি প্রভাব আমার ওপর হয়। যদি ভাল বুঝি, তাহলে বরাবর তার ওখানেই খাব।

"৯ই আগষ্ট ১৮৯২। ঝণ্ডুমলের ওখানেই খাচ্ছি। তার অন্ন ভালবাসার অন্ন। তুমি তো এখানে আসবে। যদি মনে কর, তার আতিথ্য স্বীকার করা উচিত নয়, তাহলে ছেড়ে দেব।" (ক্রমশঃ)

কর্ম্ম ও কৃপা

—*—

[শ্রীশিশিরকুমার বসু বর্ম্মন্ বি. এ.]

কর্ম্মবাদই হউক আর কৃপাবাদই হউক, উভয়েরই লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম ও জ্ঞান—এই দুইটী স্বতন্ত্র বস্তুবোধক শব্দ নহে। ব্রহ্মই জ্ঞান-স্বরূপ। সেই জ্ঞান বা চৈতন্য নিত্য, সত্য ও ক্ষয়বৃদ্ধিহীন এক অখণ্ড বস্তু। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। যে ভূতাকাশ সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সেই আকাশেরও আধার তিনি। আকাশ যেমন সর্ব্বগত, দর্শনেন্দ্রিয়ের অবিষয় হইলেও যেমন তাহার বিদ্যমানতায় সন্দেহ উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ সেই আকাশের আধার যে চৈতন্য, তিনি অতিশয় সূক্ষ্ম-বস্তু বিধায় ইন্দ্রিয়-বর্গের অনমুভূতিযোগ্য হইলেও তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয় না।

জ্ঞান যদি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তবে কর্ম্মের প্রয়োজন কি? কারণ জ্ঞান ত আর কর্ম্মফল হইতে পারে না।—কর্ম্ম মানুষের অধীন, জ্ঞান মানুষের অধীন নহে। জ্ঞানের প্রকাশের জন্য ক্রিয়া অনাবশ্যক, যেহেতু জ্ঞান স্বপ্রকাশ। তজ্জন্য জ্ঞান ক্রিয়াসাধ্য নহে। জ্ঞান যদি কর্ম্মসাধ্য নহে, তবে কায়িক বাচনিক

ও মানসিক কর্ম্ম, যথা—হোম যাগ যজ্ঞ স্বাধ্যায় ও ধ্যানধারণাদি কি অজ্ঞান দূর করিবার জন্য উপদিষ্ট নহে? না, অজ্ঞান কল্পিত—উহা অবস্তু, উহার কোন সত্তা নাই। সত্তা নাই বলিয়াই অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা নাশ, ক্রিয়া দ্বারা নহে। কারণ সর্ব্বত্রই এক চৈতন্য দীপ্তি পাইতেছেন—তাঁহার অধীনই সব—তিনি কাহারও অধীন নহেন যে কর্ম্মসাধ্য হইবেন। যদি সর্ব্বত্রই একমাত্র চৈতন্যসত্তাই বিদ্যমান থাকে এবং জ্ঞান কর্ম্মসাধ্য না হন, তবে সবাই কি ব্রহ্মজ্ঞানী? যদি তাহাই হয়, তবে জগতে এত দুঃখ, কষ্ট কেন? দুঃখ কষ্ট একমাত্র ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হেতু। আভাস-চৈতন্য বা জীব দুঃখ কষ্ট বোধ করেন, আত্মা করেন না, কারণ আত্মা নিত্যশুদ্ধ—নির্ব্বিকার চৈতন্য-স্বরূপ এবং এই জন্যই সংস্কার বর্জ্জিত। তাই যত কিছু কর্ম্ম, তাহা শুধু ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য দূর করিতে এবং মনকে একাগ্র করিতে। মনশ্চাঞ্চল্য দূরীভূত হইলেই চিদাভাস বা জীবাত্মা কিছুতেই রঞ্জিত হন না এবং তখনই জ্ঞান তাঁহার নিকট প্রকাশিত হন। চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্মযোগের উপদেশ, কারণ ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান হইলেই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় উপনীত হইয়া সুখ দুঃখ অতীতাবস্থা বা ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ হয়। মনের একাগ্রতা সম্পাদিত হইলেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান সাধকের নিকট স্বতঃপ্রতিভাত হয়। সমুদ্রে তরঙ্গ থাকিলেই তাহার স্বচ্ছতা অনুভূত হয় না—স্থির সমুদ্রেরই স্বচ্ছতা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

এইক্ষণ কর্ম্মবাদ কি তাহা বুঝিতে হইবে। কর্ম্মবাদ বুঝিতে হইলে সর্ব্ব প্রথম বুদ্ধদেব ও তাঁহার ধর্ম্মমত কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ বুদ্ধদেব আসিয়াছিলেন কর্ম্ম বাদ লইয়া। তাহার mission ছিল শুধু কর্ম্ম। তাঁহার আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস ছিল অগাধ। তিনি স্বীয় সুকর্ম্মবলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বৌদ্ধশাস্ত্রমতে ৪ বার মহাব্রহ্ম, ২০ বার ইন্দ্র, ৮০ বার সন্ন্যাসী, ৫৮ বার রাজা ও ২৪ বার ব্রাহ্মণ হইয়া উচ্চাঙ্গের কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ম্মফল ত ক্ষয়শীল, তাই তাঁহাকে বারম্বার দেবযোনি ও মানব-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই জন্মে বুদ্ধদেব পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও দুঃখ ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধ্যানস্থ হইয়া দুঃখের হাত হইতে মুক্তির উপায় কি, তাহাই চিন্তা করিতেন। অবশেষে তিনি সেই উপায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে কোন সত্যবস্তু নাই; কর্ম্মপ্রবাহই মানবজীবন। একটা অগ্নিশিখা যেমন এক বস্তু হইতে অন্যবস্তুকে আশ্রয় করিয়া জ্বলিয়া উঠে, মানবজীবনও তদ্রূপ। এই জ্বলিয়া উঠিবার মূলে ভোগপিপাসা। মানব বিষয় লালসা হেতু এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করে। এই বিষয় লালসা একেবারেই নির্ব্বাপিত করিতে হইবে। এই বিষয় বাসনা নিবৃত্ত হইলেই দুঃখের অবসান হইবে। তাই ইন্দ্রিয় দমন করিতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ও মানসিক চাঞ্চল্য দূর করিতে মন হইতে যাবতীয় চিন্তা দূর করিয়া মন শূন্যময় করিতে হইবে। এইরূপে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠায় ও চিন্তাশূন্যতায় দুঃখের আক্রমণ হইতে দূরে থাকা যাইবে।

হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মযোগে একটু বিশেষত্ব থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মবাদের সহিত যে

কোনরূপ ঐক্য নাই, তাহা নহে। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরাপ্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগি-
নাম্।"

পূর্ব্ববর্ণিত দুই প্রকার মোক্ষপরতার মধ্যে শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জ্ঞানযোগ দ্বারা এবং জ্ঞানভূমিতে আরোহণেচ্ছুর চিত্তের শুদ্ধি-কামনায় কর্ম্মযোগ দ্বারা নিষ্ঠা হয়। অবশ্য নিষ্কামকর্ম্ম জ্ঞানিগণেরও করিতে হইবে, নতুবা শরীররক্ষণই হইবে না।

এই কর্ম্মযোগ, যাহাদিগের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, বিশেষতঃ তাহাদিগেরই জন্য। যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য তিরোহিত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয় ও মানসিক একাগ্রতা লাভ হয়, সে কর্ম্ম কি তাহা দেখিতে হইবে। এই চিত্তশুদ্ধির উদ্দেশে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে দ্বাদশ প্রকার কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছিলেন। যথা—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥
—৪।২৪-২৯

অধিকারিভেদে বা ইচ্ছানুসারে পূর্ব্বোক্ত যে কোন কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু যদি ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে দেবতা সিদ্ধি হইবে বটে, কিন্তু জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। শ্রীভগবান সর্ব্বময় হইলেও দেবতা ও ভগবান এক নহেন। দেবতা উচ্চাঙ্গের জীবমাত্র। সংস্কৃত মানবাত্মাই দেবযোনিতে জন্মলাভ করেন। তাই কর্ম্মদ্বারা দেবতার কৃপা লাভ হইবে বটে, কিন্তু ভগবৎকৃপা লাভ হয় না। ফলাকাঙ্ক্ষারহিত না হইলে অনাসক্ত হয় না ও সম্যক্ প্রকারে চিত্তের শুদ্ধি হইতেই পারে না। তজ্জন্য শ্রীভগবান সাধককে সতর্ক করিয়া দিতেছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥"

কর্ম্মেই তোমার অধিকার। কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হইও না এবং কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। আসক্তিশূন্য হইতে হইলেই ফলের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। ফলাশা থাকিলেই পুনঃ পুনঃ জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

—হে কুন্তীনন্দন, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্ত যেরূপভাবে করিলে আমাতে পৌঁছায়, তদ্রূপ ভাবে করিও, অর্থাৎ যেন তাহাতে কামনা মাখান না থাকে। এইরূপ ভাবে কর্ম্মযোগ অবলম্বন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত ও সংসারানাসক্তি হইলেই তখন শ্রীভগবানের কৃপা হয় এবং তখন চৈতন্য কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং ধরা দেন বা জ্ঞান

প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধগণ ও হিন্দুগণ বিপরীত উপায় দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা করেন ও অনাসক্ত হন। বৌদ্ধগণ মানসিক শূন্যাবস্থা দ্বারা মনের ধ্বংস করেন—হিন্দুগণ মনকে কেন্দ্রস্থ করিয়া জগতের মূল কারণের দিকে অগ্রসর হন। বৌদ্ধগণের ব্রহ্মচর্য্য ও অনাসক্তিই শেষ—হিন্দুদের নিকট উহা সাধনার একটা স্তরমাত্র। ইহা সাধনার ভিত্তি। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান প্রকাশিত হন এবং জ্ঞানের মধুরতা উপভোগের হেতু তখনই জ্ঞানী ভগবানের লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন এবং জ্ঞানী তখনই ভক্তপদবাচ্য হন। চারিদিকে কেবল তাঁহারই কৃপার অজস্র প্রস্রবণের অনুভূতি হয়। তখনই ভক্তি ও কৃপার আদান প্রদানরূপ লীলা বা ভাষান্তরে ভক্ত ও ভগবানের বিলাস আরম্ভ হয়। তখনই ভক্ত দ্রৌপদীর ন্যায় ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একান্ত নির্ভরশীল হন। একান্ত নির্ভরতাকেই ভক্তি বলে। যখন আর কিছু ধরিবার নাই, আর কিছু দেখিবার নাই, আর কিছু শুনিবার নাই—যাহা কিছু সবই তিনি; তখনই কেবল ভক্তির প্রবল প্লাবনে হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া যায়। তখন ভক্তই ভগবানের প্রভু হইয়া দাঁড়ান। ভক্তির প্রাচুর্য্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া তিনি নিজেই স্বয়ং হইয়া বসেন। কারণ শ্রীভগবানের চিন্তনে তন্ময় হইয়া গিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়। তখন ভিতরে "সোঽহং" ভাব, বাহিরে ভক্তচূড়ামণি ভাব।

কিন্তু এই ভগবদ্ভাব প্রাপ্তির অন্তরায় একমাত্র মানবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের সংস্কার। প্রারব্ধ ক্ষয় হয় ও পুনরায় কর্ম্মসঞ্চয় না হয়, তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। ভোগেই কর্ম্মক্ষয় হয়। এই ভোগ প্রধানতঃ দৈহিক। কুকর্ম্মের ফলে দৈহিক দুঃখভোগে কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবশ্য এইরূপ ভোগ করিতে করিতে এক সময় মানবাত্মা কূলে পৌঁছায় বটে, কিন্তু যাঁহারা এই দুঃখভোগের হাত হইতে নিস্তার পাইতে চান, তাঁহারা এক জন্মেই প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া এবং পুনরায় কর্ম্ম সঞ্চয় যাহাতে না হয়, তাহাই করিয়া থাকেন। যেমন একটী সঙ্গীত পাঁচ মিনিটে গাওয়া যায়, আবার এক ঘণ্টায়ও গাওয়া যায়, একটা পথ এক ঘণ্টায় অতিক্রম করা যায়, আবার পাঁচ ঘণ্টায়ও অতিক্রম করা যায়, তদ্রূপ সমস্ত কর্ম্মক্ষয় একমাত্র ঐকান্তিক আগ্রহের উপর নির্ভর করে। তজ্জন্য সাধারণতঃ হিন্দুগণকে উপবাসাদির দ্বারা আত্মশাসন করিতে দেখা যায়। বর্ত্তমানে মানব অন্নগতপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হওয়ায় গীতোক্ত দ্বাদশপ্রকার যোগের একটা সংযমে অক্ষম হইবে, ইহা বুঝিয়াই শ্রীভগবান বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মক্ষয় করিবার উত্তম পন্থার আভাস দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।" সুকর্ম্ম ও কুকর্ম্ম ক্ষয় করিতে অনাসক্তি আনিতে ইষ্টমন্ত্র জপের ন্যায় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বিতীয় নাই।

কিন্তু এই মন্ত্রজপে কর্ম্মক্ষয় ও অনাসক্তি হইবে কেন? ইহার উত্তর বুঝিতে হইলে "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং" রূপ সংসারবৃক্ষের ঊর্দ্ধ ও অধঃ বুঝিতে হইবে। ক্ষর ও অক্ষর হইতে উত্তম যে পুরুষোত্তম সংসাররূপ বৃক্ষের মূল বা কারণ, তিনিই ঊর্দ্ধ এবং বিনশ্বর সংসার অধঃ। এইক্ষণ সাধককে সততই ঊর্দ্ধে বা মূল কারণ স্বরূপ পুরুষোত্তমে বাস করিতে হইবে।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

কিন্তু তাঁহাতে বাস করিতে হইলে হয় তৈলধারার ন্যায় তাঁহার রূপের নিরবচ্ছিন্ন

চিন্তা করিতে হইবে, নতুবা নাম জপ করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে রূপ চিন্তন প্রথমাবস্থায় হইতে পারে না। নাম ও রূপ অভেদ হওয়ায় নামজপে রূপচিন্তনের কার্য্য হয় ও পরে রূপ প্রকাশিত হয়। জপেই ঊর্দ্ধে বা কণ্ঠে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকের নিম্নস্তরে বাস হয়। সুতরাং ঊর্দ্ধবাসবশতঃ জড়বস্তুর আসক্তি ক্রমশঃই লোপ পায় এবং জপজনিত দুঃখভোগে কর্ম্মক্ষয় হয়। তখন কি ইহলোকে কি পরলোকে সর্ব্বত্রই ঊর্দ্ধে বাস হইয়া থাকে এবং কৃপার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে।

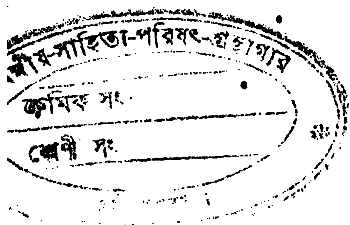
ভগবৎকৃপা পূর্ব্বোক্তরূপে লাভ হইলেও অন্য এক প্রকারে সহজেই হইয়া থাকে। সদ্‌গুরু, তদ্দত্ত মন্ত্র ও ভগবান অভেদ হওয়ায়, সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিতে পারিলেই সব অভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর কৃপাই ভগবৎকৃপা। অনেকের বিশ্বাস, গুরুই সব করিয়া দিবেন। আর এক শ্রেণী আছেন, যাঁহারা সংযমের দিকে দৃষ্টি না দিয়া সাধনার চেষ্টায় ক্রটী করেন না, অথচ কৃতকার্য্য বা অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না বলিয়া মনে মনে গুরুর উপর অভিমান করেন। কিন্তু তাঁহাদের বুঝিতে হইবে, সংযমের সহিত সাধনার ক্রটী না করিলেই গুরুর কৃপা অনুভব করা যায়। সংযমের উপরে দাঁড়াইয়া যদি সাধনা করা যায়, তবে কৃপা দর্শাইবার জন্য গুরু সব সময়ই প্রস্তুত। শুধু কৃপা দর্শাইবার জন্য প্রস্তুত বলিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি ভক্তের নিকট পরীক্ষা দিয়া তাহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া তাঁহাতে যাহাতে অটল বিশ্বাস হয়, তাহা করিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ নহেন। ইহা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে নিত্য পরীক্ষিত। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতকালে ত দূরের কথা, তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ক্ষান্ত হন নাই এবং সে পরীক্ষায় জগতের এক মহা উপকার সাধিত হইয়াছে।

যাহারা সংসারবাসনা ত্যাগ করিয়া একমাত্র সদ্‌গুরুকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাকে লইয়াই ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, যাহারা পঞ্চবিধ ভাবে একমাত্র গুরুকে জানিতে চাহিয়া মাত্র নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা তাঁহারই সন্তুষ্টি করিতে চাহিতেছে, তাহাদের সাধনভজনের আদৌ প্রয়োজন নাই। অগ্নির সংস্পর্শে অঙ্গার যেমন অগ্নিময় হইয়া যায়, তদ্রূপ গুরুর শক্তি ধীরে ধীরে শিষ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে, পরে গুরু তাহাদের মুক্তিদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত যাহারা গৃহস্থ, তাহারাও যদি গুরুকেই কেন্দ্র করিয়া আসক্তিশূন্য হইয়া সংসারে থাকিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া সংযমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গুরুদত্ত সাধনভজনের ক্রটী না করেন, তবে তাঁহারাও সদ্‌গুরুর কৃপাদৃষ্টির বহির্ভূত হন না।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা, যাহা এই দেশে কৃপাবাদ সম্বন্ধে প্রচলিত আছে, তাহা না বলিলে যেন কিছু বাকী রহিয়া যায় মনে হয়। কথাটা এই যে, কৃপাবাদ দেশের লোককে একেবারে কাপুরুষ করিয়া তোলে। তাহাদের স্নায়ু ও পেশীগুলি অতীব Sensitive হয়। কথাগুলি একেবারে অযৌক্তিক নহে। তবে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে বা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া নিজে কিছু না করিয়া শুধু ভগবৎকৃপার উপর নির্ভর করা কেবল কাপুরুষতার নামান্তর; উহা তামসিক। তাঁর কৃপা অবিরত শ্রাবণের ধারার ন্যায় বর্ষিত হইতেছে। তিনিই অধিযজ্ঞরূপে হৃদয়ে আসীন

আছেন। তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। তাঁর কৃপা না হইলে মুহূর্ত্তেই সবই লয় হইয়া যায়। কিন্তু সেই কৃপা ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ না হইলে উপলব্ধি হইতে পারে না। 'যেরূপ ছিদ্রময় ঘটে বারি স্থিতিশীল হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ না হইলে কৃপা ধরিয়া রাখিবার শক্তি থাকে না। সংযত চিত্তেই কৃপার পূর্ণ বিকাশ।

সুতরাং দেখা যায় যে কর্ম্মফল স্বীকার করিলে যে শ্রীভগবানের অস্তিত্বে সন্দেহ উপস্থিত হয় বা কর্ম্মফলে ও ভগবানের অস্তিত্বে সংঘর্ষ হয়, ইহা সংস্কারজড়িত স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবের ভ্রান্তিমাত্র।



ভাবের অঙ্কুর

[১৩০১ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর]

নামে রুচি

ইতিপূর্ব্বে ছয়টী ভাবাঙ্কুরের কথা আমরা বলিয়াছি। ষষ্ঠ ভাবাঙ্কুর সমুৎকণ্ঠা হইতেই আমরা সাধ্য-সাধনার রাজ্য অতিক্রম করিয়া সহজ অনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। সপ্তম ভাবাঙ্কুর "নামগানে সদারুচিঃ।" রুচি কথাটীই একটী মধুর বিহ্বলতার প্রতি সঙ্কেত করিতেছে। নিষ্ঠা হইতে যে রুচি উৎপন্ন হয়, তাহা ইহার পূর্ব্ব নিদান এবং এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনাও করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে রুচিকে নিষ্ঠার ফলস্বরূপ না দেখিয়া তাহার মাঝে যে স্বয়ম্ভু বিলাস রহিয়াছে, তাহার প্রতিই আমাদিগকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

হৃদয় যখন ভাবে উদ্বেল হইয়া উঠে, তখন কর্ম্মেও তাহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবের অঙ্কুর উৎপাদনের জন্য যে কর্ম্ম এবং অঙ্কুরোদ্গমের ফলস্বরূপ যে কর্ম্ম, এই উভয়ে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। পূর্ব্বে ছিল বিচারবুদ্ধির প্রাবল্য, আত্মশাসনের কঠোরতা; এক্ষণে দেখা দিয়াছে বিবশ চিত্তের আনন্দস্পন্দন। এখানে তো কার্য্য-কারণের ধারা কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কোন প্রণালী ধরিয়া ভাবের স্রোত নামিয়া আসিয়াছে, তাহা তো কেহ বলিতে পারে না। এখন আছে শুধু কূলপ্লাবী স্রোতে ভাসিয়া চলা—আদি অন্ত বিচার না করিয়া শুধুই ভাসিয়া চলা। ভাবের অঙ্গ যে রুচি—তাহা এইরূপ সহজ আনন্দের অভিব্যক্তি।

বেদান্ত বলিতেছেন, জগতের দুইটী বিভাব—নাম আর রূপ। যদি সত্য জ্ঞান লাভ করিতে চাও, তবে এই নাম-রূপের সংস্কার হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেল।—এই শাসন ভাবুকের কানে বজ্রকঠোর হইয়া বাজে। —নামরূপ মুছিয়া ফেলিলে তিনি কি লইয়া

থাকিবেন? কিন্তু উভয়ের এই আপাত-বিরোধের মাঝে সন্ধিরও একটা সঙ্কেত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। নামরূপ মুছিয়া ফেলিলে যাহা থাকিবে, তাহা আত্মস্বরূপ জ্ঞান। নিজকে বিশুদ্ধরূপে অনুভব করিবার জন্য ইহা প্রয়োজনও বটে। কিন্তু কথাটার আর একটা দিকও ভাবিবার আছে—ভাবুক তাহা ভাবিয়া রাখিয়াছেন। একটা সহজ লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়া বলি,—আমার যে নামরূপ আছে, তাহা কই, জানিতে তো পারিতেছি না। আমার চক্ষু আছে, কিন্তু সে চোখ দিয়া আমার 'আমি'কে দেখিতে পাই না; আমার রসনা আছে, কিন্তু তাহা দিয়া আমার নাম আমি উচ্চারণ করি না। ভাবুক বলিতেছেন, অন্ততঃ আমার কাছে যে আমার নামরূপ নাই, ইহা তো সহজেই প্রমাণিত হইতেছে; প্রাকৃত জগতের এই সহজ ভাবটুকু ধরিয়াই অনায়াসে বলিতে পারি, আমি নামরূপবিবর্জ্জিত আত্মা। অবশ্য প্রাকৃত জগতে এই ভাব শুদ্ধ বজায় থাকে না; জগতের নামরূপের সঙ্গে আমার নামরূপও আমার কাছে ভাসিয়া উঠে, অতি উগ্র হইয়াই ভাসিয়া উঠে। কিন্তু ইহা যে স্বভাবতঃই মিথ্যা, প্রাকৃত জনের স্থূল দৃষ্টিতেও যে নিজের নামরূপ মিথ্যা, এই সহজ অনুভূতির দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আমার নামরূপ নাই, অথচ জগতের নামরূপ আছে—এই দুইটী বিরোধী তত্ত্বের সমাবেশে একটী রহস্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই রহস্যকে জ্ঞানের দিক হইতে ও ভাবের দিক হইতে দুই ভাবে দেখা হইতেছে। আমার নামরূপ নাই, এই কথা সিদ্ধ করিবার জন্য জ্ঞানী জগতের নামরূপ বর্জ্জন করিতে চাহিতেছেন, কেননা জগতের নামরূপও যে আমাতে প্রতিফলিত হইয়া আমাকে নামী ও রূপী করিয়া তোলে। ভাবুক কিন্তু ইহার বিপরীত দিক ধরিয়া বলিতেছেন, আমার বাহিরেও যে আর কাহারও নামরূপ রহিয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই আমি বলিতেছি, আমার নিজের নামরূপ নাই। আমার যে নামরূপ নাই, তাহা নিত্যকার ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই অতি সহজে প্রমাণিত হইতেছে। এই সহজ অনুভূতিকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্যই আমার সমর্পণের সাধনা। আমার নামরূপ যদি একান্ত হইয়াই আমার মাঝে জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সম্মুখে যে প্রিয়জন রহিয়াছে, তাহার নামরূপে তো আমার চিত্ত ভুলাইতে পারিবে না। তাহার নামরূপের সংস্পর্শে আমার মাঝে যদি নামরূপের আভাস জাগিয়া উঠে—আমি তাহারই আনন্দের জন্য উহা তাহার পায়ে সঁপিয়া দিব।—এই দুইটী দিক মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, জ্ঞানীতে আর ভাবুকে শুধু দৃষ্টির বিভিন্নতা মাত্র; লক্ষ্যের বিভিন্নতা নাই।

যাহাকে ভালবাসি, তাহার নামটী আমার প্রয়োজন, তাহার রূপটী আমার প্রয়োজন। আমার নামরূপ তাহার মাঝে তলাইয়া গিয়া শুধু অনুভবস্বরূপ মাত্র জাগিয়া থাক; কিন্তু এই অনুভবের সম্মুখে ফুটিয়া উঠুক তাহার হৃৎকর্ণরসায়ন নাম, তাহার নয়নবিমোহন রূপ। এই যে অনুভূতিতে শুধু নামরূপ জাগিয়া রহিল—এই তো অদ্বৈতের অনুভূতি, মিলনের পরমানন্দ। আমারও নামরূপ রহিয়াছে, তাহারও নামরূপ রহিয়াছে, এই দ্বৈত অনুভূতিতে মিলন পরিপূর্ণ হয় না। একটা অণুর বাহিরে যেমন আর একটা অণু পড়িয়া থাকে, অতি কাছাকাছি হইয়াও সূক্ষ্ম ব্যবধানে

বিরহের সন্তাপ জাগাইয়া রাখে,—এ-ও যেন তেমনি। কিন্তু আমার সব উপাধি গিয়া যখন তাহার সবই আমার হইয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই মিলনানন্দের অনন্ত তৃপ্তিতে জগৎ ভরিয়া উঠে। "আমি নাই—তুমি আছ, আমার হইয়া আছ"—এই তো ভাবুকের কথা। আমি নাই, অথচ "আমার" বুদ্ধি আছে; কাজেই বলি, এই আমি সদসতের সমাবেশে অনির্ব্বচনীয় আমি; এই আমি মায়া আমি; ইহার বুকে সত্য শুধু তুমি। একদিকে নাস্তি আর এক দিকে পরিপূর্ণ অস্তি; দুইয়ের সন্ধিতে রস উছলিয়া উঠিতেছে। ভাবুক অস্তির দিকে জোর দিতেছেন, জ্ঞানী জোর দিতেছেন নাস্তির দিকে। দুইয়েরই এক কথা। উভয়েরই পর্য্যবসান অদ্বৈত আনন্দে।

এই তো গেল নামরূপের তত্ত্ব। এখন নামের মহিমার কথা বলি। রূপের চেয়ে নাম গভীর, তাই ভাবের অভিব্যক্তিতে মহাজনেরা নামে রুচির কথাই বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেন। খুব স্থূলভাবে বিচার করিয়াই কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করি। প্রথমতঃই দেখিতে পাই, রূপ যেন বহিরঙ্গ, অনায়াসলভ্য, আমার নিরপেক্ষ হইয়াই তাহা আমার কাছে ফুটিয়া উঠে। রূপে আনন্দ নাই, সে কথা বলি না; রূপের পিপাসায় বিরহের বেদনা যে কত তীব্র হইয়া জাগিয়া ওঠে, তাহা কোন ভাবুক না অনুভব করিয়াছেন? কিন্তু তবুও বলিব, রূপের মাঝে দ্বৈতের ছায়াটাই যেন নিবিড়। রূপ বহিরঙ্গ বলিয়াই এমনটা হয়। যাহাকে ভালবাসি, তাহার রূপ বাড়াইয়া তুলিতে পারি, কিন্তু গড়িয়া তুলিতে পারি না। আমার অপেক্ষা না রাখিয়া তাহা যদি আমার চোখে বিজলী হানিয়া যায়, তবেই আমি সুখী! এই সুখ ভুঞ্জনের সুখ—ইহার মাঝে দ্বৈতভাব বড় প্রবল।

কিন্তু শুধু ভুঞ্জনের সুখে তো তৃপ্তি নাই—সৃষ্টির সুখও যে আমরা চাই। পরের সৃষ্টি ভোগ করিয়া কতটুকু স্ফূর্ত্তি, যদি নিজের সৃষ্টি তার সঙ্গে জড়িত না থাকে! নাম সেই সৃষ্টির মন্ত্র।—যাহাকে ভালবাসি, তাহার রূপটী তাহার নিজস্ব, কিন্তু তাহার নামটী আমারই অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি। তাহার রূপের অন্তরে চিত্তবেলায় ভাবের রেখা আঁকিয়া যায় বটে; কিন্তু আমার ভিতরটা যে কি অপরূপ রসে রাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিচয় দিই নামে। তাহার নাম সে রাখে নাই, আমারই অন্তরের ভাবের আমেয়া ছানিয়া তাহার এই ছন্দঃসুরময়ী মূর্ত্তিটী আমি গড়িয়াছি। আদর করি, সোহাগ করি, অভিমান করি—এই নামটী ধরিয়া; তাহারই মাঝে বিচিত্র সুর, বিচিত্র ঝঙ্কার, বিচিত্র মূর্চ্ছনা ঢালিয়া দিই। প্রেমের ছলনায় সোহাগকে দুটা মিষ্টি গালাগালিতে রূপান্তরিত করি,—তাও এই নামেরই সহায়ে। নাম ভাবুকের কল্পতরু; হৃদয় মন্থন করি উহা মিলিয়াছে। এ একেবারেই তাহার নিজস্ব বস্তু। তাই তাহা এমন অনির্ব্বচনীয়।

নাম রূপের মত স্থূল নয়—সূক্ষ্ম। নাম শুধু শব্দ নয়, নামী তাহার সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে। নামে রূপ তো জাগিয়া উঠেই, আরও কিছু জাগিয়া উঠে—যাহা চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু বুকের মাঝে বেদনার ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠে। যে যাহাই বলুক, আমি তো বুঝি, যাহাকে ভালবাসি, আকুল হৃদয়ের বাসনা দিয়া তাহাকে যদি না জড়াইয়া রাখিলাম, তবে ভালবাসার মাধুর্য্য রহিল

কোথায়? এই বাসনা স্থূলে অভিব্যক্ত হয় রূপে, আর তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানসী প্রতিমা হইল নাম। নাম আদি-সঙ্কল্প—নাম স্বয়ম্ভূ। ভাবের স্ফুরণ হৃদয়ের শূন্য ব্যোমতল বিদীর্ণ করিয়া তাহা আপনা হইতেই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। এই যে নামের প্রথম অভিব্যক্তি, এখানে আমি নাই। কোথা হইতে কেমন করিয়া ছন্দের আবির্ভাব হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাই বেদ বলেন, নামের প্রতিষ্ঠা পরমব্যোমে। কিন্তু এই নিত্য অভিব্যক্তির পর হইতেই 'আমির' সঙ্গে যুক্ত হইয়া নাম বিচিত্র ক্রমে স্ফুরিয়া উঠে—বিচিত্র সৃষ্টির মাধুরীতে বাসনার প্রেরণা সার্থক হয়। তখন হইতে বলিতে পারি—নাম যেন দ্বৈত ও অদ্বৈতের যুগল সম্মিলন। যাহাকে ভালবাসি, ভুঞ্জনসুখের আশায় নাম দিয়া তাহাকে যেমন মনের সম্মুখে পৃথক করিয়া ধরিতেছি, তেমনি আবার সৃষ্টির সাধনায় আপনার সাথে অনির্ব্বচনীয় অদ্বৈত রসে জড়িত বলিয়াও অনুভব করিতেছি।

নামকে যখন সৃষ্টি সঙ্কল্পের সূক্ষ্মরূপে দেখি, তখনই তাহার আর একটা বিভাব চোখে পড়ে। বলিয়াছি—সৃষ্টির ধারাটা আমার সঙ্কল্পের অনুগত, কিন্তু আরম্ভ তো আমার সঙ্কল্পের অধীন নয়। বাস্তবিক নামের প্রেরণা কোথা হইতে জাগিয়া উঠে, তাহা সুনিশ্চিতরূপে কেহ বলিতে পারে না। এই জন্যই নাম গুণে অভিব্যক্ত হইলেও মূলে গুণাতীত। এই খানেই ভাবের সঙ্গে নামের সম্পর্ক। ভাব যেমন নিত্যসিদ্ধ সত্তা, আবরণক্ষয়ে আবিষ্করণই তাহার উৎপত্তির নিদান, নামও তেমনি। এই নাম ভাবস্ফুরণের সহচর—ইহা কেবল মাত্র বর্ণসমষ্টি নয়। বর্ণ হইতে পৃথক বলিয়া ধারণা করিতে না পারিলে স্থূলের সংস্কার দূর হয় না। তাই নামকে সঙ্কল্পমূলা সৃষ্টিরূপে বুঝিতে চাহিতেছি। এইটুকু দ্বৈত আশ্রয় করিয়া। কিন্তু ইহার উপরেও কিছু আছে। সেইটুকু ধারণা করিতে না পারিলে নামের সঙ্গে ভাবের সম্পর্ক বুঝিতে পারিব না। সৃষ্টির অতীত আদি বাসনা বা আনন্দের প্রথম বাঞ্জনাই নাম। ভাব যেমন স্বয়ম্ভূ, এই নামও তেমনি স্বয়ম্ভূ। চিত্ত শুদ্ধ হইলে এই স্বয়ম্ভূ নাম আপনা হইতেই চিত্তে ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে। ইহা অনিদান, অতএব নিত্যবস্তু। ইহার প্রেরয়িতা নিত্যবস্তু বলিয়াই লোকবুদ্ধির অগোচর। তাই এ নাম "কোথায় ছিল, কে আনিল"—এই রহস্যের মীমাংসা হয় না। একদিন শ্রীরাধার কণ্ঠে চণ্ডীদাস এই নামোন্মাদ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—

"সই, কেবা শোনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

এই নাম অনির্ব্বচনীয় গুণাতীত বস্তু; কে শোনায়, কি ঝঙ্কারে গড়িয়া তোলে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। (ক্রমশঃ)



সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

—*—

[শব্দপ্রমাণ—বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য]

—*—

আপ্তবচন স্বতঃপ্রমাণ। [প্রমাণ দুইপ্রকার, স্বতঃপ্রমাণ ও পরতঃপ্রমাণ। বেদ পড়িলাম, তাহাতে আমার বেদার্থজ্ঞান হইল। এই অর্থজ্ঞান চিত্তের একটা বৃত্তি বা ঢেউ মাত্র। এই বৃত্তির মূলে রহিয়াছে বেদ। বেদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা রহিয়াছে বলিয়া এই বৃত্তি হইতে একটা নিশ্চয়াত্মক বোধ আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইল। ইহার পর বেদার্থজ্ঞানকে যদি প্রমা বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা এই নিশ্চয়াত্মক বোধের উপর নির্ভর করিয়াই করিব। কিন্তু এই বোধ স্বয়ম্ভূ পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি ছাড়া আর কোনও মাধ্যমিকের সহায়তায় তাহা উৎপন্ন নহে। ইহাকেই বলি স্বতঃপ্রামাণ্য। পরতঃপ্রামাণ্যের সঙ্গে পার্থক্য নিরূপণ করিলে এই সিদ্ধান্তটী আরও স্পষ্ট বোঝা যাইবে। প্রমাণ একটা চিত্তবৃত্তি বটে, কিন্তু যে কোনও প্রমানুকূল চিত্তবৃত্তিকেই আমরা প্রমাণ বলি না। প্রমাণেরও একটা পরীক্ষা হওয়া চাই। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগবশতঃ আমার জলজ্ঞান হইল। কিন্তু জ্ঞানটী হওয়ার পর আমার মধ্যে যে প্রবৃত্তি জাগিবে, উক্ত জল দ্বারা যদি তাহার সার্থকতা ঘটে, তবেই আমার কাছে জলের প্রামাণ্য। মরুভূমিতে মরীচিকায় জলভ্রম হয়। কেবলমাত্র দর্শনই যদি প্রমাণ হইত, তাহা হইলে সেখানে ভ্রান্তির অবকাশ থাকিত না। কিন্তু মরীচিকার জলকে ব্যবহারে খাটাইতে পারি না বলিয়াই বুঝিতে পারি, উহার প্রামাণ্য নাই—অথচ এদিকে আমার জলজ্ঞান হইয়াছিল। সুতরাং প্রমাণের শ্রেষ্ঠ যে প্রত্যক্ষ, তাহারও প্রামাণ্য স্বতঃ নির্দ্ধারিত হয় না। প্রত্যক্ষ যদি সংবাদিপ্রবৃত্তির প্রয়োজক হয়, তবেই তাহা প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে। যে প্রবৃত্তির অনুযায়ী কাজ করিলে কাজের সফলতা হয়, তাহাকে সংবাদিপ্রবৃত্তি বলে। এইরূপে দেখিতে পাই, প্রত্যক্ষ পরতঃপ্রমাণ, কেননা তাহারও সংবাদিপ্রবৃত্তির অপেক্ষা রাখিতে হয়। অনুমান তো প্রত্যক্ষেরই আশ্রিত। অন্যান্য উপযুক্ত বাক্যার্থজ্ঞানরূপ যে আপ্তবচন, তাহাও এইরূপে প্রত্যক্ষের অপেক্ষা রাখে, অথবা অনুমানের অপেক্ষা রাখে। শোনা কথা মাত্রেই বিশ্বাস করিতে পারি না। যে বলিয়াছে, তাহার মত নিজের প্রত্যক্ষ দিয়া যাচাই করিয়া লইবার ইচ্ছা হয়। অবশ্য বিশ্বাসের তারতম্যের উপর এই পরীক্ষাপ্রবৃত্তি নির্ভর করে। অন্ততঃ অনেক যুক্ত আপ্তবচন বেদের দোহাই দিয়া আমাদিগকে স্বীকার করাইতে হয়। ফল কথা, প্রত্যক্ষই হউক, অনুমানই হউক বা বেদভিন্ন আপ্তবচনই হউক—সকলকেই পরীক্ষা দিয়া প্রামাণ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। সুতরাং ইহারা সকলেই পরতঃপ্রমাণ।

[একমাত্র বেদকেই আমরা বলিতেছি স্বতঃপ্রমাণ। প্রথমতঃ বলিয়াছি, বেদ হইতে বেদার্থজ্ঞানরূপ যে চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হয়,

এবং তাহা হইতে যে বোধ উৎপন্ন হয়, স্বয়ং বেদই তাহার করণ। এইপ্রকার স্বকরণকবোধনিষ্ঠ প্রমার গ্রাহক বলিয়া বেদবচনকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়াছি। কিন্তু এই কথাটা খুবই স্থূল। যে কোনও বাক্যজাত চিত্তবৃত্তিকেই তো আমরা স্বকরণকবোধনিষ্ঠ প্রমার গ্রাহক বলিয়া ধরিয়া নিতে পারি; মাধ্যমিকের প্রয়োজন হয় না, আমার বিশ্বাসের জোরে। আসলে প্রামণ্য রহিয়াছে আমার হৃদয়ে; হৃদয় যাহাতে সায় দিতেছে, তাহাই আমার কাছে প্রমাণ হইবে। বেদ যদি প্রমাতৃনিরপেক্ষ কোনও অলৌকিক ধর্ম্মবশতঃ প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারিত, তাহা হইলে জগতে বেদবিরোধীর অস্তিত্বই থাকিত না। সুতরাং উপরিউক্ত যুক্তিতে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্থিরতর হয় না। যে কোনও বিশ্বাস্য বচনই তো বিশ্বাসীর নিকট এইরূপে স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে।

[এই জন্য বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্থাপন করিতে আরও যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যে কোনও বচনের স্বতঃপ্রামাণ্য বিশ্বাসীর নিকট প্রতিভাত হইতে পারে বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লৌকিক উপায়ে লৌকিক বাক্যের পরীক্ষা সম্ভবপর। সাধারণ কথা শুনিয়া মানিয়া লইতে পারি, আবার ইচ্ছা করিলে নিজেও যাচাই করিয়া দেখিতে পারি—এই পথটুকু তাহার মাঝে রহিয়াছে। কিন্তু বেদে এই ফাঁকটুকু নাই, তাহার কারণই এই যে, বেদ অলৌকিক তত্ত্বের উপদেশ করিতেছেন। লৌকিক বুদ্ধি যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানকার কথাই বেদ বুদ্ধির ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে বেদের বাক্যে প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথাও আসিয়া পড়িতেছে। যেমন বেদ বলিতেছেন, "তত্ত্বমসি"—তুমি ব্রহ্ম। প্রত্যক্ষ জীবত্বের অনুভূতি হইতেছে; কি করিয়া মানিয়া লই, আমি ব্রহ্ম। লৌকিক বুদ্ধির কাছে এই একটা বিরোধ। অথচ শুদ্ধ চিত্তে এ তত্ত্বের অনুভূতি হয়। কিন্তু বুদ্ধির এলাকায় নামাইয়া আনিতে গেলেই ভাষায় বিরোধ আসিয়া পড়ে। "ব্রহ্ম নির্গুণ অথচ সগুণ"—এটা বেদের তত্ত্ব; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধির কাছে ইহা হেঁয়ালী।

[বেদে এই সমস্ত অলৌকিক তত্ত্ব আছে। লৌকিক উপায়ে ইহাদের যাচাই করা চলে না। এই জন্য বেদবচন সাধারণ বচনের মত নয়। তুমি যদি তাহাকে অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে আমার এমন ক্ষমতা নাই যে তোমার কাছে তাহার সত্যতা প্রমাণ করিব। কেননা সত্যতা প্রমাণ শুধু মুখের কথায় বা জড়চক্ষুর দেখায় তো হইবে না। বেদাচার গ্রহণ করিয়া বেদের অনুশাসন মানিয়া চলিলে তোমার বুদ্ধি ক্রমশঃ পরিশুদ্ধ হইয়া বৈদিক তত্ত্ব ধারণার উপযোগী হইবে। তখন লোকবিরুদ্ধ বেদবচনের মাঝেই সত্যের ইঙ্গিত পাইবে। কিন্তু এতখানি সবুর করা হয়ত তোমার পক্ষে রুচিকর হইবে না। সুতরাং বেদ তোমার কাছে ততদিন অপ্রমাণই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু রহস্য এই, বেদাচার পালন করিয়া যদি কোনও দিন বেদানুকূল বুদ্ধি জন্মায়, তখন আর দ্বিধা না করিয়া বেদকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়াই গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে। অলৌকিক জগতের আভাস পাইয়া সেই দিন বুঝিবে, লৌকিক বুদ্ধি দিয়া বেদার্থ যাচাই করা চলে না, প্রয়োজনও নাই। বেদজ্ঞানের একটা ধারা আছে;

একবার তাহাতে অবগাহিত হইতে পারিলে দিনে দিনে বেদার্থ স্বতঃপ্রমাণ হইয়া চিত্তে ফুটিয়া উঠিবে। জগতের চরমতত্ত্ব সম্বন্ধেও এই একই কথা।—তর্ক দিয়া তাহাদিগকে প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু তর্কাতীত বোধি দ্বারা অনুভব করা যায়। বেদকে সাধন-সঙ্কেতরূপে গ্রহণ করিয়াই এই কথা বলিতেছি। নতুবা লৌকিকবুদ্ধিগৃহীত কতকগুলি শব্দসমষ্টিকে স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্থাপন করিবার দুরাগ্রহ যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদের তর্ক সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইবে, কিন্তু তথাপি তাহার শৈথিল্য দূর হইবে না। ভারতবর্ষে একদিন শুধু তর্কের জোরে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য স্থাপনের চেষ্টা প্রবলরূপেই চলিয়াছিল। এই সমস্ত চেষ্টার মাঝে যে কতখানি স্বতোবিরোধ রহিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন। সেই কথা স্মরণ করিয়াই বলিতেছি, বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সাধনার দিক হইতে নিরূপিত হইবে, বালাগ্রশতধাবিদারণে ব্যস্ত পাণ্ডিত্যবুদ্ধির দ্বারা নয়।

[আবারও বলিতেছি, আপ্তবচনের স্বতঃপ্রামাণ্য নির্ভর করে বিশ্বাসের উপর, শ্রদ্ধার উপর। এই শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধি। সাধন দ্বারা ইহাকে আয়ত্ত করিতে হয়। বেদান্তের সাধন সম্পত্তির মাঝে ইহার উল্লেখ আছে—সেখানে লক্ষণ করা হইয়াছে—শ্রদ্ধা "গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ।" গুরুবচন ও বেদবচন একই। সমস্ত আপ্তবচনের প্রামাণ্য ওই একটী বস্তুর সঙ্গে অন্বিত—বিশ্বাস। যেমন নাকি ইন্দ্রিয়দোষ থাকিলে প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ হইয়া যায়, হেতুর দোষে অনুমান বিফল হইয়া যায়, তেমনি চিত্তদুষ্টিতে, বিশ্বাসের অভাবে আপ্তবচনের স্বতঃপ্রামাণ্যও ব্যাহত হইয়া যায়। পরিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত চিত্তে আপ্তবচনের ক্রিয়া ইন্দ্রজালবৎ—সেখানে শ্রবণজ জ্ঞান পলকের মধ্যে অপরোক্ষানুভূতিতে পরিণত হয়। শ্রবণ ও জ্ঞান এইরূপ অব্যবহিত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে বেদান্তভাষ্যে বিস্তর প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। কিন্তু অধিকারিবাদ না বুঝিলে সে সমস্ত যুক্তির মর্ম্মগ্রহ হওয়া সম্ভবপর নয়। আপ্তবচনের এই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদের উপরই আর্য্যসাধনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এইখানেই ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় রহস্যবাদের (Mysticism) সূচনা—এইখানেই গুরুবাদের প্রতিষ্ঠা। বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে বলিয়া এখানে ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।]

বেদের অপৌরুষেয়তা

আপ্তশ্রুতি অপৌরুষেয় বেদবাক্যজনিত বলিয়া উহা সর্ব্ববিধ দোষের আশঙ্কা হইতে মুক্ত। এই জন্যই উহা "যুক্ত।" এইরূপে বেদমূলক স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণবাক্য হইতে জনিত যে জ্ঞান, তাহাও যুক্ত হইয়া থাকে।

[বেদের প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য—এইখানে অপৌরুষেয়বাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার যুক্তি এই—বেদ যদি মানুষের রচা কথা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি সকলের বিশ্বাস নাও হইতে পারে। কেননা মানুষের কথায় বহু দোষ। মানুষ না জানিয়া কথা বলিতে পারে, মিথ্যা বলিতে পারে, কোনও মতলব সিদ্ধি করিবার জন্য বলিতে পারে। বেদ যদি মানুষের কথা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত দোষ তো তাহার মাঝে থাকাও সম্ভব। এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলা হইতেছে—বেদ অপৌরুষেয়, উহা কাহারও রচনা নয়। বেদের স্রষ্টার কথাই আমরা

শুনি, কর্ত্তার কথা তো শুনি না। বিপক্ষবাদীরা বলিবেন, বেদের এক অংশের নাম কাঠক, এক অংশের নাম কৌথুম ইত্যাদি; পুরুষবিশেষের রচনা বলিয়াই তো এই নাম। তাহা ছাড়া, প্রাবাহণি (প্রবাহণ পুত্র) বর্ব্বর, ঔদ্দালকি (উদ্দালকপুত্র) কুসুবিন্দ ইত্যাদি পুরুষের উল্লেখও বেদের মাঝে আছে। ইহাদের জন্মমরণ হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের জন্মের পূর্ব্বে বেদের ওই অংশ তো ছিল না বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাহা হইলে বেদের আদি আছে; অতএব উহা পৌরুষেয়। তার পর বেদের কোথায় কোথায়ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ্য বাক্য আছে—যেমন গরুতে এই যজ্ঞ করিয়াছিল ইত্যাদি। ইহাতেও তো বেদের প্রামাণ্য থাকে না।

[এই আপত্তির বিরুদ্ধে প্রাচীনেরা উত্তর দিলেন—শব্দ নিত্য, পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি। শব্দ নিত্য হইলে বেদও নিত্য; সুতরাং অপৌরুষেয়। এই এক কথা। কাঠক, কৌথুম ইত্যাদি নাম প্রবচন সম্পর্কে হইয়াছে; প্রবচন বলিতে প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন বুঝিব।' কঠ, কুথুম উক্ত বেদাংশের অধ্যেতা, রচয়িতা নহেন। বর্ব্বর প্রাবাহণি ইত্যাদি কোনও মানুষের নাম নয়; বর্ বর্ শব্দ করেন বলিয়া বায়ুকে বর্ব্বর বলা হইতেছে; প্রাবাহণি শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট গতির আশ্রয় ইত্যাদি। যাহাকে অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলা হইতেছে, তাহা যজ্ঞাদিকর্ম্মের স্তুতিবাচক মাত্র।—জৈমিনি মীমাংসাসূত্রে অপৌরুষেয়বাদের মোটামুটী এইরূপ আপত্তি ও উত্তর দিয়াছেন। ইহার বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। যাহার যেমন রুচি, তিনি তেমনি ইহা গ্রহণ করিতে পারেন। তবে এইটুকু দেখিতেছি, বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিবার জেদে কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও ইহারা কুণ্ঠিত হয় নাই। অন্যান্য যুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, শব্দনিত্যত্ববাদও সমস্ত দার্শনিক সমানভাবে গ্রহণ করেন নাই।

—✻—

আরণ্যক

—✻—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

— ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৯।৩

দশের তুলনায় তুমি যতই দীন হও না কেন, একমাত্র ধর্ম্মের কাছে তুমি সকলেরই সমান অধিকার লাভ করিতে পার। ধনদৌলতই বল আর জাতি কুল মানই বল, সংসারক্ষেত্রেই তাহাদের যত কিছু প্রভুত্ব এবং অধিকার। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, সত্যের পথে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রেরও অধিকার পার্থিব কোনও কৃত্রিম শাসনের দ্বারা সঙ্কীর্ণ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়া মানুষের আমিত্বকে যতই খণ্ডিত কর না কেন, সত্যের পথে তাহার জন্য তুমি কোনও বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না—সেখানে মানুষের অনন্ত অধিকার এবং পূর্ণ স্বাধীনতা।

✻

জীবনের লক্ষ্য আগে স্থির কর, প্রাণের মাঝে তাহার সহজ সরল মূর্ত্তিটীকে সজীবতায় পূর্ণ করিয়া গড়িয়া লও এবং তারই অনুপ্রেরণায় কর্ম্মের পথ বাহিয়া জীবনের গৌরব-

মর সার্থকতার অনুসন্ধানে অগ্রসর হও; দেখিবে, বিশ্ববিধাতার এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তোমার মরণের অন্ধকার দূর করিয়া মুক্তির পথ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রাণের ভিতর প্রাণের ঠাকুরকে জাগাইয়া তোল—তাঁরই চরণতলে আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার নিজকে মুক্ত করিয়া লও; দেখিবে, তোমার চিরপোষিত প্রাণভরা বিশ্বাসের বিপুল চেষ্টা এক তিলও ব্যর্থ হইয়া যাইবে না। এই হইল তোমার জীবনের আরম্ভ।

*

কর্ম্মের মাঝে অপূর্ণতা থাকিতে পারে—কেননা তাহাকে নানা বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধাবিঘ্নের নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার বুকের মধ্যে থাকিয়া যায়, তাই নিয়া আমরা অনেক কষ্টভোগ করি। কিন্তু কর্ম্ম যেখানে লক্ষ্যহীন চঞ্চল হৃদয়ের প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ নয়, অথবা কর্ম্ম যেখানে সাংসারিক প্রয়োজন সাধনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া না দাঁড়ায়, সেখানে তাহার কোনও অপূর্ণতা আমাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না। কর্ম্মের আরম্ভ অপেক্ষা তাহার ফলটাকে বড় করিয়া না দেখিয়া অন্তরের প্রেরণা দিয়া তাহাকে গ্রহণ করিলে সে কর্ম্মের অপূর্ণতা আমাদের অন্তরে একটা সজীব চেষ্টা আনিয়া দিতে পারে; তখন যত সব বাধাবিপত্তি আমাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা সম্পাদন করিবে বই কর্ম্ম পণ্ড করিবে না।

*

কল্পনাকে আশ্রয় করে সত্য দাঁড়াতে পারে না। তুমি যাঁর পূজা করবে, তাঁর সর্ব্বজ্ঞতায় তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। সত্য বিশ্বাস উপাসনার মূল ভিত্তি। যেখানে অন্তরের বিশ্বাস শিথিল, সেখানে উপাসনার ভাবও শিথিল। স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে বুঝে নিতে হবে যে, তিনি একটা অখণ্ড শক্তিমাত্র নহেন, তিনি একাধারে সৎ এবং চিন্ময় পুরুষ—আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে তাঁর ওতপ্রোত সম্বন্ধ রয়েছে; তাঁর মঙ্গল বিধি আমাদের জীবনের প্রতি স্পন্দনে চেতনা সঞ্চার করছে;—এই ধ্রুব বিশ্বাস নিয়ে তুমি তাঁর কাছে দাঁড়াতে পার, নতুবা কল্পনার ছায়ালোকে তাঁর দেখা মিলে না।

*

যারা দীনহীন কাঙ্গাল, ভবের বৈভব যাদের নাই—তাদেরও দুঃখের কোনও কারণ দেখি না। ভগবান যে তাহাদিগকে ধনৈশ্বর্য্যের মোহে মোহিত করেন না, এটা তাদের পক্ষে একটা খুবই বড় সম্পদ বল্‌তে হবে। তাই বলি, যাঁরা স্বদেশের প্রকৃত সেবক, তাঁরা ভবের ধন দিয়ে দেশের সেবা না করে যে ধনের জন্য রাজার ছেলে কাঙ্গাল সাজে, সেই জ্ঞান দিয়ে দেশের দুঃখ দূর করুন। জ্ঞানের চর্চ্চা করলে স্বরাজ না মিললেও স্বারাজ্য মিলবে।

*

যা দেখছ, তা তোমারই হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি—যা শুনছ, তা তোমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি। এই একই জগৎ একজনের কাছে মধুময়, আর একজনের কাছে বিষময় ঠেকে কেন? এর কারণ হচ্ছে, যে যেমন চিন্তা করে, সে তেমন ফল পায়। তোমার নিজের মুখভাব যেমন হবে, দর্পণে সেইরূপই প্রতিচ্ছবি দেখবে, যেমন কথা বলবে, তেমনি প্রতিধ্বনি শুনবে। কাজেই সংসার সুখময় করে তুলতে হলে সংসারের সব জিনিষকে ভাল করতে চেষ্টা না করে নিজের অন্তরকে শুদ্ধ দেবভাবাপন্ন

করতে চেষ্টা কর, দেখবে, জগৎ উল্টে গেছে—সব ভাগ হয়েছে। তখন তুমিও প্রাচীন ঋষির সুরে সুর মিলিয়ে বলবে—

"ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ॥"

*

আজকাল জগতে সাম্যের ঢেউ বইছে—সবাই সাম্যপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সাম্যের ইতিহাস কোথায়, তার খবর রাখেন অল্প লোকেই। জগতের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে আগে মানুষের অন্তরকে বেদান্তজ্ঞানের পূত মন্দাকিনীবারিতে অভিষিক্ত করে নিতে হবে; তবে সেই পবিত্র হৃদয়ে বৈষম্য বিদূরিত হয়ে সাম্যের স্থান হবে। বেদান্ত সাম্যের বিজ্ঞান—এতে জগতের ভেদজ্ঞান নিরাকরণের চরম মীমাংসা হয়ে গেছে। মানুষের অন্তর বেদান্তজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে সমস্ত কুসংস্কার দূরে যাবে—সকল দ্বন্দ্ব একাকার হয়ে যাবে। তখনই সাম্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত হব—প্রাণে প্রাণে বলতে পারব, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এর আগে আস্ফালনই সার।

*

স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে, স্ব অর্থাৎ নিজের স্বরূপের অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্মের অধীনতা। পরাধীনতার অর্থ শত্রুর অধীনতা—কামক্রোধাদি রিপুনিচয়ের বশবর্ত্তী হওয়া। ষড়্‌রিপু জয় করে যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই স্বাধীন, আর সকলে পরাধীন। যেদিন তিন গুণের ঊর্দ্ধে উঠে উচ্চকণ্ঠে বলতে পারবে "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ"—সেই দিন তুমি স্বাধীনতা পাবে—দেখবে দেশ দেশান্তরে, লোক লোকান্তরে তোমার রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে—তুমি চিরমুক্ত, চিরস্বাধীন—কে তোমায় বেঁধে রাখতে পারে ভাই? তখন যারা একটা ক্ষুদ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তাদের দেখে হাসবে তুমি।

*

আত্মজ্ঞানবিমূঢ় হয়ে যখন আমরা বলি, "আমরা জীবিত", বাস্তবিক কিন্তু তখন আমরা আত্মঘাতী—মৃত। আর যখন সংসারজ্ঞান বিমূঢ় হয়ে নিজ হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি, তখনই বাস্তবিক আমরা বেঁচে উঠি—নব জীবন লাভ করি। তাই জ্ঞানীরা বলেন, যদি বাঁচতে চাও—আত্মোদ্ধার করতে ইচ্ছা কর—তবে এই ইন্দ্রিয় সুখভোগপরায়ণ জীবনটাকে মেরে ফেল—নূতন প্রাণ পাবে, নব বলে হৃদয় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে।

*

নিজের ঘট যদি অভিমান দিয়াই পূর্ণ করিয়া রাখি, তবে আর তাঁর কৃপাবারির স্থান কোথায় রহিল? যে যতখানি নিজের ভিতর খালি করিতে পারিয়াছে, তার মধ্যে তাঁর কৃপা ততখানি স্থান লাভ করিতেছে। আর অভিমানপূর্ণ পাত্রের উপর তাঁর কৃপাবারি নির্ঝরের মত স্বতঃই অজস্রধারে পড়িয়াও স্থান না পাইয়া উপচিয়া পড়িতেছে। কাজেই তাঁর সে কৃপাধারণ করিয়া রাখিবার আধার নাই। আপনার প্রতি মমতা দেখাইতেছি, সর্ব্বোপরি—তিনি আমাকে মোটেই কৃপা করেন না, আমি আমার বুদ্ধির জোরে চলি, এই অভিমানে আচ্ছন্ন হইতেছি। এগুলি তো কিছুতেই যাইতেছে না। তাই চাই আঘাত। প্রাণ বলুক—

নিঠুর হে, এই করেছ ভালো—
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।

*

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রমসংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামেই অবস্থিতি করিতেছেন। বর্ত্তমান মাসের শেষভাগে তিনি মঠাভিমুখে যাত্রা করিবেন। পথিমধ্যে মেদিনীপুর, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীহট্টের পথে অত্রত্য মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মাসের শেষে কিম্বা শ্রাবণের প্রথমে তিনি মঠে উপস্থিত হইবেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রাবণ মাসে মঠে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

জন্মমহোৎসব

আগামী ১৯শে শ্রাবণ মঙ্গলবার ঝুলন-পূর্ণিমা তিথিতে আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠাধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু, ভক্ত ও আর্য্য-দর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত মহোৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। উক্ত দিবসে সারস্বতমঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমের বগুড়াস্থিত শাখাশ্রমেও জন্মতিথি মহোৎসব ও সপ্তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত তিথিতে ঢাকা জয়দেবপুরস্থ ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমেও শ্রীমৎ পরমহংসদেবের জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। উভয় আশ্রমের সেবকবৃন্দ সকলকে উৎসবে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

গ্রন্থপরিচয়

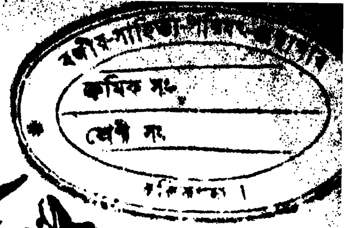
হিন্দুধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাস গুপ্ত প্রণীত ও বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রম হইতে ব্রহ্মচারী দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গ্রন্থকার সরল ভাষায় ধর্ম্মের স্বরূপ, স্বধর্ম-নিষ্ঠার গৌরব ও হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বসমন্বয়ী ঔদার্য্যের বিষয় সুন্দররূপে প্রকটিত করিয়াছেন। পুস্তিকাখানি যুগোপযোগী ভাবের বাহন, সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ্য-দায়িত্ব—সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের ৮ম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণ। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মকর্ত্তৃক কাশীধাম, ব্রাহ্মণরক্ষা সভার আনুকূল্যে মহামণ্ডল যন্ত্র হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০।

পুস্তকখানিতে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অধঃপতিত অবস্থায় কি কি সদুপায় অবলম্বন করিলে প্রত্যেক ব্রাহ্মণপরিবার স্বীয় ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তদনুকূল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য লাভ করতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ এই সকল উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য এবং পরিচালননীতি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলে লুপ্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।

সদ্‌গুরু ও রাজযোগ—শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস বি এ প্রণীত। মূল্য ১।০। শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, তামাকুমুণ্ডী, চট্টগ্রাম।—এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

একমাত্র সদ্‌গুরুর উপদেশে বিচারমূলক জ্ঞানের প্রথম সোপানগুলি আশ্রয় করিয়া জিজ্ঞাসু কিরূপে নিজকে নির্ব্বিষয়চিত্ত করতঃ ভেদবিকাররহিত সেই অনাদি পরম তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, উক্ত গ্রন্থে তাহাই সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি কথঞ্চিৎ দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ হইলেও গ্রন্থকার সরল ভাষায় সাধারণ তত্ত্বান্বেষীদের বুঝিবার পক্ষে সহজ করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির আদরণীয়।



ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)



১৮শ বর্ষ } শ্রাবণ { ৪র্থ সংখ্যা



ত্রয়ী

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—২।৪।৯]

অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তমম্ব নস্কৃধি॥

ত্বে বিশ্বা সরস্বতি শ্রিতায়ূংষি দেব্যাম্।
শুনহোত্রেষু মৎস্ব প্রজাং দেবি দিদিড্‌ঢি নঃ॥

ইমা ব্রহ্ম সরস্বতি জুষস্ব বাজিনীবতি।
যা তে মন্ম গৃৎসমদা ঋতাবরি
প্রিয়া দেবেষু জুহ্বতি॥

প্রেতাং যজ্ঞস্য শম্ভুবা যুবামিদা বৃণীমহে।
অগ্নিং চ হব্যবাহনম্॥

দ্যাবা নঃ পৃথিবী ইমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম্।
যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতাম্॥

আ বামুপস্থমদ্রুহা দেবা সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ।
ইহাদ্য সোমপীতয়ে।

সরস্বতী নদীরাণী, তুমি দেবীতমা—
ওগো মায়ি. স্নেহময়ী কেবা তব সমা?
দেখ মাগো, আছি পড়ে, যেন দীনহীন—
চাও ফিরে, আমাদেরে কর অমলিন।

উজলিছ চিত্ত মম রূপের ছটায়,
বিশ্বের সম্পদ্ যত লোটে তব পায়;—
শুনহোত্র-গোত্রীয়ের পিও সোমরস;—
দিও দেবি পুত্রধন, লভিও হরষ।

অন্নপূর্ণা তুমি মাগো—কি আছে আমার?
আনিয়াছি হব্য এই—ধর উপহার।
তুমি সত্য;—গৃৎসমদ ঋষিদের কর অঙ্গীকার—
সুরভোগ্য তব যোগ্য এনেছে যে হব্য-উপচার।

এস যজ্ঞে সুমঙ্গলা, তোমাদের করি আবাহন—
এস অগ্নি, হব্যের বাহন।

হে রোদসী, দ্যুলোকসঞ্চারী সিদ্ধ যজ্ঞ-আয়োজন—
নিয়ে চল দেবের সদন।

যজ্ঞভাগী দেবগণ অরিহীন তোমাদের পাশে—
বসিবেন সোমপান আশে।

—————*—————

কর্ম্ম ও অকর্ম্ম

—*—

সাধন ভিন্ন সিদ্ধি লাভ হয় না। সিদ্ধি বলিতে বুঝি, জ্ঞান ও প্রেম—সাধন বলিতে বুঝি কর্ম্ম। জ্ঞান ও প্রেম নিত্যসিদ্ধ নির্ব্বিকার বস্তু; কর্ম্ম অনিত্য ও চঞ্চল। আমাদের জীবন চঞ্চল, অতএব কর্ম্মময়; কিন্তু উহা একটা স্থির বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে; আমাদের এই চঞ্চল কর্ম্মরূপের পিছনেও আত্মা শুদ্ধ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ছুটাছুটী জীবজগতের ধর্ম্ম বটে, কিন্তু সকলেই বিশ্রাম চায়, ইহাও স্বাভাবিক। অনবরত ছুটাছুটীতে বিরক্ত হইয়া অনন্ত বিশ্রামও কেহ কেহ চায়। এই বিশ্রাম মিলুক আর না মিলুক, আশার মোহন স্বপ্নরূপে ইহা আমাদের মন ভুলাইয়া রাখিয়াছে। আমরা ইহাকেই বলি মুক্তি। কি হইতে মুক্তি?—চঞ্চলতা হইতে, নিরানন্দ হইতে, সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্তি। কিন্তু কর্ম্ম ছাড়া মুক্তির উপায় কেহ কোথায়ও নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। কেননা একটা স্থির বিন্দুকে লক্ষ্য করিয়া মনের মাঝে তাহার স্থৈর্য্যের রূপটী আঁচিয়া রাখিতে পারি, মনে করিতে পারি, ওই বিন্দুতে পৌঁছিলেই চলার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব;—কিন্তু তাহা হইলেও চলিতে হইবে তো? না চলিয়া বসিয়া থাকিলেই তো আমাতে আর ধ্রুব বিন্দুতে যে ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা ঘুচিয়া যাইবে না। চলার বিরাম ঘটাইবার জন্য অচলে পৌঁছিতে হইলেই চলার প্রয়োজন। অর্থাৎ কর্ম্মচঞ্চলতা হইতে মুক্তি পাইতে হইলেই কর্ম্ম প্রয়োজন।

কোনও কোনও দার্শনিক এই কর্ম্মের সঙ্গে মুক্তির একান্ত বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্লেষণ বুদ্ধি দিয়া দেখিলে তাই মনে হইবে বটে। মুক্তির স্বরূপ জ্ঞান বা প্রেম—উহা নির্ব্বিকার, নিশ্চল কর্ম্মবিরতির অবস্থা। কর্ম্ম চঞ্চল, বিকারী, খণ্ডিত। সুতরাং কর্ম্মে ও মুক্তিতে অনুভূতির দুইটী বিপরীত প্রান্তই প্রকাশ পাইতেছে। বিশ্লেষণবাদীর ইহাই মত। কিন্তু এই মত যে বুদ্ধি দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, সে বুদ্ধি কিন্তু চরম লক্ষ্যকে বেড়িয়া পায় নাই। না পাওয়ারই কথা; কেননা তাহার লক্ষ্যই এই যে, সে নিজের অতীত একটা কোনও বস্তুর সন্ধান আনিয়া দিবে। কিন্তু মানুষ যেমন নিজের ছায়া হইতে নিজকে বিযুক্ত করিতে পারে না, বুদ্ধিও তেমনি বুদ্ধির সংস্কার হইতে নিজকে বিযুক্ত করিতে পারে না। কর্ম্মতত্ত্ব বুদ্ধির এলাকায়; কিন্তু কর্ম্মাতীত অবস্থা বুদ্ধির সীমানার বাইরে। এখানে অপরোক্ষ অনুভূতির দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে পারি, বুদ্ধির কাছে কর্ম্ম অস্তি-বাচক, এবং কর্ম্মাতীত মুক্তি নাস্তি-বাচক। কিন্তু নিজের অতিরিক্ত সত্তাকে নিজের শক্তি দিয়াই প্রমাণ করিবে, এই দুরাগ্রহে বুদ্ধি নাস্তি-বাচক কর্ম্মাতীত অবস্থাকেই অস্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, এবং বাস্তবিক যাহা তাহার কাছে অস্তিবাচক ছিল, প্রকারান্তরে তাহার নাস্তিত্বই প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছে। বুদ্ধির এই বিপর্য্যয় পুরুষার্থ হইতে পারে, কিন্তু উহা স্বরূপতঃ বুদ্ধির গ্রাহ্য হইতে পারে না—সুতরাং আমাদের সাধনরাজ্যের অন্তর্ভুক্তও হইতে পারে না।

এই জন্য পরবর্ত্তী যুগে কর্ম্ম ও মুক্তির মাঝে স্বতোবিরোধের কল্পনাকে সংশোধন করা প্রয়োজন হইয়াছে। কর্ম্মও যে মুক্তির রসধারাই সঞ্জীবিত, এই ধারণা না থাকিলে সাধন সম্ভবপর হয় না। গাছের ফলটাকে গাছ হইতে পৃথক করিয়া একান্তভাবে দেখা এবং গাছ ও ফলের মাঝে বিরোধটাকেই বড় করিয়া দেখা সম্যকদৃষ্টির কাজ নয়। ফলটা যে গাছ নয়, তাহা তো স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি ; এটুকু হইল স্থাবর বুদ্ধির কাজ। আবার গাছের প্রাণশক্তিই যে ফলে রূপান্তরিত হইয়াছে, গাছের রসই যে ফলের রসে পরিপাক পাইয়াছে—এইটুকু দেখা হইল জঙ্গম বুদ্ধির কাজ। জগতে থাকিতে হইলে আমাদিগকে স্থাণু হইলে চলিবে না বা বুদ্ধিকে স্থাণু করিয়া রাখিলেই চলিবে না। স্থাবরত্ব ও জঙ্গমত্ব, উভয় ধর্ম্মই জগতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের স্বভাবের বিকাশ জঙ্গমত্বে। আমাদের প্রাণের স্ফুরণই ইহার সাক্ষী। যেখানে প্রাণের স্পন্দন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেইখানেই স্থাণুত্ব লাভ হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিভাষায় আমরা উহাকে বলি মৃত্যু ; মৃত্যু আমাদের কাম্য কখনই নয়।

কিন্তু জগতে স্থাণুত্ব যে কোথায়ও নাই—এ কথা বলিতেছি না। স্থাবরত্ব ও জঙ্গমত্বের যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, উহাদের বিপর্য্যয় ঘটিলেই অকল্যাণ। প্রকৃতির যে রূপ বাহিরে অভিব্যক্ত হইতে দেখিতেছি—উহা জঙ্গম। উহাকে স্থাবর করিতে চেষ্টা করিলে প্রাকৃতিক মৃত্যু অনিবার্য্য। অথচ এই জঙ্গমপ্রকৃতিরও একটী নিশ্চল অন্তরঙ্গ রূপ আছে—উহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকিলেও আধ্যাত্মিক মৃত্যু অনিবার্য্য। ভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি স্বভাবতঃই জঙ্গম। স্বভাবের বিরুদ্ধে ইহাদিগকে রোধ করিতে গেলে ফল কিছুই হইবে না—উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে অন্ধতমঃ প্রবেশ করিতে হইবে মাত্র। গীতায় ভগবান যে বলিয়াছেন, "অকর্ম্মে যেন তোমার আসক্তি না হয়"—তাহা এই বিপদেরই আশঙ্কা করিয়া। দেহ, মন, প্রাণ ইত্যাদির মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিণাম দেখিতেছি। এই নিয়ত পরিণামই উহাদের ধর্ম্ম, সুতরাং উহা অমঙ্গলের নিদান নহে। কিন্তু এই পরিণামের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতেছি, দুইটী বস্তু অন্বিত রহিয়াছে—একটী প্রকাশ, আর একটী আনন্দ। প্রত্যেকটী পরিণামের রেখায় রেখায় প্রকাশের আলো ফুটিয়া উঠিতেছে এবং একটী বেদনাময় অনুভূতিতে উহা অর্থযুক্ত হইতেছে। এই যে প্রকাশ ও আনন্দ, উহা স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার—একরস ; বিষয়ের বিকার আছে, এবং সময় সময় সেই বিকার বিষয়ীতে উপচরিত হইয়া বিকারের ভ্রান্তি ঘটাইতেছে বটে, কিন্তু সমস্ত বিকারের উর্দ্ধে প্রকাশ ও আনন্দ যে অব্যাহত থাকিতেছে, সমাহিত চিত্তে দৃষ্টিকে অন্তরাবর্ত্তিত করিলেই তাহা আমরা স্পষ্ট অনুভব করি। সমস্ত বাহ্যব্যাপার হইতে নিরপেক্ষ হইয়া এইখানেই আমাদের প্রকৃতির স্থাণুত্ব গুহাহিত হইয়া রহিয়াছে। জঙ্গমকে বাহিরে অভিব্যক্ত ও অব্যাহত রাখিয়া অন্তরের স্থাণুত্বে দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখা অমরত্বের সাধনা।

কর্ম্মযোগ এই কথাটাই বুঝাইতে চাহিতেছে। জগতে গতি আছে, স্পন্দন আছে—তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে। আবার নিশ্চল নির্ব্বিকার স্থিতিও আছে, তাহাকেও

স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই স্থিতিলাভ সম্বন্ধেও আমাদের একটা কথা আছে। স্থিতি বলিতে যে কি বুঝিব, তাহা কিন্তু আমরা বুঝিতেই পারি না। স্থিতিতে পৌঁছাইলে কি সমস্ত গতির অবসান হইবে? যদি হয়, তবে কাহার গতির অবসান হইবে? এখানে দেখিতেছি, আমার দেহ, প্রাণ, মন সব চলিষ্ণু। এই চলিষ্ণু বস্তুগুলির সমবায়ে আমি গঠিত, এইরূপই অনুভব হইতেছে। দেহ-মন-প্রাণের অতিরিক্ত চলিষ্ণুতায় কখনও কখনও আমার উদ্বেগ ও শ্রান্তি আসিতেছে—আমি তখন স্থিতিতে বিশ্রাম লাভ করিতে চাহিতেছি। কিন্তু এই স্থিতি কাহাকে লইয়া? দেহ-মন-প্রাণকে লইয়া কি? চলার বেগে পরিশ্রান্ত হইয়া সুষুপ্তিতে ঢলিয়া পড়ি। দেহ, মন, প্রাণের কোনও ক্রিয়া তখন উপলব্ধি করি না। আনন্দও যে না পাই, তাহা নহে—যদিও সে আনন্দ খুব নিবিড় ও নির্ম্মল বলিয়া মনে হয় না। দেহ-মন-প্রাণের এইরূপ স্থিতিকেই কি মুক্তি বলিব? ইহাই কি কর্ম্ম-বিরতির লক্ষণ হইবে? আমরা হয়ত সাংখ্য শুনিয়াছি, তাই বলিয়া উঠিব, না, ও রকম স্থিতি তো আমরা চাহি না; ও যে ঘোরতর তমঃ। কিন্তু আসলে ওটা শোনা কথা। মুক্তি বা পরমা স্থিতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক সময় সুষুপ্তি বা শূন্যাবস্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না।

কেন এমন হয়, তাহার একটা কারণ আছে। দেহ-মন-প্রাণ জঙ্গম—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা জানি আর না জানি, সর্ব্বদাই ইহাদের ক্রিয়া চলিতেছে। বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থায় আছি, সেখানে দেহ-মন-প্রাণের অতিরিক্ত কোনও সত্তার অনুভূতি আমাদের মাঝে স্পষ্ট হইয়া জাগে না। এই দেহ মন বুদ্ধির সংস্কার জড়িত আমির পক্ষে জঙ্গমতাই হইতেছে ধর্ম্ম। কিন্তু যখন স্থাণুত্বের ধারণা করিতে যাই, তখন ইহাদের সংস্কার কাটাইয়া উঠিতে পারি না—দেহ-মন বুদ্ধিবিশিষ্ট যে আমি, সেই আমিরই স্থাণুত্ব কল্পনা করিয়া বসি। ইহাতে দেহাদির জঙ্গম-ধর্ম্ম আমার কাছে আপাততঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়—স্থাণুত্ব তাহাদের উপর অধ্যস্ত হয় মাত্র। ফলে এই হয়, প্রকৃত স্থাণুত্বের আস্বাদন না পাওয়ায় আমাদের সম্পূর্ণ তৃপ্তিও মিলে না; অথচ স্থাণুত্বের আরোপে জঙ্গমধর্ম্মী বস্তুগুলিকে চাপিয়া রাখি বলিয়া তাহারাও আবার ঠেলাঠেলি করিয়া উঠিয়া পড়ে। জগতে নিদ্রা-জাগরণ, জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-প্রলয়ের আবর্ত্তনের ইহাই রহস্য। ইহাই সংসারচক্র। মোটের উপর এখানে জঙ্গমধর্ম্মই প্রবল, স্থাণুত্ব মাঝে মাঝে আরোপিত হইয়া বিশ্রাম দিতেছে মাত্র। এরূপ সাময়িক বিশ্রান্তিকে মুক্তি বলে না।

দেহ-মন-বুদ্ধির সংস্কার দূরীভূত না হইলে প্রকৃত স্থাণুত্বের স্বরূপ বুঝা যাইবে না। কর্ম্মযোগী এই কথাটা বুঝিতে পারিয়াই সাধনের সময় জগতের জঙ্গম দিকটাই সাধকের মনশ্চক্ষে বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন। একদিন মীমাংসকেরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, কর্ম্ম আর কর্ম্মফলই সব—ঈশ্বর পর্য্যন্ত স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই; কর্ম্ম করিয়া যাও, ফল আপনা হইতেই পাইবে। অবশ্য ইহা একটু বাড়াবাড়ি। কর্ম্মই কর্ম্মের লক্ষ্য হওয়াতে শেষে কর্ম্মবাদ অজ্ঞান ও নাস্তিকতায় পর্য্যবসিত হইল। জ্ঞানবাদীরা তখন বিপরীত প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিলেন—তাঁহারা কর্ম্মের সঙ্গে পুরাপুরি অসহযোগ চালাইতে চেষ্টা

করিলেন। কিন্তু ইহার ফলও হইল জড়ত্ব। উভয়ত্রই যথাযথভাবে অর্থের বিধান হয় নাই, তাই অকল্যাণ ঘটিয়াছে।

আমরা যে ভূমিতে রহিয়াছি, সেখানে কর্ম্ম প্রধান; কিন্তু তাহার লক্ষ্য রহিয়াছে কর্ম্মাতীত ভূমির দিকে। এই লক্ষ্যকে অন্তরেই সযত্নে সঙ্গোপন রাখিতে হইবে; অর্থাৎ ধারণা করিতে হইবে, অন্তরাত্মা কর্ম্মরহিত, স্থাণু, অচঞ্চল; অন্তরাত্মার স্বরূপ এই যে তিনি দেহ নহেন, মন নহেন, বুদ্ধি নহেন—তদতীত কোনও বস্তু। সে বস্তুর প্রমাণ কি? প্রমাণ নিজের অনুভব। শুধু অনুভব নয়—আনন্দময় অনুভব। অবশ্য এই অনুভূতির আনন্দে আমরা তারতম্য দেখিতে পাই; কিন্তু বুঝিতে হইবে, উহা আধারেরই স্বচ্ছতা-অস্বচ্ছতার দরুণ ঘটিতেছে। আসলে আমার অন্তরগত স্বরূপ এই—আমি স্বপ্রকাশ অতএব অহেতুক আনন্দস্বরূপ। বিনা কারণে আনন্দ অনেক সময় উছলিয়া উঠে—বিশেষতঃ কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে। ওই অবকাশটুকুকে আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে—বুঝিতে হইবে, ওই তো আমার স্বরূপ, মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের মত হঠাৎ ঝিকিমিকি করিয়া উঠিয়াছে। জীবনের মাঝে যে অকারণ আনন্দের মুহূর্ত্তগুলির সাক্ষাৎ পাই, সেগুলিকে স্মৃতির সূত্রে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে—সর্ব্বদা তাহাদের মনন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, অবসর মত তাহাদের নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। এইরূপে ছিন্ন সূত্রগুলি সংযুক্ত করিয়া ক্রমে ধ্রুবা স্মৃতি উৎপন্ন হইবে—মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে শেষে অন্তঃসলিলা প্রস্রবণের সাক্ষাৎ মিলিবে, তখন অফুরন্ত জলধারায় সমস্ত প্লাবিত হইয়া যাইবে। এই হইল অন্তরগত সাধনা। কিন্তু সাবধান, এই কর্ম্মবিরতির সাধনা আমরা যেন বাহিরে আরোপ না করি। আত্মাই অকর্ম্মা, আনন্দঘনস্বরূপ—দেহ, মন, বুদ্ধি ইহারা অকর্ম্মা নয়।

কিন্তু এই অন্তরঙ্গ সাধনাকে সহজ করিতে হইলেই কর্ম্মযোগীকে বহিরঙ্গ সাধনাও করিতে হইবে। বহিরঙ্গ সাধনা দেহ, মন ও বুদ্ধি লইয়া। ইহাদিগকে সর্ব্বদা কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতে হইবে—এই হইল প্রথম কথা। যাহার যাহা ধর্ম্ম, তাহার আশ্রয়েই সে থাকে ভাল। কর্ম্ম যাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখাই কর্ম্মবিরতি অবস্থা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু বাহিরে অন্তরে একটা যোগ থাকা চাই—বাহিরটা যেন অন্তরের দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া থাকিবে। অন্তরও বাহিরের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিবে। বাহিরের কর্ম্ম যাহাতে অব্যাহত, সুশৃঙ্খল ও প্রশান্ত হয়, সেই জন্য অন্তরকে কর্ম্মচাঞ্চল্য-রহিত শুদ্ধ গাম্ভীর্য্যে অভিষিক্ত রাখিতে হইবে। ভিতর শান্ত না থাকিলে বাহিরের কর্ম্ম স্বনুষ্ঠিত হইতে পারে না—ইহা ধ্রুব সত্য। আবার বাহিরে কর্ম্ম না থাকিলে অর্থাৎ অন্তরের স্থাণুত্ব বাহিরে আরোপিত হইলে অন্তশ্চেতনা ম্লান হইয়া নিরানন্দ জড়ত্বে পর্য্যবসান অবশ্যম্ভাবী। গুরু ভিতরে, শিষ্য বাহিরে। গুরুর শান্ত প্রেরণায় শিষ্যের কর্ম্মশক্তি সঞ্জীবিত, স্ফুরিত হইয়া উঠে; আবার শিষ্যের অবিরাম কর্ম্মসাধনায় গুরুও স্বমহিমায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠেন। উভয়ের মিলনে আনন্দ উছলিয়া উঠে—জীবন সার্থক হয়। ইহাই কর্ম্মজা সিদ্ধি।



স্বামী রামতীর্থ

—*—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

"৯ই অক্টোবর, ১৮৯২। আজকে আমাদের কলেজ খুলেছে। একটা টুইশনী পাওয়া যায় কিনা, সে সম্বন্ধে অধ্যাপকদের কারু সঙ্গে আলাপ করতে পারিনি। বাহাদুর চাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলছে, এক্জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার লাধারাম তাঁর ছেলেকে পড়াবার জন্য একটী মাষ্টার রাখতে চান। হয়ত ওটা পেতে পারি—দু ঘণ্টা পড়াতে হবে, তাতে ১৫৲ করে পাব। ভাগ্যে কিছু জুটে যাবে, এটা খুবই বিশ্বাস করি।

"যে ঘরটায় এতদিন ছিলাম, অতিবৃষ্টিতে সেটা পড়ে গিয়েছে। ঝণ্ডুমল আমার জিনিষপত্র বইটইগুলো বাঁচিয়েছে যাহোক্। এখনও কোনও বাড়ী পাইনি। কাল রাত্রে ঝণ্ডুমলের ওখানে শুয়ে ছিলাম, খেয়েছিও তার ওখানে।

"১৮ই অক্টোবর, ১৮৯২। টুইশনীর জন্য অধ্যাপকদের বলেছিলাম। তাঁরা বলছেন, পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছে, এ সময় মিছামিছি সময় নষ্ট করা কেন? আর তাঁরা ঠিকই বলছেন, মাস ১৫৲ টাকা করে রোজগার করার চেয়ে আমার সময়ের মূল্য বেশী।

"৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৯২। আমাদের ক্লাসের একজন ছাত্র আমার কাছে গণিত পড়ছে। পারিশ্রমিক সম্বন্ধে তার সঙ্গে কোন কথা হয়নি বটে, কিন্তু সে ভাল লোক; কোনও রকমে না কোনও রকমে সে কিছু দেবেই।

"আর কয়েকদিন পরেই সরদারের পরীক্ষা শেষ হবে। যে সতীর্থটীকে পড়াচ্ছি, সে আমার পড়ানোর ধরণে ভারী খুসী। আমার বাড়ীভাড়াটা আর দুধের দামটা উঠে যায়, অন্ততঃ এমন কিছু সে দেবে। তা ছাড়া সরদার বলছিল, তাদের বাড়ী গিয়ে থাকতে। তুমি যখন এখানে আসবে, তখন আমায় যা আদেশ করবে, তাই করব।

"২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৩। কলেজে গেলে পর কলেজের পিওন এসে বলল, অধ্যাপক জিলবার্টসন আমায় ডাকছেন। তখন সবে ক্লাসের ঘণ্টা পড়েছে। প্রফেসার আমার হাতে ছোট্ট একটী পুঁটুলী দিলেন, তাই নিয়ে আমি ক্লাসে ছুটে গেলাম। আজ আমার হাতে একটী পয়সাও ছিল না। তিন ঘণ্টা পর যখন পুঁটুলীটা খুললাম, দেখি তার মাঝে ত্রিশটা টাকা। আমি অধ্যাপক সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম, আমার এত টাকার তো প্রয়োজন নাই। বলে ২০৲ ফিরিয়ে দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি জেদ ধরলেন, সবটা নিতেই হবে। তুমি যদি আস, তাহলে এই কুড়িটা টাকা আমার কাছ থেকে নিতে পার; আর সম্ভব হলে তোমার খুসীমত এর থেকে দু'চার টাকা আমার মাকে দিতে পার। তুমি এখানে আসতে চেয়েছিলে বলে টাকাটা ডাকে পাঠালাম না। দশটা টাকা আমার হাতে রাখছি, কেননা আমার দু' মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া আমার নিত্য খরচের বেলায় জ্বালাপ্রসাদ আছেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩। আমি হোষ্টেলে এসেছি। সকালবেলা হোষ্টেলে খাব, আর রাত্রে ঝণ্ডুমলের ওখানে খাব। ঝণ্ডুমলের কাছে অনেক বলে ক'য়ে সকালবেলাটা হোষ্টেলে খাবার অনুমতি নিয়েছি। আমাদের গাঁয়ের নাম রাখতে চাই—মুরারি-ওয়ালা, মুরলীওয়ালা নয়।

"১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩। ঝণ্ডুমল আমাকে একজোড়া পাজামা আর দু'টা কুর্ত্তা দিয়েছে। তা ছাড়া লালা জ্বালাপ্রসাদের কাপড়চোপড়ও আমি ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারি। কাজেই আমার আর কষ্ট নাই।

"১১ই মার্চ্চ ১৮৯৩। রোল নম্বর পেলাম। বাড়ীর পরীক্ষায় অঙ্কে ১৫০ নম্বরে ১৪৮ পেয়েছি।

"১৭ই এপ্রিল, ১৮৯৩। এক বন্ধু চিঠি লিখেছেন, 'স্বস্তি, তীর্থরাম! বি,এ, পরীক্ষায় তুমি প্রথম হয়েছ।'

"১১ই জুলাই, ১৮৯৩। ভাই—আমার কাছে পড়ত। চীফ্ কলেজ হতে মধ্যপরীক্ষা দিয়েছিল। প্রথমটায় তো ফেল হয়েছিল। কিন্তু পরে আবার তার কাগজ পরীক্ষা করা হয়, তাতে সে পাশ হয়েছে।—কি আনন্দ!

"১৭ই জুলাই, ১৮৯৩। আজ নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পুলের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি, গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ বেল সাহেব সেদিকে আসছেন। তিনি খুব ভদ্রতা দেখালেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে আলাপ হল আমার চশমার কথা বললেন, ছাতা ব্যবহার করি না কেন জিজ্ঞাসা করলেন—আরও কত কি! তখন টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ছিল কিনা, তাই ছাতার কথা হল। তার পর তিনি আমায় তাঁর গাড়ীতে তুলে গবর্ণমেণ্ট কলেজ পর্য্যন্ত নিয়ে গেলেন। গাড়ীতে যেতে আমার যে সব ইংরেজী কবিতা মুখস্থ ছিল, তার অনেকগুলি তাঁকে শোনালাম। আমি বললাম, পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত আর পাঁচ ছয়খানা করে বই আমি এক এক বিষয়ে পড়ে থাকি। শুনে তিনি খুব খুসী হলেন। তার পর আমার বাপ-মার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, অবস্থা ভাল কি না জানতে চাই-লেন—আমি বললাম, আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পরীক্ষার পর আমি কি করব? আমি বললাম, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার কোনও মতলব নাই। আরও বললাম, আমার যদি কোনও বাসনা থাকে, সে হচ্ছে আমার সমস্ত জীবন, এমন কি আমার প্রত্যেকটী নিশ্বাস আমি ভগবানের সেবায়, জীবের সেবায় বিলিয়ে দিই; আর নরের সেবাই তো নারায়ণের সেবা। আমি যদি গণিত বিদ্যার অধ্যাপনা করি, তাই আমার শ্রেষ্ঠ সেবা হবে।

"ততক্ষণে আমরা প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়ীর কাছে এসে পৌঁছেছি। বাড়ীটা গবর্ণমেণ্ট কলেজের হাতার ভিতরেই। তিনি আমায় ব্যায়ামঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলাম, ছেলেরা নানাধরণের ব্যায়াম করছে। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি ব্যায়াম করি। আমি বললাম, আমি 'চারপাই-ব্যায়াম' করি, অর্থাৎ আমার শোবার খাটটার দুটো পায়া ধরে তুলি। সাহেব ছেলেদের একটা খাটিয়া আনতে বললেন। আমি বেল সাহেবের সামনেই খাটিয়াটার

ছুটো পায়াতে ধরে প্রায় একশ' বার তুললাম, কিন্তু ছেলেরা কুড়ি বারের বেশী পারল না। ছেলেদের ব্যায়ামাদি দেখে সাহেব তাদের নমস্কার করে বাড়ী চলে গেলেন। তিনি যেতে যেতে আমি এগিয়ে এসে বল্লাম, 'মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখালেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' সাহেব আমার সেলাম নিয়ে বাড়ী চলে গেলেন।

"৪ঠা আগষ্ট, ১৮৯৩। আমি এখানে অনাহতধ্বনি খুব শুন্‌তে পাই। এ স্থানটী আনন্দে পরিপূর্ণ।

"১৮ই আগষ্ট, ১৮৯৩। যোগবাশিষ্ঠ পড়তে আরম্ভ করেছি।

"২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩। আজ ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য দাদাভাই নৌরোজী এলেন—তিনটার ট্রেণে। সহরের লোক খুব সমারোহ করে তাঁর অভ্যর্থনা করল। লোকের উৎসাহ আর আনন্দের সীমা নাই। কংগ্রেস-ওয়ালারা তাঁকে যেন একেবারে ব্রহ্মাবিষ্ণু করে তুলল। সহরের নানা জায়গায় সোনালী তোরণ করা হয়েছিল। এই এখনও মিছিল করে তাঁকে নিয়ে সহর ঘোরা হচ্ছে। হাজার হাজার লোক মিছিলে যোগ দিয়েছে—লোক আর ধরে না। সবাই আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু আমার মনের উপর এতে কোনও ক্রিয়া হচ্ছে না। কিসের জন্য এই আনন্দ? ভগবান্ যে আমার মনের গতি এমন করে দিয়েছেন—এ তাঁর করুণা।

"৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩। তবে তো তুমি রাগ করেছ। আমি অপরিণতবুদ্ধি বালক মাত্র; আমায় ক্ষমা কর—অপরাধ নিও না। পড়তে পড়তেই মানুষ ঘোড়ায় চড়তে শেখে। সাঁতার শিখতে হলে ডুবতেও হয়। তোমার যদি টাকার দরকার হয়, তাহলে এখান থেকে কিছু পাঠাতে পারতাম। এ বছর অতিরিক্ত বই কিনে আর টাকা খরচ করিনি—কেবল পড়ার বই মাত্র কিনেছি। বই কেনার একটা বদভ্যাস আমার ছিল বটে, কিন্তু সেটা ছেড়ে দিয়েছি। আর নিজের খরচ কি করে আরো কমানো যায়, সেই কথাই সর্ব্বদা ভাবি। তবে দুধের জন্য কিছু পয়সা খরচ করি বটে। কংগ্রেস গিয়েছিলাম, শুধু দেশের বড় বড় বক্তাদের বক্তৃতা শুন্‌তে, আর তাঁদের বলার কায়দা সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে একটু জ্ঞান লাভ করতে। দাদাভাই নৌরজীর অভ্যর্থনার ফাঁকা আনন্দে সাধারণ লোকের মত সেদিন ফেঁপে উঠিনি বলে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম। আজও বল্‌ছি, কংগ্রেস বক্তাদের ছন্দ-বন্ধ থেকে কোনও আনন্দ, কোনও প্রেরণা পেলাম না—ও সব ভূয়ো।

"১০ই জানুয়ারী, ১৮৯৪। শুনতে পেলাম, বোনটী মারা গিয়েছে। কি যে কষ্ট হচ্ছে; কিন্তু দুঃখকষ্টের কথা লিখে লাভ কি? বহুক্ষণ ধরে ভারী কান্নাই কেঁদেছি। ওকে যেমন ভালবাসতাম, তেমন আর কাউকে নয়।

"১৪ই জানুয়ারী, ১৮৯৩। ডিগ্রী নেবার সময় নূতন গাউন কিন্‌ব কিনা, ভেবে ঠিক করতে পারছি না। এতে ৭০৲ টাকা লাগবে। কিন্তু ধারে টাকাটা পাওয়া অসম্ভব। এ বছর অনেক টাকা খরচ হয়েছে। চহলের লছমনদাসের সঙ্গে দেখা হল। ধারে একটা গাউন যোগাড় করতে পারলাম না। যদি

সম্ভব হয়, চহলের হাকিম রায়ের কাছ থেকে তাঁর গাউনটা দেওয়াতে পার?

"আমার অধ্যাপক তাঁর গাউনটা দিতে চান—অবশ্যি ওটা আমেরিকার প্যাটার্ণে তৈরী। তবে একটু অদল-বদল করলে আর, গোটা পাঁচেক টাকার মধ্যে একটা নূতন হুড কিনতে পারলে কোনও রকমে কাজ চলে যাবে।

"১১ই এপ্রিল, ১৮৯৪। এই মাত্র একটা নূতন কবিতা পড়লাম।—'রিক্ত হাত যাদের, তারা ধনীর চেয়ে মানে বড়, কেননা সরাবের বোতল রিক্ত পেয়ালা ভরবার জন্যই নুয়ে পড়ে'—(দাগ)। এর অর্থ এই, রিক্ত পেয়ালা যখন আপনাকে পূর্ণ করবার জন্য পূর্ণ বোতলের কাছে আসে, তখন পূর্ণ পাত্র তাকে নত হয়ে অভিবাদন করে।

"৩০শে এপ্রিল, ১৮৯৪। লালা রামশরণ দাস তাঁর ওখানে গিয়ে থাকতে পীড়াপীড়ি করছেন। বলছেন, যে কোনও ঘর আমি বেছে নিতে পারি। লালাসাহেব আজ রাতের মত সহরের বাড়ীতে যাবেন, বাংলায় চাকরেরা পাহারায় থাকবে। লালা সাহেব একেবারে একটি সাধু পুরুষ—এমনি ভাল লোকটা।

"৩রা মে, ১৮৯৪। তুমি এলে না। কোনও কিছু নিয়ে আমার ওপর রাগ করো না যেন। আমার ছাত্র বি, এ, পাশ করেছে—আমার যে কি আনন্দ।

"১০ই মে, ১৮৯৪। জগতে কিছুই আমাদের নিজস্ব নয়। যদি শান্তি পেতে চাই, তাহলে আমাদের দেহকেও আমাদের বললে চলবে না—বলতে হবে তাঁর; আর তাঁর কাজেই দিন গুজরাণ করতে হবে।

(ক্রমশঃ)



ভাবের অঙ্কুর

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

নাম যখন বাহিরে অভিব্যক্ত হইল, তখন হইতেই আমার মাঝে সৃষ্টির আনন্দবেগ অনুভব করিতে লাগিলাম; এই নামকে আশ্রয় করিয়াই প্রিয় জনের কানে বিচিত্র, অফুরন্ত ও অনির্ব্বচনীয় সোহাগ ঢালিয়া দিতে লাগিলাম। ইহা নামের বিলাস—এখানে আমার অন্তরঙ্গ শক্তির আনন্দময় স্ফুরণ। কিন্তু বলিয়াছি, ইহার পূর্ব্বেরও কথা রহিয়াছে। ভাবুক যদি নামের পূর্ব্ব নিদান খুঁজিতে যান, তাহা হইলে কোথায়ও তাহার সন্ধান পাইবেন না। এইটুকু নামের অনির্ব্বচনীয় রহস্য। ভাব গাঢ় হইলে নামের আকারে ফুটিয়া উঠে। ভাব বুদ্ধির হিসাবে বেড়িয়া পাইবার বস্তু নয়। তাই নামেরও

আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা অতর্কিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রাকৃত জগতে তাহা একটা বিপ্লব বাধাইয়া দেয়, ইহা আমরা হামেশাই দেখিতে পাই। তাই অতর্কিতের আবির্ভাবকে আমরা মনেপ্রাণে গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু ভাবুক তো প্রপঞ্চীর মত হিসাব করিয়া পথে চলেন না। সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা অতর্কিত, তাহাই তাঁহার কাছে সুস্পষ্ট। অজানা অচেনাকে লইয়াই তাঁহার কারবার। এই জন্য তাঁহার আনন্দের মাঝে এমন একটা তীব্রতা আছে, যাহার আভাস মাত্রে বিষয়ী সঙ্কোচে সরিয়া যায়—বলে লোকটা পাগল। অজানার স্পর্শ পাইলে পাগল হইতেই হয় বটে। এই পাগলামীর ছিট ভাবুকের থাকে বলিয়াই নামে তিনি আত্মহারা হইতে পারেন। নামের মূল প্রস্রবণ যদি অছদ্ ও অগম না হইত, তাহা হইলে সংসারবুদ্ধি ঘুচাইয়া ভাবুককে তাহা আত্মহারা করিতে পারিত না।

ভাবের সঙ্গে অন্বিত যে নাম, তাহার প্রধান লক্ষণই এই হইবে যে, উহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত। যেমন সূর্য্য মেঘে ঢাকা পড়ে, তেমনি বিষয়-কলুষে নামও ঢাকা পড়ে। তখন নামে রুচি আনিতে হইলে নিষ্ঠার অঙ্কুশাঘাতের প্রয়োজন। ইহাতে আনন্দ না পাওয়ারই কথা; সাধক তখন ভাবুকতা হইতে শত যোজন দূরে। কিন্তু অভ্যাসের ফলে অভাব দূর হইয়া স্বভাবে যখন প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে, তখন নামরস আপনা হইতে উছলিয়া উঠিবে। তখন—

"নামে ভুলায়েছ যারে,
সে কি ছেড়ে রইতে পারে—
নামরসে যে মজেছে, সে বুঝেছে কি আরাম!"

এই যে নামের স্বতঃস্ফুরণ, ইহা কেবল নিষ্ঠাসহকারে নাম অভ্যাসেরই ফল, এইমাত্র বলিলেই কিন্তু তৃপ্তি হয় না। ইহাতে মনে হইতে পারে, নাম নিত্য সত্তা নহে, অভ্যাসের বশে উহা আয়ত্ত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমরা বলি, ভাব যদি মূলে সত্য হয়, এই জগৎ যদি ভাবেরই অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু না হয়, তাহা হইলে নামও সত্য—নির্ব্বিকল্প ও নিরপেক্ষ সত্য। নাম একটা অস্পষ্ট সংজ্ঞা নয় বা বর্ণসমষ্টি নয়। যিনি যে পথের সাধনাই করুন না কেন, ভাবব্যূঢ় সকলকেই হইতে হইবে এবং সকলের ভিতরেই তখন নাম ফুটিয়া উঠিবে। বেদের প্রবচন, তন্ত্রের মন্ত্র ইত্যাদি সমস্তই নাম। ভাবের আবেগে উহা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে বলিয়াই উহাকে আমরা অপৌরুষেয় বলি। অপৌরুষেয় বলিতেই নিত্য সত্তা বুঝি। আজ যাহা বর্ণের আকারে ধ্বনিরূপে পাইতেছি, তাহাকে আবার আর একদিন ভাবের ভিতর দিয়া পাইতে হইবে। আজিকার পাওয়া অচেতনভাবে পাওয়া—তাই উহা "প্রোক্তবর্ণাস্তু কেবলাঃ"—তাই বর্ণবুদ্ধি দূর হইতে চাহে না। কিন্তু একদিন এই নামই হুঙ্কার দিয়া ভিতর হইতে চৈতন্যশিখায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে, সেইদিন প্রমাণ হইবে নাম সত্য কিনা।

একটা উদাহরণ দিই। বালিকাবয়সে যাহার বিবাহ হইয়া গেল, সে বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই জানিল না—বিবাহ তাহার কাছে একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র। তবুও এই শব্দের একটা সংস্কার তাহার চিত্তে লাগিয়া গেল। কিন্তু সেই সংস্কার সত্য অনুভূতিতে পরিণত হইল কখন?—যৌবনে যে দিন সে স্বামীর সোহাগ পাইল, নিজের হৃদয়ের অপরিসীম ভালবাসা দিয়া বুঝিল, স্বামী কি বস্তু। এখানে

যাহা সুপ্ত ছিল, তাহাই জাগিয়া উঠিল; সংস্কারের পাওয়া অনুভূতির পাওয়াতে রূপান্তরিত হইয়া সার্থক হইল।

ভিতরে ভিতরে নাম সর্ব্বদাই হইতেছে। শ্বাসের সঙ্গে নাম গাঁথা। বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য যেমন অর্জ্জুনের দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন হইয়াছিল, তেমনি এই বিশ্বনাম শুনিবার জন্য দিব্য কর্ণ, উচ্চারণ করিবার জন্য দিব্য রসনার প্রয়োজন। দিব্য চক্ষুতে অর্জ্জুনের চক্ষু আর একটা বাড়ে নাই—দর্শনে ভাবান্তর ঘটিয়াছিল, চোখে ভাবের অঞ্জন লাগিয়া সমস্তই অমৃতময় হইয়া গিয়াছিল। দিব্য শ্রুতি ও দিব্য রসন এমনই ভাবান্তর বটে; বরং শ্রুতি আরও সুস্পষ্ট। চঞ্চল চিত্তে দেখা যায় না, শোনা যায় না, জপা যায় না। চিত্ত স্থির কর—নামরূপের শ্রবণ দর্শন সর্ব্বত্র হইবে, সহজভাবে হইবে—কিম্ভূতকিমাকার কিছু হইবে না। এই ইন্দ্রিয়েরই শক্তি ভাবের স্পর্শে কি করিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তাহা অনুভব করা ছাড়া তর্ক দ্বারা বুঝাইবার উপায় নাই।

"নামগানে সদারুচিঃ"—এই লক্ষণটীকে একটু বুঝিয়া দেখিতে চাই। ইহার মাঝে চারিটী কথা—নাম, গান, সদা ও রুচি। নাম অপর তিনটীর আশ্রয়, ইহার কথা সামান্য আলোচনা করিয়াছি। বাকী তিনটী নামেরই বিভাব। ভাবের প্রেরণায় নাম যখন অভিব্যক্ত হইবে, তখন উহাতে তিনটী ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিবে—গেয়ত্ব, সদাতনত্ব ও রুচিকরতা।

শব্দের সঙ্গে ছন্দঃ ও সুর যুক্ত হইলে তাহা হয় গান। ছন্দ কথাটী ব্যবহার করিবার একটু তাৎপর্য্য আছে। বেদকে ছন্দঃ বলে; বেদ হইতেই সৃষ্টি, এমন কথাও আছে; আবার ছন্দ অর্থ ইচ্ছা; আবার ছন্দ অর্থ তাল—"যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" এই বৈদিকমন্ত্রে যাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে। ছন্দের এই লক্ষণগুলি মিলাইয়া তাহার অর্থ ধারণা করিতে হইবে। সংক্ষেপে বলিতে পারি—ব্রহ্মই নাম—নামই বেদ;—সৃষ্টির কল্পলতিকা, বাসনার আদিস্পন্দন, লীলার অন্তহীন আবর্ত্তন। ইহার সঙ্গে সুর যোগ হইলে নাম গান হইবে। সুর অনির্ব্বচনীয়—সসীমে অসীম, আনন্দের দিব্য রসায়ন। শব্দের সঙ্গে যখন সুর যুক্ত হইবে, তখনই বুঝিবে, মূলে ভাবের যোগ আছে। এই কথার ইঙ্গিত করিয়া শ্রীরাধার নামগান প্রসঙ্গে গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীরাধিকার সার্থক বিশেষণ দিতেছেন, "মধুরস্বরকণ্ঠী।" নামগানে স্বর মধুর হওয়া একটা দৈব সংযোগ নয়। ভাবের যোগে স্বর সুর হইবেই, মধুর হইবেই—ইহা বিধান। এমন কি তির্য্যক জাতিতেও আমরা এই বিধানের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না—মানুষের তো কথাই নাই। নামের মোহিনীশক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া মহাজনেরা উহাকে গানের সঙ্গে যুক্ত করিলেন। মোহিনীশক্তির প্রভাবে মনোমোহনেরও মন ভোলে। এখানেই প্রেমের গুণাতীত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয়—শ্রীমদ্ভাগবত ইহা বলিয়াছেন। নামগানের শক্তির কথা এইটুকু মাত্র ইঙ্গিত করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

তারপর নামগানের সদাতনত্ব। শ্বাসপ্রশ্বাস সর্ব্বদাই ফেলিতেছি, অজ্ঞাতসারেই ফেলিতেছি—দুইচারি বার যে ভুল হইয়া যাইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। যদি কখনও বাদ পড়িবার আশঙ্কা ঘটে, তাহা হইলে একেবারে মর্ম্মস্থানে টান পড়ে—আকুলি-বিকুলির আর অন্ত থাকে না। নাম সহজে অভিব্যক্ত

হইলেও এই দশা হয়। তখন, "জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো"—অথচ ছাড়িবার উপায় নাই। আর ছাড়িবেই বা কি করিয়া? প্রাণীর প্রাণটুকু যা, ভাবুকের কাছে নামটুকু তা। ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উহা অন্তরাত্মার সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে—ছাড়িবার কথাই যে কল্পনায় আসে না। শ্বাসের সঙ্গে নাম যখন গাঁথিয়া যায়, তখন স্বপ্ন জাগরণে সমভাবে নাম চলিতে থাকে। প্রতি শ্বাসে নাম একটা বীর্য্যশালী, তেজস্কর রসায়নের মত সমস্ত সত্তা উজ্জীবিত করিয়া তোলে। শ্বাস গ্রহণে একটা আরাম আছে—যা নিরন্তর অভ্যাসের দরুণ আমাদের কাছে অলক্ষিত; একবার শ্বাসরোধের কারণ উপস্থিত হইলে পর আবার যখন শ্বাস নিবার সময় আসে, তখন বুঝিতে পারি প্রাণনে কি স্বস্তি, কি আরাম। কিন্তু নিরন্তর নামজপের তৃপ্তি এর চেয়েও গভীর; কেননা নাম ফোটে সচেতন ভাবে—অজ্ঞাতসারে নয়; অথচ হৃদয়ের সুধাসার বলিয়া তাহার তৃপ্তিরও অন্ত নাই। অবিরাম নাম এইজন্য ভাবুকের কাছে প্রাণন অপেক্ষাও পরমানন্দের বিলাস।

শেষ কথা রুচি। রুচির হেতু নাই—এইটুকু প্রণিধান করিতে হইবে। যখন ভাল লাগে, অথচ কেন ভাল লাগে, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না—তখনই বলি, এ আমার রুচি। এই জন্য রুচি স্বচ্ছন্দ—মানে, আমার মাঝে যে "কবি মনীষী" রহিয়াছেন, তাঁর আপনার ছন্দ। কোথায়ও বাধা নাই, অথচ হেতুশাস্ত্রদ্বারাও বেড়িয়া পাওয়া যায় না—তাই কথায় বলে, "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" এই প্রবচনে যে নিরপেক্ষ স্বচ্ছন্দ আনন্দের ইঙ্গিত রহিয়াছে, নামে রুচি বলিতে তাহাই বুঝিব। রুচির মূলে হেতুবাদ নাই বলিয়া বুদ্ধির বালাই নাই, বিষয় পরিস্পর্শও নাই; কেননা বিভিন্ন বিষয়ের পরিস্পর্শে বুদ্ধির যে বিভিন্ন বিভ্রম উপস্থিত হয়, তাহাদের মাঝে বিরোধ মিটাইবার জন্যই না হেতুবাদের প্রয়োজন হয়। নাম অন্তরঙ্গ, সুতরাং বহির্বিষয় নিরপেক্ষ। ভাবুকের কাছে নাম-নামী অভেদ; সুতরাং নাম নিত্যসত্তা। অবিষয় নিত্যসত্তা কোনও যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। তবে উহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ের স্বারসিকী অনুভূতির গোচর না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুক্তি আছে বটে। কিন্তু ভাব তো শুষ্কতর্কের ফল নয়—উহা স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতির রসায়ন। সুতরাং উহা অহেতুক, অযৌক্তিক এবং ঠিক এই জন্যই আনন্দময়। যাহা হেতুপ্রসূত নহে, তাহা নিত্য, অন্তরঙ্গ ও স্বপ্রকাশ, অতএব আনন্দময়—কেননা উহা স্বভাবেরই অভিব্যক্তি। আর আমাদের স্বভাব যে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত, দুঃখপরিহারের চেষ্টাই তাহার প্রমাণ। নিত্যানন্দময় বলিয়াই নামে রুচি হয়—ভাবুক ইহার রসবেত্তা।

রূপ দেখিবার আগে নাম শুনিলেন, নাম শুনিয়াই শ্রীমতী বিহ্বল হইয়া পড়িলেন,—তখন স্পর্শের লালসা জাগিল, তারপর জাগিল রূপের পিপাসা;—যে মহাজন স্ব-হৃদয়ের রসানুভূতি এমন কোমলকান্তরূপে প্রকাশ করিলেন, তাঁহার মত তত্ত্ববেত্তা রসিক যোগিরাজ আর দেখি না। এই ধারা প্রাকৃত রীতির ঠিক বিপরীত, তাই বাসনা কামনা বর্জ্জন না করিলে ইহার মর্ম্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।—শ্রীমতী বলিতেছেন—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে অবশ করিল গো—
কেমনে পাইব সই তারে ॥
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব, কি হবে উপায় ?

আর একজন রসিক মহাজনের বর্ণনা—

সজনি, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।
কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি
জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥
পহিলে শুনলুঁ হাম শ্যাম দুই আখর,
তৈখনে মন চুরী কেল।
না জানিয়ে কো ঐছে মুরুলি আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥
না জানিয়ে কো ঐছে পটে দরশায়লি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম যাহাঁ যাই ধাইয়ে
তাহাঁ তাহাঁ রোধয়ে মাতি ॥

—এখানে চিত্তবিভ্রমের ছায়া আছে, কিন্তু তত্ত্ব সেই একই।

আবার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

সখি, রাধানাম কি কহিলে।
শুনি কান মন জুড়াইলে ॥
কত নাম আছয়ে গোকুলে।
হেন হিয়া না করে আকুলে ॥
ওই নামে আছে কি মাধুরী।
শ্রবণে রহল সুধা ভরি ॥
চিতে নিতি মূরতি বিকাশ।
অমিয়া সায়রে যেন বাস ॥
আঁখিতে দেখিতে করে সাধ।

পুনশ্চ—

রাধানাম কি কহিলে আগে।
শুনইতে মনমথ জাগে ॥
সখি, কাহে কহলি উহ নাম।
মন মাহা নাহি লাগে আন ॥
কহ তছু অনুপম রূপ।
বুঝলম অমিয়া স্বরূপ ॥
হেরইতে আঁখি করে আশ।

এ শুধু কবিকল্পনা নয়—সাধকচিত্তের রসোদ্গার। কে যেন বলিয়াছিল, নামে কি আসে যায় ? কিন্তু নামে আসে যায় বই কি ! ভাবুকহৃদয় তাহার সাক্ষী। নামে চিত্তের স্পন্দন, স্পর্শাকাঙ্ক্ষায় চিত্তের ব্যাপ্তি, রূপে বহির্ব্যক্তি—ইহা তত্ত্বানুকূল শ্রুতিসম্মত সাধনা; নিজে নামরূপবর্জ্জিত না হইলে ইহার রসাস্বাদন করা যায় না। তাই বাসনাহীন বৈরাগীকে এই পথে আসিতে আরতি করি।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষার বনিয়াদ



মানুষ মনে মনে একটা আদর্শ রচনা করে সেই অনুযায়ী বাস্তব জগৎটা গড়ে তুলতে চায়। এতে সব সময় যে সে কৃতকার্য্য হয়, তা নয়। প্রায়শঃই দেখা যায়, আদর্শে ও বাস্তবে সন্ধি হচ্ছে না। বিরোধটা যে স্বেচ্ছাকৃত তাও বলা চলে না—আদর্শ পূর্ণভাবে ফুটবে না, এ যেন কতকটা এই ভবেরই গতিক। এ অবস্থায় নিরাশ হয়ে আদর্শ ছেড়ে দেওয়াও যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, ক্ষুব্ধ হয়ে বাস্তবটাকে গাল দেওয়াও তেমনি সুবিচার নয়। আদর্শের দিকে দৃষ্টি রেখে, যতটা পারি বাস্তবকে সামলে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। হয়ত আমাদের অনিষ্পন্ন কাজ ভাবিষ্যৎ যুগের দ্বারা সম্পন্ন হবে; কিম্বা হয়ত সমষ্টিভাবে একটা আদর্শ সফল না হলেও ব্যষ্টিভাবে তা সফল হতে পারে—অধিকাংশের বিফলতাকে সেখানে বিবর্ত্তনেরই একটা ধাপ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

এই কথাগুলি শিক্ষাক্ষেত্রেও আমরা আরোপ করতে চাই। শিক্ষার ফলে মানুষ যত নিরায়াসে এবং যত শীঘ্র সম্ভব প্রকৃত মানুষ হোক্—এইটা আমাদের শিক্ষার আদর্শ। মানুষ মানুষের ঘরে মায়ের কোলেই জন্মায়, বিদ্যালয় ফুঁড়ে গজায় না। সুতরাং তার শিক্ষার পত্তনটা যে ঘরেই হবে, এবং তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে যারা তাকে জগতে এনেছে তাদেরই, এ কথাটা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন দেখি, একটা বিশেষ বয়সে শিশুকে ঘর হতে ইস্কুলে হিঁচড়ে আনা হচ্ছে, তখন ভাবি, এটাও বোধ হয় প্রয়োজন—ঘরে শিক্ষার কমতি আছে বলেই বাইরে থেকে তার পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু এইখানেই একটা খট্‌কা লাগে। ঘরে শিক্ষার কম্‌তি কোথায় হয়, কেনই বা হয়, একটা হিসাব নেওয়া কি প্রয়োজন নয়? কথাটা বলছি এইজন্য যে, ঘরে কিছুই হবে না, এমন একটা নিশ্চেষ্ট নিরাশার ভাব আমাদের মনের মাঝে চিরকালের জন্য যেন বাসা বেঁধে আছে; এবং এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও ধরে নিই, বাইরেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে, অতএব বাপমায়ের কর্ত্তব্য, ছেলে যখন একটু নড়তে-চড়তে শিখবে, তখন তাকে ইস্কুলে পাঠিয়েই সমস্ত ভাবনার ইতি করা। আমাদের মনে হয়, এইখানেই শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ছেলে বাপ মায়ের; তাঁরা যখন বিবেচনা না করেই অক্ষমতার জবাব দিয়ে বসেন এবং অপরের সক্ষমতায় বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হয়ে যান, তখন হতে শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আর তো তাঁরা মাথা ঘামাতে চান না: এর পরে শিক্ষার ব্যবসায়ে যদি ফাঁকী চলে এবং তাতে ছেলেদের সর্ব্বনাশও হয়, তাতে অদৃষ্টকে দোষী করা ছাড়া তো আর কোনও উপায় থাকে না। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে পিতামাতা শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন, তা বলছি না; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত চেষ্টার খুবই অভাব, তার প্রমাণ চারদিকেই দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষা দেওয়াটা প্রকৃতির আইনে যাঁদের গরজ হওয়া উচিত ছিল, তাঁরা নিশ্চেষ্ট বলেই শিক্ষা সম্বন্ধে

মামুলী ধারাটার কোনও উন্নতি আমাদের দেশে হতে চায় না।

আমরা প্রথমে এই প্রশ্ন করি, পাঁচবছরের ছেলেকে যখন ইস্কুলে পাঠান হল, তখন ঘরে শিক্ষার কমতি ছিল কোথায়? এবং সে কমতি পূরণ করবার কি কোনও উপায়ই ছিল না? তখনই হিসাব করে দেখতে হয়, আমার ছেলেটাকে কি শেখানো প্রয়োজন। প্রথমতঃই মনে হয়—ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো প্রয়োজন। যদি জিজ্ঞাসা করি, কেন? তাহলে গোড়াতেই অর্থোপার্জ্জনের কথাটা হয়ত মনে আসবে না; কেননা কচি ছেলে রোজগার করে খাবে বা খাওয়াবে, মমতা-বশতঃই আমরা এ কথাটা ভাবি না। তবে লেখাপড়ার প্রাথমিক উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, ছেলেটা মানুষ হবে। কিন্তু লেখাপড়া শিখলেই যে ছেলে মানুষ হয় না, এ-ও তো আমাদের দেখা আছে! সুতরাং লেখাপড়া শেখানো ভদ্রসমাজের একটা আদব কায়দা বলতে পারি। লেখাপড়ায় বুদ্ধি মার্জ্জিত হবে, চিত্ত শুদ্ধ হবে, জ্ঞান আয়ত্ত হবে—এ সমস্ত কথা বোধ হয় আমাদের মনের ত্রিসীমাতেও উঁকি দেয় না। লেখাপড়া না শেখানো একটা লজ্জার কথা—এই ভাবটাই তো দেখি; কিন্তু শিখিয়ে কি হয়েছে, না শিখিয়েই বা কি হয়েছে, তার বিচার তো করতে দেখি না। পড়াতে গিয়ে এমন কত কিছু পড়াই, যা হয়ত জীবনে কোনও কাজেই লাগবে না—এমন কি মনের ডিসিপ্লিনের দিক দিয়েও না। অথচ ভদ্রসমাজে চল আছে বলে শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে সেগুলো আমরা বাদ দিই না। ছেলে যখন আর একটু বড় হয়, তখন লেখা-পড়ার সঙ্গে অর্থচিন্তাও এসে জোটে। পাশ দেবে, রোজগার করবে—এই তখন আদর্শ। লেখাপড়ার এই দুইটী উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভদ্র-সমাজের চাল বজায় রাখা ও অর্থোপার্জ্জনের যোগ্যতা অর্জ্জন করা—এ দুটী ডিঙ্গিয়ে গেলে পর, তার তৃতীয় উদ্দেশ্য হতে পারে জ্ঞানো-পার্জ্জন, চরিত্রগঠন, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি। কিন্তু ঠিক এই শেষের উদ্দেশ্য নিয়ে গোড়া থেকে শিক্ষার পত্তন করা—এ আমাদের মাথায় আসে না।

শিক্ষার মূলসূত্র সম্বন্ধে যদি চিন্তা করি, তাহলে বলতে পারি, সব রকমে জীবনটাকে বর্ত্তমান পরিস্থিতির উপযোগী করা—এই চল শিক্ষার প্রথম সূত্র। এর জন্যই পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত জ্ঞানের সন্ধান নিতে হয়, নইলে জীবন পরিচালনা করবার কোনও সঙ্কেত পাওয়া যায় না। এইটুকু আয়ত্ত হলে পর, দ্বিতীয় সূত্র—পরিস্থিতিকে আমি যেমনটী পেয়ে-ছিলাম, তার চেয়েও উন্নত করে যাওয়া। এই কাজটা ভবিষ্যৎযুগের প্রতি লক্ষ্য রেখে; যাঁরা মহামনা, তাঁরাই এটা পারেন। সাধা-রণ লোক শিক্ষার প্রথম সূত্র আয়ত্ত করতেই ব্যস্ত থাকে। বর্ত্তমান পরিস্থিতির উপযোগী হতে হলে বিদ্যা দরকার, এবং করে খাওয়ার যোগ্যতা দরকার—এই কথাটা প্রথমতঃই মনে জাগে। তার পর মনে হয়, চরিত্রও দরকার; কতকগুলি মানসিক গুণ অর্জ্জন না করলে জগতে লড়াই করে টিকে থাকা বড় সহজ নয়। সাধারণতঃ শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তার ধারা এর বেশী এগোয় না। দ্বিতীয় সূত্রটী আমরা প্রায়শঃ বর্জ্জন করেই চলি। প্রথম সূত্রটী বলতে পারি, শিক্ষার বাস্তব দিক। এ না হলে যে চলে না, সে কথা অবশ্য একশ' বার স্বীকার করি।

শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন—এটা সূক্ষ্ম কথা, অনেকের কাছে হয়ত ফাঁকা বুলিও।

সুতরাং এ কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যা এবং অর্জ্জনশক্তি—এই ধরেই জিজ্ঞাসা করি, এই শিক্ষা কখন থেকে হওয়া উচিত এবং ঘরে তার ব্যবস্থা কতদূর সম্ভব? এ সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক উত্তর পেলেই আমরা বুঝতে পারব, ঘরে শিক্ষার ত্রুটী কোথায় হয় এবং বাইরে থেকেই বা তার পূরণ কি করে হয়।

গোড়াতেই আমাদের নজর চলে যায় বহু দূর দূরান্তরে। বিদ্যা বল্‌তে হয়ত একেবারে এম. এ, বি, এ, কে লক্ষ্য করে বস্‌ব; অর্জ্জনশক্তি বল্‌তে হয়ত ওকালতি ডাক্তারি ইত্যাদি একটা কিছু বড় ব্যবসার কথা ভেবে বস্‌ব। বিদ্যার বা ব্যবসার ওস্তাদ ঘরে ঘরে মিলে না। একটা অঞ্চলে একজন ওস্তাদ হয়ত আছেন; সবারই ইচ্ছা, শিক্ষাটা তাঁর হাতে হয়। ওস্তাদ গিয়ে সাকরেদ্‌দের বাড়ী বাড়ী শিখিয়ে আস্‌তে পারেন না; কাজ আর সময়ের সুবিধার জন্য সাকরেদ্‌দেরই ওস্তাদের কাছে আস্‌তে হয়। তখনই শিক্ষাক্ষেত্রকে ঘর হতে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজন হয়। শুধু একজন ওস্তাদ ধরেই কথাটা বল্‌ছি না। যে কোনও উন্নত ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে এই কথাটা খাটে। আজকাল শিক্ষার সাজ সরঞ্জামগুলো দেশ বিদেশ হতে সংগ্রহ করে এক জায়গায় জড় করা হয়েছে এবং শিক্ষার ব্যবসাও সুরু হয়েছে। বড় দোকানদারেরা দোকানে বসে বেচাকেনা করে, বাড়ী বাড়ী ফেরি করতে যায় না। আজকাল শিক্ষার ব্যবস্থা তাই দিন দিন বাড়ী হতে নির্ব্বাসিত হতে সুরু হয়েছে। কাজটা যে খুব মন্দ হচ্ছে, তা বলছি না। গুণীর কাছে শিক্ষা পেতে যদি ঘর ছাড়তে হয়, ছাড়বে বই কি? কিন্তু এই সঙ্গে প্রাচীন সমাজব্যবস্থার একটু আলোচনা করতে চাই।

কিছুদিন আগেও গৃহশিক্ষার এতটা অভাব বোধ হয় ছিল না। বিদ্যা বা ব্যবসা—দুটোই ঘরে না হোক, গাঁয়ে থেকে শেখা যেত। বাপের কাছে দুয়েরই হাতে খড়ি চল্‌ত। জাত ব্যবসা ছিল, কুটীর শিল্প ছিল, সমাজের মাঝে পারিবারিক সংঘ ও প্রতিপত্তি প্রবল ছিল, সুতরাং অনেক দূর পর্য্যন্ত শিক্ষাটা বাড়ী থেকেই চল্‌ত। কিন্তু আজকাল নানাকারণে সমাজের কেন্দ্র গ্রাম ছেড়ে সহরের পানে সরে যাচ্ছে। গড়নের চেয়ে ভাঙ্গনের ঝোঁকটা বেশী দেখা দিচ্ছে। এর ফলাফল কি হবে, তা সর্ব্বমঙ্গলাই জানেন। কিন্তু আপাততঃ একটা ফল দেখ্‌তে পাচ্ছি যে এতে পারিবারিক জীবনে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও শৈথিল্য খুব বেড়ে যাচ্ছে, এবং তাতে শিক্ষাসম্বন্ধে খুবই ত্রুটী ঘটছে। এম্‌, এ, পড়বার কলেজ বাড়ছে—সেটা সুলক্ষণ বটে; কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ওই প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে হওয়াতে ছেলেপিলের সাধারণ বর্ণপরিচয়টা করাতে পর্য্যন্ত চেষ্টার শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে। ওটাও আজকাল ইস্কুলের Infant Classএর ওপর বরাত দেওয়া আছে। বাবা শুধু একখানা বর্ণপরিচয় আর শ্লেট, পেন্সিল কিনে দিয়ে ছেলেকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করেই খালাস।

অর্জ্জনশক্তি বা করে খাওয়ার শিক্ষাসম্বন্ধেও এই রকম শৈথিল্য আছে। গ্রাম ছেড়ে সহরের দিকে ভদ্রগৃহস্থের টান বেশী হচ্ছে। সহরে সভ্য উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়। তাতে কলমপেশা গোলামী থেকে ডাক্তারি ওকালতী ইত্যাদি স্বাধীন পেশার প্রলোভন আছে। এখন মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে

নিয়ম-সংযম

—*—

আনন্দ ভাল জিনিষ বটে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ ভাল নয়। নিত্যকার নিয়মের ব্যাঘাত ঘটাইয়া চিত্ত যেদিন বানচাল হইয়া যায়, সেদিন একথা মনে হওয়া সম্ভব যে আজ বেশ "আমোদে" আছি। কিন্তু নিয়মের নিকট হইতে ছুটী পাইলেও নিজের জবাবদিহী হইতে তো কেহ মুক্তি পায় না। তুমি যেখানেই যাও না কেন, কতকগুলা কাজ গুছাইবার ভার তোমার উপর পড়িবেই। আজ উৎসবের দিন বলিয়াই যে অনিয়মের দিন, তার কোনও মানে নাই। নিয়মটা যদি একটানা হইয়া চিরকালই চলিতে থাকে, তাহা হইলে বন্ধনের বিভীষিকায় প্রাণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে বটে। কিন্তু মনে হয়, নিয়ম অর্থ তো তা নয়। নিয়ম অর্থে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে একটা সুডৌল পূর্ণতা। এই নিয়মই সংযম, আর তাই সৌন্দর্য্যের প্রাণ। প্রাণশক্তির যথাযথ নিয়ন্ত্রণই সংযম; প্রাণের নিষ্পেষণ সংযম নয় —উহা মৃত্যু। উৎসবের দিনের নিয়ম অন্য দিনের নিয়ম হইতে পৃথক বটে, কিন্তু তা বলিয়া তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেদিন যে রকম পারিপার্শ্বিক উপস্থিত হয়, সেই দিন সেই অনুযায়ী নিয়ম যে গড়িতে পারে, সে-ই যথার্থ নেতা—নিজেরও, পরেরও। এমনি করিয়া নিয়মের সঙ্গে মুক্তির, বন্ধনের সঙ্গে চলার সন্ধি হয়; আর ইহাতেই আনন্দ, ইহাতেই মুক্তি।

এই সন্ধির তত্ত্ব জানি না বলিয়াই কর্ম্মে আমরা পদে পদে বাধা পাই। আমরা ভাবি, চিরকালই বুঝি একভাবে চলিবে। কিন্তু সংসার তো একভাবে চলে না; তার ভাঙা-গড়া অদল-বদল আছেই। যে যথার্থ প্রাণবান্, সে এই পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সংযমের বেষ্টনীতে চঞ্চলকে সুন্দর করিয়া তোলে। চিরকাল একটা নিয়ম বজায় থাকিল না বলিয়া দুঃখ করা যেমন মূঢ়তা; তেমনি, নিত্যনূতন পারিপার্শ্বিক উপস্থিত হইতেছে বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া অসংযমের স্রোতে ভাসিয়া যাওয়াও মূর্খতা।

একটা দিনের সঙ্গে আর একটা দিনের স্বাভাবিক একটা ছেদ আছে, আবার স্বাভাবিক একটা যোগও আছে। একটী চঞ্চলতার সত্য, আর একটী অচঞ্চল অধিষ্ঠানতত্ত্ব। আমাদের দুইটীই মানিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক দিন একই কাজের পুনরাবৃত্তি হইতে থাকিলে জীবন যে একঘেয়ে হইয়া যায়—ইহা অরসিকের অভিযোগ। সে চঞ্চলকে স্থির কল্পনা করিতেছে বলিয়াই এই দুঃখ পাইতেছে। প্রত্যেক দিনের প্রারম্ভে যেমন নূতন করিয়া সূর্য্যোদয় হয়, তেমনি প্রত্যেক কাজের প্রারম্ভে নূতন করিয়া বীর্য্য উদ্বোধিত করিয়া লইতে হয়—এখন সে কাজ যতই পুনরাবৃত্ত হোক না কেন। আবার কতকগুলি কাজ এমন আছে, যা আমরা চিরকাল করিয়া আসিতেছি, অথচ তা পুরাতন হইতেছে না। এই যেমন ধর আহার। চিরদিন উদরপূরণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু তাহাতে অপ্রবৃত্তি বা বিরক্তি তো আসিতেছে না। যতদিন রক্ত তাজা থাকিবে, ক্ষুধাও থাকিবে, ততদিন

তাহার সম্বন্ধে রসবোধের অভাব আমাদের কখনো হইবে না।

তেমনি, প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য থাকিলে কাজের পুনরাবৃত্তিতেও বিরক্তি আসে না। এই সংসারকে যৌবনের রসিক দৃষ্টিতে যে দেখিতে শিখিয়াছে, কাজে কর্ম্মে নিয়মসংযমের বেষ্টনী তাহার কাছে বন্ধন বলিয়া মনে হয় না। দিনের দেনা দিন মিটাইয়া দিতে হইবে, আজকার জঞ্জাল কালিকার জন্য তুলিয়া রাখিবে না—এমনি করিয়া প্রতি সূর্য্যোদয়ে নূতন করিয়া কর্ম্মশক্তির উন্মেষ করিবে, প্রতি সন্ধ্যায় আত্মসমর্পণের মাধুর্য্যে দিনের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া ফেলিবে। এইরূপে পুরাতন নিয়মকেই প্রতিদিন নূতন করিয়া তোল দেখি—কোথায় শ্রান্তি আসে, বিরক্তি আসে!

প্রকৃতির মাঝে এই আবর্ত্তন নিত্য সংঘটিত হইতেছে। তাই চিরচঞ্চলা প্রকৃতি চিরযৌবনা। তার চঞ্চলতাই তার সৌন্দর্য্য, আর সে সৌন্দর্য্য এক অনির্ব্বচনীয় সত্য—অচঞ্চল বিশ্বাধিষ্ঠাতার কণ্ঠহার সে সৌন্দর্য্য!

পুরাতনকেই নিত্য নূতন শ্রী দান করিতে পারে—প্রেম। আবার অভিনবের অতর্কিত আবির্ভাবকে সংযমের সুকোমল বেষ্টনে বন্দী করিতে পারে—এই বীর্য্যময় প্রেম। মনে পড়ে, পুণ্যসংসারে গৃহলক্ষ্মীর কথা। নিত্য তাঁহারা সেবার ডালি বহিয়া চলিয়াছেন—কোথায় শ্রান্তি, কোথায় ক্লান্তি! মনে পড়ে, গৃহের মঙ্গলদেবতা সন্তানজননীর কথা। অভিনবকে জন্ম দিয়া স্নেহের বন্ধনে বন্দী করিয়া গৃহের সংযম রক্ষা করিতে পারেন—এই লক্ষ্মীস্বরূপিণী মা জননীরাই। অতিথির অতর্কিত উপস্থিতিতে তাঁহারা বিব্রত হন না—নিপুণ সংযমে সেবার অর্ঘ্য সাজাইয়া দেন। নিত্য কর্ম্মের পক্ষে তাহা ব্যাঘাত হয় না। অথচ অতর্কিতের দাবী মিটাইতে হইলে যে অসাধারণ বীর্য্যের প্রয়োজন আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

নিত্য নিয়মকে জীবনের ছন্দঃস্বরূপে গ্রহণ করিয়া নবীন প্রাণে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা—এই হইল প্রেমের সৌন্দর্য্য। আর অভিনবকে অকুণ্ঠিত চিত্তে অভ্যর্থনা করিয়া দৈনন্দিন নিয়মের মাঝে তাহার আসন রচনা করিয়া দেওয়া, এই হইল প্রেমের বীর্য্য।

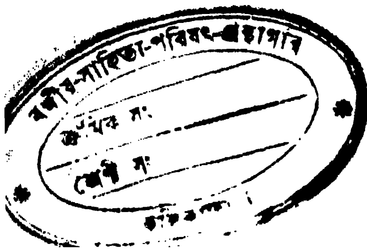
এই ভাবে জগৎকে দেখিতে হইবে। প্রত্যেকটা দিনই নূতন। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হইলেও সন্ধ্যাবন্দনার মত নবীন শ্রদ্ধায় প্রত্যেকটী দিনের কর্ত্তব্যকে অভিষিক্ত করিয়া লইতে হইব। আবার অভিনবকেও তৎপরতার সহিত ব্যবস্থিত করিতে হইবে। এই হইল শৃঙ্খলার নিদান। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা এই দিকে বড় একটা দৃষ্টি দিই না।

দৃষ্টি দিই না বলিয়াই আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া চপলতায় ভাঙ্গিয়া পড়ে—তাই সংসারে ক্ষমাও পাই না। জীবনে নিয়মের বন্ধন থাকিলে চরিত্রের একটা মেরুদণ্ড গড়িয়া উঠে। যে নিয়ম পালন করিতে জানে, নিয়মে যে রস পাইয়াছে, সে বীর্য্যবান পুরুষ। তাহার আনন্দকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তাহার আবার শঙ্কা কোথায়? তাহার আনন্দ যে ভিতরের প্রেরণায় সংযত, তাই বাহিরের দিকে তাকাইয়া সমীহ করিয়া চলিবার প্রয়োজনও তাহার হয় না।

নিয়মনিষ্ঠা থাকিলে কর্ম্মে ফলাকাঙ্ক্ষাও আপনা হইতে কমিয়া যায়। 'আমি জানি, যতটুকু আমার সাধ্য তাহা করিয়াছি, তারপর কি হইল না হইল, তাহার দায় আমার নাভেই

ঘা চাপিবে কেন?' নিয়ম পালন করিলে এ কথাটা জোর গলায় বলিতে পারা যায়। আর যে কোনও নিয়মই মানিয়া চলে না তাহার সম্বন্ধে অপরের খুঁৎখুঁতি তো দূর হয়ই না, তারও নিজের প্রতি একটা সন্দেহ থাকিয়াই যায়। মনে হয়, বোধহয় এটা আমার সাধ্য ছিল, কিন্তু আমি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছি। আর যে জায়গায় পরের কাছে আত্মসম্মান বজায় রাখার দিকে পরদৃষ্টি থাকে, সেখানে নিজের প্রতি সন্দেহটাকে অভিমানে আবৃত করিয়া সহজেই সে ভাবিয়া বসে, "আমার তো কাজের ফুরসুৎই নাই, তবুও ওরা দোষ দেয় কেন?"

নিয়মসংযমে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আনন্দ কর, তার জন্য কাহারও কাছে জবাবদিহী করিতে হইবে না। যে আপনাকে জয় করিয়াছে, সে জগৎ জয় করিয়াছে। মানুষে মানুষের কি করিতে পারে? তুমিই তোমার বন্ধু, তুমিই তোমার শত্রু। অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে যাওয়া সহজ, নিজের উপরই কর্ত্তৃত্ব খাটানো চলে না।



অধ্যাত্মসংবাদ

[স্বামী রামতীর্থ]

জানই তো, সূর্য্য সব সময় ঠিক ঠিক আলো দিচ্ছে বটে, কিন্তু জলে তার যে প্রতিবিম্বটা পড়ে, সেটা সব সময় ঠিক একরকম থাকে না। জলটা যখন জমে বরফ হয়ে যায়, তখন তার ওপরে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না। আবার জল যখন বাষ্প হয়ে যায়, তখনও সূর্য্য ঠিক তার ওপর পড়তে দেখি না। তাহলে জলের কঠিন, তরল ও বায়বীয় এই তিনটী অবস্থার মধ্যে কঠিন অবস্থায় তার মাঝে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না; জল যখন তরল থাকে, তখন প্রতিবিম্ব পড়ে বটে; কিন্তু আবার বায়বীয় অবস্থায় গেলেই প্রতিবিম্ব পড়ে না। জলের অবস্থার যেমন পরিবর্ত্তন হয়, তার সঙ্গে সূর্য্যবিম্বেরও তেমনি হয়ে থাকে। এই সব মাটীর সরার মত স্থূল দেহগুলিকে উদ্ভিদ রূপ, জান্তব রূপ ও মানবরূপ—এই তিন রূপে ভাগ করতে পারি। এমন একটা সময় থাকে, যখন সূক্ষ্মদেহটা জলের কঠিন অবস্থার মত অতি স্থূলভাবে যেন গঠিত থাকে। তখন সূর্য্য মাথার উপর থেকে সর্ব্বক্ষণ আলো দিলেও কিন্তু তার প্রতিবিম্ব পড়ে না। উদ্ভিদ ও জীবজানোয়ার ক্রমবিকাশে উন্নত হচ্ছে বটে, তবু "আমি করছি" এমন ভাব কিন্তু তাদের মাঝে নাই—কর্ত্তৃভাবের লেশমাত্রও তাদের মাঝে নাই অর্থাৎ আত্মবিম্বের কোনও

নিদর্শন তাদের মাঝে পাওয়া যায় না। এদের মাঝে, এমন কি সমস্ত প্রাকৃতজগতেই সূর্য্য হতে সবার বিকাশ ও উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু তাদের মাঝে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ে না; যেমন হিমালয়ের শৃঙ্গে সূর্য্য বরফ জমায় ও গলায় বটে, কিন্তু বরফে তার প্রতিবিম্ব পড়ে না। সূর্য্যরূপী আত্মার প্রভাবে ও কর্ত্তৃত্বেই উদ্ভিদ্ জগৎ ও প্রাণিজগতের ক্রমবিকাশ ও উন্নতি হচ্ছে বটে কিন্তু সূর্য্যের বাস্তব কর্ত্তৃত্ব ও শক্তি তারা অঙ্গীকার করতে পারছে না— আত্মার কর্ত্তৃত্ব এই সমস্ত ক্ষুদ্র দেহে উপচরিত হচ্ছে না। প্রমিথিউসের মত তারা স্বর্গ হতে আগুন চুরী করে আনতে পারেনি; "আমি এ করছি, তা করছি"—ইত্যাকার আত্মন্তরী ভাব তাদের মাঝে ফোটেনি।

সূক্ষ্ম শরীরটা যেন তরলিত হয়ে এই সমস্ত অস্বচ্ছ উপাদানে তৈরী আধারের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে করতে অবশেষে মানুষের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আধারে এসে পৌছায়। মানুষের অবস্থাটা যেন স্বচ্ছ, তরল। এর মাঝেই আত্মার আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব পড়ে। আগের মত এখানেও আসল কর্ত্তা হচ্ছেন আত্মরূপী সূর্য্যই বটে, কিন্তু তবুও এর মাঝে আত্মার প্রতিবিম্ব অহঙ্কার বা কর্ত্তৃত্ববোধযুক্ত আমির আকারে স্ফুরিত হয়ে থাকে। প্রাণি-জগতের নিম্নস্তরে বা উদ্ভিদ্‌জগতে "আমি করছি" এই ভাবটা নাই। মিথ্যা আমির ভাবটা মানুষের মাঝেই ফুটে ওঠে। "আমি কর্ত্তা"—এই ভাবটাই হচ্ছে মিথ্যা অহঙ্কার বা জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব। এই অহং মিথ্যা —অবাস্তব। ঈশ্বরই বাস্তবিক কর্ত্তা, তিনিই সব করছেন। তিনিই একমাত্র দায়সম্পন্ন প্রভু; কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ সূক্ষ্মশরীর এই দায়িত্ব নিজের বলে গ্রহণ করে। কর্ত্তৃত্ব-বোধের আরোপ থেকেই তুচ্ছ, মিথ্যা, ক্ষুদ্র অহং এর উৎপত্তি। জলের প্রতিবিম্বটা যেমন অবাস্তব, এই আমিও তেমনি অবাস্তব। বৈজ্ঞানিকেরা গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করে থাকেন যে, দর্পণ বা জলে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেটা অবাস্তব। এই দায়িত্ববোধসম্পন্ন স্বার্থ-নিবিষ্ট অহংও তেমনি অবাস্তব। তরল অবস্থা বা সূক্ষ্মদেহের পরিণাম সূর্য্য হতেই সংঘটিত হয়ে থাকে। সূক্ষ্মদেহ সূর্য্য হতে বা আত্মা হতে ক্রমেই বেশী আলোক ও উত্তাপ সংগ্রহ করে তার ঘনীভূত অবস্থাকে আরো লঘু করে থাকে। মানুষ যখন আত্মার জ্যোতিঃ বা জ্ঞান সমধিক পরিমাণে সংগ্রহ করে, তখন তার সূক্ষ্ম শরীরেরও একটা পরিণাম ঘটে। সূক্ষ্ম শরীরটা যেন তখন বায়বীয় হয়ে যায় এবং তার দরুণ স্থূলদেহের আধারে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব তাতে আর পড়ে না। তখন মিথ্যা অহং বা প্রতিবিম্ব অহং সূর্য্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়। আবার দেখছি, উদ্ভিদ্ জগৎ বা প্রাণিজগতের অবস্থা এসে উপস্থিত হল—আর কোনও দায়িত্ববোধ থাকল না; "আমি করছি" এমন কোনও ভাব তখন নাই —"আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক", এমন কোনও জবরদস্তী নাই—এ সব ভাব একদম দূর হয়ে গেল। অবাস্তব বা প্রতিবিম্ব আমকে এখানে আর দেখা যায় না; নকল-নবিশী বা ব্যবসায়বুদ্ধি দূর হয়ে যায়। সর্ব্ব-গ্রাসী স্বার্থপর আমিত্ব তখন আর থাকে না।

বায়বীয় পদার্থকে কখনও এক পাত্র হতে আর এক পাত্রে ঢালা যায় না। তরল বা কঠিন বস্তু ঢালাঢালি করা চলে, কিন্তু গ্যাস যে পাত্রে থাকে, সে পাত্রটা ভেঙ্গে

গেলেই বাতাসে তা ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুমাত্রেরই তাই লক্ষ্য এই যে, এমন সূক্ষ্মাবস্থায় গিয়ে তাঁরা পৌঁছাবেন, যেখানে আর পুনর্জন্মের আশঙ্কা না থাকে। হিন্দুজননীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ—এমন পুত্র তিনি প্রসব করবেন, যাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে না।



"মুক্তপুরুষের আত্মা মৃত্যুর পর সূক্ষ্মশরীরে থাকে না লীন হয়ে যায়?"

—গ্যাস পাত্রমুক্ত হলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ছেয়ে ফেলে। তেমনি মুক্তপুরুষের দেহ সমস্ত জগতেরই দেহ।

"সূক্ষ্মশরীর কিসে তৈরী?"

—বাসনা, কামনা, চিন্তা, নানা মনোবেগ—এই সমস্ত দিয়ে সূক্ষ্ম শরীর তৈরী। মুক্ত পুরুষের বাসনা বৈয়ক্তিক নয়—তার মাঝে স্বার্থপরতার লেশমাত্র থাকে না। যে সমস্ত বাসনা স্বার্থগন্ধশূন্য ও সার্বভৌম, তাই দিয়ে যে সূক্ষ্ম শরীর তৈরী হয়, সেটা যেন বায়বীয় অবস্থায় থাকে। গ্যাসের আধার স্থূল পাত্রটা যখন ভেঙ্গে যায়, গ্যাস তখন আর জমাট বেঁধে থাকে না—সমস্ত বিশ্বময় তা ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিহাসে আছে, পারস্যরাজ সাইরাস আমরণ লোকের হিতকামনায় ও সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁর চরম পত্রে তিনি ব্যবস্থা করলেন, "আমার দেহটা যেন জাঁক করে সমাধি দেওয়া না হয়—ওটাকে কুচি কুচি করে কেটে পারস্য রাজ্যময় যেন ছড়িয়ে দেওয়া হয়—যাতে জমীতে সার হয়।" মুক্তপুরুষের সূক্ষ্মদেহও তাই হয়। তাঁর সূক্ষ্মশরীর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই তাঁকে গ্রহণ করে—তাঁর মাংস খেয়ে, তাঁর রক্ত পান করে জীবনধারণ করে যেন। তাঁর সূক্ষ্মদেহ এমন যে সমস্ত জগৎ তাকে খণ্ডবিখণ্ড করে আহার করে। এমনি করে অভিমান দূর হয়ে যায়। মুক্তপুরুষ কথা বলুন, আর না বলুন, বই লিখুন, আর না লিখুন, লোকের কাছে শক্তি তা দিন আর না দিন, আশ্চর্য্যরূপে কিন্তু তিনি জগতের সেবা করে থাকেন। তিনি আশ্চর্য্য সংস্কারক। সসাগরা পৃথিবীশ্বরের রাজকোষেও এমন কিছু নাই, যা তাঁর কাম্য। জগতের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থেও তাঁর শিক্ষণীয় কিছু নাই। রাজার সমাদর বা ভ্রূকুটী দুই-ই তাঁর কাছে অর্থহীন। যতদিন তিনি বেঁচে থাকেন, ততদিন তাঁর পুণ্য সঙ্গ ও পূতদৃষ্টি কেবল শুচিতা ও কল্যাণ বর্ষণ করে। তাঁর মৃত্যুতে জগৎ আশ্চর্য্যরূপে সংস্কৃত হয়।

ধর, এখানে সূর্য্যের তাপে বাতাস বিরলীকৃত হল। বিরল হলেই সেটা স্বভাবতঃ উপর দিকে উঠে যাবে, নীচের জায়গাটা ফাঁক পড়ে যাবে। তার ফল কি হবে?—চার দিক থেকে ঘন বাতাস এসে তার স্থান পূরণ করতে থাকবে। এমনি করে সমস্ত বায়ুমণ্ডলে একটা গতি ও আবর্ত্তের সৃষ্টি হবে। যিনি পূর্ণ মানুষ, দেহ জ্ঞান হতে মুক্ত, বাসনা শূন্য—তাঁর কখনও পুনর্জন্ম হয় না। মৃত্যুতে তাঁর সূক্ষ্মদেহ জগতে তার স্বাধিকার ছেড়ে ঊর্দ্ধে উঠে যায়, কেননা আত্মরূপী সূর্য্য হতে তিনি প্রচুর পরিমাণে সত্যরূপী তাপ সংগ্রহ করে শোষণ করেছেন। এমনি করে বিরলীকৃত বাতাসের মত তাঁর সূক্ষ্মদেহ জগতের ঊর্দ্ধে উঠে যায়। তখন তাঁর জায়গা খালি পড়ে যায়, আর তাঁর পুনর্জন্ম না হওয়াতে যারা তাঁর নিকটতম, ভগবদ্বিধানে

তারা এসে তাঁর স্থান অধিকার করে উন্নতি লাভ করে। তখন আবার যারা এদের সন্নিহিত ছিল, তাদেরও ঊর্দ্ধগতি হয়—এমনি করে সমস্তটা জগৎই ঊর্দ্ধগতি লাভ করে—আপনা হতে তার মাঝে পরাগতির সঞ্চার হয়। এই তো এক আশ্চর্য্য সংস্কারক। মুখ ফুটে তাঁকে কিছু বলতে হয় না বটে, কিন্তু তবুও জগৎকে তিনি উন্নত করেন।

আর্কিমেডিস বলেছিলেন, "দাঁড়াবার একটা জায়গা পেলে আমি জগৎটাকে নড়াতে পারতাম।" জগৎটাকে নড়াবার মত ধ্রুববিন্দু তিনি খুঁজে পাননি। বেদান্ত বলছেন যে ধ্রুববিন্দু যে তোমার মাঝেই। তিনিই তো তোমার আত্মা। তাঁকে আশ্রয় করলে অনায়াসে জগৎটা নড়াতে পারবে।

মিথ্যা আমির সম্বন্ধে দুচারটা কথা বলব। পাত্রের জলে যেন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে। আলোকবিজ্ঞান প্রমাণ করছে যে, প্রতিবিম্বটা অবাস্তব। আলোটা আসলে বাইরে রয়েছে, জলের মাঝে প্রতিবিম্বটা শুধু আলোকের পরাবর্ত্তনের দরুণ হয়েছে। ওটা কেবল আমাদের অনুমানলভ্য বস্তু—ইন্দ্রিয়ের ফাঁকী ওটা। জলে বা কাচে আলো বলে বাস্তবিক কিছু নাই। প্রতিবিম্ব তাহলে ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। জলটা নড়লে এই আপাতদৃশ্য প্রতিবিম্বটাও নড়বে—জলটার যতটুকু নড়চড় হবে, ওরও সেই অনুপাতে নড়চড় হবে।

চুল গজায় বা রক্তধারা বয় কার শক্তিতে? এ কি এই তুচ্ছ আত্মম্ভরী নকলনবীশ আমিটুকুর জোরে? মোটেই নয়, তথাকথিত কর্ত্তা আমির গুণে মস্তিষ্কে চিন্তাস্রোত বয় না। দূর করে দাও এই মিথ্যা অহং—আত্মস্বরূপকে অনুভব কর। তুমিই যে বিশ্বরাজ—তুমি জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ—শুচির শুচি!

সুষুপ্তিতে দেখি, সূক্ষ্মদেহটা যেন কিছুকালের জন্য কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। রক্ত বইছে, খাদ্য পরিপাক হচ্ছে, কিন্তু "আমি পরিপাক করছি"—এমন ভাব তো জাগছে না। স্বপ্নাবস্থাতে সূক্ষ্মদেহটা কঠিন অবস্থা হতে যেন তরল অবস্থায় এসে পড়ে; তখন সূর্য্যের প্রতিফলন আরম্ভ হয়, তোমরাও "আমি এই চাই—এই করি" এমনতর কথা বলতে সুরু কর। স্বার্থময়, কর্ত্তৃত্বাভিমানী বাসনাযুক্ত প্রতিবিম্ব 'আমি' আবার তোমার মাঝে ফুটে ওঠে। এই স্বার্থপূর্ণ ব্যক্তিত্ববোধ যদি সত্য হত, তাহলে চিরকাল সে থাকত। কিন্তু সুষুপ্তিতে সে ছিল না কেন? সুষুপ্তিতে না থাকাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে, এই লাভান্বেষী অহংটা একেবারেই মিথ্যা। এর ঊর্দ্ধে ওঠ দেখি! তুমি সবিতার সবিতা, তুমি পূর্ণানন্দ, তুমি সত্যস্বরূপ—তত্ত্বমসি—নান্যৎ কিঞ্চন!

সাধারণ লোকের পক্ষে মুস্কিল হচ্ছে এই যে, মিথ্যা আমিকেই তারা স্বরূপ বলে মনে করে; এর মোহ তারা ছাড়তে পারে না। এই হল সকল বিপত্তির গোড়া।

জল বইছে। তাতে ছোট-বড় ঢেউ উঠছে। কিন্তু সবার মূল হচ্ছে সৌরশক্তির ক্রিয়া। জলে যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ছে, তার ক্রিয়া মোটেই নয়। সেটা বরং জল যেমন নড়ছে, তেমনি নড়ছে চড়ছে। সূক্ষ্ম শরীরটাও এই জলের মত। আত্মার শক্তিতেই তাতে আন্দোলন উপস্থিত হয়—ঢেউ ওঠে। অথচ মিথ্যা অহংএর প্রতিবিম্বটাই এমনভাবে নড়ে চড়ে ওঠে, যেন তার হেতুটা জলের মাঝেই আছে। প্রতিবিম্ব মানে

দেহাত্মবোধ, মনাত্মবোধ ইত্যাদি। দেহের অসুখ হয়, কিন্তু তুমি বল, "আমার অসুখ হয়েছে।" কেননা দেহ মনকেই যে তুমি আমি ভেবে নিয়েছ। বেদান্ত বলেন, এই অধ্যাস মিথ্যা—এটা ছেড়ে দিতে পারলেই স্বরূপ পাবে। দেহ মনের গোলযোগে তুমি ব্যস্ত হবে কেন? মিথ্যা অহং নিয়ে মিথ্যা ভাবুকতাতেই তো যত দুঃখ পাও।

*

"দেহে থাকতেই কি আত্মার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব?"

—আত্মা বলতে কি বোঝ, তার ওপর এ কথার উত্তর নির্ভর করছে। আত্মা কথার অর্থ কি? মনই কি আত্মা? বার্কলি, মিল, হ্যামিল্টন, রীড্—সবাই মনকেই আত্মা ধরে নিয়েছেন। এই অর্থে আত্মার অনন্ত উন্নতি সম্ভবপর। কিন্তু আত্মা বলতে যদি সত্যের প্রতিবিম্ব বোঝ, তাহলে প্রশ্নটা নিরর্থক।

আত্মা বলতে যদি সত্যস্বরূপকে বোঝ, তাহলে উন্নতি বা পরিবর্ত্তনের তো কোন্ অবকাশই থাকে না। কিন্তু সাধারণতঃ আত্মা কথাটা মানুষের কাছে একটা ভ্রান্তি—একটা অর্থহীন নামমাত্র। এরা নিজেরা এ বিষয়ে নিজের খুসীমত সিদ্ধান্ত গড়ে নিতে পারে।*

* স্যানফ্রান্সিস্কো, আমেরিকা—ডিসেম্বর, ১৯০২।

বেদান্তসার

—*—

[ষষ্ঠ খণ্ড—বিবৃতি—অধ্যাসবাদ]

অজ্ঞানের স্বরূপ

অধ্যাসের প্রসঙ্গ হইতেই অজ্ঞানের কথা আসিয়া পড়ে। মূলে আচার্য্য কথাটা এই ভাবে তুলিয়াছেন—"বস্তুতে অবস্তুর আরোপই অধ্যাস। ব্রহ্মই বস্তু; এবং অজ্ঞানাদি নিখিল জড়সমূহই অবস্তু।" ইহার পরেই স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠে, তাহা হইলে অজ্ঞান কি? মূলে আচার্য্য বলিতেছেন—"অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ং, ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধী, ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদ্ ইতি বদন্তি।" এই উক্তিটাকে অজ্ঞানের লক্ষণ বলা যাইতে পারে। ইহাকে বিশ্লেষণ করিয়াই আমাদিগকে অজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। আচার্য্যের বিচারের ভূমিকাস্বরূপ মোটামুটী ভাবে দুই চারিটী কথা আমরা বলিতে চাই।

অজ্ঞান কি, তাহা বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ অজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের প্রাকৃত অভিজ্ঞালব্ধ যে সংশয় রহিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে। অজ্ঞান বলিতে সাধারণতঃ আমরা জ্ঞানের অভাবকেই বুঝিয়া থাকি এবং এই অভাব-প্রত্যয়টাই আমাদের চিত্তে এত সুস্পষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠে যে ইহাতে অজ্ঞানের বাস্তব সত্তার কোনও ধারণাই আমাদের মনে আসিতে পায় না। জ্ঞান বলিতে আমরা স্থূল কোনও বিষয়ই বুঝি না, বিষয়াতীত প্রত্যয়কেই

বুঝিয়া থাকি ; কিন্তু বিষয়ের অনুগ্রাহকরূপে জ্ঞানের বাস্তব সত্তার একটা সংস্কার আমাদের চিত্তে থাকিয়া যায়। জ্ঞান বিষয়াতীত বটে, কিন্তু তা বলিয়া তাহা চিত্তের শূন্যতা নহে। এমন কি চিত্ত একাগ্র হইলে সাধারণ অবস্থাতেও কদাচিৎ চকিতে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত বিষয়নিরপেক্ষ জ্ঞানের বাস্তব প্রতীতি আমাদের চিত্তে ভাসিয়া উঠে, তখন জ্ঞানের সত্তা আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত, এইরূপ বোধ আমাদের জন্মিয়া থাকে।

কিন্তু অজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে সর্ব্বদাই একটা নিশ্চেষ্ট ভাব রহিয়াছে। একটা কিছু না জানা আমাদের কাছে কেবল মাত্র না-জানাই ; ইহার অন্য কোনপ্রকার ফলোপধায়কত্ব যে আছে, তাহা আমাদের মনেই আসে না। এই জন্য অজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের মনোবৃত্তির কোনও সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের চিন্তাধারায় কোথাও স্থান পায় না। পতঞ্জলির বিকল্পবৃত্তির লক্ষণ প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারি, আমাদের অজ্ঞানসম্বন্ধীয় সংস্কার কেবলমাত্র শব্দজ্ঞানের অনুপাতী বাস্তবতাশূন্য একটা ছায়ামাত্র। "অজ্ঞান" এই কথাটায় অভাবের যে দ্যোতনাটুকু রহিয়াছে, সেইটুকু মাত্র আমরা ধরিতে পারি এবং এই সংস্কারটুকু বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে অন্বিত করিবার জন্য "জ্ঞানে"র একটা ভূমিকামাত্র চিত্তে ফুটাইয়া তুলি। ভূমিকানিরপেক্ষ আধেয়ের কোনও বাস্তব সত্তা আমাদের প্রতীতিতে জাগে না। 'অনন্ত' বলিতে বিশেষ করিয়া 'অন্তে'র কথাটাই মনের মাঝে উঁকি মারিতে থাকে, অন্তকে অতিক্রম করিয়াও অনন্তের একটা বাস্তব পূর্ণতর রূপ আমরা কোথায়ও খুঁজিয়া পাই না ; অজ্ঞানের বেলাতেও ঠিক তাহাই হয়।

অজ্ঞানের মাঝে অভাবপ্রত্যয়ের অংশটুকুই যে বিশেষ করিয়া আমাদের চিত্তে ফুটিয়া উঠে, ইহা দোষের নয়। কেননা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে উহাও অজ্ঞানের একটা বাস্তব দিক। কিন্তু ইহাতে অজ্ঞানের স্বরূপের আর একটা দিক যে ঢাকা পড়িয়া যায়, তাহাতেই বিপত্তি। বেদান্ত কোথায়ও অবিদ্যা বা অজ্ঞানকে নিষ্ক্রিয়, অবাস্তব বা অভাবপ্রত্যয়মাত্রই বলেন নাই। অবিদ্যার স্বরূপের সঙ্গে অভাব ও ভাব যে জড়িত হইয়া রহিয়াছে, বেদান্ত সর্ব্বত্র সে কথাটা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন এবং উভয় পক্ষের মর্য্যাদা তুল্যভাবে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এই জায়গাতেই অপরের গোল হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে কল্পনার আতিশয্যে ভাবের দিকটা এত ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে যে ব্যাকরণের কল্যাণে অবিদ্যাকে নারীতে রূপান্তরিত করিয়া ঘরকন্নার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; আবার পাশ্চাত্য দেশে কল্পনার অন্ধতায় অবিদ্যার নাস্তিদিকটা মাত্র দেখিয়া বেদান্তের মায়াবাদকে জগদ্রহস্য ভেদে মানব-বুদ্ধির অপটুত্বের নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সত্যান্বেষীকে এই উভয় প্রকার অতিক্রান্তিই বর্জ্জন করিতে হইবে। ইহার জন্য চিত্তের সংস্কার পরীক্ষা প্রয়োজন। অজ্ঞান সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে বিকল্পবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছি, চিত্তস্থৈর্য্যের অভ্যাসদ্বারা তাহা দূর করিয়া অজ্ঞানের স্বরূপাবধারণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। এমন কি, নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, অজ্ঞানের স্বরূপ চিনিতে পারিলেই মুক্তি—ইহা বেদান্তীর সিদ্ধান্ত।

অজ্ঞানকে বেদান্ত কি ভাবে বোঝেন,

তাহা আমরা প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত আচার্য্যের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারি। অজ্ঞানাদি জড়সমূহ—এই একটী কথাই অজ্ঞানের স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা বিপর্য্যস্ত করিতে সমর্থ। অজ্ঞানকে যদি জড়সমূহের আদি বা উদ্ভবস্থান বলি এবং জড় বলিতে দেহ, মন, বুদ্ধি—ইত্যাদি psychic principleকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই, তাহা হইলে কথাটা সকলের কাছে সহজবোধ্য হইবে না। কিন্তু বেদান্ত অজ্ঞানকে এইভাবেই বুঝিয়া থাকেন—উহা কেবল মাত্র inertia নহে, forceও বটে। আর psychic principleর জড়ত্ব বিবেকদৃষ্টি না খুলিলে বুঝিতে পারা যাইবে না; ইহার জন্য সাংখ্যশাস্ত্রকারের শরণ লইতে হইবে। বিস্তার করিয়া সমস্ত কথা বুঝাইবার স্থানাভাব; আমরা শুধু মোটামুটী দুই চারিটা ইঙ্গিত দিয়াই ক্ষান্ত হইব।

বেদান্তী যে প্রতীতির জগৎকেই মানেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বে আরও বলিয়াছি। অজ্ঞানকেও এই প্রতীতির জগতেই স্থান দিতে হইবে। এ কথাও পূর্ব্ব হইতে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে এই প্রতীতি কল্পনা বা imagination নয়। ইহা বস্তুরই সূক্ষ্মস্বরূপ। আমরা সাধারণতঃ স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং স্থূলানুরক্ত; জগৎটাকে স্থূল পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়া দেখিতে পারিলেই তবে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হই এবং এই স্থূলের প্রত্যক্ষ হইতেই স্মৃতির ভিতর দিয়া সূক্ষ্মরূপগুলি চিত্তে সঞ্চিত হইয়া অবাস্তব মনোলোকের সৃষ্টি করে—ইহাই আমাদের ধারণা। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিবেন, আমাদের এই ধারণা বিপর্য্যস্ত অতএব অসত্য। স্থূল হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া সূক্ষ্মের কল্পনা করা নয়—সূক্ষ্ম হইতেই স্থূল অভিব্যক্ত, এই ভাবে দেখিতে শিখ। তাহা করিতে হইলেই পূর্ব্বে সংস্কারসংগ্রাহক স্মৃতিবৃত্তির সংযম করিতে হইবে। স্মৃতি স্থূল হইতে সামগ্রী কুড়াইয়া সূক্ষ্মে জমা করে; এই অভ্যাসটী ছাড়িয়া প্রথমতঃই স্মৃতির সহায়তা ভিন্ন অপরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে—এবং আমার অন্তর হইতেই বহির্জগৎ অভিব্যক্ত হইতেছে—এইরূপ ভাবকে সমস্ত অভিজ্ঞার পিছনে সাক্ষিরূপে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এইরূপ অন্তরাবর্ত্তিত দৃষ্টিতে যে জগৎ ফুটিয়া উঠিবে, তাহা বেদান্তীর প্রতীতিগ্রাহ্য জগৎ। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ বা পাশ্চাত্য idealism হইতে ইহা উৎকৃষ্ট, কেননা এই প্রতীতি বিজ্ঞানবাদের মত আত্মার একরসিকী অনুভূতি হইতে বঞ্চিত নয়, কিম্বা বিচ্ছিন্নসংস্কারের সত্তা মাত্রও নহে। এই প্রতীতিতে জগৎ পূর্ণরূপে আমার পূর্ণতা হইতেই অভিব্যক্ত এবং আমার পূর্ণতা তাহাতে অব্যাহত, বরং অধিকতর সুপরিস্ফুট। এই প্রতীতির জগতে বস্তুসত্তার যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে, অজ্ঞানকে সেই মূল্য দিতে হইবে। তাহাতে অজ্ঞানের কি স্বরূপ প্রকটিত হইবে, তাহা বলিতেছি। (২৯)

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামম্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৭১।৩

—*—

তোমার যতই অশান্তি আসুক, পারিপার্শ্বিক তোমায় যতই আঘাতে জর্জ্জরিত করুক, তাতে মনকে মলিন করলে চলবে না। অপমান অবহেলা যতই আসুক, সবই তোমার মাথা পেতে নিতে হবে। জগত তোমায় তাচ্ছীল্যের কটাক্ষ করে করুক, তুমি হাসি মুখে তা বরণ করে নাও। তাদের কাছে তুমি ঘৃণিত হয়েই থাক না। তাদের ক্ষমতা আছে, সামর্থ্য আছে—তারা করতে পারে তোমায় অবজ্ঞা, তারা থাকতে পারে মুখ ফিরিয়ে। বেশ তুমি একবার তাদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে তোমার হৃদয়ের ধন প্রাণের সখায় মনে কর না ; জগতের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার হৃদয় বীণায় সুর দিয়ে গাও না—

নাথ, যার যাহা আছে, তার তাই থাক,
আমি থাকি চির লাঞ্ছিত।
শুধু, তুমি এ জীবনে, নয়নে মননে
থাক মোর চির বাঞ্ছিত ॥

তবেই তুমি এই সব দুঃখ সব বেদনাকে আনন্দে ভাসিয়ে দিতে পারবে, তবেই জগতের সামনে তোমার নিষ্কলঙ্ক হাসিমুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে।

*

মানুষ স্বভাবতঃই সরল এবং উদার ভাবকে ভালবাসে, এবং এইরূপ উদার সরল প্রাণের সঙ্গও চিত্তের উন্নতিকর। যে যতই খারাপ চরিত্রের মানুষ হউক না কেন, সে যখনি একটু নির্জ্জনে বসবে বা স্থির হয়ে থাকবে, তখনই তার মনের মাঝে এমনি ভাবের একটা চিত্র জাগবেই। এই যে জাগা, এটা তার মনেরই এক অংশ। সাধারণ মানুষও যখন তার সঙ্গী নির্ব্বাচন করে, তখন সেও চায় তার সেই বস্তুটীকে সরলতার অমিয় সৌন্দর্য্য মাখিয়ে নিতে। এই যে ভাবের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য, এটা আমরা শিশুর মাঝে পাই এবং সেই সরলতার সৌন্দর্য্য নিয়ে আর অভাবনীয় উদারতার দৃষ্টি নিয়ে যখন একটী ছোট ছেলে এসে সামনে দাঁড়ায়, তখনই মনের নিভৃত প্রদেশ হতে যেন কে গেয়ে ওঠে—

আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ ;
মুখে মাখা সরলতা, কয় না সাজান কথা,
জানে না যুগাতে মন করি নানা ভান—
আমি চাই স্বরগের অমিয় পরাণ !

*

যা চাও, তা তোমার ভিতরেই আছে। সুখ বল, জ্ঞান বল, শক্তি বল, সকলই আত্মার মাঝেই আছে। এ সব পাবার জন্য যখনই তুমি ইন্দ্রিয়পথে বাহিরে ছুটে চলেছ, তখনই তোমার ভুল হচ্ছে। অনন্ত জ্ঞানশক্তি ও আনন্দের স্বরূপ আত্মার মাঝে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে ডুবিয়ে দাও, তাহলেই

সব পাবে, পুরুষসিংহ তোমার মাঝে জেগে উঠে বলবেন—

"চিদানন্দরূপা শক্তিরহম্"—
"চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্।"

*

স্যাণ্ডো বা বড় বড় পালোয়ানদের মাঝে যে শক্তি আমরা দেখতে পাই, তা তাদের ডাম্বেল, মুগুর বা কুস্তির ভিতর ছিল না। তা ছিল তাদের নিজেরই মাঝে। ঐ দ্রব্যের অবলম্বনে আত্মপীড়ন করায় সেই শক্তি জেগে উঠেছে মাত্র। বৈজ্ঞানিকগণ যে সত্য প্রচার করেছেন, তা সমস্তই অন্তরে পেয়ে বাহিরে বলেছেন মাত্র। এই রকম করে বাহির ধরে বিচার করলেও আমরা দেখতে পাই, মানুষ জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের উৎস স্বরূপ। সবই তার আছে, কিন্তু তথাপি মোহে আবদ্ধ হয়ে সে নিজকে দীনহীন কাঙ্গাল ভাবছে। জ্ঞানের আগুনে এই মোহ দূর করে দাও। হৃদয়ে বল পাবে, শক্তি জেগে উঠবে—আনন্দে ভরপুর হয়ে যাবে।

*

সাধক যাঁরা, তাদের বাধা বিঘ্ন দেখে ভয় পেলে চলবে না, বিপদ আপদের মধ্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করে নিজের জ্ঞানকে অব্যাহত রাখাই সাধকজীবনের সার্থকতা। বিপদের মাঝে নিজের শক্তিকে যাচাই করে দেখতে হবে—তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে—অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে বুঝা যায় না কোনটা খাঁটি সোণা আর কোনটা খাদমিশান সোণা।

*

সারাদিন ধরে শুধু একরকমের কাজই তো কর না—কত রকমের কত কাজ তোমার করতে হচ্ছে। তোমার মনোবৃত্তি এই সব করতে গিয়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করে; কোনটায় হয়ত বেশী মনোযোগ দেয়, কেননা সেটা তোমার রুচির অনুকূল; কোনটায় কম মনোযোগ ঘটে, আবার কোন কাজ হয়ত ঠেলায় পড়ে দায় সেরে যাও, মনোযোগের লেশমাত্র তাতে থাকে না। কিন্তু কর্ম্ম যার সাধনা, তার চিত্তে এমন বিমিশ্র ভাব থাকলে তো চলবে না। তোমরা কেবল কাজের বহিরাবরণটাই দেখছ—তার মূলে কি আছে, তা তো দেখছ না। কাজের মাঝে আমাদের সেই অন্তঃশক্তির স্ফুরণই দেখতে হবে। বাইরের প্রভেদ নিয়ে নিজেরাই যদি নিজের চিত্তকে বিশৃঙ্খল করে উদ্দেশ্যে উপায়ে গোল পাকিয়ে বসে থাক, তবে অন্তরে তিনি যে কি শক্তি দিচ্ছেন, তা ধরবে কি করে?—এমন কাজে আনন্দ তো কোনদিনই পাবে না। কাজেই কাজের বাইরদিকটা ছেড়ে অন্তরের দিকেই তাকাতে হবে। প্রত্যেক দিন সকাল থেকে রাত্রি শোবার আগ পর্য্যন্ত সারাদিনের সমস্ত কাজকে একসুরে গেঁথে চলতে হবে। প্রত্যেকটা কাজকে খণ্ড খণ্ড মনে না করে সবগুলি মিলিয়ে একটা অখণ্ড কাজে আমি ব্রতী হচ্ছি, এই মনে করে কাজে লেগে যেতে হবে। প্রত্যেকটাতেই সমান মনোযোগ দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। এমনি করে প্রত্যেকদিনের কাজগুলিকে অখণ্ড সাধনা বলে কাজ করতে করতে শেষে এমনি অবস্থা হবে—মনে হবে, সমস্তটা জীবনই একটা গভীর অন্তঃপ্রেরণাসম্ভূত অখণ্ড কর্ম্মপ্রবাহ। চিত্ত তখন নির্ব্বিকার হয়ে পড়বে। তখন কোদাল মারছ যে মন নিয়ে, আবার লিখছও সেই মন নিয়ে, খাচ্ছ-ঘুমাচ্ছ সবই সেই মন

নিয়ে।* "মনোযোগ" বলে একটা কথা তখন আর জোর করে টেনে আনতে হবে না, ও.তঃ অনাসক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে অবিচল আনন্দ, তা লাভ হবে। মনে যদি আনন্দ থাকে, তবে শক্তির অভাব হয় না—কাজও সুন্দর হয়; এ কথা যে কত সত্য, তা তখনি বুঝবে।

*

ক্ষুদ্রকে ভালবাসার নাম আসক্তি আর বিশ্বকে ভালবাসার নাম প্রেম। তোমার হৃদয়ের ভালবাসাকে গণ্ডীবদ্ধ কর না, তাহলে সেটা মোহ আনবে ; তাকে নিজ অন্তরে পোষণ কর, দেখবে তোমার ভালবাসার পাত্র সব জায়গাই আছে। তুমি নিজেই প্রেম-স্বরূপ—ভালবাসবে কাকে—নিজকে ভাল বাসতে শিখলেই—আত্মস্বরূপকে ভালবাসতে পারলেই নিখিল বিশ্বকে ভালবাসতে পারবে, আসক্তি তখন প্রেমে পর্য্যবসিত হবে।

*

অনেক দেশ জয় করিলেই, বা বহু শত্রু বধ করিলেই বড় বীর হওয়া যায় না। যিনি নিজের অন্তরপ্রদেশ জয় করিয়াছেন—অন্তরের রিপুগুলিকে দমন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বীর। অন্তরজয়ীর কাছে জগৎ জয় অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আত্মজয়ী পুরুষ ইচ্ছামাত্র সমস্ত জগৎকে বশীভূত করিতে পারেন। কারণ নিখিল বিশ্বে একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিকশিত হইতেছেন।

*

কমলে মধু আছে। কিন্তু সে ভ্রমরকে জানাতে যায় না। ভ্রমর গন্ধ পেয়ে আপনি এসে হাজির হয়। কমল তখন বুক পেতে দেয় ভ্রমরকে। ভ্রমরও ইচ্ছাসুখে মধু খেয়ে আপন খুসীতে উড়ে যায়। কমল কিন্তু তখন তার জন্য কাঁদতে বসে না। সাংসারিক জীবনেও তেমনি হতে হয়। অচল হয়ে আপন আসনে বসে আছি। যাদের নেবার তারা ছুটে আসছে, বুক উজাড় করে দিচ্ছি, দুহাতে তাদের জড়িয়ে ধরছি—কিন্তু আমার স্বার্থ নাই সেখানে। তাই আবার বিদায়-বেলা ঘনিয়ে এলেও চিত্ত চঞ্চল হয় না। আকাশের প্রশান্ত-বুকের উপর দিয়ে এমনি রোদ-বাদলের ঢেউ খেলে যায়—দিয়ে যায় শুধু সে লীলার মাধুরীটুকু। দ্রষ্টার আসনে থেকে অবিক্ষুব্ধ শান্তচিত্তের আনন্দদৃষ্টি নিয়ে আমি তাদের দেখব।

*

কি করে সে শান্তদৃষ্টি, সে মহান্ উদার ভাব আয়ত্ত হবে? সংসারের অভাব অভিযোগ যেখানে চারদিকে কেবল নিরাশার ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করে মনকে অহরহঃ চঞ্চল করে, সেখানে শান্তচিত্তের রসাস্বাদ কোথায়? এখানেই চাই সাধনা। সাধনা অর্থে আমার যা নাই, কেবল তাকেই অর্জ্জন করা নয়। যা আছে, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করাও সাধনা। আমাদের জীবনে এমন অনেক শুভক্ষণ আসে যখন বাইরের সমস্ত অভাবের তাড়না বিস্মৃত হয়ে আমাদের দৃষ্টি শুধু অন্তরের দিকে নিবদ্ধ হয়। তখন আমরা অন্তরের যে নিরপেক্ষ রূপটী দেখি, তাই আমাদের সাধন দৃষ্টি ফুটিয়ে দেয়।

*

তুমি হয়ত একটা নিদর্শন খুঁজে বেড়াচ্ছ, তোমার আত্মনিবেদন সত্য কি না, তুমি সম্পূর্ণরূপে তাঁর চরণে তোমার আমিকে নিঃশেষে দান করতে পেরেছ কি না ; দুঃখের আঘাত পেলে এ আত্মপরীক্ষার সুযোগ আমাদের ঘটে। ভগবানের শুভ ইচ্ছা যখন

আমাদের জীবনকে সুখময় করে তোলে, পার্থিব সুখ-লিপ্সা চরিতার্থতার ভিতর দিয়ে যখন আমরা তাঁর করুণা অনুভব করি, তখন তাঁকে আমরা ভালবাসি, তাঁর অপরসীম দয়ায় মুগ্ধ হই। কিন্তু সেই জগৎ নিয়ন্তা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই যখন আমাদের আশাকে পরাহত করে, আমাদের দুর্দ্দমনীয় সুখ-লিপ্সাকে দুঃখের কঠিন পাষাণ নিষ্পেষণে চূর্ণ করে দেয়, তখন তাঁর ইচ্ছায় অনুরক্ত হওয়াই পরীক্ষা। তাঁর উভয় ইচ্ছাকে এবং তার পরিণাম সুখ-দুঃখ, দৈন্য গর্ব্ব ও নিন্দা স্তুতিকে সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়মন বলে আনন্দে বরণ করে নেওয়াই আত্ম-নিবেদনের জ্বলন্ত পরীক্ষা। সুখকে ভালবাস—সে তোমার স্বভাব। দুঃখকে ভালবাসতে পারলেই বুঝবে তুমি ভগবানকে ভালবেসেছ, তোমার আত্মাহুতি সত্য হয়েছে।

*

একজন হারমনিয়ামযন্ত্রের বাদক যে কোন সুর সেই যন্ত্র থেকে বের করতে পারে। ঐ যন্ত্রটার ভিতরে সব রকম সুরের ঘাট সাজানো আছে। সবজান্তা ওস্তাদ তার খেয়াল অনুযায়ী যখন যে ঘাট টিপে ধরে, তখনই সে সুরটা বেরিয়ে পড়ে। তেমন তোমার ভিতরেও অনন্ত জ্ঞানের সুর সাজানো রয়েছে, তুমি একটা যন্ত্র। তোমার গুরুরূপী ওস্তাদ তার ভিতর থেকে যখন যে জ্ঞানের স্ফুরণ করতে চাইবেন, তোমার মনের ঐ বন্ধ ঘাটটীকে টেনে ধরলেই সেই জ্ঞানের দ্বার খুলে গিয়ে জগৎময় তার আলো ছড়িয়ে পড়বে। তোমার ভিতরে সব আছে, কিন্তু ঐ ওস্তাদটীকে পাওয়া চাই।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রমসংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত ২২শে আষাঢ় পুরী হইতে মঠাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশ পরিভ্রমণান্তে ৫ই শ্রাবণ মঠে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মঠেই অবস্থান করিবেন।

সাহায্যপ্রাপ্তি

ময়নামতী আশ্রমে—শ্রীযুক্ত শিবদয়াল পাল মোক্তার ৩০৲, ঐ সংগৃহীত ৩০৲ এবং কাঠ ইত্যাদি বাবদে অনুমান ৮০৲, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্ত সবজজ ৫০৲, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ্র সাহা ৮৲, শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী মুষ্টিভিক্ষা বাবদে ৬৲, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন দাস মুষ্টিভিক্ষা বাবদে ৫৲, শ্রীযুক্ত রাধানাথ দে মুষ্টিভিক্ষা বাবদে ১৲, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস মুষ্টিভিক্ষা বাবদে ১৲, শ্রীযুক্ত রাইবিনোদ পাল ২০৲। **সন্দ্বীপ হইতে**—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জী ৫৲, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ব্যানার্জ্জী ৫৲, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস ৫৲, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র কর্ম্মকার ৫, শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন গুহ ১০৲, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র তালুকদার ৫৲; সন্দ্বীপ হইতে সংগৃহীত ৫২৸০ এবং ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১১।০; শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস ২৫৲, শ্রীযুক্ত সারদাকুমার দাস ১১॥০, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দেব ১১৲, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ৫৲। দমদমা হইতে ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১৬॥০।

বাহুল্যভয়ে ৫৲ টাকার অনধিক দাতাগণের নামে উল্লেখ করা হইল না।

সারস্বত মঠে (অক্ষয়তৃতীয়োপলক্ষে)—শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দলই ১৲, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু নন্দী ১৲, শ্রীযুক্ত চক্রধর রায় ১৲, শ্রীযুক্ত পটলচন্দ্র দাস ১৲।



আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

শ বর্ষ } ভাদ্র { ৫ম সংখ্যা

অগ্নয়ে

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।১।১]

ঈলে যত্বা যজমানো হবির্ভি-
রীলে সখিত্বং সুমতিং নিকামঃ।
দেবৈরবো মিমীহি সংজরিত্রে
রক্ষা জনো দস্মেভিরনীকৈঃ॥

উপক্ষেতারস্তব সুপ্রণীতে-
গ্নে বিশ্বা নিধন্যা দধানাঃ।
সুরেতসা শ্রবসা তুঞ্জমানা
অভিষ্যাম পৃতনায়ূরদেবান্॥

আ দেবানামভবঃ কেতুরগ্নে
মন্দ্রো বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্।
প্রতি মর্ত্তাঁ অবাসয়ো দমুনা
অনু দেবান্ রথিরো যাসি সাধন্॥

৩৪

আ নো গহি সখ্যেভিঃ শিবেভি-
মহীভিরূতিভিঃ সরণ্যন্।
অস্মে রয়িং বহুলং সংতরুত্রং
সুবাচং ভাগং যশসং কৃধি নঃ ॥

বহু হব্য উপচারে পূজি তোমা, আমি যজমান—
তোমার প্রণয় যাচি, শুভ মতি কর মোরে দান।
স্তুতি তব গাহি নীতি—দেবসহ করগো কুশল,
দুর্দ্দম তোমার তেজে রক্ষ দেব মোদের সকল।

তুমি নেতা, তাই তব চরণের কাছে করি বাস—
পালিয়া তোমার ব্রত নিধি যত করিয়াছি আশ;
বীর্য্যসার অন্নে তব বাড়াইতে পারি যদি বল,
তব তেজে অভিভবি দেবদ্রোহী হিংস্র অরিদল।

দেবের সমাজে তুমি, হে পাবক, হয়েছ যে কেতু,
তাই স্তুত্য তুমি দেব, প্রজ্ঞাবান্, বিশ্বকাব্য-হেতু।
প্রতি মর্ত্ত্যবাসী তরে, হে দেবতা, পাতিয়াছ ঘর—
চল রথে আরোহিয়া, দেবব্রত, দেব-অনু-চর।

এস অগ্নি, চিরপান্থ, নিয়ে তব সখ্য শিবায়ন,
বিপুল আশ্রয়ে তব অনুগতে কর আপ্যায়ন;—
দাও ঋদ্ধি সুবিহ্বল, নাহি যাহে কোনো বিসম্বাদ,
স্তুতিযোগ্য ভোগ্য দাও—যশোযুত দেবের প্রসাদ।

——*——

গুরুবাদ

—*—

ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছু না কিছু সকলেই করি, কেননা, আর কিছু হউক না হউক, মনুষ্যসমাজের এটা একটা প্রাচীন প্রথা। কিন্তু গীতার ভাষায় বলিতে গেলে এই গতানুগতিকের দলের মাঝে হাজারকরা একজনের হৃদয়ে হয়ত সত্যের জন্ম পিপাসা জাগিয়া উঠে—পিপাসু সহস্রের মাঝে একজনের পিপাসা মিটে কিনা, সে কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। সত্যের পিপাসা যাহার হৃদয়ে জাগিয়াছে—তাহার মাঝে প্রথমতঃ এই লক্ষণ দেখা যায় যে, সে বিনয়ী হয়, প্রপন্ন হয়, প্রণিপাতে কুশল হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্য পিপাসা না জাগে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মকর্ম্মের মাঝেও আত্মম্ভরী ভাবটাই প্রবল হইতে দেখা যায়। সংসারের আর দশটা কাজ যেমন আমার নিজের শক্তি সামর্থ্যে সমাধা হইতেছে, তেমনি ভগবানকেও আমার স্পর্দ্ধার জোরে টানিয়া আনিব, এমন একটা গোপন ইচ্ছা মনের মাঝে থাকে। কেবল জিজ্ঞাসুই দেখিতে পান, ভগবান কর্ম্মের অধীন নন, জোর করিয়া তাঁহাকে পাওয়া চলে না—প্রবচন, মেধা, বহুশ্রুত, কিছুই কিছু নয়—তিনি দয়া করিয়া যাহার কাছে তাঁহার তনু প্রকাশ করেন, সেই তাঁহাকে পায়।

আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে যখন কুলায় না, তখনই এমন লোকের খোঁজ পড়ে, যে বিদ্যাবুদ্ধিতে আমার চেয়ে বড়, যাহার কাছে প্রপন্ন হইয়া, প্রণিপতিত হইয়া আমিও শিখিতে পারি। গুরুকরণ শুধু এ দেশের প্রাচীন প্রথা নয়। সব দেশেই উহা আছে। মানুষ সামান্য ব্যাপারেও মানুষের সাহায্য না নিয়া পারে না। অসীমসমুদ্রেও জলনিয়ামকের প্রয়োজন হয়, মানচিত্রের প্রয়োজন হয়;—কেবল সব চেয়ে অজানা অধ্যাত্মসমুদ্রে পাড়ি জমাইতে গেলে কাহারও সাহায্য প্রয়োজন হয় না—মানুষ যে স্পর্দ্ধা ও অপ্রেম নিয়া এমন কথা বলিতে পারে, সত্য তাহার নিকট হইতে শত যোজন দূরে।

আমার মাঝেই সব আছে বটে, কিন্তু সে তো না থাকারই মত।—সে রত্ন চিনাইয়া দিবে কে? ভগবান্ আমার অতি আপন, সুতরাং তাঁহাকে পাইবার জন্য মধ্যস্থের প্রয়োজন নাই—এমন যুক্তিরও অর্থ বুঝি না। ভগবানের উপর যাহার অত অনুরাগ হয়, মানুষের উপর তাহার এমন বিরাগ হয় কেন? ভগবান্ সব জায়গায় আছেন—"অনলে অনিলে জলে নভোনীলে" আছেন—নাই কেবল মধ্যস্থের মাঝেই? মানুষ তো আমার স্বজাতি—স্বধর্ম্মী। তাহার সঙ্গে যতটা ভাবের সাম্য ঘটা সম্ভব, অতটা কি অপর কাহারও সঙ্গে সম্ভব?

বাস্তবিক যাহার মাঝে সত্যের পিপাসা জাগিয়াছে, সে আগে নিজের মাঝে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া নিজের মর্য্যাদা সবটুকু বুঝিয়াছে—বুঝিয়াছে, "আমি" থাকিতে কল্যাণ নাই। নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে কুলাইবে না, এইটুকু বুঝিয়াই সে অপরের শরণ নিতে চায়। একটী মনের মানুষ তাহার একান্তই প্রয়োজন। যেমন একটা বিশিষ্ট বয়সে আসঙ্গলিপ্সা মানুষের মাঝে প্রবল হইয়া ওঠে,

তেমনি অধ্যাত্মজীবনেরও একটা বিশিষ্টক্ষণে তেমনি মনের মানুষের জন্য ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠে। ইহা স্বভাবের আইন। আর কিছু না হউক, নিজের হৃদয়ের সংশয় মিটাইবার জন্য, দুটা আশা-ভরসার কথা শুনিবার জন্যও গুণী মানুষের প্রয়োজন হয়। যে স্বভাবতঃই মানুষের সঙ্গ চায়, শ্রদ্ধার বিশ্বাসে তাঁহার চিত্ত যে মানুষের কাছে নুইয়া পড়িবে, এ আর আশ্চর্য্য কথা নয়। কিন্তু যাহার চিত্ত কঠিন, বুদ্ধি শাণিত, তাঁহার পক্ষেও এক সময় অধ্যাত্মসঙ্গীর প্রয়োজন হয়,—যখন বুদ্ধির প্রবলতাবশতঃ শত শত সূক্ষ্ম তর্ক ও শঙ্কাতে চিত্ত সঙ্কুল হইয়া যায়। শুধু অজ্ঞেয়বাদে ভাসিয়া যাওয়া সত্য সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা নয়। অজ্ঞেয় বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম—ইত্যাকার প্রতীচ্য দার্শনিকের আদর্শ যে কতদূর হৃদয়হীনতার পরিচায়ক, তাহা বলিতে পারি না। তার চেয়ে প্রাচ্যের দুর্জ্ঞেয়বাদে মানব চিন্তার শ্রেষ্ঠতর পরিণতি দেখিতে পাই। একেবারে যে জানিতে পারি না—এ কথায় যে নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তাহার মাঝে জিজ্ঞাসাই জাগে নাই। 'বিশ্বাস করি, জানা যায়—হৃদয় বলিতেছে সে আছে—কিন্তু তবুও জানিতে পারিতেছি না, তর্কের ধাঁধাঁয় অন্ধ হইয়া ফিরিতেছি'—এই ভাব যে জিজ্ঞাসুর চিত্তে জাগে, মানবোচিত স্নিগ্ধ ব্যাকুলতা তাহার মাঝে দেখিতে পাই। সে যে মানুষের মতই মনের মানুষ খুঁজিবে, পথিক হইয়া পথপ্রদর্শকের সন্ধান করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না—ইহা স্বাভাবিক।

কতকগুলি কথার ফাঁকি আছে, অতি-বুদ্ধি মানুষ আসিয়া সেইখানেই ঠেকিয়া যায়। এই সমস্ত কথা আমাদের অতি সনাতন দেশেও বেমালুম চলিয়া গিয়াছে। দুই একটা উদাহরণ দিই। গুরুকরণের বিরুদ্ধে এই আপত্তি শোনা যায়—কোনও মানুষ বা কোনও শাস্ত্রই অভ্রান্ত নয়, সুতরাং কাহার কথায় বিশ্বাস করি? এ কথা খৃষ্টীয় জগৎ হইতে আমদানী হইয়া আজকাল আমাদের মাঝেও প্রশ্রয় পাইতেছে। বৌদ্ধদের হাত হইতে বৈদিকধর্ম্ম বাঁচাইবার জন্য একদিন হিন্দুকেও সত্যের অপৌরুষেরবাদ প্রচার করিতে হইয়াছিল। মানুষ অভ্রান্ত নয়, এই মতের ছায়া সেখানেও দেখিতে পাই। কিন্তু মানুষ মানুষকে এতখানি অবিশ্বাস করিয়া চিরকাল থাকিতে পারে নাই। তাই পরের যুগে মীমাংসা পাইলাম—"গুরু মুখ নাদা—গুরুমুখ বেদা"—অপৌরুষের বেদেরও মর্য্যাদা লাভ হয় গুরুর মুখে। উপনিষদ্ হইতে আরও প্রাচীন প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সত্যকাম সত্যলাভের আশায় গুরুর সেবা করিলেন—কিন্তু উপদেশ পাইলেন, বৃষ, অগ্নি হংস ও মদ্গুপক্ষীর কাছে। আচার্য্য শঙ্কর বলেন, এগুলি কোনও ইতরপ্রাণী নয়; ইহারা দেবশক্তির প্রতীক; দেবশক্তিই সত্যকামের হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া জানাইয়া দিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ এবং ঘটে ঘটে বিরাজিত। সত্যকাম যখন গোসেবা ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন গুরু গৌতম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সত্যকাম, তুমি যে ব্রহ্মবিদের মত শোভা পাইতেছ; কে তোমাকে উপদেশ দিল?" তিনি উত্তর করিলেন, "কোনও মানুষ আমাকে উপদেশ দেয় নাই বটে; কিন্তু তথাপি আমি যাহা জানিতে চাই, তাহা আপনিই আমাকে বলুন। কেননা আমি শুনিয়াছি, আপনাদিগের

অন্ত আচার্য্যের নিকট হইতে যদি বিদ্যা জানা যায়, তাহা হইলে তাহা সার্থকতম হইয়া থাকে।" "গুরুমুখ বেদা"র এই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

এই তো গেল বিশ্বাসের কথা। মানুষ অভ্রান্ত হইতে পারে না—এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কি যুক্তি আশ্রয় করিয়া বলেন, তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। মানিলাম, অভ্রান্ত সত্য মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না; বিশেষতঃ মনোবাক্যতীত ব্রহ্মতত্ত্বই যদি জিজ্ঞাস্য হয়, তাহা হইলে বাক্য দ্বারা তাহা কি করিয়া প্রকাশ হইবে, মানুষের মুখ হইতে কি করিয়াই বা সে তত্ত্ব জানিতে পারিব? এ সমস্ত যুক্তি অস্বীকার করি না। কথা হইতেছে এই যে, সত্য যদি বুদ্ধির একটা নিশ্চল অবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্যবহারিক জগতে তাহাকে লইয়া কারবার করা চলে না। সুতরাং আমার প্রয়োজন অনুযায়ী সত্যের এক একটী বিভাব গ্রহণ করিব, এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে সত্যের উপরিচর রূপটী আবার গ্রহণ করিব। এইরূপে সত্যজ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবে। সত্যজ্ঞানের এইরূপ ক্রমবিকাশ আজকালকার দার্শনিকরাও স্বীকার করেন। এই নীতি অবলম্বন করিয়া আমরা বলিতে পারি, গোটা অভ্রান্ত সত্যটা যদি এক জায়গায় জমা হইয়া থাকা সম্ভব না-ই হয়, তাহাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি? মানুষ অভ্রান্ত হইতে পারে না অর্থে চরম সত্য সম্পূর্ণভাবে সে ব্যক্ত করিতে পারে না। যদি বলি, না-ই বা পারিল, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? চরম সত্য জিনিষটা তো এমন একটা কিছু বস্তুপিণ্ড নয়, যাহা এই মুহূর্ত্তে চোখে আঙুল দিয়া তোমাকে দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এখন তোমার যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই গ্রহণ কর না কেন? তোমার মন-বুদ্ধি যতটুকু সত্য ধারণা করিবার উপযোগী, ততটুকুই আপাততঃ গ্রহণ কর; তারপর যোগ্যতা জন্মিলে জ্ঞানের পরিধি আরও বাড়িয়া যাইবে। ভ্রান্তি অর্থে মিথ্যা বুঝিবার কি প্রয়োজন? আমরা বলি, ভ্রান্তি অর্থ অপূর্ণতা। যাহাকে ভ্রান্তি বলিতেছ, তাহা বিপরীত জ্ঞান হইলেও সত্য—ইহা অপরোক্ষানুভূতির প্রমাণে বলিতে পারি। তবে কিনা তাহা সত্যের সঙ্কীর্ণতর রূপ। উহার বিস্তৃততর রূপ দেখিতে পাইলে, ভ্রান্তি দূর হইয়া যাইবে। দূর হইয়া যাওয়া অর্থে মিলাইয়া যাওয়া বলিতেছি না; ক্ষুদ্র সত্য বৃহত্তর সত্যের কুক্ষিগত হইয়াই দেখা দিবে। সত্যের যে বিষয়সত্তা, তাহা জ্ঞাতার নিরপেক্ষ; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ তো প্রয়োজন নয়। উহার যে প্রতীতি-সত্তা, তাহারই সংশোধন বা নিরসন প্রয়োজন। জ্ঞান অজ্ঞানের ভেদ বলিতে ইহাই বুঝি। যে সত্য মন-বুদ্ধি দিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহা জঙ্গম বটে, কিন্তু অবাস্তব নয়; ইহাই অপর ব্রহ্ম। আর যাহা বাক্য-মনের অতীত, তাহা স্থাণু বটে—যেমন পূর্ণ বেগে একটা চক্র ঘুরিতে থাকিলে তাহকে স্থাণু বলিয়া মনে হয়। একেবারে পরিপূর্ণ চলাটা মন বুদ্ধি এক সঙ্গে দেখিতে পারে না—তাই, বলে চরমতত্ত্ব স্থির হইয়া আছে। এই তো অবাঙ্‌মানসগোচর তত্ত্ব—সেখানে "ন গুরুর্ন শিষ্যঃ," এমন কথা গুরুবাদীও বলে। কিন্তু সেই চরম কথাটা বর্ত্তমান বুদ্ধিতে আরোপ করিয়া মানুষের উপদেশের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করা কি নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় নয়?

যদি কেহ বলেন, "গুরুই ব্রহ্ম বা গুরু ভগবান্"—অমনি তার্কিক ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়া উঠেন, "এত বড় মিথ্যা কথা? মানুষ কি কখনো ভগবান হইতে পারে?" সাহস করিয়া এ কথা যিনি বলিতে পারেন, আমাদের বিশ্বাস, মানুষ এবং ভগবান—এই দুইটী বস্তুই তাঁহার বিশেষ করিয়া জানা আছে; তিনি দুইটীকেই এমন করিয়া জানেন যে, একটী হইতে আর একটীর ভেদ নিরূপণ করিতে তাঁহার বাধে না। কিন্তু তার্কিক যে মানবতত্ত্ব বা ভগবত্তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, এ কথা বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন না, কেননা ও দুটী তত্ত্বের আভাস পাইলে তাঁহার সুর অন্যরকম হইয়া যাইত, এ কথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি।--তাহা হইলে তাঁহার আপত্তিটা পুরাপুরি অজ্ঞেয়বাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ তাঁহার যুক্তি এই —ভগবান্ কি তাহা আমি জানি না; তাঁহাকে যে জানা যায়, তাহাও মনে করি না; সুতরাং মানুষকে আমি যতটুকু জানি, তাহাতে তাহাকে ভগবান বলায় আমার আপত্তি আছে। এইখানেও ঠিক আগেকারি মত সত্যের স্থাবর আর জঙ্গম রূপে গোল পাকাইয়া গিয়াছে।

আবার বলি, ভগবান বা ব্রহ্ম একটা বস্তুপিণ্ড নয়—এক গণ্ডুষ বুদ্ধি দিয়া একেবারে তাঁহাকে গিলিয়া ফেলা যায় না। চিত্তের নির্ম্মলতায়, বুদ্ধির সম্প্রসারণে ক্রমে তাঁহার তত্ত্ব স্ফুরিত হইতে থাকে। তাঁহার স্ফুরণ মানুষের মাঝেই হয়। (যাঁহারা গুরুবাদের বিরোধী, তাঁহারাও ভগবান্ যে বিশেষ করিয়া তাঁহাদের মাঝেই স্ফুরিত হইতেছেন, অনুগতজনের কাছে শ্লাঘাসহকারে তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না; অথচ গুরুর মাঝে ভগবানের স্ফুরণ যে তাঁহারা কেন দেখিতে পারেন না, তাহা একটা রহস্য বটে। এ কি প্রবল সত্যানুরাগ, না স্বজাতিবিদ্বেষ?) মানুষের কাছে মানুষই আদর্শ, বল, বুদ্ধি, ভরসা। ভগবান চিনিবার আগে মানুষ চিনিতে শিখ, মানুষের মাঝে দেবতা চিনিতে শিখ; ক্রমে মানুষের মাঝে ভগবানকেও প্রত্যক্ষ করিতে শিখিবে। আগেই একেবারে গোড়ার তত্ত্ব ধরিয়া টান দিও না। এখন তোমার যে বুদ্ধি, তাহাতে ভগবান দেখিবে কি, পুরাপুরি একটা মানুষ দেখিবার শক্তিও যে তোমার নাই। তোমার পশুদৃষ্টিতে হয়ত মানুষ একটা দ্বিপদ জন্তুর চেয়ে উন্নত জীব নয়। আসল কথা, ঠিক ভগবান্ না হইলে ভগবান দেখা যায় না। দেখা চোখের দেখা নয় যে এক বারে সবটা দেখিয়া ফেলিবে। এ দেখা হওয়ার সামিল। আস্তে আস্তে ভগবান হইয়া ভগবান দেখিতে হইবে—তবে না নির্ভুল দেখা, সত্যকার দেখা হইবে। যাহা আমার বাহিরে, তাহা হাজার পাকা দেখা হইলেও সংশয় থাকিয়া যায়; কিন্তু যাহা আমার ভিতরে—যাহা আমিই, তাহার দেখা স্বয়ংপ্রমাণ। ভগবান দেখা বা ব্রহ্ম দেখাও এমনি হইয়া দেখা। এখন যে ব্রহ্ম বা ভগবান বলিতেছি—ও শুধু মনের সংস্কার। সেই সংস্কার ধরিয়াই বালকের মত বিচার করিতেছি—এ ভগবান, ও নয় ইত্যাদি।

"গুরু ভগবান"—এ একটা কথা মাত্র। কিন্তু আঁৎকাইয়া উঠিবার মত কথা নয়। ভগবান বলিতে যে যতটুকু বুঝে, গুরুতে তার ততটুকু ভগবদ্দর্শনই হয় ও নিজেও সে ততটুকু ভাগবতসত্তাপন্ন হয়। সুতরাং ইহাতে তো কাহারও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ভূতে ভূত

দেখে, মানুষে মানুষ দেখে, ভগবান সর্ব্বত্র ভগবানকেই দেখেন—এ তো সোজা কথা। বলিতে পার, "শুধু গুরুকেই কেন ভগবান বলিব?"—জবাবে বলি, গুরু যে মানুষ এবং আমিও যে মানুষ। মানুষ ছাড়া মানুষের আত্মীয় আর কে হইবে? গাছপালা পশু-পাখীতে ভগবান দেখা সহজ, কেননা তাহাদের সঙ্গে কোথাও তো বাধে না। কিন্তু মানুষর মাঝে ভগবান দেখা বড় সহজ হয় না, কারণ আত্মাভিমান ও তুলনাপ্রবৃত্তিটাই সেখানে প্রবল হইয়া উঠে কিনা।

আমি মানুষ, তাই মানুষকে ভালবাসি। তাই ভগবানের পিপাসা মানুষের ভিতর দিয়াই মিটাইয়া নিতে চাই। জানি, বাহিরের খোলসটা মানুষ নয়; একদিন চর্ম্মদৃষ্টি অতিক্রম করিয়া মর্ম্মদৃষ্টি পাইবই—সেইদিন চিনিব মানুষের আধারে কে লুকাইয়া আছে, কেননা আমিও তো মানুষ। বিজাতীয়ে ভগবান দেখা সহজ, কারণ বিজাতীয় আমার অনাত্মীয়, ভগবানও সেখানে ফাঁকা কথা। তার চেয়ে কঠিন, স্বজাতীয়ে ভগবান দেখা;—এইখানে অভিমান বিসর্জ্জন দিতে হয়। সব চেয়ে কঠিন, স্বগতে ভগবান দেখা;—এই দেখাই পাকা দেখা—যে দেখাতে স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় সকল ভেদ দূর হইয়া গিয়া সব এক জাতিতে পরিণত হয়। ইহাই জগন্নাথক্ষেত্র—এখানে জাতিভেদ নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব

[স্বামী রামতীর্থ]

যা মূলের সঙ্গে পুনরায় আমাদের যুক্ত করে, তাই ধর্ম্ম। ইংরেজী Religion শব্দ থেকে এই তাৎপর্য্যটুকু আমরা গ্রহণ করতে পারি—সেখানে Re=পুনরায়, Ligare=বন্ধন করা।

এই মূল বা আদি উৎস কি? যার নির্দেশে মন মনন করে, চক্ষু দর্শন করে, সমস্ত প্রকৃতি প্রাণবন্ত হয়, সে কে?

মন, চক্ষু বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দিয়ে যাকে দেখা যায় না, অথচ মন, চক্ষু ইত্যাদিকে যিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম চিন্তা বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় নন। মন ও বাক্য ভীত হয়ে তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসে।

চিমটা দিয়ে সব জিনিষই ধরা যায়; কিন্তু যে আঙ্গুল দিয়ে চিমটা ধরেছ, চিমটা কি ফিরে এসে তাকে ধরতে পারে? সুতরাং যে মহৎ দুজ্ঞের্য় তত্ত্ব হতে মনবুদ্ধি প্রসূত, মনবুদ্ধি তাকে জানবে কি করে?

ধর্ম্ম তা হলে শুধু অধ্যাত্মশাস্ত্র নয় বা গোঁড়ার তর্ক নয়; বাস্তবিক ধর্ম্ম চিত্তের

এক রহস্যময় পরিণতি—যার বলে মনবুদ্ধি সেই চরম অগম প্রপঞ্চাতীত তত্ত্বের সন্ধানে গিয়ে আত্মহারা হয়ে যায়।

খ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান ভক্ত প্রার্থনার সময় হাত দুখানি উপরদিকে তুলে ধরেন, তাতে অজ্ঞাতসারে তিনি এই ইঙ্গিতই করেন যে তিনি যাঁর সান্নিধ্য খোঁজেন, তিনি ঊর্দ্ধগ, অগম ও ভাবাতীত। হিন্দু যখন ভক্তিতে বা সমাধিতে আত্মহারা হন, তখন স্বভাবতঃই তিনি চক্ষু মুদ্রিত করেন—যেন বোঝাতে চান, তাঁর মনবুদ্ধি যাঁতে লয় হচ্ছে, তিনি অন্তঃস্থ, অদৃশ্য ও ভাবাতীত।

একটা ধর্ম্ম নয়, জগতে "একমাত্র" ধর্ম্ম রয়েছে—মুসলমানী, হিন্দুয়ানী বা খ্রীষ্টিয়ানীর তাই প্রাণ। সে ধর্ম্মের স্বরূপ হচ্ছে—যেখানে জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ভেদ নাই, বাগ্‌বিতণ্ডা, দেহ-মন, দেশ-কাল-নিমিত্ত, সমস্ত দৃশ্য এবং কল্প্য জগতের ভেদ যেখানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—সেই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের অনির্ব্বচনীয় অনুভূতি। এটা কি ধাঁধা?—মোটেই নয়।

অধ্যাত্মরাজ্য সম্বন্ধে যাঁর বাস্তবিক কোনও অভিজ্ঞতা আছে, তিনিই বলুন দেখি, তিনি যখন অধ্যাত্মযোগে যুক্ত, তখন নিজের কথা বা জগতের কথা দূরে থাক্, ভগবান বলেও কোন দ্বৈতভাব তাঁর মাঝে জাগে কিনা? সত্যানুভূতিতে তুমি আমির ভেদ নাই—বিষয়-বিষয়ীর ভেদ নাই।

এই লক্ষ্যে পৌছাবার যে কোনও ক্রমসঙ্গত চেষ্টাকে "ধার্ম্মিক" প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

এই রহস্যকে লক্ষ্য করে চলার আদপেই বা কি প্রয়োজন, এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পার। এ কথার জবাব দেবার আগে বিচার করে দেখি, মানুষ যেগুলোকে আদর্শ বা আকর্ষণের বস্তু বলে ধরে রেখেছে—যথা, জ্ঞান, শৌর্য্য, প্রেম বা সুখ—সেগুলো লাভ করবারই বা কি উপায়।

১। বই কিম্বা শিক্ষকের সাহায্যে বহিরূপায়ে মানুষ যে বিদ্যাটুকু অর্জ্জন করে, তারই নাম দিয়েছে জ্ঞান। আদ্যিকালের পণ্ডিতী কেতাবের বিদ্যাতে যে মাথা বোঝাই করতে পেরেছে, সেই খুব বিদ্বান বলে খ্যাতি রটে। অবশ্য প্রাচীনকালের জ্ঞানবিজ্ঞান উপেক্ষার বস্তু নয়—সেগুলো বেশ মন দিয়ে অধ্যয়ন করা উচিত। কিন্তু বাস্তবিক শিক্ষা বা Education (e=বাইরে, duco=টানি) তখনই সুরু হতে পারে, যখন মানুষ বাইরের ভরসা ছেড়ে দিয়ে অন্তরের অনন্ত উৎসের পানে ফিরে তাকায়;—তখন সে যেন মৌলিক-জ্ঞানের স্বভাবনির্ঝর বা নূতনভাবের প্রবর্ত্তক হয়ে দাঁড়ায়। নিউটন ও অন্যান্য সত্যান্বেষী মনীষীরা মানুষের প্রয়োজনীয় কত তথ্যের আবিষ্কার করেছেন। কে তাঁদের শেখালে? যে জ্ঞানে আগের যুগের সব গবেষণা বাতিল হয়ে গেল, সে জ্ঞান কোন বই থেকে তাঁরা পেয়েছিলেন? অজ্ঞাতসারে তাঁরা আত্মারই সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, এই হচ্ছে মানবহিতৈষীদের শিক্ষার উপায়; কেননা একমাত্র আত্মার শক্তিতেই অশ্রুতকে শোনা, অজ্ঞাতকে জানা এবং অচিন্ত্যকে চিন্তা করা সম্ভবপর হয়। মন একাগ্র হলে তা হতে জ্যোতির বিকাশ হয়। অর্থাৎ মানুষ যখন ক্ষুদ্র আমিত্বকে হারিয়ে ফেলে, দেহ-মন-ইত্যাদির জ্ঞান যখন লোপ পেয়ে যায়, মানুষ যখন এমন অবস্থায় পৌছায়, যেখানে জগৎবোধ, অহং

বোধ, ইত্যাদি সবই সেই দুজ্ঞের্য়র তত্ত্বে লীন হয়ে যায়; কেবল তখনই সত্যের ধারাসারে সে সিক্ত হয়, কত আবিষ্কার অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, জ্ঞানের প্রবাহ বইতে থাকে, প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। তাহলে সব তথ্য, আবিষ্কার, উদ্ভাবন, কার্য্যক্রম, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি এক অতীন্দ্রিয় যোগশক্তিরই স্বাভাবিক স্ফুরণ—এবং এ-ও যে ধর্ম্ম, তা পূর্ব্বকথিত সংজ্ঞাতেই ব্যক্ত হয়েছে। এই অতীন্দ্রিয় ভূমিতে গেলে কবিহৃদয় থেকে ভূমানন্দময় মহৎ চিন্তার ধারা উৎসারিত হবে। গণিতজ্ঞ বা দার্শনিক যদি কেবল মাত্র তাঁর অবাস্তব অহংবোধটী ছেড়ে দেন, তাহলে অতি জটিল সমস্যারও আশ্চর্য্য সমাধান তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে। একটা সমস্যার সমাধান হলে বা আবিষ্ক্রিয়া ঘটলে মিথ্যা অহং এসে তার বাহাদুরীটুকু নিতে চায়; কিন্তু এই পেটেণ্টওয়ালা অহং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সচেতন ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হতে পারেনি। যখন অহংবোধের আত্মবিসর্জ্জনে পূর্ব্ববর্ণিত ধর্ম্মের ভাব ফুটে উঠল, তখনই সিদ্ধি ও জ্ঞান স্বতঃ উৎসারিত হতে লাগল।

যুদ্ধক্ষেত্রে একজন বীরের কথাই ধর। শক্তির অতিপ্রাচুর্য্যে সে মত্ত, হাজার হাজার মানুষ তার কাছে কিছুই না, তার নিজের দেহটাও তার কাছে কোনও রকমে বাস্তব নয়। সে তো আর দেহমন নয়—এই জগতেরও কোনও চিন্তা তার মাঝে নাই। তার চিত্ত তখন উদ্বুদ্ধ—প্রতি রোমকূপ যেন তার দেহাদির মূলীভূত ব্রহ্মসত্তায় নিমজ্জন বজ্রনাদে নির্ঘোষিত করছে। তাই দ্রষ্টার কাছে অদম্য সাহস এবং শৌর্য্যবীর্য্য, প্রাতিভাসিক জগতে পরমার্থ সত্যের বিদ্যুৎস্ফুরণ মাত্র। কিন্তু কর্ত্তার কাছে অতুল শৌর্য্য বীর্য্য অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মের সাধনা বই তো কিছু নয়—অর্থাৎ যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, তাতে আত্মলয় মাত্র।

৩। ভালবাসা কথাটাই কত মধুর। সবারই একজন ভালবাসার মানুষ থাকবে—এটা চলতি কথা। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর কাছে অধিকাংশস্থলে প্রেমভক্তি-লাভই জীবনাদর্শ। ভগবদ্ভক্তি লাভের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারেন, এমন মহাপ্রাণের অভাব নেই। প্রেমের উৎস কোথায়, তারই সন্ধান করি।

চৈতন্য মহাপ্রভু বা বানিয়ানের মত আদর্শ ভক্তেরা অলৌকিক সমাধি বা ভাববিহ্বলতার জন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ভক্তির আবেগ এতখানি গাঢ় হলে লজ্জা, লোকধর্ম্ম, সংসারজ্ঞান সব ভুল হয়ে যায়—ক্ষুদ্র আমত্বের বন্ধন ছিঁড়ে যায়। যারা অন্ততঃ ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি মমতা অনুভব করবার সৌভাগ্যও পেয়েছে, তারাও জানে, চরমে প্রেমিক-প্রেমপাত্রের ভেদজ্ঞান লোপ পেয়ে যায়—যদিও আপাতদৃষ্টিতে এটা একটা হেঁয়ালী। এই অর্থে প্রেম ও ধর্ম্ম অখণ্ডনীয়রূপে একবস্তু।

৪। আনন্দোচ্ছ্বাসকে ইংরেজীতে বলে, Ecstasy (e = বাইরে, sto = দাঁড়ান); এ কথা থেকে প্রমাণ হয়, সুখের অনুভূতি যে অবস্থাতেই আসুক না কেন, তার অর্থ—এই দেহ, মন, সংসার ছাড়িয়ে বাইরে দাঁড়ানো। আপন অভিজ্ঞতা হতেই বুঝতে পার, সুখ আর দ্বৈতবোধ হতে মুক্তি একই জিনিষ—হোক্ না সে মুক্তি যতই ক্ষণিক। বিষয় কাম্য, বিষয়ী কামী; উভয়ের পরিণয়ে একাত্মবোধ জন্মালেই আনন্দ। তাহলে স্পষ্টই দেখছি সুখ স্বভাবতঃই ধর্ম্ম।

এই সমস্ত উক্তি হতে এই প্রমাণ হয়, বুদ্ধি এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ যখন বুদ্ধির অতীত তত্ত্বে লীন হয়ে যায়, তখনই মানুষের সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ লাভ হয়।

কিন্তু এই যে বিশ্বরসে অবগাহন, এ শুধু অভিধান দেখার মত বা সমুদ্রে ডুবে গোটা-কয়েক মুক্তা নিয়ে আবার ভেসে ওঠার মত।

ইন্দ্রিয়প্রীতিও বাস্তবিক ধর্ম্মই বটে ; কিন্তু এতে যে ধর্ম্মলাভ হয়, তা যেন আবর্জ্জনাপূর্ণ কানাচ থেকে দরবারঘরে উঁকি মারা। এ যেন বিদ্যুতের ক্ষণিক দীপ্তির মত ; উদার দিবা-লোকের সঙ্গে তার স্বরূপতঃ ঐক্য থাকলেও তাতে ভালর চেয়ে মন্দই হয় বেশী। অথবা আরও খাটিয়ে বল্‌তে গেলে, এ যেন প্রমি থিউসের স্বর্গ হতে আগুন চুরী করার মত।

আনন্দের দরবারে কি সদর দরজা দিয়ে ঢোকা যায় না ? নিশীথের বিদ্যুৎস্ফুরণকে কি দিবাবাসরের চিরদীপ্তিতে পরিণত করা যায় না ? এ বিষয়ে স্বভাবতঃই আমাদের যে একটা সহজ আকর্ষণ রয়েছে, ধর্ম্মের প্রয়োজ-নীয়তা সাধারণতঃ তা হতেই বুঝ্‌তে পারি। চিত্তের সমস্ত চেষ্টাকে এই দিকে নিযুক্ত করাই প্রয়োজন। ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তাকে যারা তাচ্ছীল্য করে, তারা স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করবার ফিকিরে আছে।

দর্শন বিজ্ঞান এই অগম তত্ত্বের সন্ধান করতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়েছে। প্রত্যক্ দৃষ্টিতেই দেখ, আর পরাক্ দৃষ্টিতেই দেখ, দেশ-কাল-নিমিত্তের জ্ঞান দিয়ে তার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না। জড়, গতি বা শক্তির স্বরূপ জিজ্ঞাসুর কাছে অনতি-বর্ত্তনীয় রহস্যে আবৃত। পরমাণুবাদে যতো বিরোধ যথেষ্ট ; Boscovichর "শক্তি-কেন্দ্র-বাদও শেষকালে কোনও মীমাংসায় পৌঁছাচ্ছে না। জগতের যত মতুয়ার শাস্ত্রে কিছু না কিছু অন্ধসংস্কারের ছাপ আছেই। একটা দর্শন আর একটা দর্শনকে খণ্ডন করছে—এ আবার তাকে সুদে আসলে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, প্রকৃতির অন্তরের কথা মানবমনের কাছে চিরদিনই প্রহেলিকা হয়ে থাকবে—মানববুদ্ধির আর সৃষ্টি রহস্য ভেদ করবার ভাগ্য হবে না।

চরম অধিষ্ঠানতত্ত্বের সন্ধান করা কি তাহলে দুরাশা বলে ছেড়ে দেব ? কেবল রেল, টেলিগ্রাফ আর গোলাবারুদের বাস্তব আবিষ্ক্রিয়াতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব ? এ সব খেলা লাভেও তো শান্তি নাই। প্রতি অভিনব লাভের সঙ্গে সঙ্গেই যে আরও লাভের তৃষ্ণা অপরিহার্য্য হয়ে দেখা দেয়। এ হতে জাগতিক বাসনার মিথ্যাত্ব নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হয়।

এই সব চিন্তায় মন হতাশ হয়ে যায়। কিন্তু উপনিষদ্ বলছেন, হতাশ হয়ো না। প্রাণের গভীর পিপাসা ব্যর্থ হবার নয়। সত্যের প্রতি জোর করে যত অন্ধ হয়েই থাকি না কেন, কোনও এক একান্ত শুভ মুহূর্ত্তে স্বতঃ মনে প্রশ্ন জাগে, এই প্রপঞ্চ কোথা থেকে এল ? আমিই বা আছি কেন ? আকাশ বা পৃথিবীর তাৎপর্য্য কি ?

বেদ বলছেন, এই অন্তরঙ্গ জিজ্ঞাসার সমাধান আছেই—যদিও দর্শন, বিজ্ঞান বা সংসারাসক্তি এর কোনও জবাব দিতে পারে না। এই জিজ্ঞাসাও তো অনির্ব্বচনীয় মায়ারই অঙ্গ ; কাজেই যার রহস্যভেদ করবে, সে যে তার মাঝেই। পাখী যেমন বায়ুমণ্ডল-

ছাড়িয়ে উড়ে যেতে পারে না, চিন্তাও তেমনি খণ্ডতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারে না। যতক্ষণ জিজ্ঞাসু আর জিজ্ঞাসা থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মায়ার কারাপ্রাচীরও থাকবে—প্রতিভাস ছাড়িয়ে যাওয়া ততক্ষণ সম্ভব নয়। বিশেষ সাধনায় লক্ষ্যে পৌঁছান যায় বটে, কিন্তু সেখানে গেলে প্রশ্ন আর উত্তর দুটোই মিলিয়ে যাবে। সাধারণ সুখ, আসক্তি ইত্যাদির মোহবন্ধন ছাড়িয়ে বেদান্ত স্বাধীনভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান। ব্রহ্মানুভূতিতে আত্মহারা হয়ে বেদান্তী মনবুদ্ধির অতীত ব্রহ্মই হন। এই অনুভূতির আভাসমাত্রও যিনি পেয়েছেন, তাঁর ভয় নাই, শোক নাই। অটুট চরিত্রবলই এই অনুভূতি বা ধর্ম্মের অমোঘ ফল। ধর্ম্ম এই জন্যই পুরুষার্থ।

ওম্—ওম্—ওম্ !*

* মথুরায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

শক্তি ও শক্তিমান্

—*—

(শ্রীশিশিরকুমার বসু বর্ম্মন্ বি. এ.)

—*—

পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম যাহাই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে উহা কতকগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্ন ভাবের সমষ্টি। যে সত্যের উপর এই বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহাদের স্বতন্ত্র ভাব সংরক্ষিত করিয়া পরস্পর অবিরুদ্ধভাবে ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সে সত্যবস্তু যেন মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় কতকগুলি কুসংস্কারের আবর্জ্জনার অন্তরালে অন্তর্হিত। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম প্রধানতঃ কতকগুলি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা—বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব ইত্যাদি। বৈষ্ণবের ভিতর আবার কেহ শ্রীকৃষ্ণোপাসক, কেহ বা রামচন্দ্রের, কেহ বা লক্ষ্মীনারায়ণ বা শ্রীবিষ্ণুর, আবার কেহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসক। শাক্তদের ভিতরও আবার কেহ কালী, কেহ দুর্গা, কেহ মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দেবতার উপাসক। এইরূপ ভক্তের ভাবভেদে নানা দেবদেবীর উপাসনা হইলেও প্রকৃত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হিন্দুধর্ম্ম মোট দুইটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত—এক শাক্ত বা শক্তির উপাসক, অপর শক্তিমানের উপাসক।

কিন্তু এই শক্তি বস্তুটা কি ? কোন শক্তিবলে নেত্রহীন ক্ষুদ্র পিপীলিকা একমাত্র ঘ্রাণকে অবলম্বন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোন শক্তি বলে মানব জগতে অলৌকিক ব্যাপার সমূহ সংঘটন করিতেছে, কোন শক্তিবলে এই বিশালদেহ পৃথিবী কল্পনাতীত বেগে নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, আবার গ্রহ-উপগ্রহগুলি সূর্য্যের চারিদিকে দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে, আবার এই সূর্য্য নিজ গ্রহ উপগ্রহ

সমেত অপর একটা বৃহত্তর সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বে অচিন্তনীয় বেগে ভ্রমণ করিতেছে?

•

আবার দেখুন, এই যে জড়বস্তু, ইহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর একটা গুণ বা শক্তি আছে। আবার সেই অণুপরমাণুর একত্রিত শক্তি কি ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা রামমূর্ত্তি নাইডুর শারীরিক শক্তিতে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তারপর মানসিক শক্তি। এই মানসিক শক্তির দ্বারা অন্যকে অভিভূত করিয়া দেওয়া যায়, তাহাকে ইচ্ছামত চালিত করা যায়, তাহাকে ঘুম পাড়ান যায়, তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করা যায়, তাহাকে কুপ্রবৃত্তি হইতে ফিরাইয়া দেওয়া যায়। তারপর আর একটা শক্তি আছে, তাহা অধ্যাত্মশক্তি। সে শক্তি জাগ্রত করিতে পারিলে, এই দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করা যায়, একস্থানে বসিয়া জগতের সর্ব্বকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, শূন্যে ভ্রমণ করা যায়, অন্য গ্রহ উপগ্রহে স্বেচ্ছায় বিচরণ করা যায় ইত্যাদি। তাহা হইলে দেখা যায়, স্থূলতঃ শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথম শারীরিক (Physical) দ্বিতীয় মানসিক (Psychic)। তৃতীয় আধ্যাত্মিক (Spiritual)। কিন্তু জড় শক্তিই বল, আর মানসিক শক্তিই বল, মানবের সমস্ত শক্তির মূলে মানবদেহের মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি। মানবদেহের কেন্দ্রে যেরূপ কুণ্ডলিনীশক্তি বিদ্যমান, পৃথিবী প্রভৃতির কেন্দ্রেও তদ্রূপ কুণ্ডলিনীবৎ একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হইতেছে না। কিন্তু যদি কেহ সেই কেন্দ্রাস্থিত শক্তিকে নিজ শক্তিবলে স্থানচ্যুত করিতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ পৃথিবী কক্ষচ্যুত হইয়া শূন্যে রেণু রেণু হইয়া যাইবে।

কিন্তু এই শক্তি কাহার? শক্তি চৈতন্যের। চৈতন্যই একমাত্র জগৎকারণ। জগৎসৃজন বাসনা হইলে, সেই চৈতন্য স্বীয় শক্তির স্ফুরণ করেন। চৈতন্যশক্তির প্রথম পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব। দ্বিতীয় পরিণাম অহংতত্ত্ব, তৃতীয় ইন্দ্রিয় ও পরমাণু, চতুর্থ এই জগৎ। অর্থাৎ জগতই শক্তির ব্যক্তাবস্থা। এই শক্তির অব্যক্তাবস্থাকে কেহ প্রকৃতি, কেহ বা মায়া বলে। কিন্তু এই শক্তি ও চৈতন্য অভেদ। উপাসনা শক্তিরই হউক, আর চৈতন্যেরই হউক, উভয়ই এক। শক্তি বাদ দিলে চৈতন্য পঙ্গুবৎ ও অচিন্তনীয়। আবার চৈতন্য বাদ দিলে শুধু শক্তি জড়। চৈতন্য ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না, সে শক্তির উপাসনাও হয় না। আবার শক্তি ব্যতীত চৈতন্যের উপাসনা হয় না; নিরুপাধিক চৈতন্যের উপাসনা সম্ভব হয় না। তাই আচার্য্য বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মোপাসনা স্থলে কেবল ব্রহ্মের গ্রহণ না করিয়া যেমন শক্তির ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাবপ্রযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মায়ার আরাধনা করিলেও পরব্রহ্মের সত্তাবিশিষ্ট মায়ার উপাসনা বুঝিতে হইবে। ফল কথা এই যে, যেমন নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না, তেমনি ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল মহামায়ার উপাসনাও সম্ভবে না। অধিকন্তু মায়ার আশ্রয় নাই—তিনি ব্রহ্মের আশ্রিতা।"

যে ভাবেই দেখা যাক, শক্তি উপাসনাই বল, আর শক্তিমানের উপাসনাই বল—এক চৈতন্যের উপাসনাই হিন্দুগণ নানাভাবে করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর এক। গুণবিশেষে বা উপাধিভেদ-বশতঃ তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ভাব। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"এক এব তু পরমাত্মা ঈশ্বরস্তৈস্তৈগুণ-বিশেষৈর্বিশিষ্ট উপাস্য যদ্যপি ভবতি তথা যথা গুণোপাসনমেব ফলানি ভিদ্যন্তে, তং যথা যথোপাসতে, তদেব ভবতি।"

অবিদ্যাবস্থায় জীব উপাসক, ঈশ্বর উপাস্য, এই দ্বৈতবাদ। তন্মধ্যে উপাধি বা গুণবিশেষে উপাসনার ভেদ হইয়া থাকে। ঈশ্বর এক হইলেও যেরূপ গুণ তাঁহাতে আরোপিত বা গুণবিশিষ্ট করিয়া উপাস্য হন, গুণের তারতম্য হওয়ায় উপাসনার ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে। সাধকের হৃদয় সন্তানভাবে ভরপুর হইলে সে দাস্যভাবে ঈশ্বরের মাতৃরূপ উপাসনা করে বা ভগবানে মাতৃত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকে কালী, তারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার যে বিদ্যা সাধকের চিত্ত হরণ করিতে পারে, সেই মূর্ত্তিরই উপাসনা করে। কেহ বা ভগবানকে জ্ঞান ও বৈরাগ্য গুণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া শিবের মূর্ত্তির উপাসনা করে। কেহ বা ভগবানকে তেজোবিশিষ্ট করিয়া ব্রহ্মার মূর্ত্তিতে উপাসনা করে। কেহ বা তাঁহার ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি ইন্দ্রের উপাসনা করিয়া ঐশ্বর্য্যভিক্ষা করে। আবার কেহ বা পূর্ণানন্দলিপ্সু হইয়া ঈশ্বরের আনন্দঘন মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে। এইরূপ অনন্ত মূর্ত্তি শ্রীভগবানের অনন্ত ভাবের প্রতীক্ মাত্র। উপাসনার ভাবভেদে তাঁহার মূর্ত্তিরও ভেদ হইয়া থাকে—তবে স্বরূপতঃ তিনি এক। শুধু গুণের তারতম্য হিসাবে উপাসনার শ্রেষ্ঠতা ও ন্যূনতা লক্ষিত হয়। ইহাকেই সগুণোপাসনা বলে। এইক্ষণ শক্তির অসংখ্য মূর্ত্তির ভিতর দশমহাবিদ্যার রূপ শ্রেষ্ঠ। আবার এই দশমহাবিদ্যার ভিতর কালীমূর্ত্তি শ্রেষ্ঠতম। শক্তিমানের মূর্ত্তির ভিতর শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠতম।

এক চৈতন্যই প্রধানতঃ তিন মূর্ত্তিতে উপাসীত হন, যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব।

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈ-
যুর্ক্তঃ পরপুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

চৈতন্য যখন সত্ত্বে প্রতিবিম্বিত, তখন তিনি বিষ্ণ্বাখ্য; যখন রজোগুণে প্রতি-বিম্বিত, তখন ব্রহ্মনামধেয়; যখন তমে প্রতিবিম্বিত, তখন শিবাখ্য। তিন মূর্ত্তি একের হইলেও তমঃ হইতে রজঃ এবং রজঃ হইতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। কারণ শাস্ত্র বলিতেছেন—

"তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্।"

সত্ত্বগুণে জ্ঞান সম্যক্ প্রতিভাত হয়—যেমন দর্পণের স্বচ্ছতার উপর প্রতিবিম্বের স্ফুটতা নির্ভর করে। এই বিষ্ণুর আবার বহুপ্রকার ভাব। ভাবমাত্রেই রসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণুর বহু মূর্ত্তির ভিতর শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিই পূর্ণরসের ঘনীভূত মূর্ত্তি। যেখানে রস, সেইখানেই আনন্দপ্রাচুর্য্য; তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ আনন্দঘনমূর্ত্তি। শ্রুতি বলিতেছেন—"রসো বৈ সঃ।" অর্থাৎ পরব্রহ্মই একমাত্র রস। যাবতীয় রস একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান বলিয়াই তিনি আনন্দঘন। মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্ম ও শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কালী, তারা ইত্যাদি এক একটী রসের প্রতীক মাত্র। প্রত্যেক রসের প্রতীক উপাসনায় জ্ঞান হইতে পারে বটে, কিন্তু লীলারস ব্রহ্মানন্দের পূর্ণাবস্থা। বহুল

পরিমাণে গুণাতীত অবস্থা হইলেই পূর্ণ রসের আবির্ভাব হয়। এমন কি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি নারায়ণের চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কারণ নারায়ণমূর্ত্তিতে রসবাহুল্যের অভাব।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥"

সুতরাং যাহার ভিতর যেরূপ ভাবই থাকুনা কেন, সব রসই একাধারে শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, কারণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ধারণা কে করিতে পারে? তাই তিনি দীনের বন্ধু, শিখিপাখাধারী রাখালবালক, যত যুবজনের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের যৌবন হরণ করেন, কারণ বাসী ফুলে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা হয় না। তাঁহাকে পাইতে হইলে সমস্ত প্রেম তাঁহাকেই দিতে হইবে, সে দেহমনের উপর আর কাহারও প্রভাব থাকিবে না। তিনি রসের প্রস্রবণ বলিয়াই তিনি বহুকান্তাযুক্ত, কারণ রসের উল্লাস গোপীজনবল্লভের চিন্তাতেই হইয়া থাকে। অনেকের মনে হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন প্রাকৃত মানুষ—তাঁহার আবার উপাসনা কি? কিন্তু এ ধারণা স্থূল বুদ্ধিতেই সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের স্থূল কোন মূর্ত্তি ছিল না। তিনি দেবকীর উদরে বসুদেবের ঔরসে রক্তমাংসের শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার শরীর মায়িক শরীর। শিবাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়েনা ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্নিব লক্ষ্যতে।"

অর্থাৎ যোগমায়ার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে লোকের মনে প্রতীত হইয়াছিল যেন দেবকীর গর্ভ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ যেন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু বস্তুতঃ সব যোগমায়ার প্রভাব। তিনি নিজে অজ, অব্যয়, নিত্যমুক্ত স্বভাব। শ্রীরাধা তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ। গোপগোপীগণেরও এইরূপ জন্ম হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের কোন স্থূল শরীর ছিল না। শ্রীরাধা ঘনীভূত প্রেম, শ্রীকৃষ্ণ ঘনীভূত রস। উভয়ের আলিঙ্গিত ঘন প্রেমরসই আস্বাদনীয় বলিয়া রসের প্রতীকস্বরূপ যুগলের চিন্তায় নির্ম্মল হৃদয়েও রসের উল্লাস হয়।

কিন্তু যাঁহাদের হৃদয় সন্তানভাবে পূর্ণ, তাঁহারা ভগবানের মাতৃরূপই ভালবাসেন। শক্তিমানের উপাসনায় প্রকৃতিযুক্ত চৈতন্য উপাস্য। আবার যাঁহারা ভগবানের মাতৃভাবে আত্মহারা, তাঁহারা চৈতন্যযুক্ত প্রকৃতিকেই উপাসনা করিয়া থাকেন। কারণ ভগবানের উপাসনা ও তৎশক্তির উপাসনা উভয়ই এক, কেবল ভাবভেদে রূপভেদ মাত্র। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে শক্তিমানের উপাসনায় যেমন মূল প্রকৃতিতে উপহিত ব্রহ্ম উপাস্য, তদ্রূপ মাতৃভাবে যাঁহারা আত্মহারা, তাঁহারা চিচ্ছক্তির ভাবে বিভোর হইয়া তুরীয় ব্রহ্মযুক্ত মূল প্রকৃতির উপাসনা করেন। বস্তুতঃ উভয়ে অভেদ, কারণ জোর করিয়া ভেদ করিতে গেলে জড়ের উপাসনা করা হয়—ইহা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। এই আদ্যাশক্তির বহুবিধ রূপ আছে, যথা—কালী, মহাকালী, রক্ষাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, দুর্গা প্রভৃতি। তন্মধ্যে কালীমূর্ত্তিই শ্রেষ্ঠতমা।

কারণ জাগতিক সমস্ত বর্ণই কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়। কালী অর্থে কালশক্তি—ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সমস্ত লোকই তাঁহাতে বিলীন হইয়া যায়। তিনি দিগম্বরী; কারণ তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" তবে আর লজ্জা কাহাকে? বিশেষতঃ তিনি বিদ্যাস্বরূপিণী—পূর্ণজ্ঞানে লজ্জা বিদূরিত হয়। তিনি লোলজিহ্বা ও অসিকরা; কারণ তিনি ষড়রিপুনাশিনী। কেবল ভক্তদিগকেই দক্ষিণ হস্তে বরদাত্রী। তিনি বিরূপাক্ষবক্ষোবিহারিণী; যেহেতু শক্তি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নৃমুণ্ডমালিনী; কারণ অনন্ত কোটী ব্রহ্মা বিলীন হইয়া গিয়াছে—একমাত্র তিনিই সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। অথবা পঞ্চাশৎ নৃমুণ্ডদ্বারা ইহাই দর্শিত হইতেছে যে, পঞ্চাশৎ বর্ণমালা দ্বারা যে মন্ত্রই উচ্চারিত হউক না কেন, তাহা শুধু তাঁহারই উদ্দেশে।

কিন্তু মাতৃভাবের সাধক মায়ের পাদপদ্ম চিন্তার অধিকারী হইয়া থাকেন;—কখনও মায়ের দক্ষিণ অঙ্গ বা ভাবভেদে কেহ বা বাম অঙ্গ ও মায়ের মুখমণ্ডলমাত্র। শ্রীকৃষ্ণভক্তের ন্যায় তাঁহার অষ্টাঙ্গ চিন্তার অধিকার নাই। মায়ের সর্ব্বাঙ্গাপেক্ষা সন্তানের নিকট তাঁহার পাদপদ্মের মহিমা অধিক। কিন্তু যুগল ভক্ত ভজনীয়ের প্রতি অঙ্গের সহিত মিশিয়া যান।

শাক্তদের ভিতর এক দাস্যভাব প্রধান। সে মায়ের ছেলে, মা ই তাহার সব। মায়ের বাৎসল্যের উপর তাহার নির্ভর। মাতা তাহার সব আবদার সহ্য করিতে বাধ্য। কারণ সাধক জানে, মায়ের কাছে সে শিশুমাত্র। শিশু জগতের কি ধার ধারে? মা তাহার সমস্ত ন্যায় অন্যায় সহ্য করেন। কারণ শিশুর মাতাই শিশুর নিকট দায়ী—শিশু মায়ের নিকট দায়ী নহে। তাহার কোন চিন্তা নাই—কোন দায়িত্ব নাই। সে জানে মায়ের স্নেহের ন্যায় স্নেহ জগতে দুর্লভ। পার্থিব মাতা যখন নিজ সন্তানের মঙ্গল কামনায় চলন্ত ট্রেন হইতে লম্ফপ্রদানে সন্তান জীবন রক্ষা করে,—ব্যাঘ্রনক্রের মুখবিবর হইতে সন্তান ছিনাইয়া লইয়া আইসে, অগ্নিময় গৃহপ্রকোষ্ঠে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত শিশুকে হুতাশনের জ্বালার ভিতর প্রবেশ করিয়া বক্ষের কোমলতার ভিতর লুকাইয়া তাহার জীবন উদ্ধার করে;—তখন যে ত্রিলোকের মাতার আশ্রয় লইয়াছে, তাহার আর চিন্তা কি? সে প্রথমে শিশুর ন্যায় মাতার নিকট হইতে নানাবিধ শক্তি ভিক্ষা করিয়া ভোগ করে, তার পর শিশু যেরূপ ধীরে ধীরে খেলনাগুলি ফেলিয়া দেয়, সাধক তদ্রূপ ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া মায়ের সাহত মিলিত হইয়া যায় এবং মাতা শিশুকে লইয়া স্বীয় স্বামীর সহিত মিলিয়া যান বা শক্তি চৈতন্যে লীন বা স্তিমিত হন। অর্থাৎ প্রকৃতি নির্গুণা হইয়া চৈতন্যে লয় হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ভাব বিভিন্ন, যথা—শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য ও মধুর। এই পঞ্চবিধ ভাবের ভিতর মধুর ভাবই উৎকৃষ্ট; এক মধুরভাবে অন্য চারিপ্রকার ভাব পর্য্যবসিত হয়। স্বামীই স্ত্রীর হৃদয়ের সমস্তখানি জুড়িয়া বসিয়া থাকে। তাহাতে অন্যের স্থান নাই। মধুরভাব সত্যই বড় মধুর। কারণ স্ত্রী স্বামীকে যতখানি চিনে, তাহাকে আর কেহ ততখানি চিনিতে পারে না। স্বামীর কাছে স্ত্রীর কোনও বিষয়ই গোপন নাই। সে তাহাকে পঞ্চবিধভাবেই ভালবাসে।

পঞ্চবিধভাবে ভালবাসিলেও, সত্যই কি সব মাতাই যেরূপ তাহাদের সন্তানকে ভালবাসে, সব স্ত্রীই কি সত্যই তাহাদের স্বামীকে সমস্ত প্রাণ উবাড়িয়া ভালবাসিয়া থাকে? সে ভালবাসার আদর্শ হয়ত সহস্র স্ত্রীর ভিতর এক জনেই দৃষ্ট হয়, এবং দৃষ্ট হইলেই বিশ্লেষণে দেখা যায়, স্ত্রীর ভাবের ভিতর গুরু লঘু ভাব ভেদ আছে; তার ভালবাসার ভিতর Volume বা প্রসার থাকিলেও মাতৃস্নেহের ন্যায় প্রশান্ত মহাসাগরের অতলস্পর্শী গভীরতার অভাব থাকিয়া যায়। তাই পরকীয়া প্রেমের সহিত শুধু মাতৃস্নেহের তুলনা হইতে পারে। উপপতির প্রতি ভালবাসার তীব্রতা হেতু প্রেমিকা তাহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেয়, সে স্বামীকে তুচ্ছজ্ঞান করে, সে সন্তান স্নেহ বুক হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, গভীর রজনীতে প্রেমিকের সহিত মিলিত হইতে বিষধরের মস্তকে হেলায় পদাঘাত করে। প্রেমিকও তদ্রূপ তাহার সহিত মিলিত হইতে, শবকে ভেলা মনে করিয়া ঝটিকাহত উত্তাল-তরঙ্গক্ষুব্ধ নদীবক্ষ পার হয়, সর্পকে রজ্জুভ্রমে ধৃত করিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে। সুতরাং প্রকৃত মাতৃস্নেহের সহিত একমাত্র পরকীয়া প্রেমেরই তুলনা হইতে পারে। এই পরকীয়া প্রেম বলিতে বৈষ্ণবের ভিতর গোপী প্রেমই বুঝিতে হইবে। গোপীপ্রেম কৃষ্ণ-সুখেই পর্য্যবসিত—তাহাদের নিজের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্ত ইচ্ছা নাই। তাই মাতৃস্নেহের সহিত গোপীপ্রেমের তুলনা হয়—কারণ এ প্রেম খাদমিশান নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ও কালীর উপাসনা একমাত্র সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা; শুধু ভাবভেদে রূপভেদ মাত্র। শাক্ত ও বৈষ্ণবে যে বহুকাল হইতে ভেদ চলিয়া আসিয়াছিল, সেই ভেদভাব দূরীকরণার্থে বৃন্দাবনে শ্রীভগবান কৃষ্ণকালী-মূর্ত্তিতে উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবধানের উপর নিজেই সেতু হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। (সমাপ্ত)

স্বামী রামতীর্থ

—*—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

"৫ই জুন, ১৮৯৪। মহারাজজী, ভগবান পরম দয়াল। তাঁকে আমার বড় ভাল লাগে। তিনি বড় মধুর, তাঁর সঙ্গে তুমি সব সময় ভাব রেখে চলো। তিনি কখনও কাউকে কষ্ট দেন না। তবে তিনি খেলা ভালবাসেন কি না—তাই মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে একটু তামাসা করেন। আমরা তাকেই বলি দুঃখ। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই এখন বুঝ্‌তে পেরেছি। একদিন তোমায় সে সব কথা বল্‌ব।

"আমি যে টেবিলে বসে এই চিঠিখানা লিখ্‌ছি, তার উপর কয়েকটা চিনির দানা আছে। তার চারদিকে তিন চারটা পিঁপড়ে এসে জুটেছে। আমি কাগজের উপর লিখে

যাচ্ছি, আর তারা সেই কালো কালো আখরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। তাই নিয়ে তাদের মাঝে একটা আলোচনা চল্‌ছে, আমি তা শুনছি। তারা কি বলাবলি করছে—তা তোমায় বল্‌ছি।

"প্রথমেই বলে রাখ্‌ছি—আমার লেখার ছাঁদ নিখুঁত নয়, আমি খুব সুন্দর লিখ্‌তে পারি না; কিন্তু চীনা চিত্র আমাদের কাছে যেমন আশ্চর্য্য মনে হয়, আমার লেখাটাও এদের কাছে তেমনি ঠেক্‌ছে।

"যে পিঁপড়েটা প্রথম আলোচনা সুরু করেছিল, সে হচ্ছে দলের মাঝে সব চেয়ে ছোট্ট—একেবারে নেহাৎ কচি খোকা। খোকা পিঁপড়ে বল্‌ল, 'দেখ, দিদি দেখ, এই কলমটার ওস্তাদী দেখ। কেমন পাকিয়ে পাকিয়ে সুন্দর সুন্দর অক্ষর সব লিখে যাচ্ছে। ছিল শাদা কাগজ, লেখার পর হল একখানা চিঠি; মানুষ তখন আদর করে তাকে তুলে নিয়ে পড়বে। কলমটা কাগজের ওপর যেন মুক্তো ছড়াচ্ছে।—কি সুন্দর রং, কি সুন্দর নক্‌সা! কতকগুলো অক্ষর দেখ্‌তে দিদিদের মত। কি সুন্দর!'

"এই কথা বলে প্রথম পিঁপড়েটা চুপ করল। একটা ডাগর চোখওয়ালা বড় পিঁপড়ে তখন বল্‌তে লাগল, 'না দিদি তোমরা দেখ্‌ছ না—কলমটা তো মরা। ওর চিত্র করবার ক্ষমতা কোথায়? যে আঙুল দুটো কলমটা ধরে আছে, এ তাদেরই কীর্ত্তি।'

"আর একটা পিঁপড়ে ছিল এদের চেয়েও জ্ঞানী। সে বল্‌ল, 'তোমরা দুজনাই কিছু জান না। আঙুল দুটো তো দুটো কাঠিমাত্র। তারা কি কর্‌তে পারে? আঙুলের ওপরে যে হাতের কব্জী আছে, সেই সব করাচ্ছে।'

"পিঁপড়ের মা তখন বল্‌ল, 'না মা, তোমরা সবাই ভুল বুঝ্‌ছ। ওই লম্বা হাতটা সব করছে।'

"ওদের কথা শেষ হলে আমি বল্‌লাম, 'হে আত্মস্বরূপ, আমারই ভিন্ন দেহ তোমরা! হাতটাও যে মরা। আত্মাই তাকে গতিশীল করছেন। আত্মার অধিষ্ঠানেই সব হচ্ছে।'

"তুমি যদি এখানে এসে থাক্‌তে চাও—সে তো ভালই। আর সেখানেও যদি থাক্‌তে চাও একজন সেবক নিয়ে—সে তো আরও ভাল। তুমি যেমনটী চাও, আমি তেমনটী তোমার সেবা করব।

"কারু ওপর আমার রাগ হয় না। বড় আনন্দে আছি। মানুষ রাগের মাথায় দায়িত্ব না বুঝে নানা কথা বলে। তাদের ক্ষমা করা উচিত। তাদের সঙ্গে তোমার সন্ধি করা উচিত। তাদের বাড়ী খাও বা না খাও—সে পৃথক কথা। যা খুসী তাই কর না কেন, কিন্তু মানুষে মানুষে বিরোধ বাধিও না। ক্ষমাই সাধুর ভূষণ। আমি জানি, ভগবান তোমায় পরমা শান্তি দেবেন।

"৬ই জুন, ১৮৯৪। আশা করি, শনিবার দিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি আস্‌তে পারলাম না, প্রথমতঃ আমার ছুটী ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এখনও বৃত্তির টাকা পাইনি। টাকাকড়ি কিছু না নিয়ে যদি বাড়ী আসি, তাহলে সবাই নিরাশ্বাস হয়ে পড়ে—আমার সেটা ভাল লাগে না।

"৮ই জুন, ১৮৯৪। বড় আনন্দেই আছি। তার পায়ের ধূলা আমার চোখের মণি হোক্—এই চাই শুধু!

"৩১শে আগষ্ট, ১৮৯৪। আমি নির্জ্জনে

থাকি। তুমি সংসারের কোলাহল থেকে দূরে থেকো—ঘরের ছাতে গিয়ে বসে থেকো; আর যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি বই পড়ো। ছাতে বসে পড়লে তবে এ সব বইয়ের তাৎপর্য্য বোঝা যায়—তার নীচে থেকে নয়।

"২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪। হাঁ, মন চঞ্চল; ওকে পোষ মানানো খুব কঠিন। বরং উপবাস থাকা ভাল। লঘু আহার আর উত্তম পরিপাক সত্যলাভের অর্দ্ধেক।

"১৩ই নবেম্বর, ১৮৯৪। বাবা লিখছেন, ছোট বৃত্তিটা থেকে ২৫৲ টাকা রেখে দিতে; আর অন্য বৃত্তি হতে আগামী দু'মাস ৫৲ টাকা করে রেখে ১০৲ টাকা জমাতে। এতে আমার হাতে ৩৫৲ টাকা হবে, আর তিনি পাঠাবেন ১৫৲ টাকা; দু'য়ে মিলে পরীক্ষার ফিসের ৫০৲ টাকা হবে। কিন্তু আমি বলছি কি, ২৫৲ টাকা থেকে ১২॥০ টাকা তো কলেজের মাইনে বাবত কাটা যাবে; তার পর অসুখের দরুণ কলেজে যেতে পারিনি বলে সে কয়দিনে আরও ৬৲ টাকা কাটা যাবে। এর ওপর শীতের কাপড় কিনতে হবে—খাওয়া খরচ আছে। মাসে ৫৲ টাকা করে বাঁচানো বড় শক্ত। কালকে শীতের কাপড় কিনেছি—একজোড়া পাজামা, একটা ওয়েষ্টকোট, একটা কাশ্মিরী কোট, মোটর ওপর ৭৸০ খরচ হয়েছে।

"ও সব কথা বাবার কাছে তুলতে চাই না। কাকা কি শ্বশুর আমায় সাহায্য করবেন বলে আশা করি। ভাবনাই বা কি? ভগবান আমার সহায়—এতদিন তো তিনিই চালিয়ে এসেছেন।

"১৬ই নবেম্বর, ১৮৯৪। একটী পয়সাও হাতে ছিল না যে একখানা পোষ্টকার্ড কিনব। তাই তোমার কাছে চিঠি লিখতে পারিনি। আজ রাত দশটার সময় লালা সাহেবের আফিসে গিয়ে এই পোষ্টকার্ডখানা এনেছি। আজ জামা কাপড়গুলো তৈরী করিয়ে এনেছি। একজন চালাক লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। বেশ ভাল সওগাতই হয়েছে।

"৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪। তোমার কাছে চিঠি লিখতে দেরী হল, কারণ হাতে একটী পয়সাও ছিল না। একটা পয়সা কারু কাছে ধারও করলাম না—ভাবলাম, সময়মত বৃত্তির টাকাই তো পাব। কিন্তু টাকাটা ঠিক সময়ে যখন পেলাম না, তখন একটা পয়সা কর্জ করতে হল।

"৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪। আমার মতে বই কিনবার সময় টাকা পয়সার কথা মোটেই ভাবতে নাই। বইয়ের দাম যত বেশীই হোক্ না কেন, একটা ভাল বইয়ে যা লেখা থাকে, তার তুলনায় ও কিছুই নয়। সেকালের কথা ভেবে দেখ না কেন, ছোট্ট একটা বই নকল করিয়ে নিতেও মানুষ কত টাকা খরচ করত। আজকাল বড় কষ্টের দিন—বিশেষতঃ টাকা পয়সা সম্পর্কে।

"১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪। তাহলে তুমি রাগ করেছ? আমি আর কি করব বল? তোমার সঙ্গে যা হতে আচরণের পার্থক্য ঘটতে পারে এমন কোনও কিছুর বিন্দুবিসর্গও তো আমার মাঝে খুঁজে পাচ্ছি না। কিন্তু তবুও তুমি রাগ করেই আছ। আমার সব সময় ক্ষমা করাই তো তোমার পক্ষে ভাল। 'তোমার কটু কথাও আমার কাছে মধু। তোমার রাগে আমার অনিষ্ট হয় না, বন্ধু। তোমার দেওয়া বিষে আমার মরণ হয় না,

প্রিয়তম।' এতদিন যা কিছু শিখেছি, তার দোহাই দিয়ে বল্‌তে পারি, তোমার রাগের আসল কারণ রয়েছে তোমার পেটে। নিশ্চয়ই তোমার ভাল হজম হয় না। একটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি, সেটা খেয়ে দেখো— আমার ওতে উপকার হয়েছিল।"

*

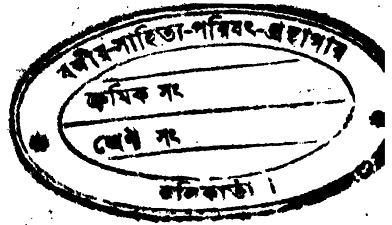
এইখানেই তীর্থরামের ছাত্রজীবনের দিনলিপি শেষ হইল। ক্ষণিক উত্তেজনা বশে একটা বড় কাজ করিয়া ফেলা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর। কিন্তু ইহাকেই অন্তরে শক্তি সঞ্চয়ের পরিচয়রূপে গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। মানুষের জীবনের যথার্থ মর্য্যাদা ফুটিয়া উঠে—তাহার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে। দশের মনে তাক লাগাইয়া দিবার মত সুযোগ সকলের ঘটে না; কিন্তু তাহাতেই যে জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। সাধারণতঃ দেখিতে পাই, ছাত্রজীবনে তাক লাগাইয়া দিবার প্রতি একটা দুর্জ্জয় আগ্রহ অনেকেরই থাকে। যে সমস্ত মহামনা ব্যক্তি বাল্যে কোনও আকস্মিক ও অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, বালকসুলভ কল্পনা-প্রাবল্যে ছাত্রেরা তাঁহাদেরই ব্যর্থ অনুকরণ করা জীবনের আদর্শ বলিয়া মনে করে। ইহাতে দোষ হয় এই যে, আত্মশক্তির পরিমাণজ্ঞান ও আত্মানুসন্ধিৎসা না থাকায় চরিত্রের কোনও দৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠে না। মহৎ জীবনের জাঁকটাই অভ্যস্ত হয়, কিন্তু শক্তির চর্চ্চাটা ফাঁক পড়িয়া যায়।

তীর্থরামের ছাত্রজীবনের মনন করিলে আমাদের দেশের ছাত্রেরা ইহার মাঝে কল্পনা-প্রাবল্যের প্রচুর প্রতিষেধক খুঁজিয়া পাইবে। তাঁহার ছাত্রজীবনে আকস্মিক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার বাহুল্য নাই, অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় নাই—অথচ সর্ব্বত্র একটী নিষ্ঠাপূত তেজস্বী স্বাবলম্বী মনের চিত্র চোখের সামনে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। অদম্য জ্ঞান-স্পৃহা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই সহায়সম্বলহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণবালক অবস্থাবিপাকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যেরূপে স্বীয় লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক ছাত্রেরই অনুকরণীয়। আজকাল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অর্থচিন্তার মর্ম্মান্তিক যোগ ঘটিয়াছে—ইহাতে শিক্ষার পবিত্রতা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহার তুলনায় তীর্থরামের এই নিঃস্বার্থ জ্ঞানস্পৃহা একটা দুর্লভ বস্তু। ইহা হইতেই তাঁহার লক্ষ্যের অন্তর্মুখীনতা সহজেই প্রমাণিত হইয়া থাকে। বাহ্যদৃষ্টিতে তিনি আর দশজনের মতই জীবন যাপন করিয়াছেন, এমন কি তাহাদের অপেক্ষা নিতান্ত হীনাবস্থাতেই তাঁহাকে কালাতিপাত করিতে হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যেই তাঁহার সংযম ও তপস্যা দেবারতির ধূপগন্ধের মত তাঁহার জীবনকে একটা পবিত্র বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

বালকের হৃদয় স্বভাবতঃই নির্ভরশীল—সে স্বতঃই একটা স্নেহের আশ্রয় চায়। পিতা মাতা কিম্বা আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে এই স্নেহ প্রচুর পরিমাণে পাইলেও তাহার হৃদয়ের সমস্ত পিপাসা ইহাতে মিটে না। শুধু রক্তের আকর্ষণে যে স্নেহব্যাকুলতা জাগে এবং তাহাতে চরিত্রের যে পরিমাণ বিকাশ ঘটা সম্ভবপর, মানুষের জীবনের পক্ষে তাহা কখনই পর্য্যাপ্ত নহে। সামাজিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে রক্তসম্বন্ধের প্রেমপ্রীতিতে এমন একটা স্থূলতার আভাস আসিয়া পড়ে, যাহা ভাব-

বিলাসীর অন্তরের তৃষ্ণাকে কিছুতেই তৃপ্ত করিতে পারে না। এই জন্য বাল্যজীবনের পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের স্নেহের পরেও আচার্য্যের অমায়িক স্নেহের প্রয়োজন হয়। গুরু কিম্বা আচার্য্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তাহা স্বভাবতঃই স্থূলতার মোহ হইতে মুক্ত। সেখানে মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে মানুষের যে পরিচয় হয়, তাহাতে জৈব প্রেরণার অন্ধতা থাকে না বলিয়াই ভালবাসিয়া এবং ভালবাসা পাইয়া আত্মা বন্ধনমুক্তির একটা অনির্ব্বচনীয় আস্বাদ পাইয়া থাকেন। এই বন্ধনহীন ভালবাসার পিপাসা সকল বালকের মাঝেই আছে—যাঁহারা শিশুচরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। উপযুক্ত আশ্রয় পায় না বলিয়া এই ভালবাসা অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া জীবনে নানা বিপ্লবের সৃষ্টি করে—ইহা নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। গুরু কিম্বা আচার্য্যকে আশ্রয় করিলে তাহার অপ্রত্যাশিত সার্থকতা ঘটিয়া থাকে,—নিত্যদৃষ্ট না হইলেও ইহা বহু ভাগ্যবানের জীবনে পরীক্ষিত সত্য।

তীর্থরামের বালকহৃদয় এইরূপ আচার্য্যের আশ্রয় পাইয়া সার্থক হইয়াছিল। সাংসারিক দেনা-পাওনার হিসাব ছাড়াও জীবনে আরো কিছু সঞ্চয় সকলেরই থাকে—তীর্থরামেরও তাহা ছিল, সাধারণ অপেক্ষা বরং একটু বেশী মাত্রাতেই ছিল। আচার্য্যের নিকট আত্মসমর্পণ দ্বারা এই আধ্যাত্মিক আসঙ্গলিপ্সা তৃপ্ত করিবার সুযোগ যদি তিনি না পাইতেন, তাহা হইলে জীবনের গূঢ়তর সমস্যাগুলির মীমাংসা করিতে তাঁহাকে বহু বেগ পাইতে হইত এবং এত অল্পকালে হয়ত তাঁহার জীবনে সিদ্ধিলাভ ঘটিত না। যেমন নাকি গ্রাসাচ্ছাদন বিষয়ে পিতামাতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তিতে বালকের দেহটী গড়িয়া উঠে, তেমনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে একজন গুণী ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতে পারিলেও হৃদয়ের পরিণতি অতি দ্রুত সংঘটিত হইতে দেখা যায়। অবশ্য শুধু পুঁথিগত বিদ্যাতে যে কাহারও হৃদয়ের পরিণতি ঘটে, এ কথা মনে করিতে পারি না। হৃদয়ের সংস্পর্শেই হৃদয় জাগিয়া উঠে। বহু ছাত্রের ভাগ্যে এই হৃদয়ের সংস্পর্শ লাভ করিবার সুযোগ ঘটে না, তাই বিদ্যাভারে আক্রান্ত হইয়াও তাহাদের চিত্ত সরস ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয় না,—চিন্তায় মৌলিকতা দেখা দেয় না। পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করা সহজ, নিজে চেষ্টা করিলেও তাহা হইতে পারে—কিন্তু মানুষের স্পর্শ না পাইলে মানুষের হৃদয় সরস হয় না। তীর্থরামের দিনলিপিতে স্থানে স্থানে তাঁহার তীব্র মনোবেগ ও চিন্তায় মৌলিকতার পরিচয় আমরা পাই। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিবার হিম্মতও তিনি দেখাইয়াছেন। ইহা তাঁহার ঔদ্ধত্য বা স্বাধীনচেতস্ব নয়; আমরা মনে করি, ইহা তাঁহার একান্ত নির্ভরেরই ফল। মায়ের আশ্রয় সম্বন্ধে যে ছেলে যত নিশ্চিন্ত, তাহার দুরন্তপনা তত বেশী হয়; আবার একটু টান পড়িতেই সে তত সবলে মায়ের বুক আঁকড়াইয়া ধরে। আত্মশক্তির স্ফুরণ ও প্রপন্ন ভাব—এই দুইটাই তীর্থরামের দিনলিপিতে আমরা জড়িত দেখিতে পাই। ইহারা পরস্পর বিরোধী নয়—এক অপর হইতে উৎপন্ন। আত্মসমর্পণের আধার মিলিলে আত্মশক্তির স্ফুরণ আপনা হইতেই হয়। এই আশ্রয় বাল্যে মিলিলে জীবন আরও সহজে সার্থক হইয়। (ক্রমশঃ)



সাধনপ্রসঙ্গ

—•—

আত্মাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে, এই হচ্ছে সকলকার আগের কথা। সাধারণতঃ তার দুটো পথ দেখ্‌তে পাই—এক হচ্ছে সাধক ভাবে মনন, আর এক হচ্ছে সিদ্ধভাবের মনন। জীব অবস্থাটাকেই যদি মনে-প্রাণে সত্য বলে মেনে নিই, তাহলে সাধকের অভিমান নিয়ে চল্‌তে হয়। তখন যেখানেই থাকি না কেন, সংসার বলে একটা কিছু আমার আছেই। আর সে সংসারের ভালমন্দ সুখ-দুঃখ আমারই। অর্থাৎ সোজা কথায়, আমি যে বদ্ধ, এ কথাটাই তখন মনের মাঝে সর্ব্বদা জাগ্‌বে; বদ্ধভাবটা অবচেতনায় থাকবে বলে বাইরের কাজ-কর্ম্ম আচার বিচার ঠিক ওই ভাবের অনুকূল হয়েই প্রকাশ হবে। তখন কর্ম্ম অবশ্যই থাক্‌বে, কিন্তু সে কর্ম্ম আমাকেই কেন্দ্র করে; কর্ম্মফল আমাকেই তখন হাঁসাবে কাঁদাবে।

*

আর একটা ভাব হতে পারে—আমি সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিয়েছি যখন, তখন হতেই মুক্ত হয়েছি, সংসারের দায় এড়িয়ে এসেছি। গুরু জগদ্‌গুরু অর্থাৎ জগতের সেবক; আমি সেই সেবার দোসর। তিনি হৃদয়—আমরা তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অতএব চিন্ময়। আমরাও নিত্যমুক্তস্বভাববান্‌। তিনি যেমন লীলার ছলে জগৎ-সেবক হয়ে এসেছেন, আমরাও তেমনি তাঁর গণরূপে সঙ্গে এসেছি—কর্ম্মের অবসানে আবার স্বধামে ফিরে যাব। মায়ার খোলস গায়ে এঁটেছি, তাই মায়ার গুণ কিছু না কিছু স্পর্শ করছে। তাই সময় সময় মনে হয়, আমারও বুঝি সাধ্য সাধন আছে। ওটুকু হয় কুসঙ্গের দোষে। আসলে ও কথাটাই মিছা। বদ্ধের আচরণের সঙ্গে আমার যত সাম্যই দেখাও না কেন, যত যুক্তিতর্ক দিয়েই আমার বদ্ধদশা প্রমাণ করতে চাও না কেন—আমি জানি সব মিছা। তোমার যুক্তিতর্ক কিছুই কিছু নয়—আমার বুদ্ধির অনুভবও কিছু নয়—সত্য শুধু আমার বজ্র-দৃঢ় বিশ্বাস, আমি গুরুর গণ—অতএব চিন্ময়। ওই আমার স্বরূপ; অন্তরের অন্তরে ওই স্বরূপের জ্যোতিঃই সহস্র বিদ্যুতের প্রভায় জ্বলছে।

*

এ ভাবেও কর্ম্ম আছে; কিন্তু সে কর্ম্ম সহজ কর্ম্ম। কর্ম্ম কোথায় নাই? জগতের সব ঠাঁই সব সময় কর্ম্মস্পন্দন আছেই। ক্ষুদ্র বালিকণার আধার হতে অসীম মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল নৃত্য পর্য্যন্ত সকলের মাঝেই তো কর্ম্মের স্পন্দন। একটা আধারে নিজকে বদ্ধ ভেবে আর একটা আধারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধলেই দুঃখ। নইলে স্পন্দন তো আনন্দেরই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিলাস। যে সিদ্ধভাবের মন্তা, সে জানে, সে নিরাধার। আপাততঃ-পাওয়া এই দেহ-মন বুদ্ধি একটা নিমিত্ত বই তো নয়। এও যেমন নিত্য নয়, তেমনি এর সুখদুঃখও নিত্য নয়। অনিত্যকে অনিত্য বলে বোধ হলেই আর দুঃখ থাকে না। কর্ম্ম থেকে দুঃখবোধ চলে গেলে ক্রমে সুখবোধও চলে যায়—তখন স্বভাবের স্ফূর্ত্তি হয় অর্থাৎ আনন্দের বিকাশ হয়।

সুখদুঃখের যে কর্ম্ম, তাই বন্ধন বটে, কিন্তু আনন্দের কর্ম্ম তো বন্ধন নয়—সে হচ্ছে বিলাস।

*

সে কর্ম্ম চিন্‌ব কি করে? যখন দেখ্‌ব, চিত্তে বাসনার একটা দাগও নেই—অথচ অফুরন্ত কর্ম্ম উৎসারিত হচ্ছে, তখন বুঝ্‌ব, এইবার জগন্ময়ীর জগৎলীলায় ভেসে চলেছি—আর ভয় নেই। যা হবার তা হবেই, এইটুকু জেনে ভিতরটাকে অবিক্ষুব্ধ রাখা, অথচ পরিপূর্ণ উত্তমের মাঝে দেহমনকে ছেড়ে দেওয়া—এই হল আনন্দ স্বভাবের কর্ম্ম। যা হবার তা হবেই। আমি বাধা দিতে পারব না; অথচ কতকগুলো কামনা-বাসনায় বাধা এনে উপস্থিত করে ঘটনার স্রোত রোধ করতে চাচ্ছি। এতে ঘটনটা ঘটেই, লাভের মধ্যে আমারই চিত্তটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়।

*

সকল আকাঙ্ক্ষা গিয়েও হয়ত জগতের হিতাকাঙ্ক্ষাটা থেকে যায়। ওইটুকু বাসনার সূত্র ধরে আবার সুখদুঃখের বন্ধন সৃষ্টি হয়। যার ইচ্ছায় সব হচ্ছে, সে যদি আমার আপন হয়, তবে আমার ইচ্ছার সঙ্গে তার ইচ্ছা বাধবে কোথায়? জগতের হিত কি আমি একা করছি? যার জগৎ, তার হঁস্ নেই?—এই যে আমার ভিতর থেকে আর সব বাসনা গিয়েও জগদ্ধিতের বাসনা থেকে গেল—এতেই তো প্রমাণ হয়, যার জগৎ, তার ভাবনার আর অন্ত নাই। তার ভাবনাটাই তো আমার মাঝে প্রেরণার আকারে ফুটে উঠ্‌ছে। কিন্তু বুঝ্‌তে হবে—এ বাসনা সতী বাসনা—শুদ্ধা বাসনা। এর সঙ্গে মনবুদ্ধির মতলববাজী জুড়ে দিয়ে জগদ্ধিতের ছক্ আঁকলে চলবে না। তাতে ফলাকাঙ্ক্ষা এসে জুটবে, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও আস্‌বে। অণুমাত্র বাসনাও না রেখে সহজ আনন্দে কর্ম্ম করা—এই যথার্থ জগদ্ধিত। সে হিত কারু বাড়ী বইয়ে দিয়ে আস্‌তে হয় না—কমলবনের সৌরভের মত আপনিই তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

*

সংসার ভাবটা যাদের প্রবল, তাদের সাধন চেষ্টা দুর্দ্দম হওয়া চাই। আত্মমুক্তির চেষ্টাই যে সকল কর্ম্মের উপরে, এই কথাটা তাহাকে অহরহঃ স্মরণ রাখ্‌তে হবে। জোর করেই বল্‌তে হবে, আমি বাসনা-কামনার তাঁবেদার নই। শুধু শুধু বলারও একটা ফল আছে; ও হচ্ছে মানসকীর্ত্তন। বার বার বল্‌তে বল্‌তে অবশেষে একদিন ভিতর থেকে সত্য হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌বে।

*

আর একটা কথা। কালের অতীত হবার চেষ্টা করতে হবে। সংসারে সময়ের বড় টানাটানি। অবসর পেলাম, এমন কথা বড় কেউ বলে না। বাস্তবিক কাজের ভিড়ে যে অনবসর ঘটে, তা নয়—মনে দুর্ভাবনার ভিড় লেগে থাকে বলেই ও কথা মনে হয়। তাই বিনা কাজে কত সময় কেটে যায়, কিন্তু তবুও সাধন ভজনের সময় আর হয়ে উঠ্‌তে চায় না। সাধন ভজন মনের কাজ কিনা; সেখানটায় ফাঁকা থাকলে তবে না সাধনের অবসর মিল্‌বে। কিন্তু এই ভাবটা দূর করতে হবে। ভাবতে হবে, সকল কাজের চেয়ে আমার ওই কাজটাই বড়। ওর জন্য অবসর করবার চেষ্টাটাই একটা সাধনা। যে দিন সে চেষ্টাটা সফল

হবে, অর্থাৎ সংসার কর্ত্তব্য করেও তাঁর কথা ভাববার প্রচুর অবসর পাব, সেই দিন বুঝ্‌ব, আমার সাধনার অর্দ্ধেক হয়ে গেল। এমন একটা দৃঢ়তা মনের মাঝে আন্‌তে হবে যে, তাকে নিয়ে যতক্ষণ থাক্‌তে পারি থাক্‌ব, তাতে যে ক্ষতি হবার তা হোক্—দেহ ভুল হয়ে যাক্—জগৎ ভুল হয়ে যাক্। একটু নিরালায় বস্‌ব, আর ভাব্‌ব, ওই বুঝি ঘড়ি বেজে উঠ্‌ল, ওই বুঝি কাজের তাগিদ এল—এ সব ভাব্‌লে চলবে না।

*

সমস্ত দিনের মাঝে অন্ততঃ একটা সময় সকল ইন্দ্রিয়ের দুয়ার বন্ধ করে একটা অটুট সঙ্কল্প নিজের মাঝে জাগাতে হবে। সঙ্কল্প অচ্ছিদ্র হয় না কেন?—বিষয় চিন্তায় ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল করে তুলি বলে। হয়ত লোকের সঙ্গে দশটা বাজে কথাই কইলাম; লাভ কিছুই হল না, মাঝে থেকে মনটা যা একটু উঁচুতে উঠেছিল, আবার হড়্‌কে নীচে পড়ে গেল। বিষয়সঙ্গের এটা মাত্র একটা উদাহরণ।

*

তারপরে সাধনক্ষেত্রে আর একটা বিপদ আছে। মনে একটু আনন্দ জমলেই সেটা ব্যক্ত করবার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা জন্মে। মূলেও এই ইচ্ছা আছে কিনা, তাই আমাদেরও অমনি হয়। তিনি তাঁর আনন্দ ধরে রাখতে পারছেন না বলেই সেটা ভাব হয়ে ঢলে পড়ছে, জগৎ হয়ে ফুটে উঠ্‌ছে। আমাদেরও তাই একটু সাধন-সম্পদ জুটলেই আনন্দ ফুটে ওঠে, আর সে আনন্দ বাইরে ছড়িয়ে দেবারও একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু ভাবতে হবে, এখনই যে ছড়াব, কতটুকু পেয়েছি? ওই তো আর চরম নয়। ওইটুকু আনন্দও হজম করতে হবে, ওকেও ছাড়িয়ে উঠ্‌তে হবে। ভাব যদি চাপতে যাও, মনে হবে, বুক যেন ফেটে গেল; তা যাক্—দেহটা না হয় পড়েই যাবে। কিন্তু তার ফলে যা পাবে, তাকে মহাশূন্যও ধরে রাখতে পারবে না—তাতে চরাচর পূর্ণ হয়ে যাবে। এইটুকু পেয়েই বিলাস সুরু করলে চল্‌বে কেন? এখনি কি হয়েছে? আরও এগিয়ে যাও। এখন দেখ্‌ছ, চন্দনের বন,—তারপরে রূপোর খনি, সোনার খনি, হীরার খনি, পরশমণি, কত কিছু মিল্‌বে।

*

এটুকু জানবে, যতই সংযম করবে, আনন্দ ততই বাড়বে। আদেখ্‌লের মত তাড়াতাড়ি পাতা পেড়ে বসে গেলে চলবে না। রসের সাগর দিনরাত টলমল করবে—কিন্তু তোমায় টলাতে পারবে না। যোগমায়া ঠাকরুণ বলেছিলেন, "বাবা, ধর্ম্মজগতে যদি বড় হতে চাও, তাহলে কৃপণ হও।" (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ)। এ কথা লাখ কথার এক কথা। শাস্ত্রও বলছে, "গুপ্তা কুলবধূরিব"—"মাতৃজারবৎ।" বাস্তবিক, পেয়েই ছড়ানো, এর মত লোভ আর নেই। শক্তি আয়ত্ত করবে কি, একটু জমতে না জমতেই খরচ সুরু হয়ে গেল—তাহলে সেই শক্তিই তো নাকে দড়ী দিয়ে ঘোরাতে লাগল। চাকে মধু জমাতে হলে হুলটী বাগিয়ে রাখতে হবে—নইলে যে-সে এসে ভেঙ্গে খাবে।

*

ভগবান্ ভগবান্ করে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর কতটুকু ধারণা করবে? আধার কোথায়? এই জগৎ তো তাঁরই বিভূতি; এরই কটা ঢেউ মানুষ অটল থেকে

সহ্য করতে পারে? একটু কিছু হতে না হতেই মানুষ হেসে কেঁদে খুন হয়ে পড়ে। আর এই আধার নিয়ে যাবে তাঁকে ধারণা করতে? শামুকের খোলে সমুদ্র পুরতে? লাভ তো কিছুই হবে না, বরং একটু কিছু যা ছিল, তাও দান খয়রাৎ করে হাদ নই ফতুর হয়ে যাবে। শেষে বেনো জল বেরিয়ে যেতে সবটুকু জল যেমন টেনে নিয়ে যায়, তেমনি হবে। তাই আত্মসংযম চাই। শুধু মন্দটাকে ঠেকাতে হবে বলেই যে সংযম দরকার, তা নয়; ভালটাকে পয়মাল হতে বাঁচাবার জন্যও সংযম চাই।

*

বাইরে না ছড়ালেও ভিতরে অভিমান জন্মাতে পারে। দুবার নাক টিপেই বা একটু জ্যোতিঃ দেখেই মানুষ যেন ফুলে ওঠে। এমন স্থূল অভিমান তো দোষের হবেই; তা ছাড়া আরও সূক্ষ্ম অভিমান হতে পারে। অভিমানের মূলে হচ্ছে অহংবুদ্ধি। অহং কর্ত্তা আবার অহং ভোক্তা। কর্ত্তা অহংটাকে যদি চেপে রাখলে তো ভোক্তা অহং মাথা কাঁড়া দিয়ে উঠল। কর্ত্তা অহং বলছে, আমি এই করেছি, ওই করেছি—তাই তো এই পেয়েছি। কিন্তু বেচারী জানে না যে কার শক্তিতে সে করেছে। আসল করানেওয়ালার ইচ্ছা না হলে কিছুই হবার যো নেই। তোমার শক্তি আর কতটুকু? ও শক্তি যদি তোমার স্বাভাবিক হতো, তাহলে চিরকালই থাকত—এই আছে এই নাই হত না। শক্তির দেখা পেয়েছ মাত্র—মুঠোর মাঝে আনতে পারনি। মুঠোর মাঝে যখন আসবে, তখন অহংটুকু মুছে যাবে, শক্তি আর তুমি এক হয়ে যাবে, **স্ব-ভাব** ফুটে উঠবে—তখন।

স্বভাব বলতে অহং থাকে না। যেমন ছেলের স্বভাব। ছেলে জানে না যে সে ছেলেমানুষী করছে, তাই ওটা মিষ্টি—কেননা ওটা তার স্বভাব। আর যে জেনেশুনে ছেলেমানুষী করতে যায়, তাকে বলে ন্যাকা—তার ব্যবহারে ভালমানুষেরও পিত্ত জ্বলে যায়। তাই স্বভাবে না পেলে শুধু শক্তির চমক দেখলেই তা আয়ত্ত হয় না। অহং না গেলে স্বভাব ফোটে না। স্ব আর ভাব দুটো যখন এক হয়েছে, অর্থাৎ শক্তিমান আর শক্তি যখন একাকার বলে বুঝতে পেরেছ, তখনই শক্তি আয়ত্ত হয়েছে। সে মিলনে আর বিচ্ছেদ নাই। এই জন্যই বলি, কর্তৃত্ব থাকতে কিছু মিলবে না। অহং ছাড়তে হবে, তবে তাঁকে পাবে।

*

কর্ত্তা অহংএর পরেও আছে ভোক্তা অহংএর জ্বালা। একটু কিছু পেতেই অমনি ভোগের অভিমান জন্মে গেল, আর তা থেকে দ্বৈত জগতে গড়িয়ে পড়লে। এটা বড় সূক্ষ্ম অভিমান, সহজে ধরবার জো নেই। ওই যে বলেছি, একটু জমিয়েই বিলাস সুরু করে দেওয়া—এর মত খারাপ আর কিছু নেই। ওতে বিলাস তো হয়ই না, মাঝ থেকে যতটুকু উঠেছিলে, তার দ্বিগুণ হয়ত নেমে গেলে। বাইরে তো ছড়াবেই না, নিজেও ভোগ করবে না—কেবল কৃপণের মত জমিয়ে যাও। যত বড় আনন্দের ঢেউই আসুক না কেন—অটল থাক। টললেই অভিমানী হলে; অমনি পড়ে যাবে—অথচ জানতেও পারবে না।

*

স্বভাবে থাকবার জন্যই চেষ্টা কর—তার জন্যই তো সংযমের সাধনা। সংযম মানেই হচ্ছে টলুনীর মাঝেও অটল থাকা। প্রথম প্রথম প্রলোভন দূরে রেখেই অভ্যাস করতে হয়—যেমন চারাগাছে বেড়া দেওয়া। তারপর বিকারেও নির্ব্বিকার থাকা। এ চাই-ই চাই।

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

—*—

[শ্রীযুক্ত জগৎ চন্দ্র দাস বি, এ, ই, এ, সি]

ঋষিশক্তি

ভবিতা মনসো জ্ঞানং মন এব প্রজায়তে।
জ্যোতিষ্মদ্বিরজো নিত্যং মন্ত্রসিদ্ধং মহাত্মনাম্॥
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৪ অঃ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ বলিতেছেন—

"মনসো বিশ্বাত্মকস্য জ্ঞানং ভবিতা ভবিষ্যতি। কীদৃশং তৎ জ্ঞানং? মন এব প্রজায়ত ইতি। স্বপ্ন ইব সর্ব্ববিষয়াকারং ভবতীতি। এতজ্‌জ্ঞানবতঃ ফলমাহ—মন্ত্রসিদ্ধং প্রণবোপাস্তি-সিদ্ধং মনো নিত্যমনাদি মায়ামাত্রং সৎ বিরজং নির্ব্বাসনং জ্যোতিষ্মৎ প্রকাশবৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি চ ভবতি।"

যে মন্ত্রসিদ্ধ মহাত্মগণের সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তাদি গুণ সকল বিকাশ পায়, আমরা তাঁহাদিগকেই 'ঋষি' সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছি। ঋষিগণ মন্ত্রসিদ্ধ বা মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ 'মন্ত্র' অর্থে প্রণব বুঝিয়াছেন। আমরাও সেই অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতে চাই, ঋষিগণ প্রণব বা শব্দব্রহ্মজ্ঞ। একদিকে তাঁহারা বেদের প্রবক্তা, অপরদিকে তাঁহারা পরব্রহ্মজ্ঞ; কেননা—

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

দ্বিবিধ ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য, প্রথমতঃ শব্দব্রহ্মরূপ প্রণব, দ্বিতীয়তঃ পরব্রহ্ম; যিনি প্রণবোপাসনা বিষয়ে নিপুণ হন, তিনিই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বা ঋষিশক্তি লাভে কাহার অধিকার সেই সম্বন্ধে উপনিষদ সকল বলিতেছেন—

তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতং। প্রশ্ন ১।১৫

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি—কঠ ১।২।১৫

সত্যেন লভ্যস্তপসা আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।

মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে বলা হইয়াছে—"যে ব্যক্তি ইহলোকে জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী হন, তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না জানিবে।" সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ঋষিশক্তি ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যার সুমহৎ ফল। ভারতীয় ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্যকে এত উচ্চ স্থান কেন দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচ্য। শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক সর্ব্ব বিষয়ে ভারত হীনতাগ্রস্ত—ভারত হইতে ঋষিশক্তি লোপ পাইয়াছে; ভারত প্রকৃত ব্রাহ্মণবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই অবনতির কারণ কি? একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় ভারতবাসী যে দিন হইতে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠাহীন হইয়া পড়িয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহার অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বহুদিন হইতেই লোপ পাইয়াছে; ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম বলিয়া কোন আশ্রম প্রতিষ্ঠান নাই। বর্ত্তমানে উহা পুঁথির কথামাত্র;

উহার স্বরূপ সম্বন্ধে নানাজনে নানারূপ কল্পনা করিয়া থাকে। গৃহীর পক্ষেও যে ব্রহ্মচর্য্য পালনীয়, একথা অনেকেই জানে না, অথবা বুঝে না। গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য একটা কিম্ভূতকিমাকার কথা, যেহেতু বর্ত্তমান গৃহীর জীবন উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা পরিপূর্ণ। ভারতীয় ঋষিগণ গৃহীকে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য যে সকল বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান নিরঙ্কুশ ভোগীর নিকট "বাড়াবাড়ি" বা অসাধ্য সাধন প্রয়াস মাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

ব্রহ্মচর্য্যের সারকথা দম বা ইন্দ্রিয় সংযম। "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।" একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, এই দম বা সংযম অভ্যাস ভিন্ন কখনই দেহ ও মনের পূর্ণশক্তি লাভ হইতে পারে না এবং উহা অব্যাহতও থাকিতে পারে না। সর্ব্বদেশীয় শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এই যে বীর্য্যধারণদ্বারা মস্তিষ্কশক্তি পরিপুষ্টি লাভ করে এবং তাহার ফলে ধীশক্তি, মেধা, মনীষা, একাগ্রতা, উৎসাহ, উদ্যম, সাহস প্রভৃতি গুণসকলের উৎকর্ষ সাধিত হয়; পক্ষান্তরে শ্রী, স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু প্রভৃতিও লাভ হয়। শারীরিক মানসিক যে কোন দিক দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, ব্রহ্মচর্য্যই যে পূর্ণ মানবত্বলাভের হেতু, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীনেরা ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ব্রহ্মবর্চ্চঃ বা ব্রহ্মতেজ লাভ করিতেন; এই ব্রহ্মতেজই ঋষিশক্তি এবং ব্রাহ্মণত্বের হেতু। বেদ-বেদাঙ্গ উপনিষদাদির মধ্যে যে সূক্ষ্মদর্শন ও গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মূলে ব্রহ্মচর্য্য বল। অনেক দিন হইল ভারত সেই সম্পদ্‌হারা হইয়াছে; ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যাই যে শাশ্বত কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এক্ষণে তাহা কষ্টকল্পনার বিষয়।

যাঁহারা ভারতবাসীর নবজীবন কামনা করিতেছেন, তাঁহাদের এই বিষয়ে প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। ইহা সুখের বিষয় যে ভারতের স্থানে স্থানে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে; কিন্তু যাহা হইতেছে বা হইয়াছে, তাহা প্রচুর নহে। যুগ যুগান্তরের যে আবর্জ্জনারাশি বর্ত্তমান গৃহস্থাশ্রমকে অশোভন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার সম্মার্জ্জন প্রয়োজন; নতুবা ব্রহ্মচর্য্য এই দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইবে না এবং ঋষিশক্তিও জাগ্রত হইবে না। ভারতীয় আর্য্যগণের যে শৌচ, সংযম ও শুদ্ধাচার জগতের নিকট অলোকসামান্য বলিয়া বিবেচিত হয়, গৃহে গৃহে তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যবল

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মত

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মচর্য্য ব্রহ্মের রূপ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে, তাহাই সমস্ত ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু মনুষ্য তদ্দ্বারা পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।" [শান্তি পর্ব্ব ২১৪ অঃ।]

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র বলেন—

ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥

অর্থাৎ কোন তপস্যাই তপস্যা নহে, ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা; যিনি ঊর্দ্ধরেতা হয়েন, তিনি দেবতা, মানুষ নহেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে আমরা ব্রহ্মচর্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভাগবতকার [৭ম স্কন্ধ, ১২ অঃ] ইহাকেই বৃহদ্‌ব্রত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মচর্য্য শারীরিক তপস্যা হইলেও উহার সহিত মানসিক ও শারীরিক কল্যাণ অচ্ছেদ্য-

রূপে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের সর্ব্বপ্রধান সাধন **কায়মনোবাক্যে** যোষিৎ-সম্পর্ক পরিহার। উক্ত হইয়াছে—

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥

এই সাধনের ফল বীর্য্যলাভ। বীর্য্যধারণের ফল কি?

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে দেখা যায় যে, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্ত ধাতুযোগে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া থাকে। ভুক্ত দ্রব্যের সারভাগকে রস বলে; সেই রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শুক্র শরীরের সার অংশ এবং জীবনীশক্তির প্রধান আশ্রয়। আয়ুর্ব্বেদ ইহাকে "বপুঃসারো জীবনাশ্রয় উত্তমঃ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

সুশ্রুত বলেন, রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতুসমূহের যে পরম তেজোভাগ, তাহাকে ওজঃ বলে। ওজঃ বলের কারণ; ইহা সর্ব্বশরীরব্যাপী; ইহাই জীবনের অবলম্বন। ইহাই দেহের শ্রী, লাবণ্য, নেত্রজ্যোতিরাদির আধার; পুরুষোচিত বলবিক্রমাদির মূলীভূত কারণ; ধী, মেধা, প্রতিভাদি মানসিক শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর আকর। শুক্রের পরবর্ত্তী বিকাশ বা পরিণামই ওজঃ; এজন্য বীর্য্যক্ষয় হইলেই ওজঃক্ষয় হইয়া থাকে। বীর্য্যক্ষয় প্রাণহানিকর। তাই শিবসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে—

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণম্॥

পূর্ণ মানবত্ব বা শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পূর্ণবিকাশ ব্রহ্মচর্য্যব্রতে প্রতিষ্ঠালাভ ভিন্ন হইতে পারে না। এইজন্য পুরাকালে উহা শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস, উদ্যম, অধ্যবসায়াদি অর্জ্জনের জন্য যেরূপ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত ছিল, তেমনি ধী, মেধা, প্রতিভা, একাগ্রতা, সূক্ষ্মদর্শনাদি লাভের জন্য উহা ব্রাহ্মণের পক্ষেও বিহিত ছিল। ফলতঃ দেহকে দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ও অনাময় রাখিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিতে হইলে ধৃতবীর্য্য হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি মনকে সতেজ ও সবল রাখিয়া একাগ্রতাসহকারে উচ্চ বিষয়ের চিন্তায় নিযুক্ত থাকিতে হইলেও ধৃতবীর্য্য হওয়া প্রয়োজন। পূর্ণ মানবত্ব পুরাকালে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছিল; পৌরুষের প্রাচুর্য্য বা পূর্ণতা ছিল বলিয়াই আদিযুগে দীর্ঘায়ু, নিরাময়দেহ, তীক্ষ্ণ মনীষা-সম্পন্ন ঋষিগণের আবির্ভাব দেখা যায়। উপনিষদ, যোগশাস্ত্র, তন্ত্রাদি সকলেই এক-বাক্যে ঘোষণা করিতেছেন যে, ঊর্দ্ধরেতাগণের অপ্রাপ্য অথবা অসাধ্য কিছুই নাই। পঞ্চম বেদ মহাভারত ব্রহ্মচর্য্যফল সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

আজন্মমরণাদ্ যস্তু ব্রহ্মচারী ভবেদিহ।
ন তস্য কিঞ্চিদপ্রাপ্যমিতি বিদ্ধি নরাধিপ॥
বহ্ব্যঃ কোট্যস্ত্বৃষীণাঞ্চ ব্রহ্মলোকে বসন্ত্যুতঃ।
সত্যে রতানাং সততং দান্তানামূর্দ্ধরেতসাম্॥
ব্রহ্মচর্য্যং দহেদ্রাজন্ সর্ব্বপাপান্যুপাসিতম্।
ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ ব্রাহ্মণো হ্যগ্নিরুচ্যতে॥
প্রত্যক্ষং হি তথা হ্যেতদ্ ব্রাহ্মণেষু তপস্বিষু।
বিভেতি হি যথা শক্রো ব্রহ্মচারিপ্রধর্ষিতঃ॥
তদ্ব্রহ্মচর্য্যস্য ফলমৃষীণামিহ দৃশ্যতে।

অনুশাসন ৭৫ অঃ।

—যিনি জন্মাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহার কিছুই দুর্লভ হয় না। সত্য-নিরত দমগুণসম্পন্ন কোটি কোটি ঊর্দ্ধরেতা মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে ব্রহ্মলোকে বাস করিতে-

ছেন ; ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার পাপের লেশমাত্রও থাকে না। ব্রাহ্মণ অগ্নি-স্বরূপ। * তপোনুষ্ঠান নিরত ব্রাহ্মণের অগ্নি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী কুপিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হইয়া থাকেন, ইহাই মহর্ষিদিগের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ।

ঊর্দ্ধরেতাগণের তেজোবিস্ফারিত লোচন, † বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও ক্ষয়াপচয়বিহীন দেহ, মনোজয় সামর্থ্য ও দেহকান্তি দর্শনে দেবরাজ ইন্দ্রও যে ভীত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

এক্ষণে পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ডাক্তার লুইস বলিতেছেন—

"শোণিতের সারাংশ যে শুক্রে পরিণত হয়, এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই একমত ।"

* ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ যে অগ্নিস্বরূপ, ইহা কবি কল্পনা অথবা ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথা নয়। এবংবিধ ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত অগ্নি যাঁহারা মাসত্রয় রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা অদ্যাপি আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন।

† বারদির লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই এই সত্যের সাক্ষ্য দিবেন।

ডাক্তার নিকল্‌স্ বলিতেছেন—

"চিকিৎসাশাস্ত্রের অথবা শরীরতত্ত্বের একটি নির্দ্ধারণ এই যে স্ত্রীপুরুষ উভয় দেহের শোণিতের শ্রেষ্ঠাংশই প্রজননশক্তির মূল উপাদান। যে ব্যক্তি পবিত্র ও সুসংযত জীবন যাপন করে, তাহার দেহে ঐ সারাংশ সংহৃত হইয়া রক্তের সঙ্গে সঞ্চারিত হয় এবং তদ্দ্বারা উত্তম মস্তিষ্কোপাদান, স্নায়ুতন্তু ও মাংসপেশীনিচয় গঠিত হয়। জীবনীশক্তি এইরূপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেহের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত হইলে তদ্দ্বারা পৌরুষ, বলবীর্য্য, সাহস ও শৌর্য্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইহার অপব্যবহার হইলে মানব কাপুরুষ ও হীনবল হইয়া পড়ে ; দেহের শিথিলতা সম্পাদিত হইয়া শরীরযন্ত্র ও মাংসপেশীসমূহের ক্রিয়া বিকলতা প্রাপ্ত হয়, স্নায়বিক বিধান অবসাদ-গ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে ; সমস্ত ইন্দ্রিয়ানু-ভূতিগুলিই অস্বাভাবিক হইয়া যায় এবং সেই কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি সহজেই কাম রিপুর অধীন হইয়া পড়ে ; অবশেষে অপস্মার, উন্মাদাদি ব্যাধি ও মৃত্যুর পথে ক্রমশঃ ধাবিত হয়।"

উপস্থের ক্রিয়া উপরত থাকিলে শারীরিক মানসিক তেজস্বিতা সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং ফলে আধ্যাত্মিকজীবনের উৎকর্ষ সাধিত হয়। (ক্রমশঃ)

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

— ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৭১।৩

অন্তরের অভাব বাইরের অভাবের মত সহসা ধরা পড়ে না। ধরা পড়লে কিন্তু তার তুলনায় বাইরের অভাব নিতান্ত তুচ্ছ বলে মনে হয়। ঠিক ঠিক অভাববোধ হলে তখন জ্বালাও মনকে ব্যস্ত করে তুলে। এই জ্বালা অনেক সময়ে বিষয়ে বিরাগ এনে দেয়, মনকে উন্নত করে, কিন্তু তবুও এ অবস্থাতেই আমরা থাকতে চাই না। অবশ্য আরম্ভ এখান থেকেই, কিন্তু এ শুধু নৈতিক উপকার। প্রথমে এটুকু না হলে যেমন আসল জিনিস মিলবে না, তেমনি এর জন্যই কেবল আকুলি-বিকুলি করলেও আসল জিনিসের প্রতি লক্ষ্য পড়বে না। সাধন পথে থামলেই মরণ; আনন্দ হতে আনন্দে, উৎসব হতে উৎসবে কেবলি এগিয়ে যাওয়া—অন্তঃশক্তিকে কেবলি স্ফুরিত করে চলা—এই চাই। এতে আকুলতার সঙ্গে সঙ্গে হতাশার পরিবর্ত্তে, সফলতা-বিফলতার উর্দ্ধে এক প্রশান্ত আনন্দ লোকের সন্ধান পাওয়া যায়। বিরূপ ছেড়ে স্বরূপের আভাস সেখানেই মিলে।

*

যতটুকু শক্তি দিয়েছেন তাই খাটাতে চাই না, তার উপর আবার তাঁকে পীড়াপীড়ি করা—একি দুর্ব্বলতা নয়? নাই নাই বলে হতাশ হয়ে আগেই পেছিয়ে যেতে থাকলে সে পেছিয়েই পড়ে। যতটুকু পারি চলতে থাকি—তাঁর দরদ আছে, খাদে থেকে এসে তুলবেনই—এতটুকু জোর আমার আপন জনের উপর আছে। তাঁর উপর জোর করব না ত কার উপর করব? আমি খারাপ, ভাল হতে চাই; তাই ভালর পথে চলছি—তিনি সঙ্গে আছেন। আমার জন্য দরদ বেশী তাঁরই। তাঁর কাছে চাইব কেন, চাইবার কিই বা আছে? আমার প্রবৃত্তি অনুযায়ী চাওয়ার চেয়ে তাঁর উপর নির্ভর করে থাকাই তো ভাল। যা পাচ্ছি, হোক্ না তা সামান্য ধূলো মাত্র—তাই যেন তাঁর পায়ের ধূলো বলে আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করি। আমার বুদ্ধিকে তিনি যে দিন দিন শুদ্ধ, শুভ্র করে নিচ্ছেন, এই আনন্দে যেন আত্মস্থ থাকি।

*

জগৎ বিস্মৃতি এবং ব্রহ্মস্মৃতি বা ইষ্টধ্যান—এই হচ্ছে জীবনের এক মাত্র রসায়ন। এ নইলে দুঃখের হাত থেকে নিস্তার নাই। তুমি-আমি মিলে যে জগৎ রচনা করেছি, তা অতি সঙ্কীর্ণ। অথচ তার মধ্যেই বা আমরা কতটুকু ভাবতে পারি—ক'দিকই বা গুছিয়ে উঠতে পারি? পদে পদে দেখছি যে, ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ আমিটার শক্তি কত সামান্য; তবুও তার এলাকায় ঘুরে মরতে হয়; এর হাত থেকে রেহাই পেতে হলে একমাত্র ব্রহ্মস্মৃতি বা ইষ্টস্মৃতি অবলম্বন করে হাতে কাজ করে যাওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। নিন্দা, প্রশংসা বা পরিণামের সুখদুঃখের হিসাব নিয়েই

মনটাকে ব্যস্ত রেখে, দুঃখ ভিন্ন সোয়াস্তি তো মিল্‌ছে না—তবে কেন মিছামিছি ওগুলি বাধিয়ে নিয়ে মরব ?' আমি সব চেয়ে যাকে ভালবাসি, সেই যদি সব চেয়ে বড় হয়, তবে আর ক্ষুদ্রে মজ্‌ব কেন ? তাঁর চিন্তায় যে সব ভুলিয়ে দেবে, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁকে সবার চেয়ে ভালবাসতে পারি না। মন যেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে আপনি নেমে পড়ে। আর দুঃখ এসে ঐ শক্তিকে ব্যাহত করে আমাদিগকে উপরে নিয়ে যেতে চায়। দুঃখকে এমনি সাধনার অঙ্গরূপে দেখ্‌লে তার দাহ আর আমাদিগকে বিব্রত কর্‌তে পারে না।

*

যখন তোমায় পাই, তখন আমার চাহিবার কিছু থাকে না। তখন যে সবই পরিপূর্ণ। সারাটী প্রাণ তোমাময়। তখন কে-ই বা চায়, কিই বা চাই, কার কাকেই বা চাই ! তুমি এলে যে অভাবেরই অভাব হয়—স্বভাবে পূর্ণ হয়ে যাই। আর যেমনি তুমি একটু একটু করে দূরে সরে যাও, আর অমনি অভাব অভিযোগ একটী একটী দেখা দিতে থাকে। তখন তোমার বর অভয় লাভে বঞ্চিত থাকি।

*

বহুত্বের লীলায় মত্ত, তাই তিনি বহুরূপী হয়ে রূপে রূপে উঁকিঝুঁকি মেরে যান। কখনও ধরাও তো দেননা। তবুও অধরকে তো ধরতে পারি না। যেমন ক্ষণিকের চাওয়া, তেমনি চকিতের পাওয়া।

*

তুমি চাও, তোমায় সকলে ভালবাসুক, সবাই তোমায় মন প্রাণ সমর্পণ করুক। খুব ভাল কথা। তা হলে এক কাজ করতে হবে—সকলকেই তোমার প্রাণ দিয়ে প্রাণবন্ত করতে তোমার ঐ ছোট হৃদয়টী একটু বড় করতে হবে। ঐ যে বিশেষ বিশেষ আধারে তোমার প্রাণটী আবদ্ধ করে রেখেছো, তার বাঁধটী কেটে দিতে হবে, তোমায় ছড়িয়ে পড়তে হবে। সসীম না থেকে অসীম হতে হবে। ওগো, নিজকে বিলিয়ে দাও—ক্ষুদ্রত্বের গণ্ডীটী ভেঙ্গে চুরমার করে দাও। প্রাণবন্ত হও—সব প্রাণের সাড়া পাবে। প্রেম সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে গিয়ে প্রেম সাগরে পাল্টে যাও, দেখবে ছোট বড় প্রেম প্রবাহিনীগুলি এসে তোমাতেই তাদের প্রেমের ধারা মিলিয়ে দিয়ে প্রেমময় হবে। প্রাণ দিয়ে প্রাণ কেড়ে লও, সর্ব্বপ্রাণাধার হও, প্রেমস্বরূপ হও।

*

আমরা অনন্ত সত্তায় সত্তাবান হয়েও তা উপভোগ করতে পারি না। অখণ্ড জ্ঞানজ্যোতিঃ, অফুরন্ত প্রেমের উৎস যে আমার আঁধার রুদ্ধ ঘরের প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে, তা তো আমি দেখেও দেখছি না। ওরা যে লাঞ্ছিত অনাদৃত হয়ে ফিরে যাচ্ছে—আমরা এ আধারটী—বড় ক্ষুদ্র—বড় সঙ্কীর্ণ, ওতে এত ধরবে কেন ? অত সইবে কেন ? তাই অসীম করেছি কি ? অমনি একটী বিশিষ্ট ছোট সঙ্কীর্ণ প্রাণের আবেশ উৎসের সঙ্গে নিজ উৎস মিলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে বসে আছি। সেই খণ্ডিত আনন্দের উৎসটুকু ভোগে তৃপ্ত হতে চাই। কিন্তু কই তাতেও তৃপ্ত থাক্‌তে পারি না—আরও চাই, কিন্তু পাই না। তাই অভিমান, তাই অন্যের দোষ দর্শন।

আমি একটা কিছু গড়ে তুলবো, দেশের দশের হিতের জন্য সমাজের জন্য একটা কিছু করবো, এই রকম যে বাসনা—এতেই আমরা আমাদের কতকগুলা অশান্তি অসোয়াস্তির সৃষ্টি করি। মূলে অহঙ্কার অভিমান হতে এদের জন্ম কি না, তাই এরা কষ্টদায়ক। তাহলে এরূপ বাসনা থাকা ভাল কি না এ প্রশ্ন মনে স্বতঃই উঠবে। উত্তরে কেউ বলবেন বাসনামাত্রেই দোষযুক্ত, কাজেই বাসনা সাঙ্গ করাই উচিত। আবার অন্য পক্ষ হয়ত বলবেন, "ঠিকের নকলটাও ভাল" কিন্তু এটাও জানা উচিত যে নকল নকলই আর সাঁচ্চা সাঁচ্চাই। সাঁচ্চার অভাবেই নকলী নিয়ে কাজ চালান। যেমন দুধের স্বাধ ঘোলে মিটান। দুধ থাকতে ঘোল প্রীতি যেমন ধাতু বৈষম্যের লক্ষণ, তেমনি সাঁচ্চা আসলে থাকতে নকলে আসক্তি বিকৃতপ্রকৃতির লক্ষণ। তবে অশক্তের পক্ষে, অভাবদুষ্টের পক্ষে তাই ভাল। ওর অভিনয় করবার জন্য কারও মোহরা দেবার দরকার হয় না। যখন বান ডেকে ওঠে, তখন আর কূলকিনারা মানে না; এ কূল ও কূল দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যায়। প্রেমের সত্যের আহ্বানে প্রাণ উদ্বুদ্ধ না হলে কোথায়ও সাড়া পাবে না। সাড়া পড়েছে বুঝবে তখনই, যখন দেখবে শত বাধাবিঘ্নও তোমার গতিরোধ করতে পারছে না। মহাপ্রাণের সাড়া যখন পড়ে, তখন সবই অনুকূল হয়। তবে একেবারে নিরঙ্কুশ নির্ব্বিবাদেই যে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, তা নয়; যা প্রতিকূলতাচরণ করবে, সেও তোমার সাহায্যের জন্যই। বাধা আসবে তোমার হৃদয়ে বলাধান করবার জন্য। পরীক্ষার অনলে না ফেললে খাঁটী ভেল্ ধরা যায় না। যখনই ঐ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করবে, অমনি তোমার হৃদয়ের বল শতগুণে বর্দ্ধিত হবে।

*

নিজ নিজ শক্তিকে আমরাই খণ্ডিত করে রেখেছি। আমার শক্তি, এই অভিমানই আমার মহতী শক্তিকে ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। ঐ যে শক্তি, ও তো সেই অখণ্ড মহতী শক্তির একপ্রকার বিকাশ মাত্র। যাঁহার শক্তি এই ক্ষুদ্র আধারে সীমাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রত্বের অভিনয় করিতেছে, তাঁহাকেই উহা অর্পণ কর। অর্পণ কেমনে করিব? অভিমানরূপ বাঁধনটী কাটিয়া দাও, তাহা হইলে সেই অদ্বিতীয়া মহতী শক্তির সঙ্গে মিশে যেয়ে ক্ষুদ্রের অভিমান ভুলে মহৎ হবে।

*

খণ্ড শক্তির উপাসনা করিয়া খণ্ড শক্তির তৃপ্তিসাধন করার চেয়ে মূল শক্তির উপাসনাই প্রশস্ত। মূলে জল ঢালিলে শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফুল ফল সর্ব্বত্র সর্ব্বাবয়বের পুষ্টি অনিবার্য্য। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"র তৃপ্তি সাধনে সর্ব্বশক্তির তুষ্টি সাধিত হইবে।

*

আমি যাই করি না কেন, তারি একটা মূল্য থাকবে—যদি আমি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হই। খাঁটী জিনিস তো মুছে যাবার নয়; সে যেখানে আছে, থাকবেই। সত্যের উপর এইটুকু নির্ভর রাখতে হবে। কোন রকম সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির বিচার যার উপর ক্রিয়া করেনি, যেখানে বিন্দুমাত্র স্বার্থপিপাসা আমার নাই, সেই অবস্থায় থেকে যা করব, তাই সত্যকর্ম্ম, তাই বিশ্বহিত।

আমি একটা আর বিশ্ব আর একটা, এই ভাবেই গলদ—যত বিরোধ অশান্তি এ থেকেই আসে। আমার দেহ-মন যেমন আমার, অন্য একটা দেহমনকেও যখন ঠিক তেমনি আমার মনে হবে, তখনি মোহ কাটবে। অথচ জগৎ যে নূতন একটা কোনও রূপে আমার সামনে ভেসে উঠবে, তা নয়; সেই একই জগতে, একই কাজে এমন একটা পরিপূর্ণ ভাবের অনুভূতি পাব—যাতে জীবন অফুরন্ত মনে করে আনন্দ হবে, একঘেয়ে মনে করে বিরক্তি আসবে না। এই তো সত্যের অনুভূতি!

এক দিনে কিছু হয়ে যায় না, কিছু চলেও যায় না। মানুষ একবার যা করে, এ জগৎ থেকে তার দাগ মুছে যেতে চায় না। সে চিহ্ন যদি তোমার পক্ষে অসহ্য হয়, তবে তুমি তার উর্দ্ধে উঠে পড়ো—তখন তারা তোমার অধীন হবে, তোমার উপর তাদের ক্রিয়া আর হবে না। সাধনাই সত্য, তার ব্যাঘাত ক্ষণিক মাত্র। ব্যাঘাতে আত্মশক্তিকে না জাগিয়ে যারা মুহ্যমান হয়ে পড়ে, তারাই সাধনায় রস পায় না। রস না পেলে শক্তি ফুটবে কিসে?

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম সংবাদ

বিগত ১৯শে শ্রাবণ অত্র মঠে মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেবের জন্মমহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত তিথিতে শাখা আশ্রমসমূহ উচালন (বর্দ্ধমান) বীরখেতি (সাঁওতাল পরগণা), কুচবিহারের নানাস্থানে ও কলিকাতা জয়গুরু সেবাসঙ্ঘে জন্মমহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বগুড়া শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসবও ঐ দিন সুসম্পন্ন হইয়াছে।

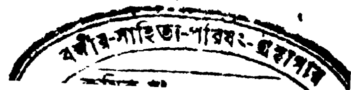
শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমান মাসে মঠেই অবস্থিতি করিবেন।

পত্রিকা পরিচয়

THE SIGNAL শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর শর্ম্মার উপদেশে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা দ্বারা সম্পাদিত ও কাশী গোধূলিয়া সত্যমণ্ডল প্রেস হইতে প্রকাশিত। এখানি একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲, প্রতি সংখ্যা ৵১০। মুখবন্ধে লেখা আছে, ইহা কোনও সম্প্রদায়বিশেষের মুখপত্র নহে—একমাত্র সত্যকে লক্ষ্য করিয়া এই পত্রিকা প্রচারিত হইবে। হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্মের উপর অন্যায় ও অসঙ্গত আক্রমণ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলেই জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া, তাহাদের সহানুভূতির আকর্ষণ করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য। আমরা এ যাবৎ পাঁচ সংখ্যা পত্রিকা পাইয়াছি। নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, ইহার উদ্দেশ্য মহৎ, পরিচালনাভঙ্গীও সুন্দর। আমরা সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

গ্রাহকগণের প্রতি

আশ্বিনের পত্রিকা ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। পূজা উপলক্ষ্যে যাঁহারা স্থানান্তরে যাইবেন, তাঁহারা স্থানীয় ডাকঘরে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন, নতুবা পত্রিকা পাইতে গোলমাল হইতে পারে।



ওঁ তৎ সৎ



আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৮শ বর্ষ } আশ্বিন { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আনন্দলহরী

—*—

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য]

শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং শশিযুতজটাজূটমুকুটাং
বর-ত্রাসত্রাণ-স্ফটিকগুণিকা-পুস্তককরাম্।
সকৃন্নত্বা ন ত্বাং কথমিব সতাং সন্নিদধতে
মধুক্ষীরদ্রাক্ষামধুরিমধুরীণা ভণিতয়ঃ॥

কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীম্।
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরী-
গভীরাভির্ব্বাগ্‌ভির্দ্দধতি সভারঞ্জনময়ী॥

সাবিত্রীভির্ব্বাচাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভি-
র্ব্বশিন্যাদ্যাভিস্ত্বাং সহ জননি সঞ্চিন্তয়তি যঃ।
স কর্ত্তা কাব্যানাং ভবতি মহতাং ভঙ্গিসুভগৈ-
র্ব্বচোভির্ব্বাগ্‌দেবীবদনকমলামোদমধুরৈঃ॥

তনুচ্ছায়াভিস্তে তরুণতরণি শ্রেণিভি-
র্দিবং সর্ব্বামুর্ব্বীমরুণমণিমগ্নাং স্মরতি যঃ।
ভবন্ত্যস্য ত্রস্যদ্‌বনহরিণীশালীননয়নাঃ
সহোর্ব্বশ্যা বশ্যাঃ কতি
কতি ন গীর্ব্বাণগণিকাঃ ॥

শারদ জোছনা অঙ্গে, জটাজূটে ফোটে ইন্দুকলা—
শোভিছে পুস্তক করে, বরাভয়, স্ফটিকের মালা ;—
স্মরি তোমা হৃদি যার একবার লোটে তব পায়,
মধু-ক্ষীর-দ্রাক্ষারস উছলে মা তার কবিতায়।

কবিচিত্ত পদ্মবন বিহারিণী বালাতপরুচি
অরুণবরণা তুমি—স্নেহাসারে কর যারে শুচি,
বীণাপাণি বক্ষঃস্রুত অভিনব শৃঙ্গারলহরী
সান্দ্র করে বাণী তার সভাজনমনোমুগ্ধকরী।

চন্দ্রকান্তকান্তিতনু বশিন্যাদি তব সহচরী ;
কাব্যসুধা উৎস তারা ;—তোমা সহ সবারে মা স্মরি,
বিচিত্র ভঙ্গীতে গাঁথে কবিতারে, যে জন চতুর ;—
বাণী তার বাণী-মুখ-কমলের আমোদে মধুর !

তরুণ-তপনশোভা ধরে মাগো তব তনুছায়া ;—
রবিমণিদীপ্তি দিয়া রোদসীবে ছেয়েছে সে কায়া ;
স্মরি তারে উর্ব্বশীরে করে বশ—আরো কত শত
ত্রস্ত-আঁখি সুরবালা—ভীতা বন-হরিণীর মত !

—————※—————

মা !

মা, মা, আনন্দময়ী মা, বরষপরে আবার তোর কাছে আজ ফিরে এসেছি মা! মা গো, তোকে ভুলে গিয়ে যে কি নিদারুণ যাতনা, সে এতদিন পরে আজ বুঝেছি;—তোকে ডাকবার জন্য, প্রাণ যখন আবার আকুল হয়ে উঠেছে, তখনি বুঝেছি, তোর কাছ থেকে সরে যাওয়ার জ্বালা কত!

তুই তো সরিয়ে দিতে চাস্‌নি মা—আমিই ভুল বুঝেছিলাম। এ ভুলের ভিতে কল্পনায় কত কিছু যে গড়ে তুলেছি—সরল সহজ উদার জীবনের মাঝে কত জটিলতার যে সৃষ্টি করেছি, তার অন্ত নাই। যতদিন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখিনি, ততদিন তো বুঝিনি—কাকে ছেড়েছি আর কাকে ধরেছি। আজ যেই আঘাতে প্রাণ মুস্‌ড়ে পড়েছে—অমনি জীবনের সমস্ত গ্লানি, হৃদয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা, অসার জটিলতা চোখের সামনে একেবারে জ্বল্ জ্বল্ করে উঠেছে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

মা, আমি একি হয়েছি? নিজের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের যে আর সীমা পাই না। মাগো, তুই এমন অর্থপূর্ণ এমন সুন্দর এমন জ্যোতির্ম্ময় করে আমাদের তোর মনে এঁকে রেখেছিস্, আর এ কি কলুষে আমরা আমাদের আবৃত করেছি? আঁধার আমরা চাই না, কিন্তু সাধ করে যে চোখ বেঁধে আঁধা হয়ে ফিরি—সে আর কার দোষ? তোকে অবিশ্বাস করে যে ধুলোকাদা গায় এবার মেখেছি, যে যাতনা পেয়েছি, আজ এ অসময়ে তুই ছাড়া আর কে তা মুছিয়ে কোলে তুলে নেবে বল্?

মা, আমাদের অন্তরে স্থৈর্য্য ছিল না, ভাবের ঐক্য ছিল না, ছন্দঃ ছিল না—তাই না জীবন এত জটিল হয়েছে। সহজ সুন্দর হয়ে এর মাঝেও তো তুই আছিস্ মা—চিরকাল ছিলি, চিরকাল থাক্‌বি;—তবুও যে তোকে আমরা চিন্‌তে পারিনি, এই তো তোর মায়া। এই মায়াও তোরি এক রূপ মা—কিন্তু একে না চিন্‌লে তো তোকে পাব না। তোরি এক রূপ দিয়ে তুই আমাদের ভুলিয়ে রাখিস্, আবার আর এক রূপে জাগিয়ে তুলিস্; আমি যে ভেবে পাই না, কখন কাকে ধরি, কাকে ছাড়ি। ভুলে গিয়েছিলাম, মনে করিয়ে দিয়েছিস্—কিন্তু চিনি না যে তোকে পাবার পথ কোন্‌টা; আজ সেই কথাই তোর কাছে শুন্‌ব মা!—আজ আবার অতীতের যত সুখ দুঃখ ভুলে গিয়ে তোর জন্য কাঁদ্‌ব, অশ্রুজলে তোর ঐ চরণ ধোয়াব। আমি আর কিছু চাই না মা—আজ শুধু তোর এক কণা কৃপার ভিখারী, শুধু এক কণা আনন্দের অভিলাষী। বল্ মা আবার কি তোর সে স্তন্যসুধা পাব না?

একবার যেন আভাস পেয়েছিলাম, সে স্মৃতি মনে জাগ্‌তেই হৃদয় আজ হাহাকার করে উঠ্‌ছে। তুই কি তা শুনিস্‌নি মা? নিশ্চয় শুনেছিস্—সন্তানের হৃদয় তোর অগম্য থাক্‌তে পারে না। কর্ম্মের আবর্ত্তনের মাঝে তোরি কৃপায় নিত্য নবীন প্রেরণা পেয়ে মনে করেছি, এ বুঝি আমারই ইচ্ছাশক্তি, মাকে ছেড়ে আমারি কেরামতী।—এ ত তুই দেখেছিস্। আবার আঘাত পেয়ে যখন আত্ম-

স্ফুরিতা ছুটে যায়, ব্যর্থতার আর্ত্তনাদে হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে, তখনো তো তুই সবি দেখতে পাস্ মা। তোর সর্ব্বস্পর্শা কৃপাদৃষ্টি যে আমার জীবনের ক্ষুদ্র অংশটুকুকেও অবহেলা করে যায়নি, তোর স্নেহ আমার দেহ-মনের প্রতি অণুপরমাণুটীকেও আবিষ্ট করে রেখেছে—এ কথা যখনি মনে করি, তখনি যে আর্ত্তনাদ থেমে যায়, যে ব্যর্থতাকে অভিশাপ মনে করি, সে ব্যর্থতা আমার জীবনের গৌরবময় সার্থকতার সূচনা করে—তখন যে তোর অভিমানে আমার হৃদয় উদার হয়েই ওঠে মা। ছিঃ—আমার অভিমান কি নীচ—সে ছোট হয়ে সব্বাইকে ছোট দেখে; আর তোর অভিমানে হৃদয় যখন স্নিগ্ধতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তো আর ছোটকে অবহেলা করতে পারি না—তখন যে ছোটও আমার, বড়ও আমার।

এই তো মা তোর কৃপা—এই তো বোধি। এতদিন তোর এ রূপ কোথায় লুকিয়ে ছিল মা? বর্ষভরা জ্বালা যাতনার অন্তে আজ তার স্মৃতিটুকুই কত মধুময়—যদি ভিতরে জেগে উঠ্ত, তবে তো আত্মহারাই হয়ে পড়্তাম। সে আত্মহারা ভাব কি, তা বুঝি না—যেদিন তুই বোঝাবি, সেদিন বুঝ্ব।

'আমি'র সংস্কারে জড়িয়ে পড়েছি—এই তো আমাদের দুঃখ। কর্ম্মের সংঘাতে দেহ-মনের একটা অন্ধ আস্ফালন চল্ছে শুধু, তাতে আনন্দের শিহরণ নাই। অভিমানের কালিমায় জগৎ আঁধার হয়ে আস্ছে—বুঝ্ছি আমারি চোখে আঁধা; নইলে সমষ্টিভাবে তোর বিশ্বরূপের তো কোন বিকার নাই মা—আমরা যে শুনেছি মা, তুই নিত্যানন্দময়ী, চিরজ্যোতির্ম্ময়ী! ক্ষুদ্রে আমাকে আবদ্ধ করে প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না—কেননা আমার 'আমি'টা যে শুধু কল্পনা। জগতে একমাত্র সতী তুই-ই মা—চিরন্তনী কৃপাময়ী, বিরাট্ হতে ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে লীলাময়ী। জগতের প্রতি ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে তোকে যেদিন দেখ্তে পাব মা—সেদিন বুঝ্ব আমার কি মূল্য; নইলে তোকে ছেড়ে এই ক্ষুদ্র আমির যে কোনই মূল্য নাই। আমার এ কল্পনায় অনুভূতিরূপে তুই জেগে ওঠ্ মা। হৃৎসরোবরে ভাবের কমল আজো অস্ফুটই রইল—আনন্দের প্রেরণায় তাকে ফুটিয়ে দে মা, তাই দিয়ে তোর পূজা করি।

*

যখন যা সইতে পেরেছি, করেছি। তোমার পূজা না করে আত্মসমর্পণের আনন্দে বিভোর না হয়ে কতকাল তো নিজের বোঝা নিজে বইবার স্পর্দ্ধা নিয়ে চলেছি। জগতে কতজন এম্নি তোমায় ছেড়ে চলেছে; কিন্তু তারা তো জানে না মা—তোমায় ছেড়ে গেলে কি হবে, তুমি যে তাদের ছাড়নি গো! তোমার দৃষ্টি চিরকাল উদার, তোমায় যে অগ্রাহ্য করে চলে, তাকেও তুমি সযত্নে বুকে করে রাখ। তাই দেখ্ছি মা, এমন করে যে তোমার স্নেহের উপর অভিমান করে নিজের অভিমান নিয়ে চলেছিলাম, তার মাঝে বিপথে গিয়ে কতবার বিপদে পড়েছি—কিন্তু তোমায় ভুল্তে তো পারিনি মা। আমার মন যেদিকে যে ভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে যাচ্ছে—কিন্তু যে কোন ভাবেরই বাহ্য অবলম্বন দুদিনের বেশী টিকেনি—সকল আশাই নিরাশায় প্রতিহত হয়ে চরমে তোমার আশারূপেই জীবনে ফুটে উঠ্ছে। মাগো, অভিমান করে আজ

কোথায় থাকব? আমার অভিমান নিয়ে চল্‌তে গেলেও যে আমি তোমারি শক্তিতে চলি, তোমারি প্রেরণায় বলি। সব যে তোমারি শক্তি, তা বুঝি তখন, যখন দেখি খেয়াল জাগ্‌লেই তো আর একটা কিছু করে ফেল্‌তে পারছি না।

কিন্তু আজ আর সইছে না—মন যে আজ চায় প্রাণ দিয়ে পূজা করতে। আমার প্রাণ যাতে ঢেলে দিতে পারি—তাই তোমার পূজা। সে পূজার মন্দির বিশ্বজোড়া—বিশ্ব-প্রাণই সে পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার। তুমি মা বিশ্বরাজরাণী, তোমার কাছে সবাই সব পেতে পারে, রাজাপ্রজা তোমার কাছে সমান। যার যা আছে, তাই দিয়ে সে তোমার পূজা কর্‌বে। সে পূজার উপচার যেমনি অন্তরে, তেমনি বাইরে। যার বাইরের সম্পদ্ আছে, তার পূজা সবাই দেখ্‌তে পায়। কিন্তু অন্তরের পূজা প্রাণের পূজা—সে তো দেখ্‌লেও আছে, না দেখ্‌লেও আছে। প্রাণের দৈন্য তো কারু মাঝে বিশেষ করে দাওনি মা; যে তা বুঝ্‌তে পারে, তার পূজার সম্পদের তো অভাব নাই। তোমাকে আমি আমার কি দেব জানি না মা—তবু আমার সব দিয়ে দিলাম—আমার উপর থেকে 'আমি'র ছাপ তুলে নিলাম—এই তোমার সব চেয়ে বড় পূজা। আমার যে দেবার কিছু নাই মা—আমি যে তোমার—এই তোমার শ্রেষ্ঠ পূজা। কারণ এর পরে যে আমার বলে কিছু করবার রইল না।

তাই আজ থেকে তোমার বিশ্ব, আমারি বিশ্ব—তোমার ব'লে আমি সবি কর্‌ব। আমি পুষ্পপত্র দিয়ে পূজা করলেও তোমারি করছি—কর্ম্ম দিয়ে সেবা দিয়ে করলেও তোমারি করছি। আমি দেব তোমায় হৃদয়-টুকু—তার পর আমার দেহ দিয়ে মন দিয়ে যাই করি—তাতেই তোমার পূজা হবে। তোমার যা খুসী তাই আমার সামনে জুটিয়ে দাও—সব দিয়ে তোমারি পূজা করছি। আহা, মা তুমি কি মধুরভাবময়ী—তুমি যে সবি। ওগো, এমনি করে চিরকাল তোমায় পেয়েও কেন পাইনি মা?—পাইনি তাই মা—তুমি যে ভুলিয়ে দিয়েছ, ভুলিয়ে দিয়ে যে বুঝিয়েছ, তুমি যেমনি মায়া, তেমনি চেতনা।

সব জানার মাঝেই তুমি আছ মা—তাই তুমি অতি দুজ্ঞের্য়। জগতের সব কাজই তোমারি সেবা—তাই তোমার পূজার আমরা অন্ত পাই না। প্রাণ তোমার পূজায় ঢেলে দিয়েও দেখি, জগতের সবার জন্যই তা সঞ্চিত রয়েছে। সে সঞ্চয়ে কার্পণ্য নাই—নিত্যানন্দময়ীর আনন্দে নিত্য পূর্ণ বলেই সে সঞ্চয় অক্ষয় অব্যয়। জগৎভরা তোমার পূজার উপচার—যত করি, যত হই, করবার হবার শক্তি ততই বাড়ে।

মা গো, তুমি যে কি, তা তো বুঝি না; দেহ-মনে-প্রাণে কতটুকু তোমায় চাই, তা জানি না; আর তোমাকে পেলে বা কি লাভ, হিসাব করে তার কিছু খুঁজে পাই না। কোনো যুক্তি, কোনো কারণ কিছু দেখাতে পারি না। তবু কেন জানি শুধু শুধুই তোমার নাম করতে প্রাণ আবেগে ভরে ওঠে—তোমার স্মৃতিতে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে আসে, স্বার্থপরতার গ্লানি দূর হয়ে যায়। এই বুঝি মা তোমার স্তন্যামৃত? এই অমৃতে যার প্রাণ তৃপ্ত হয়ে গিয়েছে—তার চিত্তে তুমি প্রতি-নিয়তই ভরসারূপে জেগে রয়েছ। ক্ষণিকের আবেগে এ আনন্দের বিদ্যুৎ মনের মাঝে চমক লাগিয়ে দিয়ে যায়, পুলকে সে নৃত্য করে

ওঠে—কিন্তু কই আপন খুসীতে তো তাকে একবার পাই না মা !

তুমি যে কখন আস, কখন পালাও, জান—থাকতে তো তোমায় বুঝি না, যখন দেখা দিয়ে লুকিয়ে যাও, তখনি প্রাণ কেঁদে ওঠে, "হায় হায়, কি পেয়েছিলাম, কি গেল !" চিরদিন ধরে কি এমনি লুকোচুরীই চলবে—স্থির ভাবের মন্দিরে একবার কি তোমায় দেখতে পাব না মা ?

একবার পেয়ে ভুলেছিলাম, বরষ অন্তে আবার তোমায় আভাস প্রাণে পেয়েছি। আজ এ শুভ শারদপ্রভাতে বর্ষাস্নিগ্ধ শ্যামলা ধরিত্রীর অঙ্গে অঙ্গে তোমারি রূপের লাবণ্য দেখছি মা। মা তুমি চিরকালের, সত্য সনাতনরূপিণী, তুমি নির্বিশেষ—তাই মা বিশেষের অঙ্গে অঙ্গে তোমার প্রকাশ, বিশ্ব জুড়ে তোমার লীলা। যেখানে যত সৌন্দর্য্য, সে যে করুণাময়ী তোমারি মূরতি মা। কদর্য্যকে তুমি বুকে তুলে নিতে জান—জগতের মাঝে যারা ক্ষুদ্র, ঘৃণ্য অবহেলনীয়, তুমি যে তাদেরও পরম করুণার্দ্র হৃদয়ে স্থান দিয়েছ—একমাত্র তুমি তাদের আছ বলেই সব চেয়ে তারা সৌভাগ্যবান্। তাদের কেউ চায় না—তুমি মা আপন হতেই তাদের তোমার কাছে টেনে নিচ্ছ। তোমার সৌন্দর্য্য সকলের মাঝ দিয়ে ফুটে উঠছে—অভিমানে অন্ধ হয়ে আমরা তা দেখতে না পেয়ে ক্ষুদ্রকে ঘৃণা করি, অবহেলায় তার বুক দলে চলে যাই। সে অবহেলা তোমারই বুকে বাজে—কেননা তুমি যে তাদের বুকেও রয়েছ মা। সত্যকে কে ম্লান করবে ? সৌন্দর্য্যকে কে খণ্ডিত করে দেখবে ? যে দেখবে, সেই ঠকবে—তোমার দান তারা হাতের কাছে পেয়েও হারাবে। মা করুণাময়ী, তোর করুণা এদের উপর স্বতোনির্ঝরিণী—কিন্তু এরা পেয়েও পেল না। অভাগাকে কবে তোর ভাবে বিভোর করবি বল—এবারের এ আভাস কি চিরন্তন হয়ে জগতের প্রতি তার সে ক্ষুদ্রতার দৃষ্টিকে পদে পদে কুণ্ঠিত করবে না ?

বছর ভরে দেখে দেখেও তোমার লীলার আর অন্ত পেলাম না মা। তুমি কখন ছলাও কখনো ভুলাও, কখনো বা আপনা হতেই এসে ধরা দিয়ে বসে থাক। কেন যে কি হয়, অত কথা বুঝি না, শুধু বুঝি, যেখানেই থাক, তুমি আছ, আর আমার হয়েই আছ—আমিও তোমার হয়ে আছি, কৃপার অভাব কোনদিনই আমাকে সইতে হবে না। আমি যে তোমায় দেখতে না পেয়েও তোমার হয়ে আছি। তোমার শ্রীপাদপদ্মপরশে এ অভাগার তনু যে এখনো পূত সত্ত্বতনু হয়নি, সে আমারি দোষ—আমি নিজেই নিজকে ঢেকে বসে আছি। কিন্তু জানি আমার এ তনু তোমারি—একদিন তোমার চরণে গিয়ে মিশবেই মিশবে। তবে আজ আর ভয় কি ? ঘটে ঘটে তোমার সে ভাবময়ী মূর্ত্তিকে দেখব, আর সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে তোমার ভাবমাধুরীতে অনুষিক্ত হয়ে থাকব। এ ছাড়া চাই কি ?

মা গো, তোমার পূজা কি মন্দিরে মন্দিরেই হবে ?—অভাগার কুটীরে চিরদৈন্যনিপীড়িত অকিঞ্চনের কুটীরে কি তোমার পূজা হয় না ?—তাদের আর কিছু না থাক্ তোমারি তরে আবেগভরা হৃদয়খানি তো আছে। তাদের নাই উপচার, নাই সম্পদ্—চিরকাল বিপদের বোঝা বয়ে বয়ে অশ্রুভারাতুর আঁখি তাদের তোমারি তরে আনত হয়ে রয়েছে।—তাদের দীন হৃদয়ের সে ভক্তি কি

তোমারি প্রতি শ্রদ্ধাকে তাদের মাঝে জাগিয়ে তোলে নি ? সব জায়গায় ঠেকে শুধু তোমাকেই যারা চাইতে শিখেছে, ভবের বৈভব হারিয়ে আর যারা তা ফিরিয়ে চায় না—বিশ্বজোড়া তোমার বিলাস বৈভব কি তাদের কাছে তুমি খুলে দাওনি মা ? আমাদের যে তাই হতে হবে—জগতের সব মায়া ছাড়তে হবে—তবেই না মহামায়াকে পাব।

মা সর্ব্বময়ী শক্তিরূপিণী, সকলরূপে তুমি আমাদেরই হয়ে রয়েছ—তোমার কাছে নূতন করে আর কি চাইব বল ? তুমি যে চির-পুরাতন, তাই নিত্যনূতনে তোমার লীলা—তাই দেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। কখন যে তুমি কি করাবে, তা তুমিই জান—চরম যা দিবে, তাতেও অবিশ্বাস করি না। স্থির বিশ্বাসের পূত শক্তিতে পলকেই তোমাকে পাওয়া যায়। সেই বিশ্বাস আমাদের মাঝে আবো জাগিয়ে দাও মা। বিশ্বাস হতেই বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি আসবে, তোমার করুণার স্মৃতিতে মনের সকল গ্লানি মুছে যাবে। সে মন যে তখন তোমারি মন—তখন বিশ্বে আপন ছাড়া কে আমার পর ? তুমি যে সবার মাঝ দিয়েই আমার হবে মা।

সবার মাঝ দিয়ে চিরকালই আমার আপন হয়ে তুমি রয়েছ,—নিজের অভিমানে অন্ধ হয়ে তা দেখিনি। কিন্তু আজ তুমি যেন নূতন করে এসেছ, আর আপনা হতে তোমার কথা তাই মনে জেগে উঠেছে। আজ আনন্দ আর হৃদয়ে ধরছে না। আমরা দীনহীন কাঙ্গাল হয়েও মা তোমাকে পাবার অধিকার পেয়েছি। এত ভুল করেছি, এত ঠকেছি—কিন্তু তবু সে কথা ভুলতে পারিনি। ভুলব কেন—আমি যে তোমায় পাবই পাব মা।

এসো মা সর্ব্বমঙ্গলে—এসো আমার হৃদয়ে এসো। এসো শ্রবণে বোধন গীতিরূপে, এসো নয়নে পূজার বেশে,—অন্তরে দেবদানবের সঙ্কুল স্থলে এসো মা চিরশান্তিময় ভাবের আবেশে।—আমার সকল চাওয়ার মাঝে তুমি আমার পাওয়া হয়ে থাক! তুমি আছ, তাই তোমায় পাচ্ছি, আরো তোমায় চাচ্ছি। কিছু না পেলেও যে শুধু চেয়েই প্রাণে কত সুখ—তাই বলি তোমাকে চাওয়াই তোমাকে পাওয়া। এই চাইবার শক্তি হয়েই জগৎকে তুমি সঞ্চালিত করছ—যা চাই, তা অস্থির, কিন্তু যা পাব, তা চিরস্থির। শেষ কথা, আমার বলে আর কিছু নাই—যা করাচ্ছ তাই করছি।

*

জানি মা তুই আমায় পায়ে ঠেলবি না—তোর ভালবাসার কাছে জগতের সকল মোহের আকর্ষণই চিরদিন আমার পক্ষে ব্যর্থ। জানি মোহ আসবে—কিন্তু আমার মাথার মণি হতে পারবে না কিছুতেই। যে মোহ শৃঙ্খল হয়ে আমায় আঁটতে আসবে, অঞ্জলি পূরে কুসুমের উপহার করে তাদের আমি তোর রাঙা পায়ে ঢেলে দেবো—তোর পরশে বন্ধন তাদের টুটে যাবে, তখন আর আমায় বাঁধবে কিসে ?

তাই মা তোকে পাবার পথ—সাহসের, তেজের, আনন্দের পথ। মোহে যারা মুহ্যমান হয়ে পড়েছে, তোকে স্মরণ করলেই তাদের অবনত হৃদয় উন্নত হয়ে ওঠে, অন্তরে সাহসের আলো জ্বলে ওঠে, সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের বিদ্যুৎ খেলতে থাকে। এই তো মা সাধনায় তোর প্রথম বিকাশ। এই বিকাশের আনন্দ বুকে পুরে নিয়ে আঁধারের মাঝ দিয়ে অদম্যবেগে

ছুটে চলতে থাকি যখন, তখন আর আঁধার-আলোক জ্ঞান থাকে না—তোর আলোতে হৃদয় আলোময় হয়ে উঠে তখন—সে শুধু মা তোরি কৃপায়! এমনি করে অন্তরে-বাহিরে অভেদজ্ঞান তুই এসে যদি না জন্মিয়ে দিস্ মা, তবে এ ক্ষুদ্র জীবের সাধ্য কি যে পদে পদে বিচার করে সে পথ চল্‌তে পারে?

তাই মা ডাকি—"আজ আয় মা একবার তোর অরূপ রাজ্য থেকে নেমে আমাদের মাঝে! রূপী জীব আমরা, তোরেই প্রলয়-বৃন্তে ফোটা সৃষ্টির ফুল আমরা—আমাদের মাঝে তোর রূপের লীলা দেখে তোর যে আনন্দ, সেই আনন্দে আমাদের মনঃপ্রলয় হয়ে যাক্। সাধ্য হয়ে কতকাল আর দূরে থাকবি মা?—একবার আয় গো জগতে সাধ্যসাধনের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়ে, মুহূর্ত্তের তরেও দৃশ্য দর্শনের বিয়োগ ঘুচিয়ে দিয়ে আয়;—তোর ঐ অরূপ স্বরূপের প্রতিরূপ বিশ্বের প্রতি রূপের লীলায় একবার ধ্যান-তদগত হয়ে দেখ্‌ব মা, এই বড় সাধ। মনের এ সাধ যদি মনেই থাকবে মা চিরকাল, তবে আর আমরা তোঁর সাধক কেন? শুধু এক রূপে দেখেই আমাদের প্রাণে তৃপ্তি নাই মা। তাই সহস্ররূপিণী তুই একের রূপে থাক্ আমাদের সিদ্ধি হয়ে, আর অজস্র রূপে সাধকের মাঝে সাধনরূপে আবির্ভূত হয়ে থাক্—এই আমরা চাই! চারদিকে ভোগ্য দিয়েছিস্ অজস্র, অভাব আমাদের কিছুরই নাই। এবার ভোক্তার মাঝে মহাশক্তিরূপিণী তুই জেগে ওঠ্ মা—ভোগের আসক্তিকে পায়ে দলে তার উর্দ্ধে আমরা উঠে যাই।" ওঁ শান্তিঃ

শক্তি ও শক্তিমান্

(শ্রীশিশিরকুমার বসু বর্ম্মন্ বি. এ.)

কালী ও কৃষ্ণ ভেদ না থাকিলেও শক্তি অপেক্ষা শক্তিমানের প্রাধান্যবশতঃ শক্তি নির্গুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই শক্তিমানে লীন হন এবং তখনই সাধক স্বরূপে অবস্থান করেন। কিন্তু এই শক্তিমান বা চিৎস্বরূপ পাইতে হইলে—বা যে কোন প্রকার সাধন করিতে হইলে, জীবমাত্রেরই ভিতর যে শক্তি সুপ্ত আছে—সেই শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। জীবদেহে এই কুণ্ডলিনীশক্তি মূলাধারে সুষুম্না দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন। এই শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সহস্রার-স্থিত পরমশিব বা চৈতন্যের সহিত মিলিত করিতে হইবে, ইহা জাগতিক সর্ব্ব সাধনার প্রাণ। কিন্তু এই বিদ্যুৎবরণী বিশ্বরূপিণী কুণ্ডলিনী মূলাধারে যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন,

ইহা ল্যাবরেটরীতে ব্যবচ্ছেদের সময় ধরা পড়ে না বা বিদেশীয়গণের অনুমোদিত নহে বলিয়া আধুনিক হিন্দুগণের অবিশ্বাস্য হইয়া পড়িয়াছে। যে সমস্ত অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয় সাধক হিন্দু শাস্ত্র লইয়া গভীর গবেষণা করিয়াছেন, বা হিন্দুশাস্ত্রানুগ সদ্গুরুর আশ্রয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এই কুণ্ডলিনীর শক্তির বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত নব্য যুবক-যুবতীদের বিশ্বাস উৎপাদন করা যাইতেছে।

"......the existence of powerful electric organ in every human being, which with proper cultivation are capable of marvellous spiritual force."

—Marie Corelli

"There is an Inner Woman in every Man"

—Sir J. Woodroffe.

এই কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করিতেই হইবে। শাক্তই বল, সৌরই বল, গাণপত্যই বল আর বৈষ্ণবই বল না কেন, সমস্ত সাধনার মূল এই পরাপ্রকৃতি বা শক্তি। কিন্তু দেখিতে হইবে, কি উপায়ে এই শক্তিকে প্রবুদ্ধ করা যায়। সেই শক্তিকে জাগরিত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই শারীরিক শক্তির সঞ্চার করিতে হইবে। যেমন সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা চাই, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করা চাই। স্থূলদেহের শক্তিসঞ্চার করিতে হইলে পরিমিত স্থূল সাত্ত্বিক আহার্য্যের প্রয়োজন। পরিমিত সাত্ত্বিক আহার্য্য ব্যতীত যেরূপ ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ফল, তদ্রূপ সাত্ত্বিক আহার্য্য গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ না করিলেও আহার্য্য গ্রহণ নিষ্ফল। এই ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে সদ্গুরুর নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া মুদ্রাদি অভ্যাস করিতে হয়। কুণ্ডলিনী চৈতন্য করিতে প্রথম এবং প্রধান সহায় শারীরিক বল সঞ্চয়—দ্বিতীয়াবস্থা মানসিক বল। এই মানসিক বলের উৎকর্ষ করিতে ঈশ্বর মনন করিতে হয়, ঈশ্বর মননের ফলে ঐকান্তিক একাগ্রতা জন্মে। এই একাগ্রতার ফলেই কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধা হন। এতদ্ব্যতীত মানসিকবলের সঞ্চয় করিতে নিষ্কলঙ্ক পূত-চরিত্র ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবন ও কর্ম্ম আলোচনা আবশ্যক। এইরূপ অহর্নিশি একই লক্ষ্যে মনন করায় কুণ্ডলিনী ধীরে ধীরে উর্দ্ধে গমন করিয়া যে ভাবে সহস্রারস্থিত পরমশিবের সহিত মিলিত হন, তাহা পরে দর্শিত হইবে।

উপরোল্লিখিত পদ্ধতিই হইল ঋষিগণ নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বাচরিত ঈশ্বরোপাসনার পদ্ধতি। কিন্তু বর্ত্তমানে ঈশ্বরোপাসনার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সমস্ত উচ্চ সাধনা ক্রমশঃ নিম্নগামী হওয়ায় অর্থাৎ স্থূলবুদ্ধিবিশিষ্ট মানবগণের হস্তে ধর্ম্মের ভার পড়ায় সমস্ত সাধনাই স্থূল বিগ্রহের তামসিক পূজার্চ্চনায় পর্য্যবসিত। স্থূল বিগ্রহের পূজার্চ্চনার সাত্ত্বিকভাব যতটুকু ছিল, তাহা দিন দিন ম্লান হইয়া যাইতেছে। বিগ্রহোপাসনা ব্যবসায়ে ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর ব্যাপারে পরিণত হইয়া সমস্তই জড়ত্বে পর্য্যবসিত হইতেছে। প্রতিমাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজার্চ্চনায় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ইহা শাস্ত্রসম্মত বটে, কিন্তু এই প্রতীক উপাসনায় একটা অতি গুরুতর ভয়ের

কারণ আছে। শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে তাহা বলিয়াছিলেন—

"যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্।

যে জ্ঞানে একটা কার্য্যে "ইহাই সব" অর্থাৎ এই প্রতিমাই ঈশ্বর বা আত্মা, এতদ্ব্যতীত অন্যত্র ঈশ্বর-সত্তা নাই, এই ভাব জাগে তাহা তামস। মক্কায় এক সময় ১৫০০ প্রতিমা ১৫০০ ঈশ্বরে পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়নির্দ্দিষ্ট প্রতিমাই তাহাদের ঈশ্বর এবং সেই প্রতিমা ব্যতীত ঈশ্বর সত্তা অসম্ভব, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস ছিল। এইরূপ সফা পর্ব্বতে যখন উক্ত প্রকার তামসভাবাপন্ন কোরেশবংশীয়গণ পূজানিরত ছিল তখন হজরৎ মহম্মদ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন যে ঐ প্রতিমা ঈশ্বর নহে। তখন অলিদ নামীয় জনৈক যুবক তাহার প্রতিমাকে স্কন্ধে করিয়া বাহিরে আনিয়া বলিল, "হে মহম্মদ, এই দেখ, আমার ঈশ্বর আমার স্কন্ধে—তোমার ঈশ্বর কোথায় আমাকে দেখাও।" এই তামসভাব নিরাকরণ করিতেই হজরৎ মহম্মদ শ্রীভগবানের দ্বারা প্রেরিত বা আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশ কাল পাত্রভেদে মহম্মদের পন্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দুর প্রতীকোপাসনা যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তামসভাব দূর করিয়া প্রতিমা পূজার ভিতর সাত্ত্বিকভাব প্রবেশ করাইতে হইবে। এই সাত্ত্বিকভাব পুনঃ প্রবেশ করাইতে হইলে দুইটী অন্তরায় পূজানুষ্ঠানের ভিতর হইতে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। প্রথম অন্তরায় —প্রতিমাই ঈশ্বর, তদ্ব্যতীত ঈশ্বরসত্তা অসম্ভব এই জ্ঞান এবং সেই প্রতিমাদর্শন জন্য মন্দিরস্বত্বাধিকারীকে দর্শনী দান। দ্বিতীয় অন্তরায় দেব-বিগ্রহের সম্মুখে নিজ রসনা তৃপ্তির জন্য জীব-শিশু বলিদান। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

পত্র, পুষ্প, ফল, জল প্রভৃতি ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত হইলেই ভগবান তুষ্ট হন। তাঁহার নিকট তাঁহার অংশীভূত জীবশিশুর বলিদানে তিনি তুষ্ট হইতে পারেন না। ইহা তিনি আরও সুস্পষ্টভাবে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥"

দম্ভ অহংকার ইত্যাদির বশবর্ত্তী হইয়া জীবশিশুবলিদানে চৈতন্যদ্রোহী হয় মাত্র। উহা তামসিক। যজ্ঞে শ্রদ্ধার সহিত বিধিপূর্ব্বক বলিদানের ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা প্রবৃত্তিমার্গের। তথায় প্রতি জীব বলিদানের জন্য স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বলিদানে কদাচ সত্ত্বগুণে পৌছান যায় না এবং সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ না হইলে ব্রহ্মদর্শনও হয় না। প্রকৃত পশু বলিদান অর্থে মানবদেহে রিপুনিচয় রহিয়াছে, তাহারাই পশুস্বরূপ। তাই ষড়রিপুর বলিদানেরই স্থূল রূপক জীব বলিদান। স্থূলবুদ্ধি মানব স্থূল দেখিয়াই বসিয়া রহিয়াছে, কিছুতেই নেত্র বিস্ফারিত করিয়া অগ্রসর হইবে না। যদি জীব শিশু বলিদানে দেবতার তুষ্টি হইত, তবে ছোট ভাইয়ের বক্ষরক্তেও মাতা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন। এই অন্তরায় দুইটী আমাদের ভগবৎ বিগ্রহ উপাসনায় জড়ত্ব আনিয়া ফেলিয়াছে। ফলে মূর্ত্তি উপাসনার তত্ত্বে পৌছান

দিন দিন কঠিন ও হিন্দুধর্ম্ম কাপালিক ধর্ম্মে পরিণত হইয়া পড়িতেছে।

একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট কি মৃত্তিকা, কি পাষাণ বা ধাতু, সবই ব্রহ্ম বা তাহার বিকাশ—কারণ একমাত্র ব্রহ্ম সত্তা ছাড়া, আর কোন সত্তাই অসম্ভব। কিন্তু সাধকের নিকট মৃণ্ময়, পাষাণময় বা ধাতব বিগ্রহ সমস্তই চিন্ময়—ভগবানের এক একটা লীলার ভাব-ব্যঞ্জক প্রতীক মাত্র। ঐ ভাব চিন্তার দ্বারা তাহার অন্তর চৈতন্যময় হইয়া উঠে। সাধনার প্রথমাবস্থায় এই সমস্ত বিগ্রহের সার্থকতা আছে। যেরূপ শিশুর নিকট "ক" শিখিতে "কাকাতুয়া"র ছবির প্রয়োজন আছে, "ক" শিক্ষা হইয়া গেলে কাকাতুয়ার ছবির আর প্রয়োজন নাই। সাধনজগতে সহস্রের ভিতর ৯৯৯ জনই শিশু, তাই মূর্ত্তি প্রয়োজন। মানব মনের বিচ্ছিন্নভাব সমূহকে ঘনীভূত করিয়া, বাহিরের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির অনুরূপ মূর্ত্তি যদি মনের ভিতর প্রতিষ্ঠিত হয়—তবে বাহ্যমূর্ত্তি পূজার সার্থকতা। বাহ্য মূর্ত্তি পূজা করিতে করিতে চক্ষু যদি মুদ্রিত হইয়া আইসে এবং মানসিক পূজার আরম্ভ হইয়া যায়, তবেই বিগ্রহ পূজার ফল অনুভূত হইয়া থাকে। তখন আর বাহ্য পূজার প্রয়োজন নাই। কারণ এই বাহ্য পূজার উদ্দেশ্যই Auto-suggestionকে গাঢ় করা। সমস্ত ধ্যান-ধারণার মূলেই এই Auto suggestion. ধরুন আমাদের নিদ্রা। মানব নিদ্রিত হয় কেন? এই নিদ্রার মূলেও সেই Auto-suggestion; সে নিয়মিত সময় শয়ন করে, শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে থাকে "আমি নিদ্রা যাই—আমি নিদ্রা যাই—আমি অজ্ঞানে প্রবেশ করি।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন সাময়িকভাবে চিন্তার অবসান হয়, তখনই নিদ্রা আসে। পূজা আহ্নিক, ধ্যান-ধারণা সবই তদ্রূপ, প্রভেদ শুধু বহু চিন্তার হাত হইতে এড়াইয়া একটা চিন্তায় নিবিষ্ট থাকা, কিন্তু মূলে সেই Auto-suggestion. কিন্তু Auto suggestionএর একাগ্রতা আসক্তির উপর নির্ভর করে। মনে করুন, আপনি প্রবাসে রহিয়াছেন এবং স্ত্রীর সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন; চিন্তা করিতে করিতে চিন্তনজনিত সুখে মুদ্রিতচক্ষু হইয়া গিয়াছেন এবং মানসিক জগতে উভয়ে এক-ত্রিত রহিয়াছেন। এরূপ স্থলে Auto suggestion খুব শীঘ্র গাঢ় হয়, কারণ মূলে অনুরক্তি বা ভালবাসা রহিয়াছে। তদ্রূপ ভগবানে Auto-suggestion দৃঢ় করিতে ভগবানের ঘনীভূতভাব স্থূলমূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে; সেই মূর্ত্তিকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে হইবে, তবেই Auto sugges-tion একাগ্র হইবে। এতদ্ব্যতীত ইষ্টনিষ্ঠা চাই। যে যে দেব-দেবীর উপাসক, তাহার সেই দেব দেবীর উপর একান্ত নিষ্ঠা—অর্থাৎ যে দেব দেবীর অচিন্ত্যশক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস তাহার কৃপার উপর একান্ত নির্ভর চাই। এই দৃঢ় বিশ্বাস ও একান্ত নির্ভরকে ইষ্টনিষ্ঠা বলে। লঙ্কায় যাইতে জাম্বুবান বিবেচনা করিলেন যে লম্ফপ্রদানে সমুদ্রের এদিকে পড়েন, কি ওদিকে পড়েন। কিন্তু মহাবীরের সে চিন্তা ছিল না। রামনাম করিয়া লম্ফপ্রদান করিবেন—যেখানে গিয়াই পড়ুন, তাহা তিনি জানেন না এবং জানিতেও চান না। তৎপরে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রশ্নেও তদ্রূপ উত্তর দিয়াছিলেন—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥"

ইহাকেই ইষ্টনিষ্ঠা বলে। এই নিষ্ঠা বলেই মনে বলের সঞ্চার হয় এবং মনের একাগ্রতা বলেই অন্তরে প্রেরণা আসে। প্রেরণা আসিলে তাঁহার মুক্তির অন্তরায় স্বরূপ কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। হৃদয়ে এই প্রেরণার অনুভূতি হইলে মনে যে একান্ত বিশ্বাস আসে—সেই বিশ্বাসের সহিত সদ্‌গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রজপে ও অহর্নিশি বিরামহীন-ভাবে তৈলধারার ন্যায় ঐকান্তিক চিন্তায় কুণ্ডলিনী জাগ্রৎ হইতে আরম্ভ করেন। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মন, মন্ত্র ও কুণ্ডলিনী একত্রীভূত হইয়া যায় এবং কুণ্ডলিনী জীবভাব ধ্বংস করিতে করিতে তাঁহার স্বাভাবিক গতিতে সুষুম্নানালের ভিতর দিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকেন। মন ও মন্ত্র কুণ্ডলিনীময় হওয়ায় সাধক মনে করে যে সে নিজেই কুণ্ডলিনী এবং ক্রমে সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিত হন। তখন সাধক আনন্দশৃঙ্গারে বিহার করেন। তখনকার অবস্থা তন্ত্রে এইরূপ দেখা যায়—

যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ।
সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি॥
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তস্য জায়তে॥"

সাধক প্রকৃতি অনুসারে প্রথমে দ্বৈত ভাবে এইরূপে বহুদিন সুখ ভোগ করিয়া পরে অদ্বয় ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন বা তখনই শক্তি নির্গুণা হন। শক্তি তখন শক্তিমানে লীন হন ও সাধক তখন নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান বা চরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা উন্নত স্তরের সাধনা। ইহাতে শক্তি সাধকের ন্যায় নিজের শৃঙ্গার রসের অনুভূতি নাই।

"যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকারে যত্নে করায় সঙ্গম॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখ সঙ্গ হইতে কোটী সুখ পায়॥"

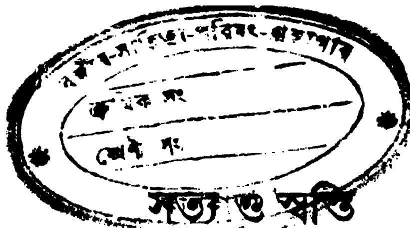
শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা কালে সাধক গোপীভাব অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন-জাত নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করেন। এইরূপ যুগল-মিলনজাত আনন্দাতিশয্যে সাধকের কুণ্ডলিনী সহসা জাগ্রত হইয়া স্বস্থানে গমন করেন। তজ্জন্যই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা শ্রেষ্ঠতম—কারণ এ উপাসনায় আত্মসুখ বলিয়া কিছু নাই। সমস্তই ভগবানের উদ্দেশ্যে, সুতরাং গোপীপ্রেমে ভগবান চিরদিনই ঋণী।

তাই তত্ত্বদর্শী ঋষি বলিতেছেন—বাসুদেবই শেষ, তাঁহার উদ্দেশ্যেই সব।

বাসুদেবঃ পরা বেদা, বাসুদেবঃ পরা মখাঃ।
বাসুদেবঃ পরা যোগা, বাসুদেবঃ পরাঃক্রিয়াঃ॥
বাসুদেবঃ পরং জ্ঞানং বাসুদেবঃ পরং তপঃ।
বাসুদেবঃ পরো ধর্ম্মঃ বাসুদেবঃ পরা গতিঃ॥"

শাক্তই হউক আর বৈষ্ণবই হউক—উভয় পৌঁছায় একস্থানে। তারতম্য শুধু সাধকের ভাব ভেদে। বস্তুতঃ উভয়ই এক, ইহা পূর্ব্বে সম্যক দর্শিত হইয়াছে। এই ভাবটী সাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে আচার্য্য বলিয়াছেন—

"মা আমার হয়েছে কালী—কালা কালে।
অবোধ মানব ভিন্ন বলে,
যারা বিষয় বিষে ভোলা
তারাই কেহ কালা,
কেহ বা কালী বলে॥"



সত্য ও স্বস্তি

—*—

[স্বামী রামতীর্থ]

—*—

"স্বামিজী, আমাদের কাছে যে সত্য প্রচার করছেন, তার অনুশীলনের জন্য আমাদের নিয়ে একটা সমিতি গড়লে হয়না ?"

—জাত আর সম্প্রদায়ের গণ্ডী ভেঙ্গে ফেলা রামের অন্যতম উদ্দেশ্য। সমিতি গড়ে সত্য প্রচারের ভিত্তি পোক্ত করা যায় বটে, কিন্তু অনেক সময় তাতে হিতের চেয়ে অহিত হয় বেশী। যদিই বা কোনও সমিতি গড়তে হয়, তা কিন্তু অন্য সমিতির মত হলে চলবে না। রাম দাসত্ব চান না—বেদান্তের জোয়াল কারু কাঁধে চাপাতে চান না। তোমাদের ইচ্ছা হলে অপর সমিতিতে যোগ দিতে পার, নবাগতের কথা শুনতে পার; যারা আমার, তারা আমার কাছে আসবে। যদি অপর কোনও বক্তা ভাল লাগে, তাঁদের মাঝে তোমার উপযোগী কোনও কিছু যদি পেয়ে থাক—তা হলে তাঁদের কাছেই যাও। সব বক্তাই রাম। আমিই কৃষ্ণ, আমিই মোহম্মদ; অবাধে তাঁদের কথা শোন। রাম তোমাদের তাঁর দাস বানাতে চান না। আলোর পথ আটকিও না। অথচ রাম চান যে এই সত্যে তোমাদের উপকার হোক্।

সত্য তুষারমণ্ডিত হিমাচল শৃঙ্গের মতই প্রাচীন; সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে ঋষিদের কণ্ঠে যে সত্য ধ্বনিত হয়েছিল, সেই সত্যই আজ ইমার্সন হুইটম্যানের হৃদয় আলোকিত করেছে, আনন্দে তাঁদের বিহ্বল করেছে। সঙ্ঘে সমিতিতে সহস্র মূর্ত্তিতে সেই সত্যই প্রকাশিত হচ্ছে—কোথাও অংশতঃ, কোথাও বা পূর্ণরূপে। তোমাদের সাময়িক পত্রে যে সত্যের কথা আলোচিত হয়, তারও একটা মনোহর রূপ আছে। কিন্তু তা বলে সত্যের কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি—হাজার বছর আগে তা যা ছিল, আজও তাই আছে। তবুও রাম বলছেন, সত্যকে সুন্দররূপে তোমাদের কাছে তিনি এনেছেন। এই বইগুলো যদি পড়, তা হলে দেখবে, রাম সত্যকে কি অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে চিত্রিত করেছেন। রামের বাগ্মিতা কারু কারু কাছে রুচিকর নয়, কেননা তিনি তাদের মনের মতন করে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলেন না। রাম যদি সত্য হতে বিচ্যুত হয়ে তোমাদের কল্পনা বিনোদনের জন্য নূতন ঢঙে কথা কইতে সুরু করেন, তা হলে হাজার হাজার লোক রামের কথা শুনতে ছুটে আসবে। কিন্তু রাম কখনও কারু রুচিমাফিক কথা বলবার জন্য সত্যের শিখর হতে নেমে আসেননি, কোনও দিন আসবেনও না।

খৃষ্ট মাত্র এগার জন শিষ্যকে তাঁর বাণী শুনিয়েছিলেন, কিন্তু বাতাস সে বাণী শোষণ করে নিয়েছিল, আকাশ তাকে ধরে রেখেছিল, আর আজ লক্ষ লক্ষ লোক সে বাণী

অধ্যয়ন করছে। সত্যকে ধূলোয় গুঁড়িয়ে দিলেও আবার সে জেগে উঠবে।

হয়ত আরো কত জনে এই চিন্তাই প্রকাশ করছে। কিন্তু আজ পুঁথিপত্রে যে সত্য প্রচার হচ্ছে, রাম তাকেই তাঁর রীতিতে প্রচার করায় কিছু না কিছু হিত হবে, কারু না কারু অভাব মিটবে। কারু এই রীতিতে উপকার হয়, কারু বা ভিন্ন রীতিতে হয়। কিন্তু রামের রীতিতে লক্ষ লক্ষ লোকের মহা উপকার হবে। যদি এ সব তোমাদের ভাল লেগে থাকে, তাহলে রাম বলছেন, সত্যকে আত্মসাৎ করে প্রচার সুরু করে দাও, সবার মাঝে বিলিয়ে দাও। রাম চলে গেলে পর যদি তোমরা সমিতিই গড়, তাহলে বিবেকানন্দ স্বামীর কাজ হাতে তুলে নিও, ইমার্সন, হুইটম্যান্, স্পেন্সারের কাজ হাতে তুলে নিও; এমন একটা সমিতি গঠন করো, যা নামের গণ্ডীতে বদ্ধ থাকবে না, সত্যের যথার্থ প্রচারই যার লক্ষ্য। এই সমিতিতে যদি কেউ মৌলিক কোনও তত্ত্ব আবিষ্কার করে থাক, অধ্যয়ন-প্রসঙ্গে অপরের সহায়ক কোনও বিষয়ের সন্ধান পেয়ে থাক, তাহলে সমিতির সামনে সে সব উপস্থাপিত কর—যাতে সবার উপকার হয়। কিম্বা নির্জ্জন সাধনায় কেউ যদি কোনও সত্য লাভ করে থাক, তাহলে সমিতিতে তার প্রচার কর। কিন্তু প্রচার করবে খুব সহজভাবে—বাঁধি গতে নয়।

এই একটা বাঁশী আছে—ফুঁ দিলে কোকিলের স্বর বেজে ওঠে। যখন তখন ফুঁ দিয়ে পঞ্চম সুর বের করতে পারি বটে, কিন্তু সুরটা স্বাভাবিক হবে না। কোকিলের স্বাভাবিক সুর দেশকালের আইনে বাঁধা নয়। সে যখন খুশী গাইবে—তুমি "গাও" বললেই গাইবে না। কাজেই দেখছ, বক্তৃতা দেওয়ার একটা সময় বেঁধে দিলেই সর্ত্ত করা হল; তাতে ফল কখনও ভাল হবে না।

সর্ত্ত বাঁধা হয়, যাতে বক্তৃতায় ঘর ভাড়ার টাকাটা উঠেও আরো বেশী টাকা পাওয়া যায়—কিন্তু এই সব বাঁধাবাঁধিতে সত্যকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়।—এই হচ্ছে ত্রিশখানা রূপোর চাকৃতির লোভে যীশুরূপী সত্যকে বিক্রয় করা।

রাম বলেন কি, যদি সমিতিই গড়তে চাও, তাহলে স্বভাবসঙ্গত উপায়ে গড়; আজকালকার সমিতির অনুকরণ করতে যেও না। হতে পারে, এই রকম সমিতি, এই প্রথম।

খৃষ্টানী চার্চ্চে একটা মস্ত বড় ভুল রয়েছে। একদিক দিয়ে ওতে যেমন হিত হয়েছে, তেমনি সমানুপাতে অহিতও হয়েছে বলতে হচ্ছে, কারণ মানুষকে তা গণ্ডীবদ্ধ করেছে, বাইবেল ছাড়া আর কোনও ভাণ্ডার হতে সত্য আহরণ করতে বাধা দিয়েছে। বৌদ্ধ, মহম্মদীয় ইত্যাদি আরও অনেক ধর্ম্মেও এমনি মস্ত বড় ভুল রয়েছে, কারণ তারাও মানুষকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করে অপর ঠাঁই হতে সত্য আহরণ করতে বাধা দেয়। কেবল ওই একটা দরজা বা জানলা দিয়েই স্বর্গে ঢুকতে পাবে—এই তাদের ভাব।

যে কোনও দরজা জানালা দিয়েই আকাশ দেখবার অধিকার তোমার আছে বটে; আবার ঘর দরজা জানালা সব ছেড়ে উন্মুক্ত আকাশকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করবার অধিকারও তোমার আছে। তাই রাম বলছেন, অন্যান্য সমিতির মত অস্বাভাবিক রীতিতে একটা কিছু না গড়ে একটা সমিতি

স্বভাবে গড়ে তোল না! সে সমিতির সভ্যেরা কোথাও বাঁধা থাকবে না—তারা স্বাধীন হবে। সেখানে সভ্যেরা প্রাণে যখন স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি অনুভব করবে, প্রেরণা পাবে, তখনি বক্তৃতা দেবে। কোকিলকে জোর করে গান গাওয়াতে গেলে গানের মাধুর্য্যই নষ্ট হয়ে যায়। কৃত্রিম ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করো না, কোকিলস্বরের অনুকরণ করতে যেও না। বিধি-বিধানে আটকা পড়ো না। সত্য কখনও গণ্ডী দিয়ে বাঁধা নয়।

রামের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা হিমালয়ের নিবিড় অরণ্যে হয়েছে—যেখানে শোনবার কেউ ছিল না। রাম সেখানে গাছকে গান শোনাতেন—বাতাসে সে গান ভেসে গিয়ে দূরদূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হত। ওই সমস্ত রচনার প্রচার হয়েছে। কিন্তু যখনই কোনও সমিতির সামনে আইনকানুনের গণ্ডীতে বাধা হয়ে রামকে বক্তৃতা দিতে হয়েছে, তখনই ফল ভাল হয়নি। বক্তৃতা তখন অস্বাভাবিক হয়েছে—তাতে কোনও সৌন্দর্য্য থাকেনি। কখনও কখনও একজন মাত্র শ্রোতা থাকলেই সত্যের সুন্দর ও মহৎ রূপ তোমা হতে ব্যক্ত হয়। শ্রোতার সংখ্যা বেশী কি কম, তা নিয়ে সত্যের কিছু আসে যায় না। একবার ভাবটা আঁকড়ে ধরলে দেখবে, সমস্ত জগৎ তা শুনছে।

তুমি সমিতির লোক হবে কেন? সমিতিই তোমার হবে।

এই তো এখানে বসে আছ। শ্বাসের সঙ্গে একটু একটু করে বাতাস টানছ, কিন্তু সমস্তটা বাতাসই তো তোমার। তাই নয় কি? জগতের সমস্ত বাতাসের মালিক তুমি। সমস্তটা বায়ুমণ্ডলই তোমার—ইচ্ছা করলে শ্বাসের সঙ্গে তার সবটাই তুমি টেনে নিতে পার। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, ইংলণ্ড বা আমেরিকার বাতাসও রামের—আবার তুমিও তো রাম। হিমালয়ের সুরভি সমীরণ তোমার। বাতাসের ওপর কারু একচেটে অধিকার নেই। তেমনি সত্যের ওপরও কারু দখলী স্বত্ব নেই। জগতের সকল সত্য, সকল ধর্ম্ম তোমার।

শ্বাস টানবার সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তা কর, এই ভাবে বিভোর হয়ে যাও যে এই দেহটা যেমন বিশ্বের সমস্ত বায়ুকে আকর্ষণ করছে, তেমনি মনও জগতের সমস্ত সত্যেরই অধিকারী।

নিখিল সত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হও—সব দিক থেকে সত্য আহরণ কর। ইমার্সন, হুইট্‌ম্যান, উপনিষদ, গীতা—সবই যে তোমার। তাদের আপন ভাব।

বই পড়তে গিয়ে গ্রন্থকারের নাম দেখো না—সব বই উপনিষদের মত হোক্—গ্রন্থকারের নামধাম হীন।

উপনিষদ্ যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা জগতে তাঁদের ভাব ছড়িয়ে দিয়েছেন বলে কোনও বাহাদুরী নেননি। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ষড়্‌দর্শনের কোথায়ও গ্রন্থকারের নাম নেই। গ্রন্থকার অপক্ষপাতে কাজ করেছেন—কপিরাইটের স্বত্ব নিয়ে নয়, দখলীকারের ভাব নিয়ে নয়—"আমিই সত্যস্বরূপ"—এই ভাবে বিভোর হয়ে। "আমি সত্যস্বরূপ"—এই ভাবনায় আনন্দ আছে। আমি একশ'-খানা বই লিখেছি, আমার পাঁচ লাখ টাকা আছে—এই সব ভাবনায় কি সুখ? যখন অনুভব করি, "আমি পূর্ণ, অখণ্ড, সত্যস্বরূপ;

আমি মহান্, অবিনাশী আত্মা"—তখনই যথার্থ আনন্দ পাই। সে আনন্দে সংসারের সমস্ত সুখ আঁধার হয়ে যায়।

তাই নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে অনুভব কর যে, জগতে যা কিছু আছে সবাই তোমার। ভাবো যে নিখিল বায়ুমণ্ডল তোমার, নিখিল সৌন্দর্য্য ও প্রেম তোমার—যেমন নাকি যে বাতাস-টুকু ফুস্‌ফুসে টেনে নিচ্ছ, সেটুকু বাস্তবিকই তোমার, তোমার ধমনীতে প্রবাহিত শোণিত বিন্দু এক একটা কোষের। এই চিন্তায় বিভোর হয়ে যাও, অনুভব কর যে নিখিল জ্ঞান, শক্তি, সত্য, সুখ, তন্ত্র, সম্প্রদায়, কৃষ্ণ, মহম্মদ, রাম, যীশু সব তোমার। এখন তোমার ভিতরে যা চল্‌ছে, তাই দিয়ে তোমার স্বত্ব সাব্যস্ত করো না।

*

সময় সময় যে মনমরা অবসাদের ভাব আসে, তা কি করে সারে, সেই সম্বন্ধেই দুটো কথা বল্‌ছি। এর প্রতীকারটা খুবই সহজ—আর সহজ বলেই তা লোকে উপেক্ষা করে।

রাম যে উপায় বলবেন, তা পরীক্ষিত সত্য; জেনে হোক্, না জেনে হোক, বড় বড় লোক অতর্কিতে এই উপায়টাই আশ্রয় করেছে। তুমিও এটা মেনে চল—ফল দেখে অবাক্ হবে।

ঘরে বসে আছ; মনটা ভাবী হয়ে আছে, শ্রান্তি বোধ হচ্ছে, স্বার্থচিন্তা বা কুচিন্তা এসে জুটেছে, ঈর্ষ্যা, অস্বস্তি বা প্রবৃত্তির তাড়না এসে উপস্থিত হয়েছে। তখন বুঝ্‌তে হবে, শরীর সুস্থ থাক্‌লে এই সমস্ত চিন্তা কিছুতেই আসত না। মনে করতে হবে, তোমার পেটে নিশ্চয়ই গোলমাল হয়েছে।

রামের কাছে কেউ যদি এসে গালাগালি করে, রুক্ষ কথা বলে, রাম তার অপরাধ নেন না বা তারি সুরে তাকে জবাব দেন না। কেউ যদি তোমার প্রতি ঈর্ষ্যা, বিদ্রূপ বা অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে, তাহলে তার ওপর যেন শোধ তুল্‌তে যেও না, বরং তার প্রতি যেন তোমার করুণা হয়; তাকে পেট খোলাসা করবার একটা ওষুদ দিয়ে দিও। তুমি নিজে যখন ভুগ্‌বে, তখন্ কি করবে? বাইরে থেকে ওষুদ খাবে? না না! বাইরের ওষুধে তো প্রতীকার হবে না, স্থায়ী ফল হবে না।

রামের উপদেশ এই, যখন মনমরা ভাব আসবে, তখন আলস ছেড়ে পুঁথিপত্র ছুঁড়ে ফেলে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়—তারপর খোলা হাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি হাঁট। স্বভাবতঃই তখন জোরে জোরে শ্বাস পড়বে। এতেই তোমার মাঝে শক্তি জাগবে, আনন্দ ফুটে উঠবে, মনমরা ভাব দূর হয়ে যাবে। তোমার মুখে চোখে যে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগবে, তার ফল হবে আশ্চর্য্য। মানুষ যে এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে না—সেটা আরও আশ্চর্য্য।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে অনেকে অনেক বক্তৃতাই দিয়েছেন, কিন্তু রাম তার একটা সহজ উপায় জানেন। রামের পদ্ধতি অনুযায়ী বেড়াতে বেড়াতে প্রাণকে তুমি শৃঙ্খলিত করতে পারবে। ঘর থেকে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এসেও তা হতে পারে। মনে কর, তাড়াতাড়ি না হেঁটে আস্তে আস্তে হাঁটছ; হয়ত তাড়াতাড়ি হাঁটাটা তরিবৎ বলে মনে কর না। তোমরা তরিবতের দাস কিনা, তাই স্বাধীনতা ভালবাস না—নিজের ভালর চেয়ে লোকের কথায় নজর দাও বেশী। কাজেই আস্তে

হাঁটাটাই তোমার পছন্দ। এতে নিঃশ্বাস তোমার পেটের ওপর পর্য্যন্তই যায়—গভীর হয়ে ভিতরে ঢোকে না। এ হলে করবে কি, রাস্তার এক কোনায় কিম্বা যেখানে তোমায় কেউ দেখতে পাবে না, এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে পুরোপুরি দম টেনে নাও। মুখে এমনি করে পুরা দম টেনে নাক দিয়ে বাতাসটা ছেড়ে দাও। বেশ জোরের সঙ্গে কয়েকবার এই প্রক্রিয়াটা করে দেখ, কেমন চাঙা হয়ে উঠবে।

রাম তোমাদের স্বাভাবিক প্রাণায়ামের কথা বলছেন। খুব করে দমভোর শ্বাস নাও। গভীর ভাবে শ্বাস টানলে তলপেট পর্য্যন্ত বাতাসে পূরে উঠবে, ভিতরের সমস্তটা খোলে বাতাস চলবে। এতে সব অবসাদ দূর হয়ে যাবে, কর্ম্মশক্তি ফুটে উঠবে। শ্বাস টানবার সময় এই ভেবে মনেরও শোধন করতে পার, "আমি নিখিল বায়ুমণ্ডলকে আকর্ষণ করছি; নিখিল প্রেম ও সৌন্দর্য্য আমার।" এতে বেশ আনন্দ পাবে। একবার পরীক্ষা করে দেখই না; উপায়টা কত সোজা, অথচ তার ফল কি আশ্চর্য্য।

হাঁটা নিয়েই ধর, সঙ্গী ছাড়া মানুষ হাঁটতে চায় না। রাম বলেন কি, তুমি যদি চিন্তাশীল না হও, আধ্যাত্মিকতা তোমার না থাকে, কোনও মহান্ সঙ্কল্প না থাকে, তাহলে সঙ্গী খোঁজা প্রয়োজন হতে পারে। কিম্বা তুমি হয়ত খুব দুর্ব্বলচিত্ত; তখন একজন গুণী লোকের সঙ্গে চলাফেরা করা ভাল। এতে তোমার ভালই হবে। কিন্তু যারা তোমায় উন্নতির পথে টেনে তুলবে না, তাদের সঙ্গে বেড়িও না; হিংসাদ্বেষের নিম্ন ভূমিতে যারা তোমায় টেনে আনবে, তাদের সঙ্গে চলো না। যদি ভাবুক হও, আর একা চল, তাহলে কেউ যখন কাছে থাকবে না, তখন প্রণব জপ করার চেয়ে হিতকর আর কিছুই হতে পারে না। প্রণব জপ করতে করতে চল, দেখবে, আকাশ বাতাস প্রেরণার বৈদ্যুতীতে ভরে উঠেছে, আশ্চর্য্য মহৎ চিন্তা তোমার ভিতর থেকে স্ফুরিত হচ্ছে।

লোকে এ কথা বুঝতে চায় না। কথাগুলো খুবই সাধারণ বটে, কিন্তু এগুলো মেনে চললে তার ফল দেখে তুমি অবাক হয়ে যাবে।*

---

* স্বামী রামতীর্থ (স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো, কালিফোর্ণিয়া, —জানুয়ারী, ১৯০৩)

জাগরণ

—:—

(শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত)

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ
নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং
ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ —গীতা ২।৩

পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে কর্ত্তব্য বিমুখ অর্জ্জুনকে তাঁহার প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "হে শত্রুগণের ত্রাসোৎপাদনকারী মহাবীর অর্জ্জুন, তুমি ক্লীবত্ব পরিত্যাগ কর, তুমি মহাবীর, শূর, এরূপ দুর্ব্বলতা তোমাতে শোভা পায় না। তুমি তোমার এই যৎসামান্য মনের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্রতী হও।"

মহাবীর, গাণ্ডীবী অর্জ্জুনের কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ক্লীব (কাপুরুষ) জনোচিত কর্ত্তব্যবিমুখতা উপস্থিত হইয়াছে। রণাঙ্গনে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবাদি দেখিয়া চিত্তে মোহের সঞ্চার হইয়াছে; তাই তিনি বলিতেছেন, "যুদ্ধ করিব না।" কিন্তু তাঁহার প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "অর্জ্জুন, এরূপ অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ তোমার পক্ষে অন্যায়। তোমার মত বীরের পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভীরুর ন্যায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কখনও কর্ত্তব্য নয়।" এই মহাবাক্যে শ্রীভগবান জগজ্জীবগণকে কি উপদেশ দিতেছেন? সংসাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত; আমাদের কর্ত্তব্য এখানে সকল প্রকার বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বধন "আত্মস্বরূপ" লাভ করা। কিন্তু তাহার অন্তরায় হইয়াছে—সংসার, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ধনদৌলত—ইহাদের মায়া বা মমতা বুদ্ধি। এই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছি। সত্যস্বরূপের অনুসন্ধান, সর্ব্ববিধ বহিরিন্দ্রিয়প্রিয় বস্তুর পরিত্যাগ ও ইহ পরকালে ভোগ সুখ বিরাগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম হইতেছি।

শ্রীভগবানের যে বাণী, তাহা যুগে যুগে সত্য। তিনি কখনও কোন ব্যক্তিবিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া কোন কথা বলিয়াছেন বা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু লীলাময়ের সেই লীলা সাময়িক বা কোন লোকবিশেষকে উপলক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা জগৎজীবগণের শিক্ষার জন্য, তাঁহার আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁহার লীলা নিত্য সত্য।

যাহা হউক, শ্রীভগবানের এই মহিমময়ী বাণী "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"—এখনও কর্ম্মবিমূঢ় জীবের কর্ণে সতেজে ধ্বনিত হইতেছে। কর্ম্মবিমুখ, কর্ত্তব্যবিমূঢ় জীবগণকে জাগাইবার জন্য, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া স্বাধিকার লাভে উদ্বুদ্ধ করিতে সেই কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনের বীর বাণী এখনও বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হইতেছে। বধির শ্রুতিযুগল একবার সচেতন করিয়া মনোযোগ করিলেই সেই শাশ্বত ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এ সংসার মায়াময়, মায়াই ইহার উপাদান। ইহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে, আত্মজ্ঞান লাভ করা দুরাশা মাত্র। আমার দেহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র কন্যা পরিবার, আমার বাড়ী, আমার ঘর বলিয়া মায়ার

আবরণে আমিত্বের যে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী গঠিত হইয়াছে, ইহা আত্মজ্ঞানবলে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পিঞ্জরমুক্ত সিংহের ন্যায় বহির্গত হইতে হইবে। আদর্শের অভাব নাই, উপদেশের ত্রুটী নাই—কিন্তু আদর্শ অনুযায়ী কর্ম্মী কোথায় ? ত্যাগম বৈরাগ্যসম্বল, ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত ঋষির বংশধরগণের ত্যাগ ভিন্ন আর উদ্ধারের পথ নাই। কিন্তু আজকাল ত্যাগের নামে বৈরাগ্যের নামে সকলেই শিহরিয়া উঠেন। শ্রুতি বলিতেছেন, "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ।" একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়—ভগবানকে লাভ করা যায় বা আত্মস্বরূপ লাভ হয়। ভগবান পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "ভয় নাই—তোমাকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে না—একমাত্র কামনকাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ"; অর্থাৎ যাহার এই দুইটী ত্যাগ হইয়াছে, কাম বা কাঞ্চনে আসক্তি টুটিয়াছে, সেই ত্যাগী—সেই অমৃতত্বের, মুক্তির অধিকারী। ভস্ম মাখিয়া, জটা রাখিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় নানাবিধ দৈহিক ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলেই তাহাকে ত্যাগ বলে না। ত্যাগের স্থান মনে। মনে যদি ত্যাগ প্রতিষ্ঠা হয়, তবে সে মহাজনের নিকট দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা আর কণ্টকাস্তীর্ণ বনভূমি একই। নামে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহস্থের গৃহস্থালীর সুখচিন্তায় নিমগ্ন থাকা অপেক্ষা গৃহে গৃহস্থ থাকিয়া সন্ন্যাসীর ত্যাগজনিত সুখ ও তৃপ্তির চিন্তায় বিভোর থাকা শতগুণ বাঞ্ছনীয়।

বিষয়বাসনা সর্ব্বদা মনকে নিম্নাভিমুখী করিয়া রাখিয়াছে। বাহ্যিক প্রভাবে চিত্ত এত অভিভূত হইয়াছে যে, কর্ম্মপ্রবৃত্তি একরূপ লোপই পাইয়াছে; বহিরিন্দ্রিয় তৃপ্তির হেতুভূত বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি মন ধাবিত হইতেছে না, কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া রহিয়াছে। তাই বিবেকরূপী শ্রীকৃষ্ণ জীবকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।"

বৃদ্ধ পিতা, যুবতী পত্নী, শিশু সন্তান ও রাজ্যসুখভোগ হেলায় ত্যাগ করিয়া কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনতনয় সিদ্ধার্থ নিশীথে ছন্দক সারথিকে সঙ্গে লইয়া বনগমন করিতেছেন। কেন? তাঁহার প্রাণে স্বাধিকার লাভের বাসনা বলবতী হইয়াছে। তখন তাঁহার সাংসারিক কর্ত্তব্যজ্ঞান, আত্মীয়পরিজন রক্ষার কর্ত্তব্যবুদ্ধি সমস্তই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া ধ্রুব সিদ্ধার্থ তখন সত্যের, অমৃতের অনুসন্ধানে বহির্গত হইতেছেন। আবার অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা মাতা ত্যাগ করিয়া বালক শঙ্কর অমৃতের সন্ধানে বহির্গত হইতেছেন। কোথায় মায়ের স্নেহসিঞ্চিত অঞ্চল আড়ালে বসিয়া আরাম করিবেন, না বালক সংসার ক্ষেত্রে যাহা জীবনের অবশ্যকরণীয় কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাই লাভের জন্য মায়ের প্রতি কর্ত্তব্যাদি সকল দুর্ব্বলতা বিসর্জ্জন দিয়াছে। তিনি এইরূপে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যে পরম মঙ্গলের নিদান আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবাসী আজও জীবন ধারণ করিতেছে; আজও তাহাই ভারতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেছে এবং সেই জ্ঞানভাণ্ডার জগতের নিকট ভারতের শ্রেষ্ঠ দানরূপে গৃহীত হইতেছে। এইরূপে কর্ত্তব্যের নিকট, উচ্চতর সত্যের নিকট জাগতিক মায়ার বন্ধন আপনিই

শিথিল হইয়া গিয়াছে। এই সেদিন নদীয়ায় শচীমাতার অঞ্চলের নিধি, বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়-মণি কর্ত্তব্যের আবাহনে জগতে নাম ও প্রেম বিলাইবার জন্য সংসারের সকল কর্ত্তব্য পদ-দলিত করিয়া, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য অগ্রাহ্য করিয়া ত্যাগের পথে, বৈরাগ্যের পথে বাহির হইলেন। একমাত্র ত্যাগই অমৃতত্ব লাভের উপায়, তাহাই জগতে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কাজেই সকলপ্রকার দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মের উদ্‌যাপন জন্য এই কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করাই পরম পুরুষার্থ এবং মানবের একমাত্র করণীয়। ভোগসুখলালসায় মানুষ কয় দিন তৃপ্ত থাকিতে পারে? তার প্রাণে যে অনন্ত পিপাসা। অনন্ত আনন্দাম্বুধিস্নাত মানব গোষ্পদে তৃপ্তি পাইবে কেন? তৃপ্তি সংসারে নাই, সুখ স্ত্রীপুত্র পরিবারে নাই, আনন্দ সাময়িক ভোগ-বিলাসে নাই। এই দুর্লভ মানবদেহ ধারণ করিয়া সংসার সুখতৃষ্ণায় আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিলে চলিবে না। কখন কালের প্রবল ঝঞ্ঝা আসিয়া এ তাসের ঘর ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে, তার ত কোন ঠিক নাই। তাই আজ সত্যান্বেষী, ত্যাগমাত্রৈকসম্বল বীরকে আপাত মনোরম মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। আর ঘুমঘোরে সুখস্বপ্ন দেখিবার সময় নাই। ঐ যে আবার ধ্বনিত হইতেছে সেই বাণী—আবার মধুর মলয়হিল্লোলে অনাহতে আহত হইয়া ঋষির হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিতেছে—

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত—
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

—*—

স্বামী রামতীর্থ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

তীর্থরামের ছাত্রজীবনের সঙ্গে ঋষিযুগের ছাত্রজীবনের তুলনা আপনা হইতেই মনে জাগে। প্রাচীন কালের গুরুগৃহবাসের সৌভাগ্য সম্পূর্ণভাবে তাঁহার ঘটে নাই বটে, কিন্তু দুর্লভ আচার্য্যসঙ্গ পাওয়ায় তাঁহার ছাত্রজীবন আশ্চর্য্যরূপে উন্মেষিত হইয়াছিল। গুরুগৃহের বাহ্য পরিস্থিতি কালবশে তাঁহার পক্ষে সুলভ হয় নাই; কিন্তু তিনি মনে-প্রাণে ঋষিবালকের পুণ্য আদর্শেই ছাত্রজীবন অতি-বাহিত করিয়া গিয়াছেন এবং যতটুকু তাঁহার আয়ত্তে ছিল, ততটুকুর ব্যবস্থা তিনি আদর্শ ছাত্রজীবনের অনুকূলেই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

আদর্শ ছাত্রজীবন বলিতে শুধু সংযম ও তপস্যাই বুঝি না—উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে ঋষি-ছাত্র "আচার্য্য-দেবঃ"—আচার্য্যই তাঁহার দেবতা; মনু মহারাজের কথায় বলিতে গেলে—"তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী, পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে"—ঋষি ছাত্রের সাবিত্রীই মাতা এবং আচার্য্য পিতা। আচার্য্য কি?— মনু বলিতেছেন—"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ"—

আচার্য্য বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মের বিগ্রহ। ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্যসাধন যদি বেদান্তীর জীবনের লক্ষ্য হয়; তাহা হইলে বাল্যকাল হইতেই আচার্য্যরূপী ব্রহ্মবিগ্রহের সঙ্গ ও আদর্শ লাভ করা যে সেই লক্ষ্যলাভেরই সহায়ক, এ কথা বলাই বাহুল্য। তীর্থরামের পরবর্ত্তী জীবনে বেদান্তসিদ্ধি যে তাঁহার এই ছাত্রজীবনের আচার্য্যসঙ্গ দ্বারাই প্রচোদিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই।

ধন্নামলের সঙ্গে তীর্থরামের যে সম্পর্ক, তাহা তাঁহার দিনলিপিতে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধন্নামল আসলে কতখানি শক্তিধর ছিলেন, সে বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই, তাহার উপায়ও নাই। আমরা কেবল অবাক্ হইয়া তীর্থরামের প্রপন্ন ভাবটাই দেখি। চরিতকার পূরণ সিং উভয়ের যোগাযোগ সম্বন্ধে খুব যে সুবিচার করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। ধন্নামলকে তিনি কতকটা অবজ্ঞার তুলিকাতেই চিত্রিত করিয়াছেন। ইহার মূলে বস্তুগত সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সে কথা ধরিয়া মহাপুরুষজীবনের ক্রমবিকাশের কোনও ইতিহাস গড়িয়া তোলা যায় না। পূরণ সিংএর কাছে ধন্নামল "that uncanny sort of person" হইতে পারেন, কিন্তু তীর্থরাম তো সে দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখেন নাই। আর তীর্থরামের জীবনের বিকাশ বুঝিতে হইলে তাঁহার দৃষ্টি এবং হৃদয় লইয়াই বুঝিতে হইবে, আমাদের সংস্কারানুযায়ী বুঝিলে তো চলিবে না।

জগতের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন আইন অনুসারে কাজ হয়, অধ্যাত্মক্ষেত্রেও যে তাহাই হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ হইতে হইলে প্রথমতঃ সৎসঙ্গ প্রয়োজন। সদ্‌গুরুসঙ্গ এই সৎসঙ্গেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মোট কথা, ভুঁইফোঁড় হইয়া মানুষ গজায় না। মানুষ হইতে যেমন মানুষ জন্মায়, তেমনি মানুষকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ বাইরে এবং ভিতরে গড়িয়া উঠে। ইহা প্রাকৃতিক আইন। হিন্দুর গুরুবাদের ভিত্তিই এইখানে। কিন্তু আজকাল স্বাতন্ত্র্যের স্পর্দ্ধা মানুষের বেশী হইয়াছে বলিয়া পরতন্ত্রবাদকে অনেকে মোটেই আমল দিতে চান না। আধুনিক শিক্ষিতদের মাঝে এই ভাবটা বেশী প্রবল। পূরণসিংহের লেখাতেও এই ভাবটা বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জন্য তীর্থরামের জীবনের ক্রমবিকাশ দেখাইতে গিয়া তিনি স্বতঃস্ফুরণবাদের দিকেই বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন। বাহিরের সাহায্য অপেক্ষা ভিতরের শক্তিতেই মানুষের জীবন বিশেষ ভাবে স্ফুরিয়া উঠে, ইহাই তাঁহার মত এবং এই দৃষ্টি লইয়াই তিনি তীর্থরামের সহিত ধন্নামলের সম্বন্ধ বিচার করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাহির ভিতরে তুলনা করিয়া একটাকে ছোট আর একটাকে বড় দাঁড় করানো সুবিচার নয়। ভিতর ও বাহির উভয়েরই প্রয়োজন আছে এবং একের প্রয়োজন অপরের দ্বারা মিটে না—এই হইল সত্যের এক দিক। আবার ভিতর বাহিরে যে প্রভেদ, তাহা আপাতপ্রতীয়মান মাত্র—উভয়ে পরিপূর্ণ মিলনানন্দের দুইটী পক্ষ মাত্র—কিন্তু স্বরূপতঃ উভয়ে এক—ইহাও সত্যের আর এক দিক। এই দুইটী কথা মনে করিয়া বাহির আর ভিতরের বিচার করিলে স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রবাদের ঝগড়া মিটিয়া যায়। বীজের মাঝে স্বতঃস্ফুরণের শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু অনুকূল ক্ষেত্র না পাইলে কি বীজ অঙ্কুরিত হয়? আর যে শক্তিটা ভিতর হইতে বীজকে অঙ্কুরের দিকে ঠেলিয়া

তেছে এবং যে শক্তি বাহির হইতে অঙ্কুরকে বীজাবরণ হইতে টানিতেছে—এই দুইটা শক্তি কি ভিন্ন? উভয় শক্তি যদি মূলতঃ এক না হয় এবং উভয়ে যদি সমঞ্জসভাবে ক্রিয়া না করে, তাহা হইলে কি বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে?

গুরুশিষ্যের সম্পর্কটাও এমনি। শুধু আমি ছাড়া আর কাহাকেও যদি না মানি, তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হয়, গুরু আমার বহিরঙ্গ। ইহা খুবই স্থূলদৃষ্টি। কিন্তু শিষ্য মাত্রেরই প্রথম অবস্থায় এই দৃষ্টি থাকে বলিয়া ইহাকে আমরা অনাদর করিতে পারি না। তখন আত্মাভিমানকে জাগ্রৎ করিয়াই সাধনা করিতে হয়। তখন গুরুকে কেবল মাত্র সহায়ক বলিয়া মনে হয়—উভয়ের মাঝে একাত্মানুভূতির কোনও স্পন্দনই শিষ্যের হৃদয়ে তখন জাগে না। এই অবস্থায় গুরুকে মানাইবার জন্য শাস্ত্রের অনুশাসন প্রয়োজন হয়; গুরুকে অবজ্ঞা করিবার বুদ্ধিটাও এই সময় জাগিতে পারে। কিন্তু তখনও বিচার করিতে হইবে, যাঁহাকে আমার বহিরঙ্গ বলিতেছি, তিনি যে আমার অন্তরোন্মেষেরই সূচক। কথাটা এই;—আমি যখন নিতান্ত জড়বুদ্ধি, তখন বাহিরটা আমার কাছে জড়ের আকারেই ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু আমার ভিতরে যতই চেতনার স্ফুরণ হইবে, ততই বাহিরেও তাহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাইব। সূর্য্যাস্ত দেখিয়া, নীলাকাশ দেখিয়া কবির কাব্য ফোটে—চাষা তাহা খেয়ালেই আনে না। তেমনি জড় বুদ্ধিতে গুরু জড় হইয়াই দেখা দেন, কিন্তু অন্তরোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জড় মূর্ত্তিও চৈতন্যময় হইয়া উঠে, শিষ্যের একাত্মবোধ স্ফুরিত হইয়া গুরুর স্বারূপ্য লাভের সূচনা হয়।

জড় হইতে ক্রমে চৈতন্যের স্ফুরণ—ইহা সাধারণ মনোবিকাশের ধারা। কিন্তু তীর্থরামের জীবন যে সাধারণ হইতে পৃথক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার চৈতন্যদর্শনশক্তি অসামান্যভাবে স্ফুরিত হইয়াছিল এবং এই স্ফুরণের সূচনা যে বাল্যকাল হইতেই—তাহা প্রমাণ করিবার জন্যও বেগ পাইতে হয় না। এমন নির্ম্মল ও শক্তিসম্পন্ন আধার পাইয়াও যে তিনি স্বতঃস্ফুরণের স্পর্দ্ধায় আচার্য্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নাই, বরং নিতান্ত মমতাপূর্ণ প্রপন্নভাব লইয়াই আচার্য্যের পায়ে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়াছিলেন, গুরুর প্রয়োজনীয়তার ইহাই তো উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

এই প্রপন্নভাবের যে কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। বলিয়াছি, অভিমানই আমাদের স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখে; অভিমান নিরস্ত হইলে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় স্বরূপ আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। অন্ততঃ অভিমান নিরসনের জন্যও প্রপন্ন ভাবের প্রয়োজন—অতি বিশুদ্ধ অধিকারীর পক্ষেও উহা প্রয়োজন। কেননা, আধার যতই শুদ্ধ হউক না কেন, স্থূলের সংস্পর্শ ঘটিলেই কিছু না কিছু বিকার তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য এবং এই বিকারটুকু দূর করিবার জন্য প্রপন্নভাবের প্রয়োজন সকলেরই হয়। অবতারকল্প মহাপুরুষদের জীবনেও ইহা দেখা গিয়াছে।

গুরুশিষ্যের সম্পর্কে বস্তুশক্তির কথাটা উঠিতে পারে। অর্থাৎ এমন হইতে পারে, গুরু যেখানে শিষ্যের "বলে হরে মন", সেখানে গুরুর শক্তিতে শিষ্যের মাথা আপনা হইতেই তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িতেছে। সাধারণতঃ আমরা ইহাকেই গুরুত্বের নিদর্শন বলিয়া ধরিয়া নিই এবং যেখানে ইহার অভাব দেখি, সেখানে

গুরুত্বেও সন্দেহ করিয়া থাকি। সম্ভবতঃ ধন্নামলের সহিত তীর্থরামের সম্পর্ক বিচারে পূরণ সিং ধন্নামলের বস্তুগত শক্তির অভাবটাই বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী কালে তীর্থরামের জীবনের আদর্শ ও গতি যেরূপ অভাবনীয়ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তাঁহার জীবনে নিরপেক্ষ ভাবটাই যেরূপ সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে এরূপ সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এখানেও আমরা বলি, কে কাহার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইবার শক্তি রাখে কি না রাখে, তাহার বিচার যাহারা পক্ষ্য, তাহারাই করিতে পারে—বাহির হইতে আমরা তাহার কি দিশা পাইব? তীর্থরাম যতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ধন্নামল ততটা করেন নাই; ধন্নামলের শক্তিহীনতার আশঙ্কা কি এই জন্যই হয়? শক্তির রূপ কি বাহির হইতেই বোঝা যায়? তীর্থরামের প্রতি আমরা একটা আকর্ষণ অনুভব করি, ধন্নামলের প্রতি তাহা করি না। কিন্তু তা বলিয়া তীর্থরাম তাঁহার প্রতি যে আকর্ষণ অনুভব করিতেন, তাহার কি কোনও বাস্তবতাই নাই? সবই কি তীর্থরামের বালকসুলভ হৃদয়াবেগ মাত্র? তা ছাড়া আর একটা কথা। আকর্ষণ যেই করুক না কেন, মূলে রসের জোগানদার তো একজনই; সমস্ত গুরুর ভিতর দিয়া এক জগদ্গুরুই আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। আধেয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে আধারের ন্যূনতার কথা মনেই আসে না। অথচ আধারের যে কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, ইহাও সাব্যস্ত হয় না।

মোট কথা, আমরা এইটুকু বলিতে চাই যে, যে কোন আকারেই হউক, আচার্য্যশক্তির ক্রিয়া তীর্থরামের জীবনে হইয়াছিল; তাহার চেয়ে বড় কথা, তিনি স্বয়ং প্রপন্ন হইয়া এই শক্তিকে আবাহন করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্যে বস্তুশক্তির সদ্ভাব কিম্বা অসদ্ভাব তাঁহার অনুভূতিতেই প্রমাণিত হইবে, বাহির হইতে আমাদের মুরুব্বিয়ানা মূর্খতামাত্র।

তীর্থরামের আচার্য্যের প্রতি প্রপন্নভাব লইয়া এতগুলি কথা বলার তাৎপর্য্য আছে। পরবর্ত্তী জীবনে তীর্থরাম বেদান্তের বলপ্রদ আদর্শই জগতে প্রচার করিয়াছেন; তাঁহার উক্তিসমূহ যুবকহৃদয়কে আত্মশক্তির স্ফুরণে উদ্বুদ্ধ করে, সমস্ত সংস্কার বর্জ্জন করিয়া স্বারাজ্যসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে প্রোৎসাহিত করে। এইসমস্ত উৎসাহবাক্য যুবকহৃদয়ে যে স্বাতন্ত্র্যের ভাব জাগাইয়া তুলিবে, তাহা যদি নিরাধার হয়, তাহা হইলে অধ্যাত্মজীবনেও উচ্ছৃঙ্খলতা ও হঠকারিতা প্রবেশ করিয়া জীবন পণ্ড করিয়া দিবে। এইজন্য এই স্বাতন্ত্র্য-মন্ত্রের ঋষির হৃদয়টীও যে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণে কত মধুর ছিল, তাহা তাঁহার উক্তি হইতেই আমরা দেখাইতে চাই। দ্বিতীয়তঃ রামতীর্থের জীবনে জ্ঞান ও প্রেমের মধুর সম্মিলন ঘটিয়াছিল। তাঁহার সাধন জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহার পরিচয় পাইব। তাঁহার প্রপন্ন ভাব যে তাঁহার প্রেমিকজীবনের ভূমিকাস্বরূপ, ইহা পূর্ব্বাহ্নে না জানিতে পারিলে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের যথার্থ তাৎপর্য্য আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না। তৃতীয়তঃ, এই প্রপন্ন ভাব ছাত্রজীবনের—বিশেষতঃ ঋষিযুগের ছাত্রজীবনের ভিত্তি। তীর্থরামের ছাত্রজীবনের মত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ ছাত্র-জীবন—বিশেষতঃ

সমাজের জীবনাদর্শ মহাপুরুষের ছাত্রজীবন পূর্ণাঙ্গভাবে আর কোথাও চিত্রিত দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যও তাঁহার প্রাপন্ন ভাব লইয়া একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

কোনও একটা সম্প্রদায় বা মতবাদের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যকে বিকৃত করা কিম্বা ঘটনা সমূহে কল্পিত তাৎপর্য্য আরোপণ করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। স্বামী রামতীর্থের সাধনজীবনে যদি কোনও অভিনব বিশেষত্ব থাকে, তবে শ্রদ্ধাসহকারে এবং নির্ভীকচিত্তে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে প্রচলিত সাধনার ধারা ক্ষুণ্ণ হইবে ভাবিয়া সত্য গোপন করিলে চলিবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে অভিনব সত্য প্রচার করিবার লোভে আমরা সত্যের সনাতন রূপকে বিকৃত করিয়া অপরাধী না হই। স্বামী রামতীর্থের চরিতালোচনায় এই আদর্শটী সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

বিরহে

আজি, সুখের আভাসে চিত্ত উঠে ফুকারিয়া।—
মিথ্যা ছলে ভুলাইয়া গেলে কি ছাড়িয়া,
প্রিয় মোর! দাও, দাও যত দুঃখভার
আছে বন্ধু, বক্ষে তব। অধর সুধার
পিয়াসী ভৃঙ্গেরে দাও তীব্র হলাহল—
হৃদয়ের রক্ত আজি হোক্ অশ্রুজল।
জানি বন্ধু অপমান করিয়াছি তব,
প্রেমেরে দিয়েছি ব্যথা নিত্য নব নব।
উচ্ছৃঙ্খল সুখালসে, করি উপহাস
বেদনাকরুণ চক্ষে অশ্রুর আভাস—
মত্ত অট্টহাস্যে নিত্য তুলেছি ফেনায়ে
হৃদয়ের উপকূল। এসেছে ঘনায়ে
যে বেদনা, বন্ধু, তব নিরুদ্ধ অন্তরে,
তার দিকে চাহি নাই একদিন তরে।
এই অপমান—এই নিত্য অবহেলা
তোমার প্রেমের পরে, এই ছেলেখেলা

নিয়ে তব অন্তরের গোপন সঞ্চয়
কত সহিয়াছ; "বুঝি হয়নি সময়—
তাই যত চঞ্চলতা শিশুর মতন;
স্নেহের ব্যাকুল বাণী, ব্যগ্র আলিঙ্গন
উপেক্ষিয়া তাই আজি হেসে চলে যায়;—
ছন্নছাড়া পাগলেরে কিসের মায়ায়
ভুলাইব আজি!"—এই তব ব্যাকুলতা—,
উথলি বুকের কাছে হরিয়াছে কথা—
চেয়ে আছ অনিমেষ সজল নয়নে।
এলাইয়া অঙ্গ আজি আলস শয়নে
ভাবিতেছি মুখ তব বেদনা-বিধুর—
কাছে থেকে তবু যেন আছ কতদূর!

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী

[শব্দপ্রমাণ—বেদের অপৌরুষেয়তা]

[বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের জ্ঞানের আকর ও জ্ঞান সঞ্চয়ের ধারা উভয়ই বিশুদ্ধ থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের জীবনে আপ্তশ্রুতির স্থান বড় কম নয়। প্রত্যক্ষ আর অনুমান দিয়া কতটুকুই বা জানিতে পারি? উভয়স্থলেই করণ এবং ক্ষেত্র নিতান্ত সঙ্কীর্ণ—এই জন্য জীবনের অধিকাংশ কাজে আমাদিগকে আপ্তশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। আপ্তশ্রুতিরও প্রামাণ্যের স্তরভেদ আছে—বিষয়, প্রবক্তা ও শ্রোতা হিসাবে সে ভেদ নিরূপিত হইয়া থাকে। চরম প্রামাণিক আপ্তশ্রুতিই হইল বেদ। ইহাকে অপৌরুষেয় বলিলে জ্ঞানকে লৌকিক জগৎ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত জগতে লইয়া যাওয়া হয়। অপৌরুষেয় বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, বেদ কোনও মানুষের রচা কথা নয়—উহা ব্রহ্মবাণী। কিন্তু অপৌরুষেয়বাদের আর একটা দিকও থাকিতে পারে। যেমন নাকি বেদবাক্যজনিত প্রমাকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য উহাকে প্রযোক্তৃ দোষ হইতে নির্মুক্ত রাখিবার চেষ্টায় অপৌরুষেয় বলা হইতেছে, তেমনি শ্রোতৃদোষ হইতে বাঁচাইবার জন্যও উহাকে অপৌরুষেয়

বলা উচিত। অর্থাৎ অপৌরুষেয় বলিতে শুধু পুরুষরচিত নয়—এমন কথাই বলিব না।—সঙ্গে সঙ্গে বলিব—বেদ পুরুষদ্বারা শ্রুতও নয়, পৌরুষেয় বুদ্ধিদ্বারা গৃহীত হইলে তাহার প্রমাত্ব ব্যাহত হইবার সমধিক আশঙ্কা আছে। সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় উভয়তঃ।

[ঠিক এই ভাবে গ্রহণ না করিলে অপৌরুষেয় বাণীর প্রামাণ্য অব্যাহত থাকিতে পারে না। মানিলাম, পুরুষদ্বারা রচিত নয় বলিয়া একটা কথা ভ্রমপ্রমাদাদি শূন্য; কিন্তু এ কথাটার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবে তো আর একজন পুরুষ। সে যদি তাহার সংস্কারানুযায়ী বেদবাক্যকে গ্রহণ করিয়া তাহার বিকৃত অর্থ কল্পনা করে। যেখানে বিষয় ও বিষয়ী এই দুইটা কোটা আশ্রয় করিয়া প্রামাণ্য নিরূপণ করিতে হয়, সেখানে শুধু এক পক্ষকে যাচাই করিলেই তো প্রামাণ্যের শুদ্ধি হইবে না। প্রমাতারও অন্তঃশুদ্ধি চাই, নতুবা আপ্তশ্রুতি প্রামাণিক হইবে না—এই কথাটা স্বীকার না করিলে অপৌরুষেয়বাদ পঙ্গু থাকিয়া যাইবে। বুঝিতে হইবে, আপ্তবাক্যের অপৌরুষেয়ত্ব উভয়তঃ

[কথা হইতে পারে, তাহা হইলে "শ্রুতি" কথাটা ব্যর্থ হইয়া যায়। এরূপ বিচার করিলে প্রত্যক্ষের যে লক্ষণ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাহাতেও দোষারোপ করা যাইতে পারে। যাহা চরম প্রত্যক্ষ, তাহা ইন্দ্রিয়াদি সংস্পর্শ শূন্য ও বিষয় বিষয়ী ভেদ বর্জ্জিত। সেই চরম প্রত্যক্ষই বিশিষ্ট হইতে হইতে অবশেষে আমাদের এই লৌকিক প্রত্যক্ষে পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং তখন তাহাতে অঙ্গভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। এই কথা আপ্তশ্রুতি সম্বন্ধেও খাটে। চরমে উহা নিরপেক্ষ, কিন্তু তা বলিয়া লৌকিক ব্যবস্থাতে উহার সাপেক্ষত্ব তো কেহ বারণ করিতেছে না। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে প্রামাণ্য স্বীকার করিব কাহার? উত্তরে বলি, প্রামাণ্য উভয়েরই স্বীকার করিব। প্রকৃতির পরিণাম যদি সাংখ্যসম্মত সত্য হয়, তাহা হইলে প্রামাণ্যের ক্রমিক তাত্ত্বিকতা স্বীকার করা তো কোনও অসঙ্গত ব্যাপার নয়।

[প্রত্যক্ষ এবং আপ্তশ্রুতি—এই উভয়েই যদি চরমে নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ভেদ কোথায় হইল, ইহা একটা প্রশ্ন হইতে পারে। ভেদ হইবে আদিতে—জ্ঞানের স্বতঃ ও পরতঃ স্ফুরণে। স্ব, পর দুইটা বিভেদ আছে, ইহা আমরা সকল কথার গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লই। এই স্বাভাবিক দ্বৈতবুদ্ধি হইতেই প্রমাণের দুইটা ধারা নিঃসৃত হইয়াছে। চরমে আত্মপর ভেদ ঘুচিয়া গিয়া উভয়ে এক হইবে বটে, কিন্তু অধিকারভেদে গোড়াতে এই ভেদটুকু থাকা খুবই সঙ্গত।

[প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তশ্রুতির সহিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের সম্পর্ক কি, তাহা বিচার করিলে কথাটা আরও সুস্পষ্ট হইবে। প্রমাণ তিনটী যে ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বুঝি, প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, অনুমান তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং আপ্তশ্রুতি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। লৌকিক বিচারে কথাটা মিথ্যা নয়; এবং এই লৌকিক বিচার আশ্রয় করিয়া সাধনজগতের প্রমাণস্বরূপ শ্রবণাদির মূল্য নিরূপণ করিতে গেলে স্বতঃই মনে হইবে, শ্রবণ সাধনের প্রথম অঙ্গ, কেননা আপ্ত-

শ্রুতিরূপ নিকৃষ্ট প্রমাণের উপর তাহার ভিত্তি। শোনা কথায় প্রত্যয় বড় দৃঢ় হয় না— কাজেই অল্পাধিকারীর পক্ষে শোনা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। এই শোনা কথাকেই মনন সাধনে অনুমান দ্বারা দৃঢ় করি এবং পরিশেষে নিদিধ্যাসনের সহায়ে প্রত্যক্ষ করি। আমাদের জ্ঞানাধিকারের পরিক্রমা তখনই সমাপ্ত হইয়া থাকে।

[লৌকিক দৃষ্টিতে কথাটা এইরূপ মনে হইতে পারে বটে—বিশেষতঃ যখন প্রমেয়ের দিক হইতে আমরা বিচার করি। কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে—যেখানে প্রমাতার দিক হইতে বিচার করা ছাড়া বিচারের আর কোনও ধরণ পাওয়া যায় না, সেখানে কিন্তু ঠিক বিপরীত কথাটাই সত্য। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের সঙ্গে সেখানে শ্রবণের এবং আপ্তশ্রুতির সহিত নিদিধ্যাসনেরই সম্পর্ক—স্ফুটতর। শ্রবণমাত্রে প্রত্যক্ষ হওয়া সেখানে উত্তমাধিকারীর লক্ষণ এবং নিদিধ্যাসনদ্বারা আপ্তশ্রুতির যাথার্থ্য নিরূপণ করা অধমাধিকারীর লক্ষণ। মনন মধ্যাবস্থা, উহা উভয়ের মাঝে সেতুস্বরূপ এবং মধ্যমাধিকারীর পক্ষেই উহা প্রশস্ত। ফল কথা—শ্রবণজাত প্রত্যক্ষ, ও আপ্তবচনের নিদিধ্যাসনজনিত প্রত্যয়—উভয়ই চরমে এক। আদিতে কেবল উহা প্রমাতার অধিকার লইয়া বিভিন্ন হইয়াছে।

[আপ্তশ্রুতিকে যদি আমরা এইভাবে প্রমেয় ও প্রমাতার দিক হইতে বিচার করি, এবং অপৌরুষেয়বাদকে সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করি, তাহা হইলে বেদ সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। বাস্তবিক আজকাল আমরা বেদ বলিতে যাহা বুঝি, তাহা আমাদের সংস্কারান্ধতার ফল ভিন্ন কিছুই নহে। বেদ বলিতে গুরুমুখ বুঝিব—ইহাই বেদের প্রকৃত লক্ষণ। "গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।"—আচার্য্য শঙ্করের এই উক্তি বেদরহস্য-পরিজ্ঞানের অমোঘ সঙ্কেত। আদিগুরু ভগবান্ হইতে আচার্য্যপরম্পরায় যাহা নামিয়া আসিয়াছে—তাহাই অপৌরুষেয় বেদ। আমরা এখানে এই তত্ত্বের দিগ্‌দর্শন মাত্র করিয়া রাখিলাম।

[ইহার পর আচার্য্য বেদজ্ঞানবিকাশের কি ধারা, তাহাই বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—

আদিবিদ্বান্ কপিলদেব। তিনি পূর্ব্বকল্পে যে শ্রুতি অধিগত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কল্পের আদিতে তাহা স্মরণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। যেমন ঘুম হইতে জাগিলে পরের দিনেও পূর্ব্বদিনের অধিগত বিষয়ের স্মৃতি হইয়া থাকে। আবট্য ও জৈগীষব্য ঋষির কথোপকথনে জানা যায়, ভগবান্ জৈগীষব্য দশমহাকল্পব্যাপী নিজের জন্মকথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, "দশসু মহাকল্পেষু বিপরিবর্ত্তমানেন ময়া" ইত্যাদি।

[সংক্ষেপতঃ এখানে তত্ত্ব এই—এক একটী কল্প যেন সৃষ্টিচক্রের এক একটী আবর্ত্তন। শ্রুতিতে আছে, "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পানুযায়ী একই ধারা ধরিয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। যে জ্ঞানধারা দ্বারা এক এক কল্পের সৃষ্টি সঞ্জীবিত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তাহা সেই কল্পের আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়ে স্বতঃই স্ফুরিত হইয়া থাকে—যেমন শিল্পীর হৃদয়ে শিল্পের পরিকল্পনা ফুটিয়া উঠে। যে কোনও সৃষ্টি সম্বন্ধেই এই কথা

ঘাটে। কল্পের আবর্ত্তন আমাদের জীবনেও হইতেছে এবং প্রতিকল্পের মুখেই নিত্য বেদজ্ঞানের স্ফুরণ হইতেছে। ভগবান্ কপিল দেব সাংখ্যজ্ঞানের গুরু। প্রতি কল্পারম্ভেই এই জ্ঞান গুরুমুখে ব্যক্ত হইয়া শিষ্যপরম্পরায় প্রবহমান হইয়া চলিয়াছে। প্রতি কল্পে একই ধারার পুনঃপ্রবর্ত্তন অযৌক্তিক নহে। স্থানাভাবে আমরা তাহার বিস্তৃত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিলাম না—প্রমাণ ও প্রমাতার বৈশিষ্ট্যের উপর প্রমেয়ের প্রকার নির্ভর করে, অভিজ্ঞ পাঠক এই সূত্র ধরিয়া তাহার বিচার করিয়া বুঝিয়া লইবেন]

[ইহার পর সাম্প্রদায়িক ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আচার্য্য বলিতেছেন—

“আপ্ত” এই কথাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু, জৈন সংসারমোচক প্রভৃতি সম্প্রদায়ে প্রচলিত যে সমস্ত আগমাভাস রহিয়াছে, তাহাদের প্রামাণ্য নিরাকৃত হইল। কেননা এই সমস্ত বচন অযুক্ত। অযুক্ত বলি এই জন্য যে, শিষ্ট সমাজে ইহারা নিন্দিত, ইহাদের কোনও মৌলিক প্রামাণ্য নাই, প্রমাণবিরুদ্ধ বিষয়ের উপন্যাস ইহাদের মাঝে আছে এবং পশুতুল্য ম্লেচ্ছাদি পুরুষাধমেরাই এই সমস্ত বচন মানিয়া চলে।

[কথাগুলি সাম্প্রদায়িক ভাবদ্বারা কলুষিত—সুতরাং ইহাদের বিচার বা বিবৃতি নিষ্প্রয়োজন। আপ্তশ্রুতিকে এইরূপ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ভিতর পুরিয়া রাখায় সত্যেরই অমর্য্যাদা।] (ক্রমশঃ)

আরণ্যক

—✻—

“যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥”

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৯।৩

নির্ব্বাণ অর্থে নিভে যাওয়া নয়। আত্মার দূর-গমনও নয়। যে আত্মা অজর অমর এবং অবিনাশী, তাহার ক্ষয় কল্পনাতীত। আমাদের আত্মা জরামরণহীন অচিন্ত্য পদার্থ; জড়-জগতের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠতা হেতু আত্মার স্বরূপাবস্থিতি হইতে বহির্জ্জগতের সঙ্গে যে মিথ্যা বন্ধন রচিত হইয়াছে, সেই বন্ধন মোচন এবং আত্মার স্ব-স্বরূপাবস্থিতির সম্পূর্ণ অনুভূতিই নির্ব্বাণ বা মুক্তি। দেহাবস্থিতিতে সাধকের এই অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী।

✻

তোমার মহান উদার হৃদয়টীকে সীমার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ না রেখে অনন্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করে দাও; তোমার মানসদূত তোমার পারিবারিক সম্বন্ধের মোহময় ঘনিষ্ঠতা উপেক্ষা করে এই অনন্তকোটী সৌরমণ্ডলের এক একটী সৌর সীমায় প্রকৃতির সুসংযত বিপুল নিস্তব্ধ স্বাধীনতা অন্বেষণ করে বেড়াক্; পার্থিব সুখ দুঃখের কঠোর কশাঘাতে তোমার মনকে এতদিনে যতটুকু সঙ্কুচিত করে তুলেছিলে, বিশ্বপ্রকৃতির এই গভীর স্পন্দনলীলার মাঝে জীবনের শুভ মুহূর্ত্তে তুমি যে

একটী মহৎ উদার ভাব উপলব্ধি করলে, তারই প্রসারে অসংকোচে জীবনের পথে নূতন করে যাত্রা আরম্ভ কর; তোমার হৃদয় বিশ্বপ্রেমের নূতন পরশে আরও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্‌বে, পথের অন্ধকার আলোক-রেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে।

*

কোন বিষয়ে নিজে পরিপক্ক অবস্থা লাভ করবার আগে সে বিষয়ে অপরকে উপদেশ দিয়ে পরে সাধন করতে গেলে উপদেশের ক্ষুদ্র অহঙ্কারে সে সাধনস্পৃহা শীঘ্রই অলক্ষ্যে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তুমি জীবনে যে সকল সদ্‌বৃত্তির অনুভাবনা করবে বলে মনে করেছ, অথবা যে সকল সদ্‌বৃত্তি এখনও তোমার জীবনে নিগূঢ় সত্যের আলোক প্রদান করেনি, সে সব বিষয়ে তুমি নির্ব্বাক হও। তোমার জীবনের গভীরতম প্রয়োজনরূপে আগে তাদের সার্থকতা অনুভব কর এবং তার একান্ত সাধনে সিদ্ধ হও; তখন দেখবে, তোমার সেই সঞ্চিত শক্তির একটী মাত্র ইঙ্গিত যার জীবনের উপর অর্পিত হচ্ছে, সে-ই এক অজ্ঞাত আকর্ষণে কল্যাণের পথে ছুটে যাচ্ছে। তোমার সত্যোপলব্ধির প্রত্যেকটী বাণী পরশমণির মত জগতের মর্ম্ম স্পর্শ করে তাকে উজ্জ্বল করে তুলছে; সত্যের পূর্ণ গৌরব তখনই তুমি উপলব্ধি করবে।

*

জগৎ যেন এমনি বিসদৃশ হয়েই আমার সামনে রয়েছে; কিন্তু যে মূলনীতি অনুযায়ী এটা এমনিভাবে রয়েছে, সে মূল সূত্রটী যেদিন আয়ত্ত হবে, সেদিন আর এর মাঝে অসামঞ্জস্য কিছু দেখব না;—প্রত্যেকটী বস্তুর মাঝেই তাঁর রূপ দেখ্‌ব। তখন আমার এই অসমঞ্জস দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হয়ে জগৎ মধুময় হয়ে উঠবে।

*

নিজের ভার নিজে নিয়েই যত গোল-যোগের সৃষ্টি করেছি। নিজের সুখ-সোয়াস্তির ব্যবস্থা নিজেই করতে চাইছি, তাই ভুল-ভ্রান্তি—আর ফলে লাভ মর্ম্মন্তুদ অস্বস্তি অশান্তি।

*

আত্মসমর্পণ আর স্বার্থ সংরক্ষণ দুইটী বিপরীত ধর্ম্ম। ওদের পরস্পর সম্বন্ধ কেমন?—যেমন আলোক আর অন্ধকার। "যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম; যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম।"

*

আত্মসমর্পণ, আত্মত্যাগই নাকি তোমার মূল মন্ত্র, তোমার জীবনের সাধন—তবে আবার এ ছেলেখেলা কেন? একবার দিচ্ছ, আবার ফিরে নিচ্ছ। অর্পণসিদ্ধি সেই মুহূর্ত্তে হবে, যখন তোমার সত্ত্ব চির তরে বিসর্জ্জন দিতে পারবে। সত্ত্বত্যাগেই দান সিদ্ধি। দিই দিই করছো, দিতে পারছো না—কখনো দিয়েও ফেলছো কিন্তু পারছো না,—আবার ফিরিয়েও নিচ্ছো। "আমার" "আমার" ছাপটা বড় জোরে মেরেছো কি না, তাই মুছতে পারছো না। "আমার" "আমার" ছাপটা মুছে ফেল। অহংকারের কালিমা উঠিয়ে ফেল। সব তাঁর কর—সব ভার তাঁর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। তোমার সব বালাই ঘুচে মুছে যাক।

*

সেবার অধিকারলাভে যদি কৃতকৃতার্থতা জ্ঞান না হলো, তা হলে তো সব পণ্ড হলো—সবই বৃথায় গেল। ধন্য আমি, কৃতকৃত্য

আমি—যে আমি এতটুকু সেবার অধিকার পেয়েছি; সেবক নাম পেয়েও ধন্য হয়েছি। এ শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি—সবই ধন্য, সবই পুণ্য, যদি এদের দিয়ে কোনও রকমে আমার সেবক নামের সার্থকতা অর্জিত হয়—এদের যদি কোনও রকমে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করে আপ্যায়িত হতে পারি।

*

তাঁকে তেমন করে চাই নাই, তাই পাই নাই। তাঁর অভাবে তো তেমন পীড়ন করছে না—তবে আর কান্না আসবে কেন? তাই আঘাত এসে তাঁকে স্মরণের সুযোগ ঘটিয়ে দেয়। সে আঘাতের বেদনায় ছুটাছুটি করে যখন সব রকমে হতাশায় প্রাণ আইঢাই করে ওঠে, তখনই তাঁর কথার মনে পড়ে। এখানেই যথার্থ ভালবাসার পরখ হয়। একটুখানি ডেকে পেলাম না বলেই তাঁকে ছেড়ে দিয়ে যখন আমায় নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ি, তখন তো তাঁর তোয়াক্কা রাখি না। কিন্তু আমি খোঁজ না রাখলেও যিনি দরদী, তিনি ত আমায় ভুলে থাকতে পারেন না—তাই বজ্র হয়ে এসে কাছে দাঁড়ান। সে বজ্র দেখে ভয়ে যখন প্রাণ কেঁদে ওঠে; আর আশ্রয় না পেয়ে আকুল হয়ে উঠি; তখন দেখি, সে রূপ আর নাই;—আমার প্রাণের অন্তস্তলে যে মণিটীকে ভুলে ছিলাম, ভয়াবহ আভার পরিবর্তে চতুর্দ্দিকে এ যে তাঁরি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্মণ্ডল! আর তার মাঝে দয়াল আমার বরাভয় হস্তে দাঁড়িয়ে।

*

তাঁর রূপ চিনবার যো নাই, বজ্ররূপেও আছেন, আবার কমল হয়েও রয়েছেন। প্রাণ দুর্ব্বল, তাই বজ্রকে ভয় করে—কমলকে ভাল লাগে। প্রাণের মাঝে নিভৃতে যিনি রয়েছেন, তাঁকে এই দুয়ের মধ্যেই যেদিন সমান দেখতে পাব, সে দিন তাঁকে ঠিক চিনব।

*

কোথায় কোন সুদূরে তিনি আছেন বলে মনে করে যেন হতাশ হয়েই বসে ছিলাম, তাঁকে চাচ্ছিলাম। যত দিন যাচ্ছে, ততই দেখছি নিত্যনৈমিত্তিক ঘরকন্নার মাঝেই নেমে আসতে হচ্ছে। তিনি কোথায় কোনও সুদূরে ত নন—এই রোজদিনকার চলাফেরার মাঝেও যে তিনি রয়েছেন। দূরের দিকে তাকাই কেন? যিনি নির্ব্বিশেষ—দূর নিকট যে তাঁর মাঝে। তবে কেন নিকটে তাঁকে পাব না? এখন তাহলে নূতন কি করা উচিত?—নূতন কিছুই করতে হবে না, শুধু ভাব—চির পুরাতনের সুর বদলে যাবে।

*

যে অন্তরে তাঁকে পেয়েছে সে সর্ব্বত্রই তাঁকে পাবে। ধড়চূড়া-মোহনবাঁশরীধরা তাঁকে দেখব—আগে যদি অন্তরে তাঁকে পাই। সেই জন্য রূপে অরূপে সকল দিকেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের উপায় হল ধ্যান। অর্থাৎ মূলে অন্তরের সাধনা—আত্মসমর্পণ। আর দেহে মনে সামঞ্জস্য রক্ষা করবার জন্য বাইরের সংযম। সংযমে ইন্দ্রিয় অন্তরাবৃত্ত হলে মনকে সহজেই ধ্যাননিরত রাখা যায়।

*

আর সমস্ত মিথ্যা হয়ে যাক্ বা অগ্রাহ্য হয়ে যাক্—নিত্যনূতন চলার মাঝ দিয়ে তাঁকে অনুভব করবার যে চেষ্টা করছি, এইটুকুই সত্য। না হয় আমার চলার মাঝে কোথাও একটু ভুল, কোথাও একটু অসামঞ্জস্য এসে

পড়ল, সে তো মিথ্যা ; আমি তাকে বুঝ্‌বা-মাত্র যে সে পালাবার জন্য অধীর হয়ে উঠবে। নিজের দোষ নিজে বুঝতে পারলেই সে ক্ষীণ হতে থাকে। মাঝে মাঝে আবার যখন ঐ বুঝবার শক্তিটুকুর উপর মেঘ এসে পড়ে, তখনি সেই দোষটী আবার এসে দেখা দেয়। আবার বুঝ, সে চলে যাবে। বার বার বুঝতে বুঝতে বুঝবার শক্তি স্থায়ী হয়ে যাবে।

*

শক্তি চাই, মানে শক্তিকে বুঝতে চাই। শক্তি তো আমাছাড়া নয়—শক্তিই যে আমার প্রাণ। শক্তি আমার ভিতরেই রয়েছে—শুধু তাকে অনুভব করা। অনুভূতিলাভ করতে হলেই মননশীল হতে হবে ; মননে শান্তিলাভ করতে হলেই দেহ লঘু অর্থাৎ সত্ত্বশুদ্ধ হওয়া চাই। অন্তরে আর বাহিরে একটা আনন্দপূর্ণ যোগ বা সামঞ্জস্য আছে ; সেই সামঞ্জস্য অনুভূত হলেই শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শক্তির সঙ্গে ভাবের মিলন ঘটলে তবেই তা সার্থক। আমি যা চাই এবং যা দিয়ে তা পেতে চাই, দুইটীকেই যখন আনন্দের সঙ্গে স্পষ্ট অনুভব করতে পারব—দৈহিক বা মানসিক কোন বিকারে যখন সে অনুভূতিকে আবৃত করতে পারবে না, তখনি বুঝ্‌তে হবে, এইবার পথের সন্ধান মিলেছে

*

ওই আমার পথ—কেননা ওটী একটী সত্য জিনিষ, আমি স্বচ্ছন্দে তার উপর নির্ভর করতে পারি। আমার কোন বিকারেই যাঁর বিকার দেখ্‌ছি না, অথচ যাঁর কথা মনে হতেই সমস্ত বিকারের চেয়েও মহৎ জিনিষের আভাসে প্রাণ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ছে, দেহে অনাসক্তি আস্‌ছে, মন শান্তিপূর্ণ বোধ হচ্ছে—তিনিই তো সত্যস্বরূপ, প্রেমময়। তাঁর কথা যত মনে হচ্ছে, ততই যে জগৎ মধুময় হয়ে উঠ্‌ছে। একমাত্র তাঁর কৃপাই আমার পথের আলো।

*

এক এক সময় দেখ্‌ছি—সব সুখ দুঃখ তুচ্ছ হয়ে আস্‌ছে, সবার প্রতি একটা নিরপেক্ষ ভাব আস্‌ছে—আমি যেন তখন অনেকেরই আশ্রয়। ক্ষণিক একটু অনুভূতি-তেই জগতে আমার স্থান যখন এত উচ্চ হয়ে যায়—যিনি সমগ্র বিশ্বের আশ্রয়, তাঁর ভিতর সে অনুভূতি না জানি কত সুন্দর, কত মহৎ। এমনিতর একটা অব্যক্ত বস্তুর আভাসেই প্রাণে কত জোর পাই। এ থেকে মনে হয়, ঐ অব্যক্ত বস্তু ভাবময়, আনন্দঘনবিগ্রহ ; তাঁর চির প্রশান্ত বক্ষে শক্তির তরঙ্গ উঠ্‌ছে আর দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে। বিক্ষোভে তো বাস্তবিকই আক্ষেপের কিছু নাই—বরং ভাবপূর্ণ হৃদয়ে তা অনুভব করবারই জিনিষ।

*

একদিকে শক্তির বিক্ষেপে চারদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ছি, কর্ম্ম কর্‌ছি ; আর এক-দিকে স্থির হয়ে তা দেখ্‌ছি, প্রশান্তিতে হৃদয় পূর্ণ ও একান্ত নির্ভরসুপ্ত শিশুটীর মত নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে। এই তো আনন্দ—ভাব আর শক্তি, স্থিতি আর গতি যার মাঝে সমঞ্জসভাবে রয়েছে। হৃদয় আনন্দপূর্ণ থাক্‌লে কর্ম্মে আর মননে বিরোধ দেখ্‌তে পাই না। তখন এ-ও যার ও-ও তার। যাঁর জন্য কাজ করি, তাঁর জন্যই ভাবি।

*

ওগো প্রভু! আরো স্পষ্ট হও, আরো সুন্দর হও—তোমায় আমায় আরো নিবিড় মিলন হোক্। এখনও তোমার পূর্ণরূপ

আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না—আমার দৃষ্টি আরো বিকশিত করে দাও। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তুমি আমায় সম্পূর্ণ ধরা দিচ্ছ না। কেন প্রভু—এই কি তোমার লীলার চরম? তুমি কি এর চেয়ে সুন্দর নও? তুমি কি এর চেয়েও মহৎ নও? তোমার সৌন্দর্য্যকে, ভাবময় মাধুর্য্যকে পাওয়ার এই যদি চরম হত, তবে আমার ভিতর এমন অতৃপ্তি কেন? কত শক্তি তো পাচ্ছি, তবু তো প্রাণ ভরছে না; যে অতৃপ্ত মন তোমার কাছে আমায় যেতে বলছে, তাকে শুদ্ধ একটা চরম পরম আশ্রয়ের মাঝে আমি মিলিয়ে যেতে পারছি না তো। এ চাওয়াই যে তোমা হতে আমায় ভিন্ন করছে; চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে বড় কি তুমি নও?

*

সমগ্র জগৎকে পূর্ণরূপে বুঝিলে দেখিব, তাহা কিছুই না; তখন প্রত্যেক কিছু অর্থাৎ সমগ্র জগতই আমার চোখে পরম অর্থপূর্ণ, পরম কিছু—চরম সুন্দর। তাহাকে ইন্দ্রিয় দিয়া পাইলেও সে সুন্দর, না পাইলেও সে সুন্দরই রহিয়াছে। যথার্থ সৌন্দর্য্যজ্ঞান লাভ সত্যান্বেষণেরই মধুময় ফল।

*

প্রকট জগৎকে যদি লাভের কিছু মনে করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া না উঠি, তবে যাহা অপ্রকট রহিয়াছে, তাহার জন্য খেদ করিব কেন? একটা কিছু চাহিলেই চিত্তকে খণ্ডিত করিতে হয়—কিছুই না চাহিলে তো সে বালাই নাই।

প্রভু, তুমি যাহাই দাও, তাহাই আমার। তবে আর দুঃখকে পর বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিব কেন? সুখকে আমার অতি আপন বলিয়া মনে হইবে, ইহা স্বাভাবিক; তাই বলিয়া তার প্রতি অন্ধভাবে আকৃষ্টই বা হইব কেন? প্রাণের ঠাকুরকে আমি জানি, "সুখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা দুঃখেষু বিগতস্পৃহঃ"; তাঁর আমি—আমিও যে তেমনটীই হইব।

*

সঙ্কীর্ণ আবেগের বাধা উদ্বেগ—একে অপরের ভক্ষক। কিন্তু আমার প্রাণ আজ যে আবেগে পূরিয়া উঠিয়াছে, সে আবেগ যে উদ্বেগকে দেখিয়া সঙ্কোচে পিছায় না—সে আনন্দ যে দুঃখকে বুক পাতিয়া সহিবার জন্যই। আমার বাধা জগতে কেহ নাই—অর্থাৎ আমার আনন্দকে ব্যাহত করিবার মত বাধা জগতে নাই। ওঁ আনন্দম্—এই তাঁর স্বরূপ; তুমিও তাঁর—তৎ ত্বম্ অসি!

*

কোন বিশেষকে না চাহিলেই দেখিব, সকল বিশেষই আপনা হইতে কাছে ছুটিয়া আসিতেছে। বিশেষ করিয়া কিছুই চাই নাই তাঁর কাছে—তাই আজ আমার পরম মুক্তি। তিনি যা দিতেছেন, তাই আমার; আবার এখনি কাড়িয়া লইলেও তাহা আমার হইয়াই রহিয়াছে।

*

জগতে যাহা পাইয়াছি, তাহা তো আমারই; যাহা পাই নাই, তাহাও যে আমার। কেননা, আমার দেহটাই তো শুধু আমার নয়—আমার দেহ-মনাতীত যে আমি, সে-ই আজ আমার মনকে এই বলিতেছে, সবি তোমার—যাহা আছে তাহাও, যাহা নাই তাহাও।

আশ্রম সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব ৺পূজার অব্যবহিত পরেই এস্থান হইতে পুরী অভিমুখে যাত্রা করিবেন। পথে কুমিল্লা ময়নামতী আশ্রম, ভাওয়াল সারস্বত-আশ্রম, ও হালিসহর আশ্রমে কিছুদিন অবস্থান করিয়া যাইবার কথা আছে।

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

৮শ বর্ষ } কার্ত্তিক { ৭ম সংখ্যা

গৃহপতিঃ

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।১।১]

—*—



নি দুরোণে অমৃতো মর্ত্ত্যানাং
রাজা সসাদ বিদথানি সাধন্।
ঘৃতপ্রতীক উর্বিয়া ব্যদ্যৌদ্
অগ্নি বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্॥

এতা তে অগ্নে জনিমা সনানি
প্র পূর্ব্যায় নূতনানি বোচম।
মহান্তি বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা
জন্ম জন্মন্নিহিতো জাতবেদাঃ॥

ইমং যজ্ঞং সহসাবন্ ত্বং নো
দেবত্রাবৈহি সুক্রতো ররাণঃ।
প্রযংসি হোতর্ব্বৃহতী রিষো নো-
গ্নে মহি দ্রবিণং মা যজস্ব॥

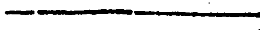
ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ
শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবা-
গ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥

মর্ত্ত্যের দুয়ারে আসি, হে অমৃত, পেতেছ আসন,
নিখিল যজ্ঞের ভার নিতি তার বহ হে রাজন্ !
শুভ্রকায়ে বহুদূর দীপিয়াছ বিদ্যুতের মত,
বিশ্বকাব্যমর্ম্ম তুমি, হে দেবতা, আছ অবগত।

জানি মোরা তুমি অগ্নি, নিত্য সনাতন—
প্রাচীনে নবীন স্তুতি গাঁথি তব করি উচ্চারণ ;—
তব তরে কল্পতরু সোমাহুতি দিয়েছি প্রচুর—
জীবে জীবে গুহাহিত—আলোকিয়া আছ চিত্তপুর !

শক্তিরে রেখেছ মুঠে, কর্ম্ম তব তাই শোভা পায় ;—
আনন্দে মোদের এই যজ্ঞাহুতি বহ দেবতায়।
গৃহপানে আমাদের দেবতারে কর আবাহন—
পূর্ণ পাত্র অন্ন দাও—দাও, দেব, সুবিপুল ধন।

তোমারে আহুতি কত দিনু নিতি, জান তো তা তুমি,
প্রাণ ভরি কাজ করি, ধেনু পালি—দাও হেন ভূমি !
বীর্য্যশালী পুত্র হোক্—করিবে যে কুলের প্রসার,
সুমঙ্গল দৃষ্টিখানি দাও মেলি গৃহে সবাকার।



ত্রিধারা

—*—

পাতঞ্জলে অভ্যাসযোগের কথা আছে। "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ"—লক্ষ্যে অবস্থান করিবার জন্য যে যত্ন, তাহাই অভ্যাস। এই অভ্যাসকে দৃঢ় করিবার জন্য তিনটী গুণ চাই। প্রথমতঃ দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা, দ্বিতীয়তঃ নৈরন্তর্য্য, তৃতীয়তঃ সৎকার। সাধনার যে পথই অবলম্বন করি না কেন, এই তিনটী গুণ থাকা চাই।

একদিনে কিছু হবার নয়। কত যুগ-যুগান্তরের সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, এ কি দুই একদিনের চেষ্টায় ঝাঁটাইয়া ফেলিতে পারি? কিন্তু আমাদের ব্যস্তবাগীশতার সীমা নাই। সমস্ত দিনের মাঝে পাঁচ মিনিটও যদি চিত্ত স্থির করিতে পারিতাম, তবেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু এইটুকু না করিয়াও দুইদিন পরেই আবদার জুড়িয়া দিব, ভগবান কেন দেখা দিলেন না। ভগবান কি অমনি হাতধরা? এই যে একটু কিছু করিতে না করিতেই অসহিষ্ণু হইয়া ফলের জন্য কান্না জুড়িয়া দিই, এর মত অবিশ্বাসীর কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের মাঝেও একটা ন্যায়বুদ্ধি আছে; সারাদিন একটা লোককে খাটাইয়া নিয়া সন্ধ্যাবেলায় তাহার মজুরী মিটাইয়া দিবার সময় ন্যায়বুদ্ধি স্বভাবতঃই সচেতন হইয়া বলিয়া উঠে, সাবধান, ফাঁকি দিও না যেন। ইহার পর কাজ দেখিয়া খুসী হইয়া পাওনার উপর দুই চার গণ্ডা বেশী দেওয়ার কথা তো আছেই। ভগবানের জন্য আমরা যখন খাটি, তখন কি একবার এ কথাও মনে হয় না যে তাঁর ভিতরেও এমনিতর একটা ন্যায়বুদ্ধি থাকা সম্ভব? বরং আমরা ন্যায়ে ফাঁকি চালাইতে পারি, কেননা আমাদের দৃষ্টি অল্প, বুদ্ধি বাঁকা। কিন্তু তাঁহার চোখকে তো ফাঁকি দেওয়ার যো নাই, তাঁর মাঝে তো বৈষম্য নাই। থাকিলে তাঁহার কাছে হাত পাতিতে পারিতাম না—ভগবান মানিতাম না, নাস্তিক হইয়াই থাকিতাম। কিন্তু ভগবান বলিয়া যখন মানিতেছি, তখন তাঁহাকে কৃপণ বলিব কি করিয়া? ঠিক যে যতটুকু কাজ করিবে, ততটুকু ফল সে পাইবেই—এইটুকু বিশ্বাস থাকা চাই।

এইটুকু বিশ্বাস না থাকিতেও পারে, এই এই আশঙ্কা করিয়াই মহাজনেরা বলিতেছেন, কাজ করিয়া যাও, ফলের দিকে তাকাইও না। বাস্তবিক এটা কিন্তু পরমবিশ্বাসীরই কথা। ফলের জন্য আমাদের ব্যগ্রতা এত বেশী যে, না তাকাইয়া পারি না। ফলে চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, লক্ষ্য হারাইয়া যায়—অবিশ্বাসের শাস্তি তখনই পাই।

এই তো ফল সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতার কথা। কাজ করিতেছি, অথচ ফল পাইতেছি না, এমন অভিযোগ যে করে, তাহার সম্বন্ধে এই বিচার। তাহাকে মনে রাখিতে হইবে, ভগবানের হিসাবে কোথায়ও গোল নাই—ঠিক যেমনটী করিতেছি, তেমনটী ফলই পাইতেছি। এই জন্য আপাততঃ বিফলতা দেখিয়াও দমিয়া যাইতে নাই; তখন বুঝিতে হইবে, দোষ আমার কর্ম্মের, ফলদাতার দোষ নয়। এই ভাবিয়া আরও উৎসাহের সহিত

কাজে লাগিতে হইবে। যখন ফলদাতার ন্যায়-বিচারসম্বন্ধে একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাব চিত্তে আসিবে, তখন এই নির্ভরটাই হইবে একটা নূতন শক্তি, নূতন লাভ। এই লাভে চিত্ত প্রসন্ন হইবে, বুঝিতে পারিবে, ভগবানের দান অফুরন্ত। প্রাণে প্রাণে বোঝা চাই; যে যত অনুভব করিবে পারিবে, তার লাভের অঙ্ক ততই বাড়িয়া যাইবে।

তার পর তিনি যে শুধু পাওনাই মিটাইয়া দেন, তা তো নয়—তিনি পাওনার উপরিও দেন। নইলে শুধু দেনা পাওনার সম্পর্ক ধরিয়া তাঁহাকে কি কখনও পাওয়া যাইত? তাঁর জন্য কতটুকু আমরা খাটিতে পারি? কতটুকু খাটিলে তাঁহাকে পাইব, তাহার হিসাব এই পর্য্যন্ত কেহ কসিয়া দিয়াছে কি? এত গণ্ডা প্রাণায়াম, এত হাজার জপ বা এত ঘণ্টা ধ্যান করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, এমন ভরসা কেহ দিতে পারে কি? ভগবান্ কর্ম্মের অধীন নন। তাঁহার উদ্দেশ্যে যা করি, তা-ও কর্ম্ম। সে কর্ম্মেরও এমন সাধ্য নাই যে, তাঁহাকে বাঁধে। ভগবান কর্ম্মফল নন, কর্ম্মফলের দাতা। দান দাতার প্রসাদ, দাতা স্বয়ং তার চেয়েও বড়। সাধনাতে তাই দুটাই থাকে, দান পাওয়ার আনন্দও থাকে, দাতাকে পাওয়ার আনন্দও থাকে। সাধনজাত একটা আনন্দ আছেই, সেটুকুই কর্ম্মফল; কিন্তু ভগবান তারও পরপারে—সে আনন্দ অসাধনের আনন্দ, অকারণ আনন্দ। সাধনফলে দেনা-পাওনার হিসাব আছে; কিন্তু সাধ্যপ্রাপ্তি অহেতুক। দান দিতে দিতে দাতা আসিয়া কখন ধরা দিবে, তাহা গ্রহীতা কি আন্দাজ করিয়া বলিতে পারে?—সেটা নির্ভর করে দাতার খুসীর উপর।

বাস্তবিক তিনি যদি আপন খুসীতে ধরা না দিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাওয়ার কোনও উপায়ই তো ছিল না। অতি ছোট ছোট সাধনেও কেবল তাঁরই খুসীর অভিব্যক্তি। সব কর্ম্মেই তিনি ফল দেন, আবার তার সঙ্গে একটু উপরি রসেরও জোগান দেন। সেইটুকু হিসাবের বাইরে—সেইটুকু তিনি। গীতাতে এই কথাটাই বুঝাইয়া বলিতেছেন, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" বিভীষিকা প্রচুর, বাধা যথেষ্ট; তার তুলনায় ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করি অতি অল্প; কিন্তু তবুও যে বাঁচিয়া যাই—এ কি তাঁর বেহিসাবী করুণা নয়? সমস্ত দিন উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত নিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছ; তার পর দিনশেষে ঐকান্তিক চেষ্টায় পাঁচমিনিটের জন্যও যদি চিত্ত স্থির করিতে পার, দেখিবে, সেই আনন্দের নেশায় সমস্তটা রাত বিহ্বলভাবে কাটিয়া গিয়াছে। পাঁচমিনিটের কর্ম্মের ফল পাঁচমিনিট মাত্রই থাকে না কেন? ফুলের গন্ধ শুধু ফুলের কোষেই আবদ্ধ থাকে না কেন—দূরদূরান্তরের বাতাস আমোদিত করিয়া তোলে কেন? এ কি হিসাবের কথা? এই হইতেছে তাঁর খুসীর দান—আমাদের উপরি পাওনা।

তিনি আনন্দময়, করুণাময়, প্রেমময়; তাই শুধু আমাদের পাওনা মিটাইয়াই ক্ষান্ত হন না—তার উপরেও কিছু দেন। তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া যে কাজ করিব, তাহাতে শুধু কাজের ফলটাই হাতে আসিবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও পাইব—অহেতুক আনন্দরূপে। এই সংস্কার চিত্তে দৃঢ় করিয়া তাঁহার সেবা কর। ফলের দিকে তাকাইও না—ও হইল বেনিয়ার বুদ্ধি। কাজ কর, কিন্তু

তাকাও তাঁর দিকে—রসিকের দৃষ্টি নিয়া, প্রেমিকের দৃষ্টি নিয়া। যদি কাজের ফলে সুখ আসে, তাঁর আনন্দে তা আরও মধুর হইবে ; যদি দুঃখ আসে, তাঁর কথা মনে করিয়া কাঁদিয়াও সুখ পাইবে। কর্ম্মের ফল অধ্রুব, তিনি ধ্রুব ; তাই ফল ছাড়িয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে বলা। কর্ম্ম উপলক্ষ্য, ভগবান্ লক্ষ্য—এই ভাবনায় ফল চিন্তা দূর হয়।

মজুরীর উপর উপরিলাভও কিছু আছে, এই কথা যে কর্ম্মী বুঝিতে পারে, তার কর্ম্মে উৎসাহ আসে। দীর্ঘকাল ধরিয়া সে কাজে লাগিয়া থাকিতে পারে। অভ্যাসযোগের এই প্রথম সর্ত্ত। যে কিছু করিবে না, বুঝিবে না, সেই রাতারাতি ফল পাইতে চায়, সেই দুদিন খাটিয়াই বছরের মজুরী চায় ; কিছু না পাইলে মনিবকে গালি পাড়ে। কিন্তু যে বিশ্বাসী, সে জানে কাজের ফল তো আছেই—তার উপরিও কিছু আছে। প্রথমটার মূলে ব্যবসা বুদ্ধি—দ্বিতীয়টার মূলে প্রেম। যে প্রেমের কাঙ্গাল, তার কাছে কাল তো দীর্ঘ নয়। যুগযুগান্তর আশায় কাটিয়া গেলেও সে ডরায় না, কেন না সে জানে প্রাপ্তি নিশ্চিত।

বাস্তবিক সাধনজীবনে দীর্ঘকালের বিভীষিকাটা মিথ্যা—ওটা অরসিকের কথা। যাহারা সাধনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা জানে, দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ সবটা পাইবার আশায় বসিয়া থাকিতে হয় না ; যেদিন হইতে পাওয়ার দিকে মন যায়, সেই দিন হইতেই একটু একটু করিয়া পাওয়া সুরু হইয়া যায়। দীর্ঘকাল সাধনার পর ভগবান্ মিলিল—এটা বাইরের দেখা ; ভিতরের পাওয়া কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বে সুরু হইয়া গিয়াছে। বীজ পুঁতিলাম, গাছ হইল, ফল ধরিল ; বীজ হইতে ফল ধরিল এই হিসাব যদি করি আর বাহির হইতে দেখি, তাহা হইলে বীজের সাফল্য দেখিতে দীর্ঘকালের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বীজ হইয়া বীজের ভিতর হইতে যদি দেখিতে সুরু করিতাম, তাহা হইলে বুঝিতাম, যেদিন মাটীর সংস্পর্শ ঘটিয়াছে, সেইদিন হইতেই ফলাভিমুখী পরিণতি সুরু হইয়াছে, সেইদিন হইতে রসের সঞ্চয় আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই অন্তর্দর্শীর পক্ষে বিভীষিকাটা মিথ্যা। যে কোনও সাধনকে যে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে, সেই একথা বুঝিতে পারে।

তারপর দ্বিতীয় কথা নৈরন্তর্য্য। সাধনায় নিরন্তর লাগিয়া থাকিতে হইবে, ফাঁক দিলেই পিছাইয়া পড়িতে হইবে। প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইলে হাত পা ছাড়িয়া দিবার যো নাই—যতটুকু বিশ্রাম করিবে, তত টুকু পিছাইয়া আসিতে হইবে। কিন্তু প্রথম প্রথম আমরা একেবারে লাগিয়া থাকিতে পারি না। শুধু চিত্ত চঞ্চল বলিয়াই নয়, ধারণাশক্তিই কম বলিয়া। সাধনের ফল সম্বন্ধে যখন গল্প শুনি, তখন মন লুব্ধ হইয়া নাচিয়া উঠে, ভাবি, কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাই—পারিব না কেন ? কিন্তু তার পর কিছুক্ষণের অভ্যাসেই স্নায়ু শিথিল হইয়া পড়ে, মন অবশ হইয়া যায়, হাতে পায়ে যেন খিল ধরিয়া আসে। শাস্ত্রে এটাকে বলে প্রমাদ—এ ঘোর তমোর লক্ষণ। বিজ্ঞানও বলে, জড়ের মাঝে inertia বলিয়া একটা গুণ আছে—তার ফলে সে নড়িতে চায় না—ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আগাইয়া দিলেও ক্রমশঃ বেগ মন্দা হইয়া শেষে স্থাণু হইয়া বসিয়া পড়ে আধ্যাত্মিক জগতেও ঠিক তাই।

প্রমাদের প্রতীকার করিতে হইলে জড়ত্বের সঙ্গে লড়াই চাই। লড়াইটা বৈজ্ঞানিক রীতিতে করিতে হইবে। দেহ, মন, বুদ্ধি, এইগুলি লইয়াই সাধনা। ইহাদের মধ্যে যে যত জড়ের নিকটবর্ত্তী, তাহার মাঝে তমো বা inertia তত বেশী। প্রথমতঃই মনে হইবে দেহের কথা। দেহ যদি লঘু না হয়, তাহা হইলে সে অপর যন্ত্রগুলিকেও নিজের ভূমিতে নামাইয়া আনিবে। দেহাত্মবাদ আমাদের জীবনের প্রথম ভিত্তি। কাজেই সর্ব্বপ্রথম দেহের জড়ত্ব মোচন করিতে হইবে। তার জন্য শৌচ, আহারশুদ্ধি, নিদ্রাজয় ও ব্রহ্মচর্য্য —এই চারিটী সদাচার প্রয়োজন। দেহের পীড়ন বা উচ্ছেদ প্রয়োজন নয়, কিন্তু তাহার শুদ্ধি বা লঘুত্ব একান্তই প্রয়োজন। সাধন-রাজ্যে দেহ'ক উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ তাহার ক্লেদ দূর না করিয়া মানসিক উন্নতির চেষ্টা করিলে কোন ফলই হইবে না। দেহের লঘুত্ব সাধিত হইলে সহজেই প্রাণায়াম ও চিত্তনিরোধ করা যাইতে পারে—ইহা যোগের উপদেশ। যে কোনও সাধনের পক্ষে এই কথা খাটে। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

—এখানে যোগ খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। সমস্ত যোগীর পক্ষেই কায়শুদ্ধির এই অমোঘ সঙ্কেত।

কায়শুদ্ধিতে প্রমাদ দূর হওয়ার পক্ষে প্রচুর সহায়তা মিলিবে। দেহ শুদ্ধ হইলেই সাধনায় নিরন্তর লাগিয়া থাকিবার শক্তি পাওয়া যাইবে। তখন আপনা হইতেই চিত্তে দীপ্তি আসিবে, উৎসাহ জাগিবে। শুদ্ধ আধারে মন স্বভাবতঃই ঊর্দ্ধমুখী প্রেরণায় সঞ্জীবিত থাকে। তখন সাধনায় রুচি হয়—ফলাকাঙ্ক্ষা দূর হইয়া সাধনা বলিয়াই সাধনা তখন ভাল লাগে; কারণ সাধনা তখন স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া যায় এবং প্রকৃতির ঊর্দ্ধপরিণামের নিয়মানুসারে আপনাআপনি তাহা পদ্মের মত বিকশিত হইতে থাকে। অসাধক অবস্থায় প্রবৃত্তিতে যেমন স্বভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, সাধকের তখন নিবৃত্তিতেও তেমনি স্বভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে। ইহাই অভ্যাসযোগের তৃতীয় অঙ্গ সংকৃতি। ইহার পর যোগযুক্ত সাধকের আর পতনের আশঙ্কা থাকে না।

—————*—————

সিদ্ধিপথ

—*—

সম্মুখে সীমাহীন বিশাল সমুদ্র। এই মহাসমুদ্রে একবিন্দু জলের পেছনে যে শক্তি, একটা তরঙ্গের পেছনেও সেই শক্তি। একটা তরঙ্গের পেছনে যে শক্তি, আর একটার পেছনেও তাই। একটা বুদ্বুদের আশ্রয়ও সেই মহাসমুদ্র; একটী বীচিভঙ্গের আশ্রয়ও সেই অসীম মহাসমুদ্র।

তেমনি ভাব—ভাব যে যাকে তুমি দেহ বলছ—মহাসমুদ্রের এই যে ক্ষুদ্র বিন্দু, এই যে তরঙ্গ—একে ধারণ করছে, পোষণ করছে,

এর বলাধান করছে সেই সীমাহীন মহা-সমুদ্রই ;—সূর্য্য-তারাকে যিনি ধারণ করে আছেন, তোমার এই দেহের ধারক তিনিই।

তোমার আত্মাই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ নক্ষত্রের ধারক। তোমার প্রতি রক্তবিন্দুর আত্মা তিনি। তোমার দেহের আত্মা তিনি, তোমার প্রতি রোমের আত্মা তিনি।

তুমিই তো সেই অনন্ত স্বরূপ ; শুধু এই দেহটাই ধরে আছ, তা তো নয় ; সমস্ত দেশ সমস্ত কাল যে তোমায় আশ্রয় করে আছে। এখন শোন—সমস্ত দেশ কালের ধারক যে আত্মা, তুমি তাই ; তুমি সেই অনন্ত স্বরূপ। যদি দেহটা মরে, তাহলে আত্মাও কি তার সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে ? না। দেহ যদি মরে, তবুও আত্মা মরতে পারবেন না।—কেননা দেশ আর কাল রয়েছে যে। কি মহা রহস্য এ! নিখিল দেশের আত্মা—নিখিল কালের আত্মা—অসীমের আত্মা আমি।

নির্জ্জন ভ্রমণের সময় এই ভাবের মনন করো। সমুদ্রের তীরে বা খোলা মাঠে বেড়াচ্ছ যখন, একা দাঁড়িয়ে আছ যখন, তখন এই ভাবে বিভোর হয়ে যেও। সহজভাবে ওঙ্কার জপ হয়ত তোমার হয়না। এই ভাবনাই হচ্ছে অনুভূতির সঙ্গে ওঙ্কার সাধনা।

ওঙ্কার জপের বাহ্য সাধনার উপর জোর দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই ; কেবল অনুভূতিতে এই ভাব জেগে উঠুক—"আমি অন্তহীন, সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত হয়ে আছি আমি, সমস্ত দেহ ভাণ্ডকে পূর্ণ করে রয়েছি। শত্রুর বাসনা, মিত্রের কামনা,—জগতের সকল আকাঙ্ক্ষা, আমার—আমার !"

ধর, একজনের প্রতি আমার ঈর্ষ্যা রয়েছে। তাকে আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করি। এখন ভাব দেখি—"আমি সেই প্রতিদ্বন্দ্বী।" সব ভেদবুদ্ধি দূর করে ফেল ; ঈর্ষ্যাকলুষিত ক্ষুদ্র অহং তুমি নও—এইটী ভাব দেখি। তুমি কাউকে ভালবাস ; আর এক জনও তাকে ভালবাসে ; তখনই প্রাণে ঈর্ষ্যা জাগে। এ ভাবকে প্রশ্রয় দিও না। যাকে ভালবাসছ, সে তো তুমি ; আর একজন যে তোমার পরাণপুতলীকে ভালবাসছে, সেও তো তুমি। তার আনন্দ তো তোমারই আনন্দ ; এই সত্য অনুভব কর দেখি।

এ অনুভব করতে হলে তোমার নিজকে সত্যস্বরূপ বলে অনুভব করতে হবে। ভাব, "সে যার কাছে যাচ্ছে, আমিই যে সেই—ভেদ তো নাই।" ভেদবুদ্ধি ছাড়িয়ে ওঠ। ছোট বড়র ভাব একদম দূর করে ফেল। ছোট নাই, বড় নাই—এই অনুভূতির উদ্বোধনে বেদান্তের সত্য প্রয়োগ কর। ভাব, "যে আজ বড় হয়েছে সে-ও আমি, যে আজ বড় হয়নি, সে ও তো আমি।" তোমার চেয়ে কেউ বড় হতে পারে, বেশী টাকা রোজগার করতে পারে, বেশী মান পেতে পারে। এখন এড়ুবার পথ হচ্ছে এইটুকু বোঝা যে, যা আমি ঈর্ষ্যা করছি, সে তো দেহটা ; কিন্তু দেহটা তো তার আত্মা নয় ; তার আত্মা আর আমি যে এক! এই অনুভূতিতে ঈর্ষ্যার বিকার কাটিয়ে ওঠ!

প্রকৃতির মাঝে যা কল্যাণকর, তার সঙ্গে তোমার হৃদয় যতই স্পন্দিত হবে, ততই অনুভব করবে, সমস্ত প্রকৃতির মাঝে প্রাণরূপে তুমিই উচ্ছ্বসিত হচ্ছ। তরুলতার উদ্গমে-বিনাশে তুমিই নিঃশ্বসিত। সূর্য্য উঠছে, ডুবছে—তাই নিশ্বাস এবং প্রশ্বাস।

জীবন ও মরণ যেন নিশ্বাস ও প্রশ্বাস।

যতক্ষণ প্রকৃতি হতে বিযুক্ত হয়ে আছ, ততক্ষণ মরে আছ! যতই ভাববে—বিশ্বজগৎ তোমার নিঃশ্বসিত, মৃত্যুরহস্যের মাঝে, পৃথিবীর উদয়-বিলয়ের মাঝে যে মহাশক্তি উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, সে তুমিই—ততই তুমি তুচ্ছ ভাবনা চিন্তার বহু ঊর্দ্ধে। এই তো অন্তরের সুষমা। যারা অন্তরে সুন্দর হয়েছে, তাদের মুখাকৃতি যাই হোক্ না কেন, তারা মনোমোহন, সমস্ত জগতের আকর্ষণ তারা!

সোক্রাতেস্ কুৎসিৎ ছিলেন—তিনি চেয়েছিলেন অন্তরের সৌন্দর্য্য। সৎচিন্তা পোষণ করাই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য।

সমস্ত জগৎ তখন তোমার কাছে একেবারে নির্ব্বিরোধ হয়ে যাবে। যখন জানছ, তুমি মুক্ত, তখন কোথাও বৈষম্য নাই, কোথায়ও বিরোধ নাই জগতে!

সূর্য্য খসে পড়ুক্, চন্দ্র রেণু রেণু হয়ে যাক্, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্ত শূন্যে মিশে যাক্—তোমার তাতে কি?—তুমি যে আত্মস্বরূপ, সত্যস্বরূপ! কিছুতেই তোমার ক্ষতি নাই—এইটী অনুভব কর। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের ধ্বংশ হতে পারে, কিন্তু তোমার ধ্বংশ নাই; —তুমি দেশ-কালের আত্মা। তুমি অবিনাশী —গিরিতুল্য অটল। এই অনুভূতিতে সিদ্ধ হও। এইভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতে হবে—শুধু নাক দিয়ে নয়, মন দিয়েও। মনের প্রাণনে সমস্ত জগতের আত্মারূপে তোমার নিশ্বাস বইছে জানবে। এমনি করে প্রকৃতির সঙ্গে তোমার মিলন হবে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন একসুরে গাঁথা হবে।

গতির সামঞ্জস্য কেমন করে হয়? মস্তিষ্কের ক্রিয়া আগে সুসমঞ্জস হোক্। সুসমঞ্জস গতিই বিশ্বসঙ্গীত। সেই গতিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তালে তালে নিঃশ্বাস ফেলছে।

এই গতির সুষমা আয়ত্ত কর। তার সঙ্গে তাল রেখে, বিশ্বসঙ্গীতের তালে তালে চল; তাহলে ভিতরটা সুন্দর হবে।

মহাসমুদ্রে একটা মাছ আছে; সমুদ্রের জল তার কান্‌কোর ভিতর দিয়ে ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। সমস্ত গতিটুকু সে অনুভব করছে।

তেমনি ভাব যে, সমস্ত জগৎ আমারই। কিসে তোমার মনমরা ভাব এল, আনন্দ দূর হয়ে গেল, জান? এ রোগের নাম হচ্ছে আধ্যাত্মিক অস্বচ্ছতা। নিজকে স্বচ্ছ করে তুলতে হবে, অস্বচ্ছ যা কিছু ভিতরে আছে, দূর করে ফেলতে হবে; ওতেই তো আঁধা হয়ে আছ।

এই অস্বচ্ছতা কি? এ তোমার ক্ষুদ্র অহং, স্বামিত্ব লোলুপ অহং—সে বলছে, "এটা আমার, ওটা আমার" ইত্যাদি। এই অস্বচ্ছতা দূর করতেই হবে। মুক্ত বায়ুতে শ্বাস ফেল আর ভাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার—আমার! তুমি স্বচ্ছ হয়ে যাবে—সব তোমার হবে।

রাজার কাছে দুটী লোক এসে ধরল, রাজপ্রাসাদের দেওয়ালগুলো চিত্র এঁকে সাজিয়ে দিতে তাদের হুকুম করা হোক্। তারা ছিল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী—কারবারটা একচেটে করবার মতলবে রাজার কাছে এসেছে। কাজ দেবার আগে রাজা তাদের পরখ করতে চাইলেন—তাদের সামনাসামনি দুটো দেওয়াল চিত্র করতে দেওয়া হল।

দুটো দেওয়ালের মাঝে পরদা টানিয়ে দেওয়া হল, যাতে তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে। প্রায় মাসেক কাল দুজনে কাজ করার পর একজন রাজার কাছে গিয়ে

বলল, তার কাজ শেষ হয়েছে ; কেমন হয়েছে মহারাজ এসে দেখলেই হয়। রাজা অপর চিত্রকরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার আর কত দিন লাগবে। সে বললে, মহারাজ, আমারও হয়ে গেছে।, দিন ধার্য্য করা হল, রাজা পাত্রমিত্র-দর্শক সকলকে নিয়ে দেখতে গেলেন, দুজনের মাঝে কার জিত হল। প্রথম চিত্রকরের দেওয়ালের সমুখ থেকে পরদা খুলে নেওয়া হল। রাজা আর দর্শকেরা চিত্র দেখে খুব চমৎকার হয়েছে বলে তারিফ করতে লাগলেন। তাঁরা যেন আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্লেন—এমনি চমৎকার ছবিই সে এঁকেছে।

সভাসদরা কাণাকাণি করতে লাগল, এর চাইতে ভাল আর কি হতে পারে? অপর চিত্রকরের ছবি আর মহারাজ দেখবেন কি? কেননা, এই ওস্তাদ যা করেছে, এমনটী তো কেউ আশা করেনি ; সুতরাং কাজের ভার তাকেই দেওয়া উচিত। কিন্তু পাত্রমিত্রের চেয়ে রাজার বুদ্ধি বেশী ছিল, তাই তিনি অপর দেওয়াল হতে পরদাটা সরিয়ে নেবার হুকুম দিলেন। পরদা উঠতেই—বাঃ! লোকে বিস্ময়ে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল—হাঁ করে হাত তুলে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, শ্বাস পড়ে কি না পড়ে!—কি আশ্চর্য্য, কি চমৎকার—এ যে অতুলন!

তারা কি দেখল—বুঝতে পারলে কি? দ্বিতীয় চিত্রকর সারা মাস ধরে কিছুই কিন্তু আঁকেনি। সে কেবল দেওয়ালটাকে যথাসম্ভব স্বচ্ছ করবার ফিকিরে ছিল। সে তাকে ঘসে ঘসে পালিস করে অবশেষে একেবারে স্বচ্ছ করে ফেলেছে। পরদা তুলতেই দেখা গেল, তার প্রতিদ্বন্দ্বী সামনের দেয়ালে যা কিছু এঁকেছে, সব এই দেয়ালটাতে প্রতিফলিত হয়েছে। তা ছাড়া এ দেয়ালটা বেশী পালিস্, চক্‌চকে, সুন্দর—কিন্তু সামনার দেয়ালটা অসমান, কুৎসিৎ। সেই পালিসের উপর চিত্রের ছায়া পড়েছে—কাজেই দ্বিতীয় দেয়ালটাতে প্রথম দেওয়ালের সমস্ত শ্রীটুকু যোগ হয়ে তার শোভা আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

তখনকার লোকে কখনও আয়না দেখেনি ; তাই তারা বিশেষ পরখ না করেই বলে উঠ্‌ল, "মহারাজ, চিত্রকর যে দেয়ালের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, ও যে দেয়ালের ভিতরে পাঁচ হাত খুঁদে ছবি এঁকেছে।" আয়না থেকে জিনিষটা যত দূরে থাকে, ছায়াটা আয়নার মাঝে ততখানি দূরে দেখায় কিনা।

চিত্রকর যেমন বালি দিয়ে ঘসে ঘসে দেওয়ালটা একেবারে স্বচ্ছ করে ফেলেছিল, তোমরাও তেমনি কর। যারা কেবল বই পড়ছে, তারা উপরভাসা একটা জ্ঞানলাভ করছে মাত্র। শুধু বাইরে চিত্র করলে হবে না—ভিতরেও চিত্র করতে হবে, সর্ব্বজ্ঞতা আহরণ করবার সঙ্কেত জানতে হবে।

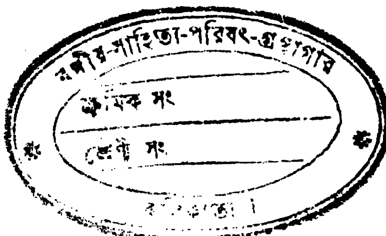
তার উপায় হচ্ছে ঘসে ঘসে চিত্তটাকে দর্পণের মত স্বচ্ছ করে ফেল—চিত্ত শুদ্ধ কর। তখন সমস্ত জগতের জ্ঞান তোমার চিত্তে প্রতিফলিত হবে। বিশ্বভাবে বিভোর হবে তখন।

রাম তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌তে পারেন, যখন হিমালয়ের গভীর অরণ্যে তিনি বাস করতেন, তখন তাঁর চিত্ত আসক্তিশূন্য হয়ে স্বচ্ছ হতেই মহান্‌ভাব, গভীর দার্শনিক তত্ত্ব, আশ্চর্য্য শক্তি কিসের প্রেরণাবলে যেন তাঁর চিত্তকে প্লাবিত করে দিত। তাই

রাম বলছেন, সবই প্রেরণাবশে লেখা ; বাইবেল, উপনিষদ্, বেদ, মিল্টন, ইমার্সন, ইম্রাসেঁলের রচনা—সব প্রেরণাবশে লেখা। বেদ, কোরাণ বা বাইবেল যেমন প্রেরণা—স্পেন্সারের রচনাও তেমনি প্রেরণা বই কি। প্রেরণা ছাড়া জ্ঞান হতেই পারে না। ব্যবসাদারী, আত্মম্ভরী স্বার্থবুদ্ধি যখন জাগে, লোকের কাছ থেকে কেবল আদায় করবার ফন্দী যখন মাথায় খেলে, ভিখারীর কাঙ্গালবৃত্তি যখন মানুষকে পেয়ে বসে, তখনই হৃদয় অস্বচ্ছ, অসমান হয়ে যায়; মানুষ তখন বুকে হাঁটে, চুরী চামারীর মতলবে ফেরে। যখন এই ভাব দূর হয়ে যায়, চিত্ত তখন আবার স্বচ্ছ হয়। সমস্ত জগতের হৃদয়ের তালে যখন স্পন্দিত হচ্ছ, জগতের কাজ যখন তোমার কাজ, জগতের হৃদয় তোমার হৃদয়, বিশ্বের মাঝে তোমারই নাড়ীর স্পন্দন যখন অনুভব করছ, সবিচারে হোক্ বা নির্ব্বিচারে হোক, যখন এই অবস্থায় থাকবে, তখনই পূর্ণ জ্ঞান হবে। নান্যঃ পন্থাঃ।

পুঁথিতে মন্দিরে শুধু খুঁজলে হবে না। রহস্য যদি জানতে চাও, নিজের মাঝে খোঁজ—সমস্ত জগতে প্রাণ সঞ্চার কর। তুমি যে স্বচ্ছ! চিত্তে যখন ঈর্ষ্যা নাই, স্বার্থের দাবী নাই, শত্রুর বাসনাও তোমার বাসনা বলে যখন মনে হবে, নিজকে পরখ করে যখন বুঝতে পারবে, যাদের ঈর্ষ্যা করতে, তাদের এখন আত্মস্বরূপ বলেই জানছ, তাদের কামনাকে তোমার কামনা বলেই গ্রহণ করতে পারছ—তখনই চিত্তের মালিন্য দূর হবে। শত্রুরা যদি তোমার দেহটাকে মেরে ফেলতে চায়, আর এই ইচ্ছাতে তাদের যে আনন্দ, সে আনন্দ তুমিও প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে পার যদি, তাহলে জগতের সঙ্গে তোমার বিরোধ ঘুচে গেল, তুমি বিশ্বসুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দিলে। তুমি স্বচ্ছ তখন, সব অবরোধ দূর হয়ে গেছে—তুমি তখন ব্রহ্মস্বরূপ। এই হচ্ছে সিদ্ধির পথ। জগতের সমস্ত সম্পদ তখন তোমারই। ওঁ ওঁ!*

* স্বামী রামতীর্থ (স্যানফ্রান্সিস্কো, কালিফোর্ণিয়া, —জানুয়ারী, ১৯০৩)



স্বামী রামতীর্থ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

তীর্থরামের বাল্যের আত্মসমর্পণ কি করিয়া পরবর্ত্তী জীবনে চিত্তের স্বতঃস্ফূরণে পরিণত হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অধ্যাত্মজগতের একটা রহস্যের মীমাংসা হইবে। সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক জীবনে যে আমরা কোনও উন্নতি দেখিতে পাই না, তাহার মূল কারণই হইতেছে লক্ষ্যহীনতা। খুঁজিলে এমন লোক অনেক পাইব, যাহারা অনেক বই পড়িয়াছে, বড় বড় তত্ত্ব নিয়া তর্ক করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু তবুও প্রাণে শান্তি পায় নাই, কিম্বা জীবনে কোনও সত্যের ক্রমিক স্ফুরণ অনুভব করে না। ইহা লক্ষ্যহীনতার পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারা অধ্যাত্ম সম্পদ চায় বটে, কিন্তু

অর্জ্জনের কোনও পথ পায় না। প্রথমতঃ যে কোনও একটা লক্ষ্যে চিত্তকে আবদ্ধ করা প্রয়োজন; তার পর অবান্তর বিষয়-গুলিকে সেই লক্ষ্যেরই চারিদিকে সুবিন্যস্তভাবে সাজাইয়া নেওয়া প্রয়োজন। এমনি করিয়া একটী ভাবের বৃন্তে কমলদলের মত জীবনকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। বুদ্ধির বৈচিত্র্য, যুক্তির বৈচিত্র্য, জ্ঞেয়ের বৈচিত্র্য থাকুক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য যে একই সত্যের পরিণতি, এইটী হৃদয়ে ধারণা করিতে হইবে।

এই সত্য সব সময়ে যে একটা তত্ত্ব হইবে, তাহা নয়; মানুষও আমাদের ভাবের কেন্দ্র হইতে পারে। এই কথাটা বাল্যজীবনে বিশেষ করিয়া খাটে। বিচারশক্তি যখন অপরিণত থাকে, তখন হৃদয়াবেগের প্রাবল্য ঘটিবে, ইহা অযৌক্তিক কথা নয়। আবার আবেগমাত্রই যে বিচারহীন হওয়াতে উপেক্ষার বিষয় হইবে, তাহা নয়। বরং অনেকস্থলে আবেগ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিচারকৌশল মাত্র। তীর্থরাম তাঁহার দিনলিপিতে এই কথাটা একবার উল্লেখ করিয়াছেন (২৯শে জুলাই, ১৮৯০)। ভগবদ্‌বুদ্ধিদ্বারা প্রণোদিত যে আবেগ, তাহার মূলে সত্য থাকিবেই। তাহা কোথায় ন্যস্ত হইতেছে, সে বিচার তত গুরুতর নয়, এই আবেগের একমুখীনতা ও বিশুদ্ধি অব্যাহত রহিয়াছে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য।

গুরুগৃহবাসের সময় বালকের হৃদয়ে এইরূপ আবেগ উৎপন্ন হইয়া গুরুতে ভগবদ্‌বুদ্ধি আনিয়া দেয়। ভগবান্ কিরূপ, কি বৃত্তান্ত, যুক্তিতর্ক দ্বারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া বুঝিবার শক্তি বালকের নাই। কিন্তু কোনও অভাবনীয় শক্তিবলে আকৃষ্ট হইয়া ব্যক্তিবিশেষে সে তাহার সমস্ত নির্ম্মল হৃদয়াবেগকে ন্যস্ত করিয়া তাহাকেই ভগবানের আসনে বসায় এবং এইরূপে লোকাতীত সত্তার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ একটা বিগ্রহকে আশ্রয় করিয়া তিল তিল করিয়া জীবনে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বালকের এই সরল বিশ্বাসে তাহারই লাভ—ইহাতে তাহার জীবনই উন্মেষিত হইবার অনুকূল ক্ষেত্র পায়। অধ্যাত্মজীবনের প্রতি বালকহৃদয়কে সচেতন করিবার আর কোনও পন্থা নাই—এ কথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। যে কোনও উপায়ে হউক, বালকের কাছে ভগবানকে মানুষ হইতেই হইবে, নতুবা ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে ঝুরি ঝুরি উপদেশ দিয়া তাহার নৈতিক চরিত্রের যত উন্নতিই হউক না কেন, শুধু তত্ত্বোপদেশ দ্বারা অধ্যাত্মরস জীবনে কখনই সঞ্চারিত হইবে না।

এই কথার সঙ্গে তীর্থরামের জীবন যদি মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তের স্বতঃস্ফুরণের একটা মীমাংসা পাই। শুধু নীতির শাসন নয়, ভগবদ্‌বুদ্ধির রসায়ন বালক তীর্থরামের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিয়াছে। ইহাতে তাঁহার চিত্ত একটা আশ্রয় পাইয়া স্বভাবতঃই আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিচিত্র আকারে ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ পাইয়াছে। তীর্থরাম পরবর্ত্তী জীবনে কি হইয়াছিলেন, তাহা আমরা সবাই জানি; কিন্তু বাল্য হইতে এইরূপ আশ্রয় না পাইলে, দুর্গে বসিয়া লড়াই করিবার সুযোগ না পাইলে তিনি কি হইতেন, তাহা কল্পনা করিতে পারি না। আশ্রয় ভাঙ্গিয়া দিলে যে তাঁহার চিত্ত ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে, এ কথা তাঁহার দিনলিপিতে করুণ বেদনার সহিত তিনি বহুবার প্রকাশিত করিয়াছেন। হউক সে আশ্রয় তাঁহার মনঃকল্পিত, কিন্তু তাঁহার

মননজীবনের পক্ষে উহা যে অপরিহার্য্য, তাহা যুক্তির প্রামাণ্য দিয়াও তো আমরা বুঝিতে পারি।

আশ্রয় সম্বন্ধে 'নিশ্চিন্তভাব তাঁহার সাহস আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। এ কথার ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। স্বভাবতঃই তাঁহার চিত্ত সবল ছিল, বহুমুখী প্রতিভা ছিল। আশ্রিতবুদ্ধি দ্বারা লালিত হইয়া এই স্বভাবশক্তি প্রচণ্ড মনোদ্বন্দ্বের মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সবলতাকে চিন্তার ঔদ্ধত্য বলিয়া বুঝিলে ভুল করা হইবে। স্বাধীনভাবে আপনার মত প্রকাশ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই; তাঁহার পারিপার্শ্বিকও এমন ছিল যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার যথেষ্ট সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার চরিত্র দৃঢ়, নির্ভীক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই নির্ভীকতা কোথায়ও যে অবিনয়ে পর্য্যবসিত হইয়া আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে তাহা নয়। এই তেজস্বী হৃদয়েও প্রপন্নবুদ্ধি যে কত প্রবল, তাহা তাঁহার দিনলিপির ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ঘাত-প্রতিঘাতে—dialectic method-এ কি করিয়া তাঁহার চিত্তশক্তি স্ফুরিত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার মত। একদিকে তাঁহার তীব্র হৃদয়াবেগ, আর একদিকে তীক্ষ্ণ প্রতিভা। একটী তাঁহাকে সহজ প্রত্যয়ের পথে আহ্বান করিয়াছে, অপরটী সংশয় দ্বারা কণ্টকিত বৈচিত্র্যের পথে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছে। হৃদয়াবেগ যে স্থানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়াছে, বুদ্ধি আসিয়া সেখানে প্রশ্ন তুলিয়াছে, সংশয় জাগাইয়াছে, সত্যের কষ্টিপাথরে আবেগকে যাচাই করিয়া নিতে চাহিয়াছে। এই সংশয় প্রত্যয়কে বিনষ্ট করিতে আসে নাই, অন্তর্বিরোধকে জয় করিবার জন্য—অভিজ্ঞতার প্রশস্ততর ক্ষেত্রে হৃদয়কে আহ্বান করিয়াছে। সংশয় যখন সহজ প্রত্যয়কে আসিয়া আঘাত করে, তখন হৃদয়ে যে বেদনার সৃষ্টি হয়, তাহা নবভাবের স্ফুরণেরই সূচনা। হৃদয় যাহাকে পূজা করে, বুদ্ধি তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতে চায়, কেননা সে বাহির হইতে অনেক দেখিয়া শুনিয়া বহু যুক্তিতর্ক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এরূপ স্থলে বুদ্ধির বিরোধ মিটাইবার জন্য হৃদয়কে স্বতঃই প্রশস্ত হইয়া উঠিতে হয়। এইরূপেই গুরু বিচারশীল প্রপন্ন শিষ্যের হৃদয়ে তাঁহার সত্যমূর্ত্তিকে ক্রমস্ফুরিত করিয়া তোলেন। ইহা অধ্যাত্মজগতের একটা অপ্রতিহত বিধান। উপযুক্ত নিমিত্ত থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, এক্ষেত্রেও তাই। পরিস্থিতি দেখিয়াই তীর্থরামের অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। ইহা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিতে চাই যে, তেজস্বী হৃদয়ের পক্ষে বশ্যতা স্বীকার সব সময় ক্ষতির কারণ না-ও হইতে পারে—যদি সব রকম যোগাযোগ ঠিক থাকে। বর্ত্তমান উদ্ধত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দিনে এই শিক্ষাও একটা কম লাভ নয়।

মননই বেদান্তীর জীবনের মুখ্য সাধনা। মননে স্বাধীনতা থাকা চাই—নতুবা অবিচারে কেবল কতকগুলি তত্ত্বকথা গিলিয়া গেলে কোনও লাভ নাই। আর বাস্তবিক সাধনা যদি জীবন্ত হয়, তাহা হইলে মননে স্বাধীনতা না আসিয়াই পারে না। তেজস্বী হৃদয় আপন অপরোক্ষ প্রত্যয় ছাড়া আর কিছুর উপরই নির্ভর করিতে পারে না। উত্তরজীবনে

স্বামী রামতীর্থকে বজ্রকণ্ঠে বার বার এইকথা ঘোষণা করিতে আমরা শুনিয়াছি । বার বার তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া কহিয়াছেন—"শোন খৃষ্টান, শোন মুসলমান, শোন বৈষ্ণব, শোন বিশ্ববাসী নিখিল ধর্ম্মসম্প্রদায়, যদি মনে করে থাক যে খৃষ্টের, বুদ্ধের, কৃষ্ণের বা অন্য কোনও সাধুর মহিমায় তোমার মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হয়েছে, তবে তোমার সে ধারণা ভুল। জেনো, খৃষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ বা আর কারু মাঝে মুক্তির মূল কারণ নিহিত নয়—সে পরমকারণ তোমার আত্মাতেই সমাহিত। ধর্ম্মমত আর শ্রদ্ধাতে যে পার্থক্য রয়েছে, তা ভুলে যেও না। শ্রদ্ধাই মানুষকে বাঁচায়, ধর্ম্মমত নয়। খৃষ্ট, বুদ্ধ বা কৃষ্ণ প্রভৃতিতে প্রাণহীন বিশ্বাসে কি ফল? তোমার আত্মায়, তোমার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মে সে বিশ্বাস রাখ না কেন? কত সরল, কত সহজ সে পন্থা—শ্রদ্ধার কি স্বাভাবিক পরিণতি!"

এমন নির্ভীক, তেজস্কর, প্রচণ্ড যাঁর আহ্বান, তাঁহাকে যে কতখানি সংস্কারের বাধা কাটাইয়া উঠিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার মননজীবনে তুমুল ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কি নির্ম্মম হইয়াই যে তাঁহাকে সর্ব্ববিধ সংস্কারের সহিত লড়িতে হইয়াছে, তাহা এই প্রমুক্ত হৃদয়ের গৈরিক উচ্ছ্বাস হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য মনে হয়, যখন অনুসন্ধান করিয়া দেখি, এই জ্বালাস্রোতের উৎস রহিয়াছে একটী অতি স্নিগ্ধ সুকুমার ভাব-প্রবণ বালকের হৃদয়ে—যে বালক জীবনের তরুণ প্রভাতে মমতায় গলিয়া গিয়া অসঙ্কোচে সর্ব্বাগ্রে আপনার অহংকেই অস্বীকার করিয়াছে। এই একান্ত পরনির্ভর আর এই প্রবুদ্ধ আত্মার বজ্র-নির্ঘোষ—এই উভয়ের মাঝে কার্য্যকারণের ধারা কোথায় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা সহসা তো আমাদের চোখে পড়ে না। আত্মসমর্পণ হইতে মননশক্তি কি করিয়া এরূপ প্রচণ্ড তেজে স্ফুরিত হইবে, ইহা একটা রহস্য বটে।

তেজস্বিতাকে যাহারা স্পর্দ্ধা বা আস্ফালন বলিয়া মনে করে না, যাহারা উহাকে জীবনে একটা সত্য শক্তি বলিয়া জানে, তাহারাই অনুভব করিতে পারে, কি করিয়া দুর্দ্দর্শ তেজের সহিত অপরিসীম স্নিগ্ধতার পরিণয় হইতে পারে। "কোটীসূর্য্য সমপ্রভ আবার কোটীচন্দ্র সুশীতল"—এই যে একটা কথা আমরা সচরাচর শুনিতে পাই, ইহা অধ্যাত্ম-জীবনের চরম সামঞ্জস্যের সত্যকেই প্রকাশ করিতেছে। স্বামী রামতীর্থ যখন বজ্রকণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"আত্মানং বিদ্ধি"—তখন আমরা বুঝি, তিনি গুরু, তিনি শাস্তা, তিনি পুরুষ; তাই একদিকে তাঁহার কথায় আমাদের প্রকৃতি প্রীতিস্নিগ্ধ হৃদয়ে তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়ে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তর্নিহিত গুহাশায়ী পুরুষটীও হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠেন—"ওম্—অহং ব্রহ্মাস্মি।" এ তো আমাদের নিত্যপ্রত্যক্ষের বিষয়। গুরুর কাছে শিষ্যের প্রপন্নতা এবং তাঁহার প্রেরণায় শিষ্য গুরুত্বের স্বতঃপ্রকাশ—এ তো অধ্যাত্মজগতের স্বভাবসঙ্গত ঘটনা। একই হৃদয়ে যুগপৎ স্বাতন্ত্র্য ও সমর্পণের বিলাস—শিষ্যের জীবনে ভাবের গোধূলিলগ্ন কতবার যে আসে যায়, ইহা কোন্ সাধক না অনুভব করিয়াছে?

এই ভাবদ্বৈত সকলের জীবনেই রহিয়াছে—এমন কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও প্রকৃতি-

পুরুষের যুগলমাধুরী কত ছন্দে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার খবর আমরা কি রাখি? সাংখ্যকারের পরিভাষা লইয়া অল্প কথায় বলিব, প্রকৃতির আত্মসমর্পণে পৌরুষের জাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা যদি দার্শনিক সত্য হয়, এমন কি অতি স্থূলভাবেও যদি আমাদের সংসারজীবনে এই ভাবদ্বৈতকেই ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তাহা হইলে তীর্থরামের জীবনে পূর্ব্বোত্তরকালে বিরোধ দেখিব কোথায়? সনাতন পুরুষ ও সনাতনী প্রকৃতি যে আমাদের মাঝেই—কে কাহাকে ছাড়িয়া রহিয়াছেন বা থাকিতে পারেন? সুতরাং একই জীবনে উভয়ের প্রকাশ দেখিতে পাইব, এ আর আশ্চর্য্য কথা কি? প্রকৃতি-পুরুষের প্রেমই সাধকজীবনে রসের যোগান দেয়, আবার সিদ্ধজীবনে বিলাসের সৃষ্টি করে। আমিই একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি—অন্তঃস্বরূপের বহির্ব্যক্তিতে স্বভাবেরই লীলা সর্ব্বত্র। তীর্থরামে দেখিতেছি প্রেমবিহ্বলা প্রকৃতির আত্মসমর্পণ; আবার স্বামী রামতীর্থে দেখিতেছি জ্ঞানভাস্বর পুরুষের ঈক্ষণ, প্রেরণা, স্বারাজ্যসিদ্ধি; তীর্থরাম তখন বিপর্য্যস্ত হইয়া রামতীর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার স্বামিত্ব তখন স্বপ্রকাশ দীপ্তিতে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উভয়ত্রই স্বভাবের আর একটা দিক আড়াল হইয়া থাকিলেও নাস্তি হইয়া যায় নাই। এই জন্য তাঁহার সমর্পণে আমরা স্বাতন্ত্র্যের আভাস পাই; তাঁহার জ্ঞানে যে প্রেমের স্নিগ্ধতা কিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

তীর্থরামের জীবনে এইটুকু দেখি, সাধকের পক্ষে সমর্পণ ও স্বাতন্ত্র্য উভয়ই স্বাভাবিক; যদি ইহাদের মাঝে ক্রমের বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, প্রথম জীবনে সমর্পণই সাধনার অনুকূল—উহাই উত্তর জীবনে স্বাতন্ত্র্য আনিয়া দিবে। ইহা যেমন দর্শনসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত কথা, তেমনি সত্যান্বেষী সাধকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেও পরীক্ষিত। সাধনে আচার্য্যের প্রয়োজনীয়তা এইখানেই। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

[শ্রীযুক্ত জগৎ চন্দ্র দাস, বি, এ ই, এ, সি]

ব্রহ্মচর্য্যহীন ভারতের অবস্থা

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠান কিরূপে কখন সমাজ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে তাহার সম্যক্ ইতিহাস নাই। কিন্তু বৌদ্ধযুগে যে বৈদিক আচার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত; সেই কালেই হউক অথবা তৎপরবর্ত্তী পৌরাণিক বা তান্ত্রিক যুগেই হউক সমাজ হইতে আশ্রম-ধর্ম্মরূপে ব্রহ্মচর্য্যের স্বাতন্ত্র্য যে লোপ পাইয়াছে তাহা অনুমান করা যায়। পুরাণ এবং তন্ত্রের যুগে যে জ্ঞানালোক ম্লানভাব ধারণ

করিয়াছিল এবং জনসাধারণ যে প্রাচীন শমদমাদির আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। অধঃপতিত কামাসক্ত জীবের জন্য যে ভাগবত ও তন্ত্রোপদেশ, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।* এই তামসযুগই ঋষিশক্তির অসদ্ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। অধ্যাপক মোক্ষমূলর উপনিষদ্ সকলের উচ্চ আধ্যাত্মিকতা দর্শনে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি উহাদিগকে জগতে অতুলনীয় বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আবার বলিয়াছেন যে পরবর্ত্তী যুগসমূহে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ক্রমিক অবনতিই সাধিত হইয়াছে; চিন্তাজগতের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে মধ্যযুগের পরবর্ত্তী ভারতবাসী উল্লেখযোগ্য কিছুই প্রদান করিতে পারে নাই। এই অবনতি যাহারা দর্শন করে না তাহারা অন্ধ। ব্রহ্মচর্য্যবল অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে ভারতীয় আর্য্যগণের গৌরব লুপ্তপ্রায়, তাহা আর কাহাকেও চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। যুগযুগান্তর হইতে বংশানুক্রমে ব্রতভঙ্গের বিষময় ফল অবতীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; এবং বর্ত্তমানে উহা ব্যক্তি ও সমাজদেহকে অন্তঃসারবিহীন করিয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবাসীর মর্কটদেহ রোগাধারে পরিণত হইয়াছে; ধৃতির অভাবে তাহাতে অকালোচিত বাসনাকামনার উদ্রেক হইতেছে। বর্ত্তমান যুগের লোক উচ্চ বিষয়ের চিন্তায়, উচ্চতর গবেষণায় এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনোযোগ দিতে অসমর্থ।

*

* ভাগবত ও তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না।—আঃ দঃ সঃ

শারীরিক অবনতি

সুমেরুগিরি যেমন ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেইরূপ পৃষ্ঠস্থিত মেরুদণ্ড মানবদেহকে ধারণ করিয়া আছে। এই মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধপ্রান্তে মস্তিষ্ক বা মস্তক এবং নিম্নপ্রান্তে জননেন্দ্রিয় স্থান। মেরুদণ্ডের মধ্যে যে মেরুমজ্জা অবস্থিত আছে, উহা হইতে স্নায়ুতন্তুসকল উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রসকলকে আচ্ছাদন করিয়া আছে। মেরুমজ্জার সঙ্গে মস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ যোগ; এই যোগ আছে বলিয়াই দেহের যে কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্পর্শানুভূতি স্নায়ুযোগে মেরুমজ্জা দিয়া তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে নীত হইয়া থাকে। অন্যদিকে মস্তিষ্ক হইতে গত্যুৎপাদিকা শক্তি মেরুমজ্জা ও স্নায়বিক বিধানের সাহায্যে সঞ্চালিত হইয়া দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদিতে উপস্থিত হইতেছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই দেহকে আকর্ষণাত্মক ও বিক্ষেপণাত্মক দুইটী শক্তি সর্ব্বদা নিয়মিত করিতেছে। আমরা জীবের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াদ্বয়ের মধ্যে এই শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। বিক্ষেপণীশক্তির কার্য্য ক্ষয় বা ধ্বংস; দেহে এই শক্তির ক্রিয়াধিক্য হইলে তদ্দ্বারা যন্ত্রাদির শিথিলতা সম্পাদিত হইয়া পরিণামে যে দেহধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে, ইহা কে না বুঝিতে সমর্থ?

মানুষের যে কার্য্যে যত অধিক অনুরাগ বা আসক্তি, সেই কার্য্যের জন্য মনের তত তীব্র বেগ বা গতি হইয়া থাকে। গতির আধিক্যে যে সকল যন্ত্রাদি অত্যধিক ব্যবহৃত হয়, তাহাদের ব্যাধি বা বিকলতা উপস্থিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। আমরা বিশেষভাবে যে

প্রসঙ্গক্রমে এইসকল কথা বলিতেছি, উহা জননেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম। ষড়রিপুর মধ্যে কামরিপু যে দুর্দ্দমনীয়, ইহা স্ত্রীপুরুষ সকলেই বুঝিতে সক্ষম; এই রিপুর উত্তেজনায় মানুষ না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। এই রিপুর চরিতার্থতাজন্য দেহে যে গতির উৎপত্তি হয়, উহা অত্যধিক প্রবল।* এতদ্দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে জননেন্দ্রিয়, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক ও চক্ষু—পরোক্ষভাবে মূত্রাশয়, পাকাশয়াদিতেও ক্রিয়া হইয়া থাকে। ক্ষণিক সুখভোগে উন্মত্ত হইয়া শরীরিমাত্রেই শুক্রক্ষরণ করিয়া থাকে; কিন্তু তদ্দ্বারা যে জীবনীশক্তির অপচয় হয়, তাহা অনেকেই চিন্তা করিয়া দেখে না। দুগ্ধে নবনীতের ন্যায় শুক্র সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। দুগ্ধ হইতে নবনীত আকর্ষণ করিয়া লইলে দুগ্ধের যে অসারাবস্থা হয়, শুক্র ক্ষরিত হইলে রক্তেরও সেই অবস্থা হয়। যাহারা বিবিধ অনৈসর্গিক উপায়ে অথবা অনিয়মিত স্ত্রীসম্ভোগ দ্বারা অযথা শুক্রক্ষরণ করিয়া থাকে, তাহাদের দেহস্থ শোণিতমধ্যে মেদমজ্জাদি-পরিপোষক সারাংশের অভাব ঘটে। রক্তক্ষীণতা বা শোণিতবিকৃতি হইতে অশেষবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শুক্রক্ষয়মূলে উৎপন্ন না হইতে পারে, এমন অল্প ব্যাধিই আছে। সমস্ত ব্যাধির উল্লেখ করা এ স্থলে অসম্ভব ও অসঙ্গত হইবে; এ জন্য আমরা কেবলমাত্র চক্ষু, মস্তিষ্ক ও শ্বাসযন্ত্রসম্বন্ধীয় কতিপয় রোগের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। অন্যান্য যন্ত্রঘটিত পীড়ার কথা পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন।

মস্তিষ্ক ও মুখমণ্ডলের পরিচয় দিয়াই মানুষ এবং মুখশ্রীর হেতু চক্ষু। চক্ষু ও মস্তিষ্ক পীড়িত হইলে দেহ যে অশোভন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। কোটর-প্রবিষ্ট প্রভাহীন চক্ষুই অপরিণামদর্শী কুক্রিয়াসক্তের প্রধান চিহ্ন; দৃষ্টিক্ষীণতা, শিরঃ শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের মধ্যে খালি খালি বোধ, স্মৃতিশক্তির বিলোপ, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, সন্ন্যাস, শ্বাসকষ্ট, হৃৎকম্প, ক্ষয়কাশ, মেরুদণ্ডের পীড়াদিও তাহার অনুগমন করে।

অনেকের মুখ হইতেই শুনিতে পাওয়া যায় যে, পিতৃপুরুষগণ সুস্থদেহে যেরূপ শতায়ু জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে আর সেরূপ করা সম্ভবপর হইবে না; শরীরে নানাপ্রকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি দেখা দিয়াছে, অকালবার্দ্ধক্য উপস্থিত, পঞ্চাশৎ বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়াই সুকঠিন বোধ হইতেছে। ফলতঃ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান সময়ে মানবদেহের সমূহ অবনতি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে মানবদেহে যে কত প্রকার উৎকট আধিব্যাধি দেখা দিয়াছে এবং তাহার উপশমকল্পে যে কতপ্রকার প্রয়াস চলিতেছে, তাহার সম্যক অবধারণ করিতে হইলে প্রতিদিন ডাকযোগে যে সমস্ত ঔষধাদির বিজ্ঞাপন হস্তগত হয়, পথে ঘাটে রেলে ষ্টীমারে চলিতে অযাচিতভাবে যে সকল হ্যাণ্ডবিল বিতরিত হয় এবং সংবাদপত্রসকলের বিজ্ঞাপন

---

* প্রাণবায়ুর সঞ্চালন দ্বারা গতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়; বিবিধ শারীরিক চেষ্টায় প্রাণবায়ুর গতি যেরূপ হয়, তাহা এই—

গান	করিবার সময়	১৬ অঙ্গুলি
আহার	”	২০ ”
গমন	”	২৪ ”
নিদ্রা	”	৩০ ”
সঙ্গম	”	৩৬ ”

ব্যায়ামকালে গতির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

জন্তে যে সকল অব্যর্থ ঔষধ, মাদুলী, কবচাদির মহিমা প্রচারিত হয়, তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত।

বড় বড় সহরে আজকাল চস্‌মা চক্ষে নাই, এরূপ যুবকের সংখ্যা অতীব বিরল। অজীর্ণ, শিরঃপীড়া, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যহেতু না ভুগিতেছে, এমন ছাত্রের সংখ্যা কম। দুই তিন বৎসর হইল কলিকাতার বিদ্যার্থিগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল; তাহাতে এরূপ অবগত হওয়া গিয়াছে যে, অধিকাংশেরই চলনসই সাধারণ স্বাস্থ্য নাই। গৃহের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, এমন গৃহ বিরল, যেখানে সুস্থ, সবল, নীরোগ প্রসূতি জননী আছেন! অনেকস্থলেই ভগ্নদেহ ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া জননীগণ মৃতপ্রায় হইয়া সন্তানসন্ততি প্রসব করিতেছেন। তাঁহাদের প্রসূত সন্তান হয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, না হয় নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। এই দেশে প্রসূতিমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর তালিকা দেখিয়া অনেকেই স্তম্ভিত হইয়া যান; স্তম্ভিত হইবারই কথা।

বর্ত্তমান সময়ে "শিশুমঙ্গল" বলিয়া একটা অনুষ্ঠানের সূচনা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সুসন্তান লাভোপায় ও শিশুমৃত্যুর প্রতীকারোপায় চিন্তা করা হইতেছে। শিশুমঙ্গলের পূর্ব্বে যে পিতৃমঙ্গল চিন্তার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি দেশের নেতৃগণ চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন? পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি উভয়ের যে ম্লান ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা হইতে শিশুমঙ্গলের আশা অতি কম। এজন্য আমাদের মতে পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির পুনরুদ্ধার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রজননশক্তির ক্রমিক অবনতিই যে বর্ত্তমান দৈহিক অবনতির কারণ, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? ভারতবাসী বর্ত্তমানে শৌর্য্যবীর্য্যহীন, জগতের নিকট ভীরু কাপুরুষ বলিয়া উপেক্ষিত। আমাদের মনে হয়, ইহার মূলে গার্হস্থ্যজীবনে আর্য্যোচিত সংযম ও সদাচারের অসদ্ভাব। ভারতবাসী দেশাচার কুলাচার প্রভৃতি বিবিধ কদাচারে লিপ্ত হইয়া পিতৃ ও মাতৃশক্তির অপব্যবহার ও অপচয় করিতেছে এবং ক্রমে রসাতলে যাইতে বসিয়াছে।

মানসিক অবনতি

ইন্দ্রিয়গণ মনের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে; মনঃসংযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের বিষয়গ্রহণক্ষমতা নাই। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়গণ উপরত হইলেও মন কার্য্য করিতে পারে। সুতরাং মনই জীবের বিষয় ভোগের মুখ্য যন্ত্র বা উপায়; ইন্দ্রিয়গণ গৌণ যন্ত্রমাত্র। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র বলেন—

"মনঃ করোতি পাপানি
মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে (২১৪ অঃ) দেখা যায় যে হৃদয়ের মধ্যভাগে মনোবহা নামে একটী নাড়ী আছে; সেই নাড়ী সর্ব্বগাত্র হইতে সঙ্কল্পজন্য শুক্রকে সঞ্চালিত করিয়া উপস্থাভিমুখে আনয়ন করে। স্বপ্নাবস্থায়ও যোষিৎসম্পর্ক বিনা ঐ সঙ্কল্পজন্য দেহ হইতে শুক্রক্ষরণ করে। এই সকল উক্তির আক্ষরিক সত্য আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে; কিন্তু সঙ্কল্পাত্মক মনই যে সমস্ত বিষয়গ্রাহী এবং মনের প্রেরণা হইতেই যে শুক্রোৎপাদন ও ক্ষরণ হইয়া থাকে, তাহাই প্রদর্শনীয়।

পাশ্চাত্য দেহতত্ত্ববিদ্‌গণের মতেও দেখা যায় যে মস্তিষ্ক হইতে গত্যুৎপাদিকাশক্তি

উৎপন্ন হইয়া মেরুমজ্জা দিয়া উহা স্নায়ু-বিধানের সহায়তায় দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ ঐচ্ছিক মাংসপেশী, রক্তবহা নাড়ী ও যন্ত্রাদিতে নীত হয়। কিন্তু এই গতি বা ক্রিয়ার কর্ত্তা কে? প্রথম পরিস্পন্দন উৎপাদন কে করে?

যে মেণ্ডুলা অবলংগেটার উপরিভাগে মস্তিষ্ক অবস্থিত, সেই মেণ্ডুলা অবলংগেটার শীর্ষস্থানই আজ্ঞাপদ্মের স্থান এবং আজ্ঞাপত্রান্তরালে মন অধিষ্ঠান করে বলিয়া যোগশাস্ত্রে নির্দ্দেশ। সূক্ষ্মরূপী মনের সঙ্কল্প হইতেই মস্তিষ্ক সঞ্চালিত হইয়া থাকে

মন, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিধানের সাহায্যে কার্য্য করে বলিয়া ইহা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুবিধানের শিথিলতা সম্পাদিত হইলে মনের কার্য্যকরী ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পাইয়া থাকে। যে আকর্ষণ বা সঙ্কোচাত্মক শক্তি ধৃতি বা দমগুণের মূলে, একদিকে তাহার ক্ষয় সাধিত হয়, অপরদিকে উত্তম উৎসাহাদি বিক্ষেপণাত্মক শক্তির মূলেও কুঠারাঘাত পতিত হয়। এইজন্যই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়দেশীয় শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, যাহারা অনৈসর্গিক উপায়ে অথবা অনিয়মিত স্ত্রী-সংসর্গ দ্বারা অযথা রেতঃস্খলন করে, তাহাদের মানসিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য। এবংবিধ কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের স্বপ্ন, জাগ্রৎ যে কোন অবস্থায় স্মৃতি বা সঙ্কল্পমাত্রই রেতঃ স্খলিত হইয়া যায়। অপরিতৃপ্ত ভোগেচ্ছা ও দেহের অকর্ম্মণ্যতা হইতে অসন্তোষ, বিমর্ষ, নৈরাশ্য, আলস্য, নিরুদ্যমতা, আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি দেখা দেয়। এই সমস্তই চিত্ত-বিকার বা মানসিক ব্যাধি। এবংবিধ ব্যাধিগ্রস্ত মন দ্বারা অর্থ বা পরমার্থ কোন বিষয়েরই সাধন হইতে পারে না। উচ্চবিষয়ের চিন্তা বা গবেষণা—যাহা আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষণ, তাহা একবারেই অসম্ভব। সূক্ষ্মদর্শন বা একাগ্রচিত্তে কোন তত্ত্বান্বেষণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ঈদৃশ মানবকে নরাকার পশু বলিতে কোন আপত্তি দেখা যায় না।

এক্ষণে বর্ত্তমান জনসমাজের মানসিক অবস্থার আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান যুগের মানুষ কি চা'য়, কি নিয়া কাল কাটায়? তাহার চিন্তানুধ্যানের বিষয় কি? গুরুতর বিষয়ের চিন্তা, আধ্যাত্মিক চিন্তা কয়জন লোক করে? পল্লবগ্রাহিতাই বর্ত্তমান যুগের পাণ্ডিত্য; মৌলিক চিন্তা বা গবেষণা অতি বিরল। তত্ত্বদর্শী বিবেকী মহাপুরুষগণ সমাজের অবস্থাদর্শনে হতাশ হইয়া পড়েন; বর্ত্তমানযুগের জীব উদর উপস্থ পরায়ণ বলিয়া কটূক্তি বা কটাক্ষপাত করেন। ইহার মূলে কি কোন সত্য নাই?

গণিকাবৃত্তি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে; নগর, সহর, বাজার, গ্রাম, এমন স্থান নাই যেখানে বেশ্যালয় নাই। যেস্থানে কতিপয় লোক স্বীয় আত্মীয় পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেছে, সেইস্থানেই বেশ্যালয় দৃষ্ট হয়। বড় বড় নগরে ও সহরে দেখা যায়, কন্দর্পদেবের পূজার জন্য দূর দূরস্থ গ্রাম হইতে বালিকাপহরণ, পরস্ত্রী অপহরণ প্রভৃতি জঘন্য ব্যবসায় চলিতেছে। শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া প্রচ্ছন্ন সমাজদ্রোহিগণ কামপ্রবৃত্তি পরিপোষণকারী গ্রন্থরচনা বা সঙ্কলন করিয়া উহা অবাধে প্রচার করিতেছে। চতুর্দ্দিকে প্রণয়গাথা, প্রণয়লিপি, তরল-ভাবোদ্দীপক গল্প, রাজ-রাজড়াদের কলঙ্ক-কাহিনী, কুরুচি ও কুভাবপূর্ণ কাব্য ও উপন্যাস

অভিসার অভিলাষব্যঞ্জক দৃশ্যসম্বলিত নাটকাদির ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে। বারবনিতার সহযোগে থিয়েটার সকলে অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে; অশোভন হাবভাবব্যঞ্জক দৃশ্যাবলী বায়োস্কোপাদিতে প্রদর্শন করা হইতেছে; এবং তাহাতেই দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ যুবক বৃদ্ধ যোগদান করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছে। মানবের নীচ বৃত্তি সংবর্দ্ধনের জন্য দেশ বিদেশ হইতে নানাপ্রকার চিত্র ফটোগ্রাফ প্রভৃতি আমদানী হইতেছে। অজ্ঞ মূর্খ ইতরব্যক্তিগণই যে এ সকলের পৃষ্ঠপোষক তাহা নহে; দেশের কৃতবিদ্য লেখক, গ্রন্থকার, সংবাদপত্র পরিচালক, ধনাঢ্য সম্ভ্রান্তলোক প্রভৃতি সকলেই, সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে ইহাদের পোষকতা করিতেছেন। জনসমাজ গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছে বলিয়াই এ সকল ব্যবসায়ের প্রতিপত্তি ও প্রসার; পোষকতা না পাইলে ব্যবসায় চলিতে পারিত না। কবি, টপ্পা, হোলী, কিশোরীভজনাদি সমাজের নিম্নস্তরে আবদ্ধ বলিয়া যাঁহারা গৌরবসূচক কথা বলেন, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত সভ্যসমাজের চিন্তানুধ্যানের বিষয় কি? এবং তাঁহাদের মানসিকভাবের চরিতার্থতার সামগ্রী কি? সুখপিপাসার নিবৃত্তি কোথা হইতে হইতেছে? দেশের লোক কি নিয়া মোহমুগ্ধের ন্যায় কালাতিপাত করিতেছে? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে বর্ত্তমানযুগের চিন্তানুধ্যানের মধ্যে উদর উপস্থের চিন্তা ব্যতীত অপর কিছুই নাই।

আমাদের শাস্ত্রকারগণের মতে মৈথুন অষ্টপ্রকার, যথাঃ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ ॥

কত কেলি কীর্ত্তন ব্যভিচার, ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্মাচরণ যে সমাজ দেহকে তিল তিল করিয়া ধ্বংস করিতেছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতেছে? কলাবিজ্ঞান, সভ্যরীতিনীতি প্রভৃতির নামে বিবিধ অপবিত্র সঙ্কল্প অধ্যবসায়াদি আজও অনায়াসে প্রসার প্রতিপত্তিলাভ করিতেছে। সঙ্কল্প থাকিলেই সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্যও প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। সভ্যতার কৃত্রিম চাপে ব্যভিচার ঢাকা থাকে না, তাই সময় সময় সভ্যসমাজের প্রকৃত মানসিক চিত্র বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

মন যে ক্ষেত্রে এত নিম্নস্থান অধিকার করিয়া আছে সেই ক্ষেত্রে উচ্চ চিন্তা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, গুরুচিন্তা অসম্ভব। এই আবেষ্টন ও আবহাওয়ার মধ্যে যে ব্রহ্মচর্য্যপালন প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গৃহকে সমাজকে অনুকূল করিতে না পারিলে কখনই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যশক্তির পুনরভ্যুদয় হইবে না। বর্ত্তমানযুগের লোক ধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা একদা সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনবিদিত ছিল, এক্ষণে তাহা ঊর্দ্ধগগনস্থ ছায়াপথের মৃদুভাতিবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; সেই আলোকের তেমন আবশ্যকতাও দৃষ্ট হইতেছে না। এ হেন অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যবল দ্বারা শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ঘুচাইতে না পারিলে কালস্রোত ফিরাইবার সম্ভাবনা কোথায়?

মানুষ-গুরুর প্রয়োজনীয়তা

—*—

(শ্রী যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়)

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যিনি চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, শান্ত, ব্যোমাতীত, নিরঞ্জন ও নাদবিন্দুর অতীত, সেই গুরুদেবকে নমস্কার।

হিন্দুশাস্ত্রের সাধনপন্থায় গুরুকরণ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গুরু ভিন্ন ধর্ম্মলাভ অসম্ভব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে হিন্দুর এই বিশিষ্টতা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। হিন্দু চিরকাল এই বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে এবং সেইজন্যই অমৃতের আস্বাদন ও সত্যের অনুভূতি তাহার করায়ত্ত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে বিগ্রহরূপে দর্শনে তাহার একাধিকার।

প্রাচীন সমাজে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল, তপস্যা ও জ্ঞানানুশীলন ছিল; তাই তখনকার লোকের মনে গুরুশক্তির নিত্যতা এবং নরদেহবিশিষ্ট গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক উঠিত না। সমাজ এখন অধঃপতিত হইয়াছে, বিধর্ম্মীর বিজাতীয় সভ্যতায় মানুষ অন্ধ হইয়াছে; তাই এখন প্রশ্ন উঠে—"গুরুর প্রয়োজনীয়তা কি?" তাই পাশ্চাত্য মোহমদিরায় বিভ্রান্ত হিন্দুসন্তান অভিমানের ঘাড় ভাঙিয়া শ্রীগুরুর চরণতলে লুটাইয়া পড়ে না, সাম্যের নিশান্ উড়াইয়া দাসত্ব বলিয়া বিদ্রোহ আনিতে চায়।

পৃথিবীর অন্যত্র কুত্রাপি এমন দৈন্যের সহিত মানুষের চরণে মানুষের আত্মসমর্পণ দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর "গুরুতত্ত্ব" মিথ্যা দাসত্ব বলিয়া প্রমাণিত হইল কি? "ভগবান্ সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, তিনি আমার হৃদয়েও রহিয়াছেন; তাঁহাকে ডাকিতে, তাঁহার নাম করিতে, আমিই সম্পূর্ণ সমর্থ; সমস্ত শাস্ত্র তাঁহার স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছে, স্বাধ্যায়নিরত হইয়া আমিই তাঁহার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি; ইহাতে গুরুর প্রয়োজনীয়তা কি রহিয়াছে?—আর সে প্রয়োজন থাকিলেও এমন দাসত্বের প্রয়োজন কি রহিয়াছে?"—এমন চিন্তা এ দেশের, এই ভারতবর্ষের হিন্দুসন্তানের যদি হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিব, কোন্ দেশে এমন শুনিয়াছ যে মানুষ মানুষকে এমন আকুলকণ্ঠে ডাকিয়া কহিয়াছে—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"—হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ। তোমরা শ্রবণ কর, আমি এই অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি।" কোন্ দেশের মানুষ মানুষকে মহামায়ার বন্ধনে বিমূঢ় শোকদুঃখজর্জ্জরিত ভীত মুমুক্ষু দেখিয়া এমন অভয়বাণী শুনাইয়াছে—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—তাঁহাকে জানিলেই এই জননমরণশীল সংসারচক্র হইতে মুক্তিলাভ করিবে, ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই।" মানুষ ভগবান্‌কে পাইয়াছে, তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছে, এমন আশার

কথা এই দেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশের মানুষ মানুষ মানুষকে শুনাইতে পারে নাই। ভগবানকে পাইয়া অন্য কোন দেশের মানুষ মানুষকে এমন করিয়া ডাকিয়া বলে নাই— "ভয় নাই, তাঁহাকে পাইবে, তাঁহার দর্শনলাভ হইবে; আমি তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় কহিতে পারি।" এমন আশার কথা, এমন অভয় আশ্বাসবাণী মানুষ মানুষের নিকটেই পাইয়াছে; তাই গভীর শ্রদ্ধার সহিত ভারতের মুমুক্ষু মানুষের প্রাণ মানুষের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহা দাসত্ব নহে—ইহা প্রেমের আত্মবিসর্জ্জন। এই বিসর্জ্জনে মনুষ্যগুরু সেখানে কল্পতরু হইয়া তাহাকে বরণ করিয়াছেন—তাহাকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন নাই।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতিই ধর্ম্মের অনুসন্ধান করিয়াছে, সকলেই না হোক্ অনেকেই এই জগৎসংসারের মূলকেন্দ্ররূপে একটা অনির্দ্দেশ্য শক্তি বা প্রেমের উৎস ধারণা করিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তি বা প্রেমের কেন্দ্রস্থ সত্তা যে মানুষের প্রত্যক্ষানুভূত হইতে পারে, এমন কথা কোন দেশের মানুষ কহিতে পারে নাই। ভারতের মানুষগুরু উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছেন—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি॥ (মুণ্ডক)

—জীব যখন সেই জ্যোতির্ম্ময় কর্ত্তা, ঈশ্বর, ব্রহ্মযোনি (সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন) পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হইয়া পরম সমত্ব লাভ করেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ (কঠ)

—যাহাকে তিনি বরণ করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে। তাহারই নিকটে পরমাত্মা নিজ তনু প্রকাশ করেন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ (কঠ)

—অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ দুঃখ অতিক্রম করেন।

এই চরাচর জগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে আবার বিলীন হইবে, যিনি একমাত্র সৎ, যিনি জ্ঞান, যিনি বিজ্ঞান, যিনি সত্য, যিনি অনন্ত, যিনি আনন্দ, তাঁহাকে অনির্দ্দেশ, অলক্ষ্য, অতর্ক্য ও অবাচ্য বলিয়াও পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ, ভারতের মানুষগুরুগণ, মানুষকে ডাকিয়া কহিয়াছেন—

হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। (কঠ)

তিনি হৃদয়ে সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু
তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥ (মুণ্ডক)

জ্ঞানপ্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত সাধক ধ্যানযোগে নিষ্কল (অখণ্ড) পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

সেই অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মসত্তা যে কেবল হৃদয়ে অনুভূত হয়, নিরাকার চৈতন্যশক্তিদ্বারা যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কেবল যে তাহাই অনুভূত হইতে পারিবে, এমন কথা নয়। বেদান্তদর্শনে মহর্ষি ব্যাসদেব কহিয়াছেন—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।
(ব্রহ্মসূত্র)

সংরাধনকালে তিনি দৃষ্ট হন, শ্রুতি স্মৃতি ইহার প্রমাণ।

এস্থলে 'অপি' এই শব্দ দ্বারা 'তিনি প্রত্যক্‌চৈতন্যস্বরূপ হইলেও' এই অর্থ বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন—

সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধনঞ্চ ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্॥

যোগিগণ সংরাধনকালে তাঁহাকে দর্শন করেন। সংরাধনের অর্থ ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান ইত্যাদির অনুষ্ঠান।

ঐ সূত্রের 'গোবিন্দভাষ্যে' মহাত্মা বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিতেছেন—সংরাধনে সম্যগ্‌ভক্তৌ সত্যাং চাক্ষুষাদিনা প্রত্যক্ষেণ গ্রাহ্যোঽসৌ ভবতি। কুতঃ প্রত্যক্ষেতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে সম্যক্ ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে তিনি চক্ষু প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হন। ব্রহ্ম কেবল মানস প্রত্যক্ষেই প্রাপ্তব্য এবং বিশুদ্ধ মনের দ্বারাই তাঁহার অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, ইত্যাদিরূপ কোন কোন শ্রুতিবাক্যের সিদ্ধান্ত নিরসন করিবার জন্যই মহর্ষি বেদব্যাস কহিতেছেন যে ভগবানকে সাধক আরাধনাকালে চাক্ষুষাদিতেও প্রত্যক্ষীভূত করিতে সমর্থ হয়েন অর্থাৎ দেখিতে পান। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতির ভগবৎদর্শনলাভের উপাখ্যান উক্ত বাক্যের প্রমাণ। কেন না শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ। যথা—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
(গরুড়পুরাণ)

মহর্ষি ব্যাসদেব উক্তসূত্রের পরের সূত্রে আবার বলিয়াছেন—'প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ' অর্থাৎ ভগবানের ধ্যাননির্ম্মিত অর্চ্চনাদি ক্রিয়ার অভ্যাস হইতে তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে। ধ্যানের বিশেষরূপ অভ্যাস হইতেই অতিশয় গুপ্ত পরব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায় ইত্যাদিরূপ উপনিষদ্‌বাক্যই উহার প্রমাণ।

সুতরাং দেখিতেছি, অন্য দেশের মানুষ যে স্থলে ব্রহ্মকে অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয় বলিয়া নিরস্ত হইয়াছে, সেস্থলে ভারতের মানুষ তাঁহাকে জ্ঞেয় অর্থাৎ জানা যায় বলিয়াছেন এবং শুধু তাহাই নহে, তিনি নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও ভক্তির সাধনায় মানুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন, এই আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন। সংসারদাবদগ্ধ মানব এই অমৃতসিঞ্চিত আশ্বাসবাক্যে মানুষগুরুর পদতলে লুটাইয়া পড়িবে না কেন?

বহুযুগযুগান্তর পূর্ব্ব হইতে ভারতীয় গুরুগণ এই বাণী মায়াভীত মানবগণকে শুনাইতেছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—"আমরা ভগবানকে দেখিতে পাইয়াছি, তোমরাও ইচ্ছা করিলে দেখিতে পার, তাঁহাকে দেখিলে সমস্ত শোক দুঃখের অতীত হইয়া যাইবে।" ভারতীয় গুরুগণের এই সত্যলাভ শিষ্যপরম্পরাক্রমে ঊর্দ্ধমূল—অধঃশাখ অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় বর্ত্তমানযুগেও নামিয়া আসিয়াছে। তাই সেদিনও সত্যজ্ঞানবিরহবিধুর উদ্‌ভ্রান্ত নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যক্ষেত্রে সত্যদর্শী রামকৃষ্ণপরমহংসকে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ভগবান্‌কে কি দেখা যায়?" তখন ভগবান্ রামকৃষ্ণ পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের ন্যায়ই কহিয়াছিলেন, "হাঁ, তাঁহাকে দেখা

যায়, আমি যেমন তোমাকে দেখিতেছি, তুমি যেমন আমাকে দেখিতেছ, সেইরকমই তাঁহাকেও দেখা যায়।" আহা, এমন প্রাণারাম অভয়বাণী, এমন চিত্তোন্মাদী আশার কথা শুনিয়াই ত ব্রহ্মচারী নরেন্দ্র আকুলক্রন্দনে ঐ মানুষগুরুর চরণতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, প্রকৃতির অন্তরের অন্তস্থল হইতে নিঃশব্দবাণী উঠিয়াছিল—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্
লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

—আজ কুল পবিত্র হইল, জননী কৃতার্থা হইলেন। বসুমতী পুণ্যবতী হইলেন। এই মানুষগুরুর দাসত্ব করিয়া যুবক নরেন্দ্র পথভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, না বিশ্বজগৎ তাঁহার মস্তকে বিজয়মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল? মানুষগুরু ভগবানেরই করুণার ঘনবিগ্রহ, নিষ্ঠাবান্ শিষ্যের সর্ব্ববাঞ্ছাকল্পতরু।

তাই গুরু যাজ্ঞবল্ক্য, যখন শিষ্য রাজর্ষি জনককে কহিয়াছিলেন,—(বৃহদারণ্যকে)

এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়েনং প্রাপিতোঽসি।

তখন রাজর্ষি জনক কহিয়াছিলেন—

সোঽহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি
মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি।

অর্থাৎ হে ভগবন্ বিদেহরাজ্য আপনাকে দান করিলাম, তৎসঙ্গে নিজকেও নিবেদন করিলাম।

ভারতের মানুষগুরুগণ মানুষকে এইরূপ অভয় প্রদান করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন এবং এখনও তাঁহাদেরই প্রসাদে ভারতবাসিগণ ইহপরকালের শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং বিদেশীয় বিধর্ম্মী মানুষগুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিলেও ভারতের ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু মানুষ প্রাণে প্রাণে মানুষগুরুর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

এই মায়াপ্রপঞ্চময় জগৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জগৎ মায়ার অধীন, কিন্তু তিনি মায়ার অতীত। জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার অখণ্ড সত্তা সর্ব্বভূতাবগাহী হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার এই সৃষ্টিলীলা হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া রহেন নাই, সমস্ত ভূতের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন এবং ইহার বাহিরেও তিনি রহিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ কহিতেছেন—যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ—ঊর্ণনাভ যেমন নিজের জাল রচনা করিয়া নিজকে আবৃত করে, তিনি সেইরূপ প্রাকৃতিক জগৎজালে নিজকে আবৃত করিলেন। কিন্তু জগৎ হওয়াতে ব্রহ্ম নিঃশেষিত হইয়া গেলেন না। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি (পুরুষসূক্ত)"—তাঁহার এক চতুর্থাংশে সমস্ত বিশ্ব, আর তিন অংশ বিশ্বাতিগ, অমৃত। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ"—আমি একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি। সুতরাং তিনি এই মায়ার জগৎমধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়াও ইহার বাহিরে মায়াধীশরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বিশ্বের সমস্ত ভূতের সহিত তাঁহার এই নিগূঢ় সম্বন্ধ, এই অব্যাহত যোগ এবং তাঁহার মায়াধীশত্ব ইহাই গুরুতত্ত্বের ভিত্তি। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

আমার এই ত্রিগুণময়ী অলৌকিক মায়া

নিতান্ত দুরতিক্রমা। যাহারা আমাকে ভজনা করে, তাহারা এই মায়া উত্তীর্ণ হয়।

মায়া যাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, মায়া যাঁহার অধীন, তাঁহার কৃপা ভিন্ন সে মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বস্তুতঃ থাকিতে পারে না। সুতরাং তিনিই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। তাঁহার এই ত্রাণশক্তি পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে, নতুবা মায়ার সৃষ্টি করিয়া নিজেই নিজের লীলা ব্যর্থ করিতেন। যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তিনি এই ত্রাণশক্তি বা গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনিই এই মায়ায় বদ্ধ হইয়া জীব হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে এই বন্ধনদশা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি পূর্ব্বেই গুরু হইয়া রহিয়াছেন। যেমন একজন মন্ত্রবলে ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিতে জানিলে, ঐরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে অপর একজনকে পুনরায় মানুষ হইবার মন্ত্রটী শিখাইয়া দেয়, নতুবা ব্যাঘ্র হইলে তাহার মন্ত্র স্মরণ থাকে না। সেই অপর ব্যক্তি মন্ত্রবলে পুনরায় তাহাকে মানুষ করিতে পারে, তাহার ব্যাঘ্রলীলা এইরূপে অন্ত হইয়া মানুষরূপ পুনরাগত হয়। সুতরাং মায়ার অধীন করিয়া জীব সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে তিনি পূর্ব্বেই গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন। সেইজন্যই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

সর্ব্বস্যচাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥

সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমি প্রবিষ্ট রহিয়াছি। আমা হইতে স্মৃতি ও জ্ঞান হয়, এবং আমাদ্বারাই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও হয়। বেদসকলের দ্বারা আমিই বেদ্য, আমিই বেদান্তার্থের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক অর্থাৎ আমিই লোকসকলের জ্ঞানদাতা এবং আমিই বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তা।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী "বেদান্তকৃৎ" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকশ্চ। জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ" অর্থাৎ আমিই জ্ঞানদাতা গুরু।

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্)

তাঁহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল।

সেইজন্যই বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে—'অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বসিতানি।' অর্থাৎ যেমন বিনা প্রযত্নে প্রাণিগণের নিশ্বাস প্রবাহিত হয়, সেইরূপ সমস্ত বিদ্যা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, যজ্ঞবিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান—সমস্তই সেই মহৎ ব্রহ্ম হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। সেইজন্যই পাতঞ্জলদর্শনকার বলিয়াছেন —'তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্'—'তাঁহাতে নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞতার বীজ রহিয়াছে' এবং সেইজন্যই 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' এই সূত্রে, বেদান্তদর্শনকার বেদব্যাস 'তাঁহা হইতেই সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে' বলিয়াছেন।

সুতরাং ভগবানই আদি গুরু। তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মা এই বিদ্যা প্রাপ্ত হন। যথা—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ॥
(শ্বেতাশ্বতর)

ভগবান্ প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদসমূহ প্রদান করেন। (ক্রমশঃ)

অভিভাষণ*

—*—

যৎসম্প্রযুক্তগুণভেদযুতার্করশ্মি
বৈশিষ্ট্য-হৃষ্টতনুবর্ণধিয়া বভূবুঃ।
বিপ্রাদয়স্তমখিলপ্রভবাদিহেতুং
মার্ত্তণ্ডমণ্ডলগতং পুরুষং প্রপদ্যে ॥

ব্রাহ্মণসভার এই উনবিংশ বার্ষিক অধিবেশন বর্ষবিভাগে ঊনবিংশ, অধিবেশনানুসারে কিন্তু ইহা অষ্টাদশ। সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ এবং কার্য্যকরী সমিতির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গুরুতর পীড়া বশতঃ অনুপস্থিতি প্রভৃতি বিবিধ কারণে গতবর্ষে সভার অধিবেশন হয় নাই; এবর্ষে শ্রীশ্রী৺ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় তাঁহারা উভয়েই পীড়ামুক্ত হইয়া এখানে উপস্থিত, অন্যান্য কারণও উপশান্ত, সুতরাং এই উনবিংশ বার্ষিক অধিবেশনকে যুগ্ম অধিবেশন রূপে গণ্য করিলে আর কোন অসামঞ্জস্য থাকে না।

ব্রাহ্মণসভার এই বার্ষিক অধিবেশনে আজ আমি যাহা বলিতেছি, হে সমাগত ভূদেবমণ্ডলি, কৃপাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করুন।

সপ্তশতী চণ্ডীতে যে বৈপ্রচিত্ত অসুর সংঘের কথা আছে, যে বৈপ্রচিত্ত অসুরগণের শোণিতরঞ্জিতদশনা মহাশক্তি রক্তদন্তিকানামে অভিহিত হইবেন বলিয়া চণ্ডীতে ভবিষ্যদ্বাণী আছে, আমরা আজ সেই বৈপ্রচিত্ত অসুরগণের তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যে যে অসুর বা আসুরভাব বিপ্রগণের চিত্ত হইতে সমুদ্ভূত, তাহারা কি বৈপ্রচিত্ত নামে অভিহিত হইতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে,—সেই বৈপ্রচিত্ত অসুরগণ ,ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গভূমির—শান্ত তপোবন বিধ্বস্ত করিতেছে। এক এক করিয়া সেই সমস্ত আসুরতার প্রদর্শন অসম্ভব হইলেও প্রধানতঃ তাহা কীর্ত্তন করিতেছি।

যে বংশ সদাচারে সুপ্রতিষ্ঠ, সেই বংশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণসন্তানও এখন, শাস্ত্রসম্মত সদাচার পালনে কেবল বিমুখ নহে, যাহারা পালন করিতে যত্নপর, তাহাদিগকে যেন-তেন-প্রকারেণ হেয় করিবার জন্যও ব্যস্ত। এই যে হীনভাব, এই যে ধর্ম্ম-দ্বেষ, ইহা বৈপ্রচিত্ত আসুর ভাবের একটা অভিব্যক্তি।

এই যে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনপ্রযত্ন, ইহার জন্য যে কয়জন প্রযত্ন করিতেছেন, তন্মধ্যে এমন কয়েকজন ব্রাহ্মণ সন্তান আছেন,—যাঁহাদিগের পিতৃপিতামহ সদাচারপূত শাস্ত্রবিশ্বাসী বিখ্যাত সুব্রাহ্মণ ছিলেন। অথচ তাঁহারা এই শাস্ত্রগর্হিত আন্দোলনে এমন মত্ত যে, পিতৃপথপরিত্যাগকে তাঁহারা সৎসাহস বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন। যে দেশে পিতৃবাক্য পালন মধ্যবিধ পুত্রের কার্য্য, পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া তদনুরূপ কার্য্য করাই উত্তমপুত্রের কার্য্য, সেই দেশে—সেই পবিত্র ভারতবর্ষে—এখন পিতৃবাক্য উপেক্ষিত, পিতার অভিপ্রায় অবজ্ঞাত, বৃদ্ধগণের পরম্পরাগত সদাচার কুসংস্কার নামে নিন্দিত। ইহা সেই যজ্ঞবিধ্বংসী আসুর ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি। এই বৈপ্রচিত্ত অসুরগণ বেদজ্ঞ নামেও পরিচিত হইতে ইচ্ছুক! ইহাঁরা জর্ম্মানির মুদ্রিত বা তদনুকরণে

* বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার উনবিংশ অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় দ্বারা পঠিত।

মুদ্রিত কিয়দংশ বেদের পুস্তকমাত্র যেন-তেন-প্রকারেণ নিজের গৃহাধিষ্ঠিত করিয়াই সর্ব্ববেদ পারদর্শী হইয়া বলিয়া থাকেন—এই আচার বেদে আছে, এ আচার বেদে নাই ইত্যাদি। বেদের বিবিধ শাখা; সেই বিবিধ শাখার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ আছে। পুরাণে তাহার পরিচয় আছে; সেই সুবৃহৎ বেদরাশির মধ্যে ৫৬টি শাখার মন্ত্রভাগ ও কতিপয় ব্রাহ্মণভাগ মাত্র মুদ্রিত। সেই মুদ্রিত বেদাংশের তাৎপর্য্যাবধারণ ক্ষমতা না থাকিলেও কুশিক্ষাগ্রস্তগণের অপসিদ্ধান্তকেই সৎসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া স্মার্ত্তসম্মত আচারকে নিতান্ত আধুনিক বলিতেও তাহারা লজ্জিত হয় না;—আসুর ভাবের এমনই প্রভাব।

সেই বৈপ্রচিত্ত আসুরভাবে আবিষ্ট জনগণ জানে না যে, স্মৃতি কাহার নাম এবং স্মৃতির প্রামাণ্য কতটা? জৈমিনীর সূত্রে বেদের প্রামাণ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও বেদাবিরুদ্ধ স্মৃতি ও শ্রুতির অবিরুদ্ধ শিষ্টাচারও পূর্ণ প্রমাণ রূপে পরিগৃহীত। ভগবান শঙ্করাচার্য্য মনুস্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন বেদের পূর্ণ প্রচার, সেই সময়ে মনুর প্রাধান্য সর্ব্বসম্মত—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥"

শ্রুতিও আছে—"মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজং ভেষজতায়া ইতি।"

সেই মনু বলিতেছেন—

দিবাকীর্ত্তিমুদক্যাঞ্চ পতিতং সূতিকাং তথা।
শবং তৎস্পৃষ্টিনঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানেন শুধ্যতি॥
৫ম অঃ, ৮৫ শ্লোক।

দিবাকীর্ত্তি (চণ্ডাল ও তত্তুল্য জাতি) রজস্বলা, পতিত, সূতিকা, শব ও শবস্পর্শীকে স্পর্শ করিলে স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইতে হয়। চণ্ডাল ও তত্তুল্যজাতির দিবাকীর্ত্তি নাম হইবার হেতুও মনুসংহিতায় আছে—

রাত্রৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ।
মনু ১০।৫৪।

চণ্ডালজাতির রাত্রিকালে গ্রামে নগরে বিচরণ নিষিদ্ধ হওয়াতে তাহাদিগের কীর্ত্তি কেবল দিবসেই ঘটিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদিগের নাম দিবাকীর্ত্তি।

এই মনুস্মৃতির মূল স্বল্লাবশিষ্ট বেদমধ্যেই নিহিত আছে বুঝা যায়;—ভগবান শঙ্করাচার্য্য কৃত বেদবাক্য মধ্যে আছে—

পদ্যু হ বা এতচ্ছ্মশানং যচ্ছুদ্রঃ।

শূদ্র জঙ্গম শ্মশান;—শ্মশান যেরূপ অপবিত্র, শূদ্রও তদ্রূপ। এই শ্মশানসদৃশতা খ্যাপনদ্বারা তাহার অস্পৃশ্যতা সূচিত হইয়াছে। আবার বেদে অন্যত্র আছে, "নিষাদস্থপতিং যাজয়েৎ"—নিষাদও শূদ্রজাতীয়। যে শূদ্র শ্মশানবৎ অপবিত্র, তাহার যাজনবিধান আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইলেও মনু তাহার মীমাংসা করিয়াছেন—

শূদ্রানাং মাসিকং কর্ম্ম বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।
বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ—

শূদ্র দুইভাগে বিভক্ত—ন্যায়বর্ত্তী বা সৎশূদ্র এবং শূদ্র; এই সৎশূদ্রগণের আচার বৈশ্যতুল্য। বেদোক্ত এই নিষাদস্থপতি সৎশূদ্রের অন্তর্গত, এইজন্য ইহাদিগের বৈশ্যতুল্যত্বহেতু শ্মশানতুল্য অপবিত্রতা ইহাদিগের নাই—অপর শূদ্রগণ শ্মশানবৎ।

নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে।
মনু ১০।৮

ব্রাহ্মণসন্তান হইলেও নিষাদ শূদ্র। কেননা—

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥
মনু ১০।৪১

মনু দিবাকীর্ত্তি প্রভৃতিকে সেই শ্মশানতুল্য অপবিত্র শূদ্র বুঝিয়া তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল—মনু বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান বেদের অবিরোধসংস্থাপক ব্যাখ্যান মাত্র করিয়াছেন, বেদবিরুদ্ধ কিছুই করেন নাই, প্রত্যুত বেদবিধানের সমন্বয়যুক্ত অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। যাহারা বলে, মুসলমান রাজত্বের সময় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রকৃতই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বন্ধন করিয়াছেন, তাহা বৈদিক নহে, তাহারা কতদূর অজ্ঞ, আপনারা তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করুন। আর বুঝিয়া দেখুন—এই দম্ভ বৈপ্রচিত্ত আসুরভাব প্রসূত কি না? আর এই যে আসুরভাব, তাহা বৈপ্রচিত্ত হইলেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহার প্রভাব প্রবর্ত্তমান। এখন যে আর একদল আছেন, তাঁহারা আমাদিগকে তন্ত্রাচার সমর্থন করিতে দেখিয়া বলেন,—তন্ত্রে ত ভৈরবীচক্রে কোন দোষ নাই, তবে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার কেন? শৈব বিবাহ যখন আছে, তখন অসবর্ণ বিবাহে দোষ কি? তাহাদিগের অজ্ঞতায় দুঃখ হয়; বৈপ্রচিত্ত অসুরের পরাক্রম দর্শনে বিস্ময় উপস্থিত হয়। যাহারা ঐ সকল কথা বলে, তন্ত্রসম্মত আচার কয়টা বা ভাব কয়টা, তাহা একেবারেই জানে না; জানিলে এমন কথা বলিতে পারিত না।—তন্ত্রে সাতটী আচার আছে, তিনটী ভাব আছে; বৈদিক আচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার—এই চতুর্ব্বিধ আচার ও পশুভাব নির্দ্দিষ্ট সাধারণ অধিকারীর জন্য, এই আচার ও ভাবে ভৈরবী চক্রও নাই শৈববিবাহও নাই, যাঁহারা উপযুক্ত অধিকারী, তাঁহাদিগের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। যেমন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
(গীতা)

এই যে সমদর্শন, তাহা উচ্চাধিকারীর; তেমনই ভৈরবীচক্রে শৈববিবাহ যে সাধনমার্গে বিহিত, তাহার অধিকার তন্ত্রশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহার অধিকারী সাধারণ নহে; আর সাধারণ লইয়াই সমাজধর্ম্ম। প্রবাদ আছে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কারণ সেবা করিলে, তাঁহার কতিপয় শিষ্য, গুরুপ্রসাদ বলিয়া অবশিষ্ট কারণ সানন্দে পান করে। তখন ভগবান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সুরা পান করিলে কেন? শিষ্যগণ উত্তর করিল, গুরুপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছি। আচার্য্য কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক কর্ম্মকারশালায় তপ্তলৌহপিণ্ড দেখিয়া তাহার কয়েকটী অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করিলেন, শিষ্যগণ তাহা দেখিল, কিন্তু গুরুপ্রসাদ গ্রহণে অগ্রসর হইল না; তখন আচার্য্য বলিলেন,—কৈ গুরুপ্রসাদ লইলে না? শিষ্যগণ ভীত ও নীরব রহিল। তখন আচার্য্য তাহাদিগকে পতিত করিলেন। প্রবাদ অসত্য হইতে পারে, কিন্তু এই প্রবাদের মধ্যে যে মহাসত্য নিহিত আছে, তাহা নিঃসন্দেহ। সে মহাসত্য এই যে কাম বা লোভবশতঃ মানুষ যাহা করে, তাহা সমর্থন করিবার জন্য শাস্ত্রের যে কোন বচন প্রমাণস্বরূপে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু সেই বচনের প্রয়োগস্থান কোথায়, সে কার্য্যের অধিকারী কে?—এ সব বিচার করিতে চাহে না, প্রতিকূলবচনগুলিও শুনিতে চাহে না। একদল 'পণ্ডিত' গজাইয়াছেন; তাঁহারাও এই পথের পথিক; টাকা হইলেই হইল, অশ্বনেত্র চিকিৎসায় যে 'কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ' আছে, তাহা মানুষের নেত্রচিকিৎসাতেও প্রয়োগ করিতে তাঁহারা অকুণ্ঠিত। এই সমস্ত বৈপ্রচিত্ত অসুরের পরাক্রম।

শাস্ত্রে স্পর্শদোষ বিশেষভাবে থাকিলেও—তাহা ঘৃণায় প্রতিষ্ঠিত নহে ; মনুর যে বচনে 'দিবাকীর্ত্তি' স্পর্শ নিষিদ্ধ, সেই বচনেই রজস্বলা ও সূতিকা স্পর্শও নিষিদ্ধ। প্রিয়তমা পত্নী কখন ঘৃণার পাত্রী নহেন, যে বংশধরকে প্রসব করিয়া ভার্য্যা 'জায়া' হইয়াছেন, যে বংশধর নিজের পুন্নাম নরক ত্রাণকর্ত্তা এবং পিতৃপুরুষের আশা ও আনন্দ স্থল, প্রসবের পর (সূতিকা) ব্রাহ্মণী বিশদিন অস্পৃশ্যা, এই যে অস্পর্শ ইহাকে যে ঘৃণার ফল বলে, তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায় ?

স্পর্শবিষয়ে সাবধানতা বৈজ্ঞানিক দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিজ্ঞান স্থুল বিজ্ঞান নহে—সূক্ষ্ম ত্রিগুণবিজ্ঞান। কিরূপ বস্তু বা ব্যক্তি স্পর্শে মানুষের রজোগুণ অথবা তমোগুণ বৃদ্ধি হয়—তাহা সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের পরিজ্ঞাত ছিল ; তদনুসারে উপদেশ দিয়াছেন, যাহাতে রজোগুণ ও তমোগুণের বৃদ্ধি না হয়, সেইরূপ কার্য্য করিতে। স্পর্শ, পান, ভোজন ইত্যাদি সকল সংসর্গেই যে একটা নিয়ম আছে, তাহার মূল কারণ এই ত্রিগুণ বিজ্ঞান। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি, তমোগুণ ক্ষয় ও রজোগুণের সামঞ্জস্য সম্পাদনই ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। প্রবৃদ্ধ সত্ত্বগুণের সহায়তায় যখন সত্ত্বগুণের উন্মেষ হয়, তখন আর তাহাকে রজোগুণ ও তমোগুণ স্পর্শ করিতে পারে না। রাত্রিতে অন্ধকার, দীপালোক ও সূর্য্যোদয়, এই তিনটির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে। অন্ধকার দূর না হইলে দেখিতে পাওয়া যায় না ; তাই সে সময়ে দীপালোকের ব্যবস্থা এবং বাত্যায় দীপ নির্ব্বাণ না হয়, তাহারও উপায় করিতে হয়। এইরূপ উপায়ে দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখন আর দীপালোক রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয় না। তত্ত্বজ্ঞান হইলে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির জন্য যে বিধি-নিষেধ আছে, তাহার প্রয়োজন থাকে না।

এই ভাব মোক্ষশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। মোক্ষশাস্ত্রের উদ্দেশ্য সাধারণ নহে, বিশেষ মোক্ষাধিকারী অতি বিরল। এই ভাবব্যত্যয়, অধিকার ভেদে অনভিজ্ঞতা সেই বৈপ্রচিত্ত অসুরের কার্য্য। "

ঈশ্বর না করুন, এই প্রদেশেই যদি আবার সেইরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, হিন্দুগণের সে বিক্রম, সে সাহস, সে প্রতিভা আর দেখা যাইবে না। যাহারা হিন্দুমহাসভা বা কংগ্রেসের সহিত সম্মিলিত হয় নাই, এখনও তাহাদিগের ভিতর ধর্ম্ম বন্ধন আছে ; ধর্ম্মকার্য্যে সংযমশক্তির প্রয়োগ এখনও তাহারাই করিতে পারে। কেননা, তাহাদিগের হৃদয় হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন এখনও স্খলিত হয় নাই, শাস্ত্রবিশ্বাস এখনও বিনষ্ট হয় নাই। কিন্তু বৈপ্রচিত্ত অসুরগণের যে বিক্রম দেখিতেছি, তাহাতে প্রাণে আশঙ্কা হইতেছে—এই ধর্ম্মবন্ধন ও শাস্ত্রবিশ্বাস অচিরেই বিনষ্ট হইবে।—৺তারকেশ্বর তীর্থে ইহার একটু সূচনা দেখা গিয়াছে। মহাবীরদল ও কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ তারকেশ্বর তীর্থে মোহান্তের অত্যাচার নিবারণার্থে যত্ন করিয়া আমাদিগের সন্তোষ সাধন করিয়াছেন ; পক্ষান্তরে কতকগুলি অনাচারের সমর্থন করিয়া আমাদিগকে ক্ষুভিতও করিয়াছেন। পরিশেষে সে অনাচার পরিহারে তাঁহারা যে যত্ন দেখাইয়াছেন, তাহাও এই ব্রাহ্মণসভার আন্দোলনের ভয়ে, কিন্তু প্রাণের আকর্ষণে বা কর্ত্তব্য

বুদ্ধিবশতঃ নহে। একটী গূঢ় কথা আজ প্রকাশ করিতেছি। ৺তারকেশ্বরের তৎকালিক সত্যাগ্রহ যে পরিণামে অচল হইবে, ইহা বুঝিয়া বাঙ্গালীর মান রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণসভা বৈধ উপায় আশ্রয় করিতে নেতৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন; তাঁহারা সে কথামত কার্য্য না করিয়া দেবত্র সম্পত্তির অর্দ্ধাধিক অংশ মোহান্তকে অর্পণ করিয়া হীন সন্ধি করিতে প্রস্তুত হন, আর ব্রাহ্মণসভার বিরুদ্ধে বিবিধ কলঙ্কারোপ করেন। অথচ সেই হীন সন্ধি। তাহার মূলে যে কিরূপ হীন ভাব কতিপয় ব্যক্তির হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিব না; কিন্তু সেইস্থানে বর্ত্তমান সময়ে অনুসন্ধান করিলে সকলেই তাহা জ্ঞাত হইতে পারেন। এ সব ভাব কি? ইহা সেই আসুর ভাব।

হে ব্রাহ্মণমণ্ডলি! সেই বৈপ্রচিত্ত অসুর সংহারের উদ্দেশ্যে আপনারা ব্রহ্মণ্যদেবের মহাশক্তির শরণাপন্ন হউন। সত্ত্বগুণের অনুগামী রজোগুণের আশ্রয়ে সৎকর্ম্মশক্তি প্রবুদ্ধ করুন। সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিসমূহ এতদিন যে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সে উপেক্ষা করা আর চলিবে না। এখন সেই বৈপ্রচিত্ত অসুরকুল সংহারের জন্য রক্তদন্তিকা মূর্ত্তি আবির্ভাবের প্রয়োজন। মা ভবিষ্য বাণী করিয়াছেন,—

"পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্বৈপ্রচিত্তান্মহাসুরান্॥
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ।
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যান্তি সততং রক্তদন্তিকাম্।"

এখন ব্রাহ্মণ-সভার কর্ত্তব্য, সমগ্র ভারতে—ভারতে না হয়,—অন্ততঃ সমগ্র বঙ্গদেশে সদুপদেশ প্রদানের ব্যবস্থা সম্পাদন, উপযুক্ত ধার্ম্মিক বাহিনী সংগঠন। এই বাহিনী ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ মাথায় লইয়া, আত্মদ্রোহ প্রবৃত্ত জাতিগণের বিরোধ দূরীকরণে ও মিলনের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইবেন। ব্রাহ্মণ সভা এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের ভার গ্রহণ করুন। কেবল কি শাস্ত্রতত্ত্বে—সমাজকর্ম্মেও বৈপ্রচিত্ত অসুরের দৌরাত্ম্য!

শ্রীযুক্ত গান্ধি স্পর্শদোষ সম্বন্ধে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলিলেও আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধে জাতিভেদ তাঁহার সম্মত, মেদিনীপুর সভাতে সে কথা তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, কিন্তু যাহারা গান্ধিভক্ত, তাহারা কি সে বিষয়ে গান্ধির উপদেশ মানিয়া থাকে? ভোজন যে এখন অবারিত, ফলতঃ গান্ধির প্রতি ভক্তি বা অনুরাগ একটা ছলমাত্র। কোন প্রকার সংযমের অনুসরণই এখন কষ্টকর; কেবল পশুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছ ব্যবহারই এখন কুশিক্ষাগ্রস্ত লোকে চাহে; তাহাই জনমত নামে প্রখ্যাপিত। পরন্তু জনমত এখনও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিকূলে যায় নাই। সংবাদপত্রের নেতৃবৃন্দ এখন উন্মার্গগামী; এই নেতৃবৃন্দ কুশিক্ষামোহাবৃত বা বৈপ্রচিত্ত আসুরভাবে মূঢ়। ইহাদিগের প্রত্যেক কার্য্যই সমাজের অকল্যাণকর। হিন্দু মুসলমানের একতার জন্য ইহাদিগের যে চেষ্টা, তাহার বিপরীত ফল প্রত্যক্ষ; এই একতার প্রযত্নই হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষের হেতু হইয়াছে। ১৩১৩ সালে ময়মনসিংহ জামালপুরের প্রতিমা ভঙ্গ ও তাহার অল্পদিন পরে বঙ্গীয় রাজধানী কলিকাতার বক্ষে বড়বাজারে মাড়ওয়ারিগণের উপর অকথ্য মুসলমান নির্য্যাতন হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত কত হিন্দু-

মুসলমানে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে তাহার ষোড়শাংশও হইত না। যাহারা স্বধর্ম্মে স্বশাস্ত্রে আস্থাশূন্য হইয়া, নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে উচ্চ সনে স্থাপন করে, তাহাদিগের কার্য্য পরম্পরায় যে সমাজের মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

"ধর্ম্মো জগতঃ প্রতিষ্ঠা।" তুমি বর্ণাশ্রমধর্ম্মী, তুমি শুদ্ধি আন্দোলন তুলিয়া বৃথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ রাজনীতিমার্গের প্রসার লাভার্থে যে যত্ন করিবে, তাহা কি কখন মঙ্গলকর হইতে পারে? জাননা কি—একবিন্দু গোমূত্র পাতেই দুগ্ধকুম্ভ বিনষ্ট হয়,—ধর্ম্মময় বর্ণাশ্রমী সমাজে—সত্যসদাচারপূত বর্ণাশ্রমিসমাজে অধর্ম্ম অসত্য ছলচাতুরী প্রবেশ করিলে তাহাতে সমাজ ধ্বংস অনিবার্য্য। অনেক শিক্ষাবিভ্রমগ্রস্ত নেতৃসংজ্ঞায় সম্মানিত পুরুষ দেশের ঐক্য স্থাপন প্রয়াসী। তাঁহাদিগের মতে ঐক্য হইতেছে আহারে বিহারে একাকার, কিন্তু জানা উচিত—সে ঐক্য ঐক্যই নহে, ধর্ম্মবন্ধনমূলক ঐক্যই প্রকৃত ঐক্য। পূর্ব্বে সমাজের যে কোন জাতি স্বধর্ম্মে, শাস্ত্রে ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণজাতির প্রতি ভক্তিমান ছিল, গো ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ জীবনত্যাগ পরমধর্ম্ম বলিয়া সকলে মনে করিত, এখন কিন্তু নেতা নামধারীদিগের উৎপাতে সে ভাব সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে আত্মদ্রোহের উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে যে জাতিভেদ—উৎকর্ষ অপকর্ষ,—এ ধারণা এখন নষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ কতকগুলি জাতিকে চাপিয়া রাখিয়াছে, শাস্ত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের রচনামাত্র, এই ধারণা যাহাতে জনসমাজে বদ্ধমূল হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। শাস্ত্র কল্পিত হইলে ধর্ম্মও কল্পিত মাত্র, এভাব লোকের মনে হইবেই। যত এই ভাব প্রসারিত হইতেছে, ততই হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ বাড়িতেছে। সংবাদপত্রে দেখিলাম, এক আর্য্যসমাজীর চেষ্টায় হুগলীর একজন মুসলমান কল্পিত শুদ্ধি আশ্রয়ে "আর্য্য হিন্দু" হইয়াছে। আর এই বর্ষে ২০০।৩০০ হিন্দুমুসলমানও খৃষ্টান হইয়াছে। হইবারই কথা; "হিন্দু" নাম ধারণ করিয়া যদি হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাবাদ করে, তাহার ভাঙ্গা দলে প্রবেশ না করিয়া একটী প্রতিষ্ঠিত সমাজ প্রবেশের চেষ্টা যে স্বাভাবিক। পিতৃপিতামহক্রমাগত ধর্ম্মই যদি কল্পিত হয়, তবে তুমি সেই দলের এক ছোকরা; তোমার কথা না শুনিয়া পুরাতন মুসলমান বা খৃষ্টান হইতে ইচ্ছা হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি;—কোন ধার্ম্মিক ভট্টাচার্য্যের পুত্র যদি মিথ্যা ঘোষণা করে যে, "আমার পিতাকে তোমরা ভক্তি কর, তাঁহার কথা শুনিয়া থাক বটে, কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, ইহা তোমাদিগের মস্ত ভুল; আমি জানি আমার পিতা বুজরুক,—তোমরা তাঁহাকে মানিও না; আমাকে মান্য কর, আমার কথা শুন।" ইহা প্রচার করিলে, সাধারণ শ্রোতার মনে হয়—এই যুবক ভট্টাচার্য্যের পুত্র; ঘরের খবর এ যত জানে, তত আমরা জানিব কিরূপে? অতএব ইহার কথা সত্য, ইহার পিতা যথার্থই বুজরুক কপটী, তাহার কথা শুনা আমাদিগের উচিত নহে। আরও তাহারা মনে করে—এখন সেই বুজরুক ভট্টাচার্য্যের পুত্রের কথা শুনিব কি না? এই প্রশ্নের সমাধান তাহাদিগের মনে তখনই হয় যে, না—এই বা কেমন, তাহা বুঝিব

কেমন করিয়া ?—যদি ভটাচার্য্যের শাস্ত্রই মিথ্যা হয়, তবে ভট্টাচার্য্যের পুত্রের শাস্ত্র যে সত্য, তাহার নিশ্চয় কি ?—অতএব তার পথে যাওয়া হইবে না, মৌলবী সাহেব, পাদরী সাহেব কেমন আদর করে, কেমন যত্ন করে। বুড়ো কর্ত্তাদের ধর্ম্ম যদি ঝুটাই হয় তাহা ছাড়িয়া মুসলমান বা খৃষ্টান হওয়াই ত ভাল। এই মনে করিয়াই আর্য্যসমাজের আন্দোলনের ফলে, হিন্দুসভার ও কংগ্রেসের প্রচারের ফলে ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মণভক্ত বাগতীত (বাগদী) নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিদের অন্তর্গত নানাব্যক্তি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে। আর্য্যসমাজীদিগের শুদ্ধিকরণে মুসলমান ও খৃষ্টানেরাও জোরে প্রচার কার্য্য চালাইতেছে। ইহার ফলেও অনেকে আকৃষ্ট হইতেছে। হিন্দুসন্তান হইয়া পৈতৃক ধর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন যাহারা করে, শাস্ত্র ও শাস্ত্রসেবী ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষ যাহারা করে, তাহারা জাতীয় বিলোপ সাধনে অগ্রণী ;—তাহাদিগের আসুরভাব দমনের জন্য বৈধচেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য।

অর্থাৎ রাজনীতি বিষয়ে কল্পিত সুবিধা লাভের জন্য নেতার দল যে ঐক্যস্থাপনের উপায় প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাই আত্মদ্রোহের পরস্পর অনৈক্যের হেতু হইতেছে। পূর্ব্বে এই কংগ্রেস সামাজিক বিপ্লব সম্পাদনে নিরস্ত ছিলেন, কংগ্রেসের পূর্ব্বতন প্রতিষ্ঠাতৃবৃন্দ এই দোষ দেখিতে পাইতেন, কিন্তু এখনকার কংগ্রেস ও হিন্দুসভা, তাহা বুঝিতেছেন না—তাঁহারা ঘরে ঘরে অনৈক্যের বীজ বপন করিতেছেন, হিন্দুর সঙ্ঘশক্তি বিধ্বস্ত করিতেছেন। মুসলমানের সহিত সংঘর্ষে বসিরহাটের হিন্দুগণ হিন্দুসভা সংস্থাপনের পূর্ব্বে যে সাহস ও বিক্রম দেখাইয়া ছিলেন, সে সংঘশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

যে ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরাক্রমে আমরা সেবা করিয়া আসিতেছি,—সদাচারপূত সংযমপ্রধান সেই ধর্ম্মই আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখিবেন, আমরা যেন তাঁহাকে ধরিয়া থাকি। আমরা শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি,—সেই ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না ; যে সময়ে যেমন ভাবে তাঁহার পরিবর্ত্তন করিতে হয়, শাস্ত্রই তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সে পরিবর্ত্তন শীতের প্রাদুর্ভাবে শীতবস্ত্র ব্যবহার, গ্রীষ্মের আধিক্যে শৈত্যোপচার যেমন পরিবর্ত্তন সেইরূপ ; কলিকালে মানুষের স্বভাব বিপথগামী—পূর্ব্বে যে সংযম শীতাগমের পূর্ব্বে শীতবস্ত্র ব্যবহারের ন্যায় নিষ্প্রয়োজন, কলিকালে সেই সংযম শীতাগমে শীতবস্ত্র ব্যবহারের ন্যায় আবশ্যক ; আবশ্যক বলিয়াই ব্যবস্থা করা আছে। পূর্ব্বকালে ক্ষেত্রজ পুত্র ছিল, সে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন বিধি বড়ই সংযমযুক্ত ; কলিতে সেরূপ সংযম মানুষের হওয়া অসম্ভব, তাই কলিকালে তাহা নিষিদ্ধ। এইরূপ পরিবর্ত্তন শাস্ত্রেই আছে, কাম ক্রোধ লোভ দূষিত চিত্ত আধুনিক মনুষ্য সে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। তবে মানুষের অশক্তি হেতু যে সকল অনাচার সমাজে প্রবেশ করিতেছে, তাহার প্রতিরোধ সকল সময় সাধ্য না হইলেও—তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন—তাহা অনাচার। তৎপ্রতিকারে ধার্ম্মিকের প্রযত্ন সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। লোকের সুবিধার জন্য অর্থাৎ কাম প্রবৃত্তি, লোভ প্রবৃত্তি প্রভৃতি দুষ্টপ্রবৃত্তিসমূহকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য—ধর্ম্মকে লোকানুবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করার ন্যায় পাপ আর নাই, কেননা ইহাই জাতিধ্বংসের হেতু। আমাদিগের বর্ণাশ্রমধর্ম্মপদ্ধতি নিবৃত্তি-

মুখী আর প্রতীচ্য পদ্ধতি উদ্দাম প্রবৃত্তিমুখী। শিক্ষামোহগ্রস্ত প্রধান পুরুষগণের যে কোন কার্য্য, তাহাই প্রতীচ্য; সুতরাং উদ্দাম-প্রবৃত্তিমুখী। এই বিরুদ্ধ ভাব আমাদিগের সনাতন পদ্ধতি বিপর্য্যস্ত করিতে বসিয়াছে; আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে রাজধর্ম্ম আছে; অর্থ শাস্ত্রে রাজনীতি আছে। রাজধর্ম্ম ধর্ম্ম আর রাজনীতি অধর্ম্ম। দুষ্মন্তকে কণ্ব শিষ্য বলিয়াছিলেন,—

"আজন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো য
স্তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
পরাভিসন্ধানমধীয়তে যৈঃ
বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ।"

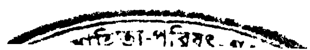
রাজনীতির মধ্যে শঠতা প্রবঞ্চনা মিথ্যা ইত্যাদি ভাবই প্রবল। সে ভাব সমাজের সেবা হইলে তাহাতে সমাজধ্বংস অনিবার্য্য। কালমাহাত্ম্যে সে মন্দভাব স্বতঃই উদ্ভূত হয়—রাজনীতির চর্চ্চায় তাহাদের ইন্ধনক্ষেপ একেবারেই অকর্ত্তব্য। তবে আমাদিগের পরাধীনতা অপনোদনের উপায় কি? এই প্রশ্ন কেহ আমাকে করিলে, যাহা প্রকৃত পরাধীনতা—তাহা আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সুবিন্যস্ত ধর্ম্মসেবা হইতেই বিদূরিত হয়। বিদেশীয় করগ্রাহী রাজা বাহিরে থাকিয়া দেশের শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলে তাহা প্রকৃত পরাধীনতা নহে,—মনকে পরের অধীন করিলেই প্রকৃত পরাধীনতা হয়। এখনকার এই প্রতীচ্যানুকরণ রাজনীতিচর্চ্চা, ইহাই প্রকৃত পরাধীনতার বীজ। যে পরাধীনতা জাতীয়বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে, যে বৈপ্রচিত্ত অসুরের কথা চণ্ডীতে আছে,—সেই বৈপ্রচিত্ত অসুরই এখন আমাদিগের সম্পূর্ণ পরাধীনতা আনয়ন করিতেছে। যে কল্পিত 'স্বরাজ', তাহাও প্রতীচ্যের নকল; সে স্বরাজ আমাদিগের প্রার্থনীয় নহে। আমাদিগের স্বরাজ দল বাঁধিয়া লাভ করিতে হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মনকে আয়ত্ত করিলে এই আনন্দময় স্বরাজ বা স্বরাজ্য পাইতে পারেন,—আসুরমোহে এই সত্যভ্রষ্ট হইয়া সমাজ বিপথে ছুটিয়াছে। যে সকল অভাব সৃষ্ট হইয়াছে, বিলাসে বাসনে যে সকল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাহার দমনই প্রকৃত স্বরাজ্যলাভের প্রথম সোপান। ইহাতে ব্যক্তির যেমন উপকার, জাতির তেমনই উপকার; ইহাতে রক্তপাত নাই, হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই; ইহার মূলমন্ত্র হৃদয়স্থিত ষড়রিপু জয়ে প্রযত্ন। এই রিপুজয়ের উপদেশই শাস্ত্রের বর্ণে বর্ণে বিন্যস্ত। এই রিপুবশেই জাতির দারিদ্র্য, এই রিপুবশেই জাতির দুঃখ, এই রিপুবশেই জাতির সর্ব্ববিধ অশান্তি। বর্ত্তমান রাজনীতি আন্দোলন এই রিপুগণেরই বিক্রম মাত্র। বৈপ্রচিত্ত অসুর বলেই এই রিপুদল প্রবল হইয়াছে। সেই বৈপ্রচিত্ত অসুর দমনের জন্য আমাদিগের সাধনাই অবলম্বনীয়, ধর্ম্মপথই আশ্রয়ণীয়, শাস্ত্রবিশ্বাসই করণীয়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

—*—

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত ১৮ই আশ্বিন মঠ হইতে পুরী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি শ্রীহট্ট, ময়নামতী, চট্টগ্রাম হইয়া সম্প্রতি ঢাকা পৌঁছিয়াছেন। তথা হইতে কলিকাতা হইয়া কার্ত্তিকের মাঝামাঝি সময়ে পুরী পৌঁছিবেন।

—*—



আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৮শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ { ৮ম সংখ্যা

বৈশ্বানরঃ

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।১।৩]

—※—

বৈশ্বানরায় পৃথুপাজসে বিপো
রত্না বিধন্ত ধরুণেষু গাতবে।
অগ্নির্হি দেবাঁ অমৃতো দুবস্যতি
অথা ধর্ম্মাণি সনতা ন দূদুষৎ॥

অন্তর্দূতো রোদসী দস্ম ঈয়তে
হোতা নিষত্তো মনুষঃ পুরোহিতঃ।
ক্ষয়ং বৃহন্তং পরিভূষতি দ্যুভি-
র্দেবেভিরগ্নিরিষিতো ধিয়াবসুঃ॥

বিশ্‌পতিং যহ্বম্ অতিথিং নরঃ সদা
যন্তারং ধীনামুশিজং চ বাঘতাম্।
অধ্বরাণাং চেতনং জাতবেদসং
প্রশংসন্তি মনসা জূতিভির্বৃধে॥

বৈশ্বানর তব প্রণাম্যাচকে
যেভিঃ স্ববির্দো বিচক্ষণ।
জাত আহপো ভুবনানি রোদসী
অগ্নে তা বিশ্বা পরিভূরসি ত্মনা ।।

পুণ্যপথে নিয়ে যাও, বীর্য্যশালী দেব বৈশ্বানর,
যজ্ঞভূমে যাজকেরা রচে তাই স্তুতি মনোহর।
হে অগ্নি, অমৃত তুমি, নিত্য কর দেবতার সেবা—
রাখিয়াছ সনাতন ধর্ম্মে, তাই তারে দূষে কেবা ?

দ্যুলোক-ভূলোক মাঝে কান্ত দূত কর বিচরণ,
হোতা তুমি, মানুষের পুরোভাগে নিয়েছ আসন।
সুবিশাল যজ্ঞভূমি ভূষিয়াছ আলোকছটায়—
নিরমল প্রজ্ঞা নিয়ে এস মর্ত্ত্যে দেব-প্রেরণায়।

প্রজাপতি তুমি দেব, সুমহান, অতিথিরতন—
বুদ্ধির নিয়ন্তা তুমি যাজকের কামনার ধন;
যজ্ঞের চেতন তুমি, পশ জীব-হৃদয়গুহায়—
স্তুতি নতি রচি নর নিত্য তব মহিমা বাড়ায়।

বৈশ্বানর, তব দিব্য দ্যুতি আমি করি গো বন্দন—
যার তেজে আলোকিয়া স্বর্লোকেরে জ্ঞান বিচক্ষণ।
জাতমাত্র রোদসীরে ব্যাপিয়াছ, আর ত্রিভুবন—
হে অগ্নি নিখিল বিশ্বে একা তুমি প্রভু চিরন্তন।

———*———

মানুষ-গুরুর প্রয়োজনীয়তা

—*—

(শ্রী যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়)

শ্রীমদ্ভাগবতে "য তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে" ইত্যাদি দ্বারা ইহারই প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে। সুতরাং স্বয়ম্ভু ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা এই বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে এই বিদ্যা জগতে প্রচারিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

এতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ। প্রজাপতির্মনবে, মনুঃ প্রজাভ্যঃ।

অর্থাৎ এই বিদ্যা ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু মানবগণকে বলিয়াছিলেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবান্ গুরুশক্তিরূপে স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং ভগবানই গুরু অথবা গুরুই ভগবান্, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। অতএব গুরু ও ভগবান দুইজন হইতে পারেন না। তবে দুইটী নামে তাঁহার দুইটী বিভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে মাত্র। তথাপি গুরু ও ভগবানকে যদি পৃথক্‌রূপে বিচার করা যায়, তাহা হইলে ভগবৎশক্তি হইতে গুরুশক্তিকেই বড় বলিতে হয়। ভগবান মায়া সৃষ্টি করিয়া নিজেই সে মায়ায় বদ্ধ হইলেন এবং অহংবুদ্ধি জাগ্রৎ করিয়া জীবরূপে আপনার স্বরূপ ভুলিয়া রহিলেন। ইহা তাঁহার আনন্দাস্বাদনের লীলা, কিন্তু জীবের দিক হইতে দেখিলে মর্ম্মঘাতী দুঃখের খেলা বলিয়াই মনে হয়। এই দুঃখ হইতে মুক্ত করিবার জন্য গুরুশক্তিরূপে তাঁহার করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং গুরুকে ভগবানের চেয়েও বড় বলিতে বাধ্য হইতে হয়। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন—

জীবের নিস্তার হেতু নন্দসুত হরি।
ভূতলে উদয় হন গুরুরূপ ধরি॥
মহিমায় গুরুকৃষ্ণ এক বলি জান।
অতএব গুরুবাক্য শিরে ধরি মান॥

মূল গুরুশক্তি ভগবানই মানুষগুরুরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণকে উদ্ধার করেন। গুরু ও ভগবান মহিমায় এক। এস্থলে 'মহিমায় এক' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মহিমার দিক বিচার করিলে গুরু ও ভগবান্ এক, কিন্তু করুণায় গুরু ভগবান হইতেও বড়! কারণ তাঁহারই করুণায় জীবের উদ্ধার সাধন হয়। এই জন্যই ভগবানের এই শক্তিকে শাস্ত্রকর্ত্তাগণ "গুরু" কহিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার তুলনায় অন্য সমস্ত, এমন কি ভগবানও লঘু। গুরুর গুরুত্ব গুরুনামেই প্রমাণিত হইতেছে।

মূল গুরুশক্তি ভগবান্ হইতে জ্ঞান ও ত্রাণশক্তি প্রসৃত হইয়া শিষ্যপরম্পরাক্রমে মানুষের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং ভগবৎতত্ত্ব জানিতে হইলে, তাঁহাকে পাইতে হইলে, মানুষগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত এবং শাস্ত্রেও তাহাই নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যথা—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
(মুণ্ডকোপনিষদ্)

তাঁহাকে জানিবার জন্য সমিধ হস্তে শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর অনুগামী হইবেন।

এস্থলে 'সমিধ' শব্দ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের শিষ্যের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও শাস্ত্রবিৎ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই স্থূল অর্থ। ছান্দোগ্যোপনিষদ কহিতেছেন—

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।

যিনি আচার্য্যকে আশ্রয় করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞান লাভে সমর্থ হন।

সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবেই। গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আপনা আপনি শাস্ত্রালোচনাদ্বারা তত্ত্বভাবনায় ভাবিত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না। পূর্ব্বোদ্ধৃত মুণ্ডকোপনিষদের 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ইত্যাদি' বাক্যের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কহিতেছেন—

শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাৎ।

শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ গুরুর অধীন না হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অন্বেষণ করিবে না।

সহস্র শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম অধিগত হইলেও গুরুমুখ হইতে আগত না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না। গুরু আশ্রয় করিবার পরেও, গুরু হইতে আগত না হইয়া অন্য যে কোন প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইলে তাহা ফলবতী হইবে না। উপনিষদুক্ত সত্যকাম-জাবাল সংবাদে ইহা জানিতে পারা যায়।

সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ গৌতম ঋষির নিকটে উপস্থিত হইলেন। গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন্ গোত্র? সত্যকাম কহিলেন—আমি কোন্ গোত্র, তাহা জানি না। মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি কহিলেন যে 'তিনি যৌবনকালে বহুব্যক্তির পরিচারিণীর কার্য্য করিতে করিতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং আমি কোন্ বংশসম্ভূত তাহা তিনি বলিতে পারেন না।' তাঁহার নাম জাবাল, আমার নাম সত্যকাম, সুতরাং আমি সত্যকাম জাবাল, এইমাত্র তিনি বলিলেন।

গৌতম সত্যকামের অসাধারণ সত্যপরায়ণতা দেখিয়া বলিলেন,—তুমি ব্রাহ্মণ, সমিধ আহরণ কর, আমি এইক্ষণেই তোমাকে উপনীত করিব।

এই বলিয়া তাহাকে উপনীত করিয়া, দুর্ব্বল ক্ষীণকায় গাভীদিগের মধ্য হইতে চারি শত গাভী মোচন করিয়া বলিলেন,—তুমি ইহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর, চারি শত গাভী সহস্র না হইলে প্রত্যাগমন করিবে না।

সত্যকাম দীর্ঘকাল প্রবাস করিলেন এবং ঐ সময়মধ্যে গাভী সহস্র সংখ্যক হইল। তখন পালের ষাঁড় বলিল,—হে সৌম্য! আমরা এক্ষণে সহস্রসংখ্যক হইয়াছি, আমাদিগকে আচার্য্যের বাটী লইয়া চল। আমি তোমার নিকট ব্রহ্মের চারি অংশের একাংশ বর্ণনা করিব।

সত্যকাম কহিলেন,—ভগবন্ বর্ণনা করুন।

ষাঁড় কহিল,—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এই চারি দিক্ ব্রহ্মের অবয়বস্বরূপ

এই চতুরবয়ব হইতে ব্রহ্মের প্রকাশময় নাম হইয়াছে। যে বিদ্বান্ ব্রহ্মের প্রকাশময় রূপের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে খ্যাতিলাভ করেন, পরে অমৃতলোক প্রাপ্ত হন। অগ্নি তোমাকে চারি অংশের আর এক অংশ বলিবেন।

সত্যকাম পরদিন প্রত্যূষে আচার্য্যের গৃহাভিমুখে গাভী পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে সত্যকাম সমিধ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বসিলেন। অগ্নি কহিলেন,—আমি তোমাকে ব্রহ্মের চারি অংশের একাংশ বলিতেছি। পৃথিবী ব্রহ্মের অবয়ব, অন্তরীক্ষ ব্রহ্মের অবয়ব, স্বর্গ ব্রহ্মের অবয়ব, সমুদ্র ব্রহ্মের অবয়ব। এই চতুরবয়ব হইতে ব্রহ্মের অনন্তময় নাম হইয়াছে। যিনি এই অনন্তময় চতুরবয়বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তময় হন এবং পরে অনন্তময়লোক প্রাপ্ত হন। হংস তোমাকে ব্রহ্মের এক অংশ বলিবেন।

পর দিন সত্যকাম সমস্ত দিন গাভী পরিচালনা করিয়া সন্ধ্যাকালে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় একটী হংস উড়িয়া আসিয়া বলিল,—আমি তোমাকে ব্রহ্মের চারি অংশের একাংশ বলিতেছি। অগ্নি ব্রহ্মের অবয়ব, সূর্য্য ব্রহ্মের অবয়ব, চন্দ্র ব্রহ্মের অবয়ব, বিদ্যুৎ ব্রহ্মের অবয়ব, এই চতুরবয়ব হইতে ব্রহ্মের নাম জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। যিনি ব্রহ্মের এই জ্যোতির্ম্ময়রূপ উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে জ্যোতির্ম্ময় হন এবং পরে জ্যোতির্ম্ময়লোক প্রাপ্ত হন। মদ্‌গুপক্ষী ব্রহ্মের অপরাংশ বলিবেন।

পর দিন পূর্ব্ববৎ অগ্নিসমক্ষে বসিলে একটী মদ্‌গুপক্ষী (পানিকৌড়ি) আসিয়া বলিল,—আমি তোমাকে ব্রহ্মের অপরাংশ বলিতেছি। প্রাণ ব্রহ্মের অবয়ব, চক্ষু ব্রহ্মের অবয়ব, শ্রোত্র ব্রহ্মের অবয়ব, মন ব্রহ্মের অবয়ব, এই চতুরবয়বহেতু ব্রহ্মের নাম আয়তনবান। যিনি আয়তনবান্ অর্থাৎ আশ্রয়বানরূপের উপাসনা করেন তিনি ইহলোকে আশ্রয়বান্ হন এবং পরে আশ্রয়বান্‌লোক প্রাপ্ত হন।

সত্যকাম আচার্য্যগৃহে উপস্থিত হইলে আচার্য্য কহিলেন,—হে সৌম্য! তুমি ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির ন্যায় শোভা পাইতেছ। কে তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছে?

'অন্যে মনুষ্যেভ্য ইতি হ প্রতিজজ্ঞে ভগবাংস্ত্বেব মে কামং ব্রূয়াৎ। শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি তস্মৈ হৈতদেবোবাচাত্র হ ন কিঞ্চন বীয়ায়েতি বীয়ায়েতি।'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্)

সত্যকাম কহিলেন,—'মনুষ্যভিন্ন অন্যদ্বারা আমি শিক্ষিত হইয়াছি। হে আচার্য্যদেব! এক্ষণে আপনি আমাকে শিক্ষা দিন্। আপনার ন্যায় ঋষিদিগের নিকটে আমি শুনিয়াছি, আচার্য্যের নিকটে বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহা ফলবতী হয়।' গৌতম ঋষি সত্যকামকে পুনর্ব্বার ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। তবেই দেখিতেছি, গুরুর নিকট হইতে আগত না হইলে যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হইতে পারে না। এমন কি মহাশাস্ত্রজ্ঞান হইলেও গুরুমুখ হইতে তাহা প্রাপ্ত না হইলে সে জ্ঞান সিদ্ধ হইবে না এবং সেইজন্যই ছান্দোগ্যোপনিষদ্ কহিয়াছেন,—আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠম্ প্রাপয়তি অর্থাৎ গুরু হইতে জ্ঞান লাভ হইলেই সে জ্ঞান অভীপ্সিত ফল প্রাপ্ত হয়। উপনিষদ্ কহিতেছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥
(কঠ)

বেদাধ্যয়ন দ্বারা, বহু বেদবাক্যশ্রবণ দ্বারা অথবা গ্রন্থার্থধারণসামর্থ্যসম্পন্ন বুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না। আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহারই নিকটে তিনি নিজতনু প্রকাশ করেন।

সুতরাং দেখিতেছি ব্রহ্ম বুদ্ধিলভ্য নহেন, তিনি বোধিলভ্য এবং তাহারই বোধিলভ্য যাহাকে তিনি নিজে কৃপা করেন অর্থাৎ গুরু হইতে শিষ্যে সঞ্চারিত হন। তিনিই সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তিনিই গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া শিষ্যরূপী ব্রহ্মাকে কৃপা করিয়াছিলেন এবং তাহাই শিষ্য হইতে শিষ্যান্তরে সঞ্চারিত হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং বহু তর্কযুক্তি, বহু বিচার, বহু কথার ঘোর-প্যাঁচ, বহু বিদ্যার বাহাদুরী, বহু বুদ্ধির খরচে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না, তাঁহাকে পাইতে হইলে গুরুকে পূজা করিতেই হইবে।

এই দেখুন, মুণ্ডকোপনিষদ্ কহিতেছেন—

স বেদৈতং পরমং ব্রহ্মধাম
যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্।
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা
স্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥

নিখিল জগৎ যে ব্রহ্মলোকে সমর্পিত রহিয়াছে, যে শুদ্ধ ব্রহ্মপদার্থ নিজ জ্যোতিঃ প্রভাবে প্রতিভাত হইতেছেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে বিদিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, কামবিরহিত মুমুক্ষুব্যক্তিগণ সেই আত্মবিৎ ব্যক্তির উপাসনা করিবেন। যে সুধী ব্যক্তি এইরূপ আত্মবিৎ ব্যক্তির উপাসনা করেন, তাহাকে আর পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

সুতরাং ব্রহ্মকে জানিতে হইলে ব্রহ্মবিৎ গুরুর উপাসনাই করিতে হইবে। উক্তশ্লোকের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কহিতেছেন—

তমেবোপাসতে পুরুষং যে হ্যকামা বিভূতি তৃষ্ণাবর্জ্জিতা মুমুক্ষবঃ সন্ত উপাসতে পরমিব দেবং তে ন পুনঃ ক্ব রতিং করোতীতি শ্রুতেঃ। অতস্তং পূজয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ॥

বিভূতি তৃষ্ণাবিরহিত হইয়া ও মুমুক্ষু হইয়া পরদেব ব্রহ্মের ন্যায় সেই আত্মজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা আর অন্য কিছুতেই রতি করেন না, শ্রুতিতে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মেই তাহাদের রতি হয়। অতএব তাঁহাকে, সেই ব্রহ্মজ্ঞব্যক্তিকে পূজা করিবে ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়।

আরও দেখুন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ কহিতেছেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যিনি ভগবানে পরাভক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং যিনি ভগবানের ন্যায় গুরুতে পরম-ভক্তিমান্, সেই মহাত্মার নিকটেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ অর্থযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়।

আর সেই জন্যই ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

ব্রহ্মবেত্তা গুরুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক (প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারঃ ইতি শাঙ্কর

তাধ্যম্) প্রশ্ন ও সেবা করিয়া (সেবয়া গুরু শুশ্রূষয়া) আত্মজ্ঞান শিক্ষা কর। তত্ত্বদর্শী গুরুগণই তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুকে মুক্তির উপায় বা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় প্রশ্ন করিতে হয়, তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিজের সমস্ত অভিমান চূর্ণ করিতে হয়, তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া, পূজা করিয়া নিজকে পবিত্র ও দীনাতিদীন করিতে হয়, তবে না তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের আসন প্রতিষ্ঠিত হইবে? তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্'—লোক সকলের জ্ঞানদাতা আমিই এবং আমিই বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তা। সুতরাং তিনিই গুরুরূপে শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ কহিতেছেন,—

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
ব্রহ্মসন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি॥
ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।

ব্রহ্ম জানিলে ব্রহ্মই হয়। ব্রহ্ম হইলে ব্রহ্ম জানা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন।

সেই জন্যই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কহিয়াছেন,—

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

যজ্ঞরহস্য

স্বামী রামতীর্থ

ব্রহ্মার মহাযজ্ঞভূমি পুষ্করতীর্থে বাস করবার সময় রামকে একবার চিঠি লিখে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল যে ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য-সাধনের উদ্দেশ্যে প্রাচীন যজ্ঞপ্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন প্রয়োজন কি না। তার উত্তরে রাম বলেছিলেন—

"সবচেয়ে বড় ধর্ম্মের নাম নেই; শুদ্ধির চরমোৎকর্ষ লজ্জার আকারে ফুটে ওঠে; যেখানে সতর্কতার নিতান্ত অভাব, সেখানেই খাঁটী সদ্বিবেচনা; সাধুতা যখন অন্তরে থাকে, তখন তাকে চেনা দায় হয়; বিকারহীন বুকারই সবচেয়ে পোক্ত হয়ে থাকে; সবচেয়ে উঁচু আওয়াজ শোনাই যায় না; আর যে বস্তু সবচেয়ে বড়, তাই নিরাকার।"

সূর্য্য যদি বোম্বাই আমকে ডেকে বলে, "আমি হিমালয়ের দেবদারু আর ভূর্জ্জ গাছকে আলো দিয়েছি, তাপ দিয়েছি, সুতরাং তোমাদের আর তা দেব না ওই সব পাহাড়ে বাক্সে গাছগুলোর কাছেই আমার শক্তি ও কল্যাণের মহিমা প্রকট করেছি—যেখান থেকে শক্তি আহরণ করে তোমাদের বাঁচতে হবে, পুষ্ট হতে হবে"—তাহলে বোম্বাই আমের দফা রফা হবে। সূর্য্য যদি কেবল বাগানের ফলের উপরই কিরণ ঢালে, তা হলে

মাঠের ফুল বাঁচে না ; বুদ্ধ, খৃষ্ট বা মোহাম্মদের কাছে সত্যের যে রূপ প্রকট হয়েছে, শুধু তাই ধরে শেক্সপীয়র, নিউটন বা স্পেন্সারের কিন্তু বাঁচা দায়। তাই আমাদের সমস্যা নিজেদেরই পূরণ করতে হবে, নিজেদের চোখ দিয়েই দেখ্‌তে হবে, অতীতকালের পরমপূজ্য ঋষিমুনির চোখ দিয়েই শুধু দেখ্‌তে থাকলে চলবে না। আর তা সম্ভবও নয়।

প্রত্যেক স্মৃতিই বল্‌ছে, "কালকে আমাদের এই এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল ; কিন্তু সেটা আজকে তোমাদের কাছে কেমন ঠেক্‌ছে ?" প্রত্যেক অনুশাসনই চলিত মুদ্রার মত, তবে কিনা তাতে আমাদের নিজেদের ছাপ মারা। ক্রমে ছাপ অস্পষ্ট হয়ে অচিন হয়ে যায়, তখন আবার টাকশালে মুদ্রাটা ফিরিয়ে দিতে হয়। দানা বাঁধ্‌ছে, ভাঙ্গছে, আবার বাঁধছে—এই করেই প্রকৃতির আনন্দ পরিবর্ত্তনহীন পরিবর্ত্তনের জীবনের মূল-সূত্র।

ভবিষ্যৎটা যার পেছনে, আর অতীতটা সর্ব্বদা সুমুখে, তার মত দয়নীয় দশা আর কারু নয়। আমি এখন যা কিছু বল্‌ব, তার প্রত্যেকটা কথা শ্রুতি, গীতা, মনুসংহিতা হতে শ্লোক তুলে সমর্থন করা যায়। কিন্তু ইচ্ছা করেই অতি সতর্কতার সঙ্গে সে পথ পরিহার করা হয়েছে, পাছে লক্ষ্যছেড়ে অবাস্তব প্রসঙ্গে চলে যেতে হয় অর্থাৎ শ্লোকের সঙ্গে শ্লোক ঠুকে কেবল কথার শুকনো হাড় চিবুতে হয় যদি। তা ছাড়া এতে কুশিক্ষার পথ প্রশস্ত করে পাপই অর্জ্জন করা হবে অর্থাৎ সত্যের অনুশীলনের চেয়ে পুঁথির অনুশীলনকে বড় করা হবে।

মহান্ শঙ্করাচার্য্যের এই ভুল হয়েছিল যে তাঁর হাতের আলোটা তিনি ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলেন। যে সত্য তাঁর অপরোক্ষ-অনুভূতিতে ফুটে উঠেছিল, তাঁকে প্রমাণ করবার জন্য শাস্ত্রবচনকে হিঁচড়ে-মুচড়ে তিনি সময়ের অপব্যবহার করলেন কেন ? তাঁর প্রত্যক্ষের চেয়ে কোন প্রমাণ বড় ছিল ? তার পরেও অন্যান্য আচার্য্যেরা এসেও ওই নিরুপায় শাস্ত্রবচনগুলো ঘেঁটে একই পাঁতি থেকে আপন মনগড়া অর্থ বের করে নিলেন আর তাঁদের এই সদুদ্দিষ্ট চেষ্টার ফলে সত্যের প্রগতি না হয়ে তার যাত্রা কুণ্ঠিত হয়েই রইল। স্পষ্ট কথায় বল্‌তে গেলে আজ যে ভারতবর্ষের এই দুর্দ্দশা, তার মূলে হচ্ছে প্রাকৃতিক-বিধানের বিপর্য্যয়—জীবন্ত মানুষকে পুথির ভূতের গোলাম করার ফলে এই হয়েছে। শ্রুতিজননীর আজ কি দুর্দ্দশা ! সুপুত্রদের মাঝে কেউ তাঁর চুলের মুঠি চেপে ধরে এই দিকে টান্‌ছে, কেউ ওদিকে টান্‌ছে। আসলে যার যা খুশী, তাই সে বলছে, কিন্তু শ্রুতির ঘাড় দিয়ে সেটা চালান করছে—সত্যের মর্য্যাদাই তাতে কলুষিত হচ্ছে। হে প্রাচীন ভারতের ঋষিবৃন্দ ! আজ কি দেশের এতই দুর্দ্দশা হয়েছে যে তোমাদের ছেলেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপারের মীমাংসা করতে গিয়েও একটা মৃতভাষার ব্যাকরণের সূত্র খুঁড়্‌তে হবে ?

বন্ধু, আইন-কানুন মানুষের জন্যই, মানুষ তো আর আইনকানুনের জন্য নয়। কেউ কেউ বলেন "ভাষ্য দিয়ে অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যৎকে দৃঢ়সূত্রে গেঁথে রাখা হয়েছে।" কি সুন্দর কথা, আর কি চমৎকার যুক্তি ! বলি, মান্ধাতার আমলের পোষাকে জোড়া-তালি আর রিপুকর্ম্ম কি কিছু কম করা হয়েছে ? সত্যের সঙ্গে রফার প্রয়োজন হয় না। জগৎ সংসার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করুক,

সূর্য্যের কি গরজ সঙ্গে [illegible] বেড়াবার ? অতীতের সঙ্গে ভা[illegible] রাখবার মতলবে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি কি বাইবেলের গোঁড়া সিদ্ধান্ত বা টীকা ভাষ্যাদির উক্তির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া চলে ? যা ভগবানের শ্রীমুখের বাণী, তা আমাদের কাছে স্বতঃপ্রভাসিত হোক্। এটুকু ভদ্রতা-জ্ঞান ভগবানের নিশ্চয়ই ছিল যে একটা কথায় দুটো মতলব রেখে তিনি কিছু বলেননি, কিম্বা এমন ইচ্ছা করেননি যে তাঁর কথার অর্থ নিয়ে জগৎ হাজার হাজার বছর ধরে কেবল ভুল হতে ভুলে টক্কর খেয়ে চল্‌তে থাকুক – অবশেষে হাজার হাজার বছর পরে, একজন স্বয়ংসিদ্ধ প্রবক্তা বা টীকাকার এসে বিচারকের নিরপেক্ষতার ভাণ করে তার অর্থ বের করবেন, অথচ তাঁর ব্যাখ্যার তলে তলে থাকবে উকীলের কূট চাল! সত্য প্রতিষ্ঠা কি কারু হুকুমে হয় ? সূর্য্যকে দেখতে হলে কি প্রদীপ জ্বেলে দেখতে হবে ? খৃষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, জারাথুস্ত্র বা বেদবেদান্ত এসে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করলেই কি গণিতের একটা সহজ সত্যেরও কিছু মর্য্যাদা বাড়বে ? রসায়নশাস্ত্রের মর্য্যাদা জানতে হলে আমরা সোজাসুজি পরীক্ষা করেই তা জানতে পারি। শুধু পরপ্রমাণ কথায় বিশ্বাস করে মাথাটা বোঝাই করা বুদ্ধিবৃত্তির নিদারুণ নিষ্পেষণ মাত্র। সত্য কাকে বলি ?—যা আজ হোক্, কাল হোক্, চিরকাল এক ভাবে আছে। একটা বিশেষ কোনও ঘটনার সঙ্গে তাকে ঘুলিয়ে ফেললে চলবে কি করে ? ঘটনা পরের মুখে শুনে মেনে নিতে পারি, কিন্তু সত্য জানতে হবে স্বরূপতঃ। বেদান্তের সত্য প্রতিষ্ঠা করতেও প্রমাণ, যুক্তিতর্কের প্রয়োজন কেন ? কেবল যথাযথভাবে যদি সে সত্যের উল্লেখ করতে পারি— তবে সেই উক্তিই তার অকাট্য প্রমাণ হবে। সুন্দরকে চিত্তাকর্ষক বলে প্রমাণ করবার জন্য বাইরের সুপারিশ প্রয়োজন হয় না।

যদি কিন্নরকণ্ঠে প্রাণমাতানো গান গাইতে পার বা ঘুমপাড়ানো মিঠে ছড়া বলতে পার, তন্দ্রাজড়তার আমেজ লাগাতে পার অর্থাৎ কিনা লোকের রুচিমাফিক কথা বলে তাদের অজ্ঞানকেই ফাঁপিয়ে তুলতে পার, তাহলে অগুণ্‌তি চেলাচামুণ্ডা জুটিয়ে ফেলা কোনও কঠিন কাজ নয়। কিন্তু সত্যই হচ্ছে বাস্তব, আর স্থাবর জঙ্গম সবই অবাস্তব; যে আপাতদৃশ্য রূপের খাতিরে সত্যকে বিসর্জন দিতে পারে—তাকে শত ধিক্! সত্য-সূর্য্য কি করে প্রবুদ্ধ হবে, তা আর তোমাকে বলতে হবে না—সত্য যেমন খুসী তেমনি আত্মপ্রকাশ করুক। বজ্রগর্জ্জনের সঙ্গীতে আমাদের ঝাঁকিয়ে তুলুক! আমিই সত্যস্বরূপ —এই দেহরূপী প্রতিভাসের মর্য্যাদা বাড়াবার জন্য আজ সত্যকে বিসর্জন দিয়ে আত্মহত্যা করব ?

এর পর যজ্ঞের কথায় আসা যাক। নানা দিক থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে আমরা যজ্ঞ সম্বন্ধে বিচার করব।

সাধারণতঃ যজ্ঞ বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি, তার মাঝে হবন বা আহুতিই মুখ্য অঙ্গ বলে ধরে নেওয়া হয়। আজকাল যাঁরা হবনের পক্ষপাতী (যেমন আর্য্যসমাজীরা) তাঁরা সাধারণতঃ এই যুক্তি দেখান—"হবন বায়ুকে নির্ম্মল করে, সুগন্ধ বিস্তার করে।" কথাটা কিন্তু খুব স্থূল এবং টেনে বুনে বলা। যে কোনও সুগন্ধই হোক না কেন, তাই উত্তেজক। আর

যা উত্তেজক, তা দেহকে যতটুকু চাঙ্গা করে তোলে, প্রতিক্রিয়া স্বরূপে আবার ততটা নামিয়ে আনে। উত্তেজক বস্তুতে আমাদের শক্তির সঞ্চিত ভাণ্ডার হতে ঋণ গ্রহণ করে বটে—কিন্তু ঋণটা নেওয়া হয় চক্রবৃদ্ধির হারে আর সে ঋণ কখনো পরিশোধ করাও হয় না।

কিন্তু কথা হচ্ছে কি, হবনবাদীরা যে যুক্তি দেখান, তার মাঝে হবনের ফলে সুগন্ধ বিস্তার হল গৌণ কথা। হবনের ফলে স্থূলতঃ যা উৎপন্ন হয়, তা হচ্ছে কার্ব্বণ ডায়োক্সাইড্। ও একেবারে খাঁটী বিষ। তাই কি বায়ুমণ্ডলকে নির্ম্মল করে?

এক সময়ে ভারতবর্ষে মানুষের বসতি কম ছিল, তার তুলনায় জঙ্গল ছিল বেশী। তখনকার দিনে ঘৃত প্রভৃতি হাইড্রোকার্ব্বনেট দাহন করলে তাতে উদ্ভিজ্জের পুষ্টির সহায়তা হওয়া সম্ভবপর ছিল—যদিও সে সহায়তাও খুব বেশী নয়। ফল কথা, যে কার্ব্বণ ডায়োক্সাইড্ উৎপন্ন হত, তাতে বায়ুমণ্ডলে উদ্ভিদের দরুণ খাদ্যসঞ্চয় হত বটে। কিন্তু আজকাল তো সে যুগ নাই। আমাদের দেশে বনজঙ্গল তো নাই ই, বরং এখন লোকে একেবারে ঠাসাঠাসি হয়ে গিয়েছে। এ অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বন ডায়োক্সাইডের ভাগ অমনিই বেশী হয়ে গিয়েছে। তাইতে আমাদের মধ্যে জড়তার বৃদ্ধি হয়েছে। ভারতবর্ষে আজকাল প্রচুরপরিমাণে অক্সিজেন ও ওজোন বাষ্পের দরকার—কার্ব্বণ ডায়োক্সাইড্ নয়।

এ কথা মনে রেখো, যে ক্রিয়াতে বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক ফল উৎপন্ন হয়, তা কিন্তু ঠিক লোকজনকে খাওয়ানোর মত। বহুমূল্য ঘি কৃত্রিম অগ্নিতে আহুতি না দিয়ে, যে জঠরাগ্নি আজ লক্ষ লক্ষ নারায়ণরূপী জীবন্ত বিগ্রহের অস্থি মাংস দগ্ধ করছে, তাকে তৃপ্ত করবার জন্য দুমুঠো শুকনো দানাও দাও না কেন? ভারতবর্ষে এমনিধারা হবনেরই বেশী দরকার হয়েছে।

আবার এও বলি, একদিন শুধু হাজার হাজার কাঙ্গালী খাইয়েই বা কি লাভ? দেশ-কাল-পাত্রের বিবেচনা না করে দান করাতেই আজ এদেশে জাতকাঙ্গালীর সংখ্যা বেড়েছে। ভারতের এই দৈন্যদশা কেন? বিচারহীন দানধর্ম্মের ফলে। একজন ফরাসী লেখক বলেছিলেন, দান-খয়রাতে যে দুঃখ দূর করে, তার অর্দ্ধেক দুঃখ পয়দা করে, কিন্তু যে দুঃখ সে পয়দা করে, তার অর্দ্ধেক দূর করতে পারে না। শুধু দাতার অভিপ্রায় দেখলেই ত হবে না। ফল কি দাঁড়াচ্ছে, তাও তো দেখতে হবে। দুর্ব্বলচিত্ত তীর্থযাত্রী নাছোড়বান্দা ঘ্যানঘ্যানে কাঙ্গালীর হাতে কিছু দিয়ে মনে করল, সে বুঝি পরকালের আত্মোদ্ধারের কিছু পুঁজি সঞ্চয় করল। সে যা হোক্, ইহকালে তার জাতির ধ্বংসকল্পে সে যে কিছু করে গেল, এ একেবারে নিশ্চয় কথা।

এখন ঠিক ঠিক যজ্ঞ করতে পারাই হল আমাদের সমস্যা। সে হচ্ছে দীন দরিদ্রের সেবা ও রক্ষণ—আর তা এমন ভাবে করা, যাতে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে না যায়। মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দিতে হলে দিতে হবে জ্ঞান। আজ একটা লোককে খাওয়াতে পার, কিন্তু তার তো কালই ক্ষুধা পাবে। কিন্তু তাকে একটা শিল্প শিখিয়ে দাও—সে সারা জীবন খেটে খেতে পারবে। এমন জ্ঞান অর্জ্জন করতে হবে যাতে জীবন বাস্তিবকই সার্থক হয়।

বিদ্যাবুদ্ধিতে পদমর্য্যাদায় যারা হীন, তাদের প্রতি প্রত্যেক ভারতবাসীর এমন মনোভাব

থাকা উচিত যে—তারা যেন তাদের ছেলের মত; ফলের প্রত্যাশা না রেখে তাদের সেবা করতে হবে। তাদের আত্মার খোরাক জোটাতে হবে—উৎসাহ, জ্ঞান, প্রেম দিয়ে তাদের আত্মার পুষ্টি করতে হবে। এই তো মায়ের কাজ—তাঁর পরমানন্দময় সেবার অধিকার। এই যথার্থ নিষ্কাম যজ্ঞ।

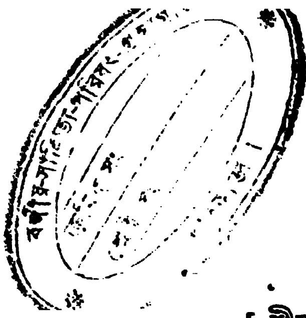
যদি সুযোগ হয়, তবে ভারতবর্ষের কর্ম্ম-কাণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু বলবার ইচ্ছা রইল। প্রাচীন কালে সমাজ এত কৃত্রিমতাপূর্ণ ছিল না। খাওয়া-পরা-থাকার বাঁধাধরা রীতিনীতি সম্বন্ধে এদেশে লোকের ততটা আগ্রহ ছিল না। তখন দেশে প্রচুর ফলের গাছ ছিল—যেমন কাশ্মীরের কোথায় কোথায়ও এখনও আছে। বসনের বিরলতা তখন নিন্দার বিষয় ছিল না। পর্ব্বত-কন্দর বা ছায়াশীতল বৃক্ষই তখন আশ্রয় বলে গণ্য হতে পারত। সেই যুগে মানুষের দেহ-মনের অবরুদ্ধশক্তি অন্য আকারে প্রকাশিত হতে না পেরে দেবতাদের সঙ্গে আদান-প্রদানের ভাবে ফুটে উঠল। এইরূপে নানা-রকম যজ্ঞের সৃষ্টি হল। আগে এই যজ্ঞগুলি ছিল দেবতাদের সঙ্গে সোজাসুজি একটা হিসাবনিকাশ। তাতে হাত কচলানো, মাথা কোটা, নিজকে খাটো করে ভিখারীর মত ঘ্যানঘ্যান করার ভাব ছিল না। শক্তিকে প্রাচীনেরা যে ভাবে বুঝেছিলেন, তাই ধরে সমানে সমানে স্বস্থ চিত্ত নিয়ে তাঁর সঙ্গে কারবার চালাতেন। বলতে পার, এটা দেব-শক্তির সঙ্গে দোকানদারী—কিন্তু তা বলে আজকালকার মত বেণে বুদ্ধি নিশ্চয়ই তার মাঝে ছিল না; দেওয়া-থোওয়া আর হরণ-পূরণের ভাব কতকটা অবশ্যই ছিল।

সমস্ত যজ্ঞই নির্ভর করছে "যদি"র উপর। "যদি" বৃষ্টি চাও, এই যজ্ঞ কর; "যদি" পুত্র চাও, এই যজ্ঞ কর; "যদি" শত্রুবিজয় চাও, এই যজ্ঞ কর; "যদি" ধন চাও, এই যজ্ঞ কর ইত্যাদি।

যখন আমার নিজের গরজের "যদি"র উপর যজ্ঞ নির্ভর করছে, তখন যজ্ঞ তো স্বেচ্ছা-মূলক; এর মাঝে গোড়ায় তো কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। ক্রমে যজ্ঞ আচারের সামিল হয়ে পড়ল, তখন তা স্বেচ্ছাকৃত বাধ্য-বাধকতায় এসে দাঁড়াল।

ইতিহাসে দেখতে পাই, পরের যুগে পৌরাণিক কর্ম্মকাণ্ড এসে বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের স্থান অধিকার করছে। মহা-ভারতের যুদ্ধে দেশে একটা স্থূলতঃ পরিবর্ত্তন ঘটল। ধার্ম্মিক ও রাজনৈতিক ক্রান্তিতে জাতির ধারাটাই একদম বদলে গেল। প্রাচীন দেবতার প্রতি তখন লোকের আরেক রকম ভাব দাঁড়াল। ভৌতিক অভাব অভি-যোগ বাড়ল। একটা যজ্ঞ নিয়ে মাসের পর মাস বা গোটা বছরটা কাটিয়ে দেওয়া লোকের পক্ষে সম্ভব হল না—তাইতে প্রাচীন যজ্ঞবিধির স্থানে পৌরাণিক কর্ম্মকাণ্ড বাহাল হল। ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র ক্ষতিও না করে, কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তন যে করা যেতে পারে—এই ব্যাপার তার একটা মস্ত নজীর।

আর একটা কথা রাম বলছেন, স্মৃতি ও কর্ম্মকাণ্ড যে কালবশে কেবল বদলেই গেছে, তা নয়—একাই দেশের বিভিন্ন অংশে তা বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছে। উপযুক্ত পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও প্রগতির উপরেই সমাজের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। "হয় বদলে যাও, নয় মর"—এই হচ্ছে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য আদেশ। (ক্রমশঃ)



ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

—*—

[শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস, বি, এ, ই, এ, সি]

যুগসমস্যায় কর্ত্তব্য কি ?

অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, সত্য-যুগের আয়ু, বল, স্বাস্থ্য বর্ত্তমান মানবদেহে নাই ; সামাজিক আচার ব্যবহার রীতি নীতি, মানুষের খাদ্যাখাদ্য বেশভূষাদি সমস্তেরই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দেশ পরাধীন ; রাজশক্তি প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতে বিমুখ ; অর্থ প্রয়োজনে রাজভাষা শিক্ষা প্রয়োজন। জ্ঞানার্জ্জনের পন্থা বদলিয়া গিয়াছে ; বিদ্যালয়াদির সংস্রবে ধর্ম্মশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা নাই, হইতেও পারে কি না সন্দেহের বিষয়। এমতাবস্থায় অতীত যুগের বিধিব্যবস্থা কিরূপে মানিয়া চলা যাইতে পারে ? অনেকেই মনে করেন, সামাজিক রীতিনীতি যুগধর্ম্মানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়—ইহাই স্বাভাবিক। কালোপযোগী বিধি ব্যবস্থা না হইলে উহা খাপ খায় না। কালস্রোত কেহ কি কখনও রোধ করিতে পারে ?

আমরা যুগানুশাসনের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান নহি ; কিন্তু যুগবিধির মধ্যে যদি কোন শাশ্বত ও সনাতন পদ্ধতিকে কোন প্রকারে খর্ব্ব করা হয়, তাহা আমরা মানিতে প্রস্তুত নই। ব্রহ্মচর্য্যানুশাসনের মূল তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে [illegible] মানবদেহের বিক্ষেপণী ক্রিয়ার খর্ব্ব[illegible] আকুঞ্চনই উহার উদ্দেশ্য। সত্য [illegible], [illegible] সাধন, সত্য শিক্ষা—সকলেরই [illegible] প্রতিষ্ঠা। আত্মপ্রতিষ্ঠাই ধর্ম্মলা[illegible] প্রত্যাবর্ত্তন ; উহা এক যোগের অবস্থা। বিয়োগ বা বিক্ষিপ্তভাব কারণ নিবারিত না হইলে যোগসাধন হইতে পারে না ; যোগসাধন ভিন্নও আত্মসাক্ষাৎকার অসম্ভব। এতদর্থে প্রাচীনেরা যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটী উদ্দেশ্য লক্ষ্য করা যায়—(১) অনুকূল ক্রিয়াভ্যাস বা সংরক্ষণ প্রয়াস ; (২) প্রতিকূল ক্রিয়ারোধ বা বর্জ্জন প্রয়াস। ব্রহ্মচর্য্যপক্ষে গুরুসঙ্গ, সত্ত্বগুণবিবর্দ্ধক আহার ও স্বাধ্যায় অনুকূল ক্রিয়া ; যোষিৎ সম্পর্ক পরিহার, বিলাসসামগ্রী বর্জ্জনাদি প্রতিকূল ক্রিয়ারোধ। যাঁহারা কালোপযোগী ব্রহ্মচর্য্যবিধির বিষয় চিন্তা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এই দুই মূল নীতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ভারতের কোন যুগধর্ম্মবিধানে ব্রহ্মচর্য্যকে কোন প্রকারে খাটো করা হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। যুগধর্ম্মবিধানে শাশ্বত বা সনাতন ধর্ম্মের অনুশাসনকে স্থিরতর রাখিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী সময়ের বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রিকায় কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনমু-[illegible] ভাষায় যে অভিমত ব্যক্ত করিয়া-[illegible] এই—"প্রাচীন ভারতবর্ষের [illegible] অধ্যয়ন কাল, ততদিন ব্রহ্মচর্য্য-[illegible] এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য-[illegible] বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায়, তাহা

নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে, তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানাদিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেকসময় অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে—যে সময়ে যে সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা, তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে; ইহাতে কেবলি শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্ব্বল ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অথচ জীবনের আরম্ভ কালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকাল বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যের নবোদ্যমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য্য পালনের উদ্দেশ্য।"

"ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া হয়। উপদেশ দেওয়া নহে, শক্তি দেওয়া হয়। নীতিকথাকে বাহ্য ভূষণের মত জীবনের উপর চাপাইয়া দেওয়া নহে, জীবনকেই ধর্ম্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং ধর্ম্মকে বিরুদ্ধে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে, চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময় উপদেশ নহে, অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশী আবশ্যক।"

কবিবরের কবিত্বের মধ্য হইতে তাঁহার সমগ্র ভাবটি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, তিনি নাগরিক জীবনের বিক্ষিপ্ততা হইতে দূরে থাকিয়া স্বভাবের স্বাভবিকতার মধ্যে বিদ্যার্থীকে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে বলিতেছেন এবং ধর্ম্মকে স্বভাবে পরিণত করিতে বলিতেছেন। এসকল কথার সঙ্গে মূলতঃ আমাদের কোন বিরোধ নাই; কবিবর অনুকূল অভ্যাসের উপর বেশী জোর দিতেছেন, আমরা অনুকূল অভ্যাস ও প্রতিকূল ক্রিয়া-রোধ, উভয়েরই আবশ্যকতা দেখাইয়াছি। কবিবরও বিলাস বর্জ্জনের উপদেশ দিয়া ত্যাগের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগসমস্যা যে এক জটিল ব্যাপার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সমস্যার সম্যক আলোচনা এস্থলে হইতে পারে না। বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যে ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রতিকূল তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের সমস্ত বিদ্যালয় সংস্রবে যে উহার প্রবর্ত্তন সম্ভবপর, তাহা নহে। শিক্ষা-প্রদানের ভার যে পর্য্যন্ত ভারতবাসী স্বহস্তে আনিতে না পারিবে, সেই পর্য্যন্ত কেবল জাতীয় বিদ্যালয় সমূহের সংস্রবেই উহার প্রচলন সম্ভবপর। দেশীয়গণের হস্তে যে সমস্ত বিদ্যালয় আছে, তাহার সংখ্যা নিতান্ত মন্দ নহে।

বর্ত্তমান প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিতেছেন যে, শিক্ষাদ্বারা সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিক্ষাগুরুর সঙ্গে থাকিয়া বিদ্যা অর্জ্জন করা আবশ্যক। গুরুর 'তামাকসাজা'কে যাঁহারা এতদিন আত্মসম্মানের হানিজনক জ্ঞানে গুরুগৃহে সন্তানসন্ততিকে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেন, তাঁহারা বোধ হয় এখন আর সেই ভাব পোষণ করেন না। বিশেষতঃ গুরুগণও যে স্থলে হুঁকাকল্কির অভ্যাস ছাড়িতেছেন, সেই স্থলে আশঙ্কার কোন কারণই থাকিতে পারে না। সদ্‌গুরুর প্রভাব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সদ্‌গুরু যদিও দুর্ল্লভ, তথাপি আমরা সকলকে এই সুযোগকে বরণ করিয়া লইতে বলি।

পুরাকালে ব্রহ্মচারিগণ স্বাধ্যায়রত হইয়া থাকিতেন। এই যুগে অর্থকরী বিদ্যাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না; সুতরাং আমরা স্বাধ্যায়ের অর্থান্তর গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। "স্বাধ্যায়" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অধ্যেয় (বেদভাগের বা অধ্যয়নীয় শাস্ত্রের) বিষয়। পাতঞ্জল যোগসূত্রের সাধনপাদে ১ম ও ৩২শং সূত্রস্থ স্বাধ্যায় শব্দের "প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্র জপ অথবা মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন" এই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলতঃ প্রণবই আদি বেদ; প্রণব বা প্রণবাত্মক মন্ত্রাভ্যাসকে কাহারও স্বাধ্যায় বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি হইতে পারে না। স্বাধ্যায়ের এই অর্থ গৃহীত হইলে বর্ত্তমান অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার একটা স্থান করা যায়। এতদ্দ্বারা যে স্বাধ্যায়ের উদ্দেশ্যের কোনপ্রকার খর্ব্বতা সাধিত হইবে, তাহাও মনে হইতেছে না।

সত্ত্বগুণবিবর্দ্ধক খাদ্যই ব্রহ্মচারীর আহার্য্য; কিন্তু ব্রহ্মচারীর যে দুইটী প্রধান খাদ্য—অর্থাৎ বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ ও ঘৃত—দেশে তাহার অসদ্ভাব হইতেছে। সুতরাং মনে হইতেছে, বর্ত্তমান অবস্থায় আহার্য্যেরও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করা প্রয়োজন হইবে। মৎস্যবর্জ্জনপূর্ব্বক মাংসকে ব্রহ্মচারীর আহার্য্যভুক্ত করা যাইতে পারে কিনা, ইহা চিন্তনীয় বিষয়। মাংসভক্ষণের সপক্ষে অন্যতর যুক্তি এই যে, ভারতবাসী বর্ত্তমানে যেরূপ হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে রজোগুণবিবর্দ্ধক খাদ্যের কিঞ্চিৎ প্রয়োজন দেখা যায়। হিংসা বর্জ্জনপূর্ব্বক মাংসাহার করিতে দিতে পারা যায় বলিয়া মনে হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম কুস্তি প্রভৃতি অঙ্গচালনার ব্যবস্থা থাকিলে তদ্দ্বারা অপহৃত ক্ষাত্রতেজের পুনরুদ্ধার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রয়োজনানুসারে বয়োবৃদ্ধিসহকারে খাদ্যের পুনঃ পরিবর্ত্তন করিতে কোন বাধা থাকিবে না।*

ত্যাগমন্ত্রসিদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন ফলে আজকাল অনেকেই বিলাসিতাবর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। ত্যাগের কঠোরতার প্রতি পূর্ব্বে লোকের যে ভয় ছিল, তাহা আর বর্ত্তমানে নাই। দেশ ত্যাগকে বরণ করিয়া লইতেছে। সুতরাং এক্ষণে ভারতবাসী ব্রহ্মচর্য্যাকে বিভীষিকার চক্ষে দেখিবে না।

বর্ত্তমানে ভারতবাসী শূদ্রত্বের জড়তায় অভিভূত; তাহার পক্ষে হঠাৎ ব্রাহ্মণত্বলাভ অসম্ভব। শূদ্রত্বের অবসাদ ঘুচাইতে হইলে প্রথমতঃ স্বাবলম্বন শিক্ষাদ্বারা বৈশ্যত্ব লাভ প্রয়োজন। চরকার প্রচলন দ্বারা মহাত্মাজী সেই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিছুকাল বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মপরিচয়

* ব্রহ্মচারীর মাংসাহার সম্বন্ধে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি। প্রথমতঃ উহা আর্য্যবিধানের বিরুদ্ধ; মনু স্পষ্টই বলিতেছেন—"বর্জ্জয়েৎ মধু মাংসঞ্চ।" মাংসাহার সত্ত্বশুদ্ধির বিরোধী। সত্ত্বশুদ্ধিই ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষ্য। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে বলবীর্য্য আপনি আসিবে, তজ্জন্য বিশেষ করিয়া রজোগুণের উদ্দীপনা অনাবশ্যক। সাধারণভাবে সমগ্র দেশের বলাধানের উপায় স্বরূপ মাংসাহার যদিও বা সামান্যতঃ সমর্থনযোগ্য হয়, তথাপি ব্রাহ্মণ্য আদর্শে প্রবুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী শিক্ষার্থীর পক্ষে মাংসাহার কখনও সমীচীন হইবে না। বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিকে এরূপ ব্রহ্মচারী যেমন অধিকসংখ্যায় তৈরী করা যাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না, তেমনি তাহাদের একান্ত প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা চলে না। এই মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ্যভাবানুপ্রাণিত ব্রহ্মচারীর আচার শৈথিল্য কোনও প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে। পরিশেষে বক্তব্য এই—নিরামিষ আহার্য্যের মাঝেও মাংসাপেক্ষা পুষ্টিকর অথচ সুলভ আহার্য্যের অসদ্ভাব নাই—ইহা আধুনিক চিকিৎসকেরাও বলিয়া থাকেন। —সঃ আঃ দঃ

লাভ না করিলে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকার জন্মিবে না। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন যে শুভযোগ আনয়ন করিয়াছে, তাহার প্রতি কোন দেশহিতৈষীরই উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে চলিবে না।

কৌমার্য্যব্রত বা বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্য্য

অনুকূলস্থানে সাধনক্ষেত্র না হইলে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিবার বিঘ্ন ঘটে; এ জন্য ব্রহ্মচারীর জ্ঞানার্জ্জনক্ষেত্র জনাকীর্ণ স্থানের বিবিধ উদ্বেগকর প্রভাবের অনধিগম্য হওয়া উচিত। ব্রহ্মচারী জীবনের উদ্দেশ্য শক্তির আহরণ, শক্তির ক্ষয় নহে; শক্তির সংরক্ষণ, শক্তির অপচয় নহে। বর্ত্তমানকালের নগর ও সহরে সভাসমিতির যেরূপ আলোড়ন ও সংবাদপত্র সকলের যেরূপ অযথা উদ্বেজন; রঙ্গালয় বায়োস্কোপ, ঘোড়দৌড়, প্রতিযোগী ক্রিয়া-প্রদর্শনের যেরূপ উত্তেজনা, বিবিধ চর্ব্বচোষ্য-লেহ্যপেয়াদির যেরূপ ছড়াছড়ি; বারাঙ্গনা-গণের যেরূপ স্বচ্ছন্দবিহার—তাহাতে তথায় শক্তির অযথা ক্ষয় ও অপচয়ের আশঙ্কাই অধিক। সুতরাং এমত স্থান কোন ক্রমেই ব্রহ্মচর্য্যের সাধনক্ষেত্র হইতে পারে না। ব্রহ্মচারীর সাধনক্ষেত্র যে প্রভাবত্রয়বিমুক্ত হওয়া উচিত, তাহার আভাস নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—

অহেরিব গণাদ্ভীতঃ সৌহিত্যান্নরকাদিব।
কুণপাদিব চ স্ত্রীভ্যঃ স বিদ্যামধিগচ্ছতি॥

অর্থাৎ যাঁহারা জনসমাগমকে সর্পের ন্যায়, মিষ্টান্নজনিত তৃপ্তকে নরকের ন্যায়, কামিনী-গণকে শবের ন্যায় বিবেচনা করেন, তাঁহারাই জ্ঞান অর্জ্জনে সমর্থ হন।

ব্রহ্মচারী যাহাতে শমদমাদি অভ্যাসের অন্তরায় হইতে দূরে অবস্থান করতঃ স্বাধ্যায়-নিরত থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। বিরুদ্ধ সঙ্গ, বিরুদ্ধ চিন্তা বর্জ্জন জন্য গুরুদ্বেষ-কারী অথবা বিরুদ্ধসংস্কারবিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যাহাতে কোনরূপ সংশ্রব না ঘটে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। লোভ ও কাম—দুই দুর্দ্দান্ত রিপু; এ জন্য লেহ্যপেয়াদি ভোগ বিলাসসামগ্রীর প্রলোভন এবং স্বৈরচারিণী-গণের প্রভাব হইতে দূরে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। প্রণয়সঙ্গীত, ইতর স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব কলহাদি অশ্রাব্য শ্রবণ, নিরম্বরা রমণীর প্রতি-কৃতি, পশুমৈথুনাদি দর্শন যাহাতে সম্ভবপর না হয়, তাহারও সুব্যবস্থা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে মহাজনগণের আলেখ্য ও জীবনী এবং অন্যান্য চিত্র ও সদ্গ্রন্থ—যদ্দ্বারা অনুকূল চিন্তা পরিপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

ব্রহ্মচারী জীবনের প্রধান লক্ষ্য দেহমনের পবিত্রতা রক্ষা করা। "দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ"; শৌচ শুদ্ধি ও সচ্চিন্তাদি অভ্যাস দ্বারা এই পবিত্রতা রক্ষিতব্য। ব্রহ্মচারী কদাচ এমন কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারেন না, যদ্দ্বারা তাঁহার দেহ বা মনের কোনও প্রকার মলিনতা সাধিত হইতে পারে। আলস্য, ঔদাস্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; অলস ব্যক্তির মন কুচিন্তার আলয়। কুচিন্তাগুলি গন্ধমূষিকবৎ, সাময়িক ভাবে হইলেও গৃহকে দুর্গন্ধপূর্ণ করিয়া দেয়। এজন্য ব্রহ্মচারী কদাচ নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিবে না।

যে স্থানে গমন করিলে, যে সঙ্গে থাকিলে, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে মনোবিকার

উপস্থিত হয় বা হইবার সম্ভাবনা, তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে যে সঙ্গে থাকিলে সদাকাঙ্ক্ষা, সদুৎসাহ ও সুরুচি পরিপুষ্টি লাভ করে, সেই সঙ্গে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। ক্রীড়াকৌতুক পরিহাসের মধ্যেও গ্রাম্যতাদোষ পরিহার করা উচিত। সর্ব্বদা উৎসাহ সহকারে বিহিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে রত থাকিবে এবং অবসর সময় সদ্‌গ্রন্থপাঠে, সৎপ্রসঙ্গে অথবা নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিবে। চিত্তবিনোদনের একটী শ্রেষ্ঠ উপায় সঙ্গীত অভ্যাস ও শ্রবণ। সদ্‌গ্রন্থ, সঙ্গীতাদি গুরুগণ নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন।

জীবনগঠনের জন্য প্রতিদিন আত্মচিন্তা অভ্যাস করা অত্যাবশ্যক। পাশ্চাত্যদেশে আত্মচিন্তার সহায়তার জন্য অনেকে "দৈনন্দিন লিপি" লিখিতে অভ্যাস করেন; ইহা একটী উত্তম অভ্যাস। জীবন কি ভাবে চলিতেছে, কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইতেছে কিনা, তাহার অনুশীলন আবশ্যক। এই অনুশীলন দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহা গুরুর নিকট অকপটভাবে নিবেদন করিলে তদ্দ্বারা প্রভূত ফললাভের সম্ভাবনা।

গুরুশিষ্য পরস্পর পরস্পরকে বুঝিবার মধ্যে কোন প্রকার বাধা বা অন্তরায় থাকিলে চলিবে না। জ্ঞানার্থীর মূলধন শ্রদ্ধা; শিষ্যের গুরুতে এই বিশ্বাস থাকা চাই যে, গুরু সতত তাহার কল্যাণকামী, তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিবার কোন অন্তরায় নাই। অভাব অক্ষমতা, এমন কি নৈতিক দুর্ব্বলতার কথাও নিঃসঙ্কোচে গুরুর নিকট প্রকাশ করা যায় এবং গুরুর হৃদয়ের সহানুভূতি আকর্ষণ করা যায়—এবংবিধ খোলাখুলি ভাব গুরু-শিষ্যের মধ্যে থাকা চাই।

গুরুশিষ্যসম্বন্ধের আন্তরিকতার উপরই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রকৃত সফলতা নির্ভর করে। প্রাচীন কালের গুরু ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রেরিত হইয়া জ্ঞান বিতরণ করিতেন। ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইবার অন্যতম উপায় অধ্যাপনা, এজন্য প্রাচীন কালের কৃতবিদ্যগণ অধ্যাপনাকে জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিতেন। বৃত্তির জন্য গুরুগিরি বা শিক্ষকতা সে কালের লোক জানিত না; শিষ্যও কোন প্রকার বেতন বিনিময় দ্বারা বিদ্যালাভের চেষ্টা করিত না; শিষ্যের একমাত্র সম্বল ছিল শ্রদ্ধা। আত্মবিদ্ গুরু শিষ্যের অধিকারানুযায়ী শ্রেয় উপদেশ করিতেন; শুশ্রূষু শিষ্য অবিচারিত চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেন। যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের মধ্য দিয়া সেই আদান প্রদান চলিত, বর্ত্তমানকালে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে কুত্রাপি সেই সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না; তাই অনেক বক্তৃতা, অনেক আলোচনা, অনেক উপদেশ নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। যিনি অধ্যাপনাকে জীবনের ব্রত করিতে পারেন নাই, যাঁহার অধ্যাপনা-নিষ্ঠা নাই, তিনি শিক্ষাদানের অযোগ্য। যিনি গুরুর গৌরবমঞ্চ হইতে শিষ্যের নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে পশ্চাৎপদ, যিনি শিষ্যের অক্ষমতায় সহানুভূতি প্রকাশে অসমর্থ, তিনি কখনও শিষ্যের হৃদয় অধিকার করিতে পারিবেন না।

নিয়মাধীনতাই ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্য নহে; কিন্তু নিয়মাধীনতার মধ্য দিয়া সহজ স্বাভাবিকতাকে জাগ্রৎ করিয়া তোলাই সেই সফলতা। একমাত্র সদ্‌গুরু চরিত্রপ্রভাবই সেই সফলতাদানে সমর্থ। আচরণাদি প্রত্যক্ষ করিয়া শিশু যাহা শিক্ষা করে, তাহাই জীবনে স্থায়ী হয়; সেই শিক্ষা উপদেশ শুনিয়া অথবা পুঁথি পড়িয়া হয় না। এই জন্য গৃহে পিতামাতার আচরণ যেরূপ অনিন্দনীয় হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদাতার আচরণ সমালোচনার অতীত হওয়া অত্যাবশ্যক। (ক্রমশঃ)

প্রকাশ ও আনন্দ

—*—

(শ্রীশিশিরকুমার বসু বর্ম্মণ্ বি. এ.)

মানুষের মনে স্বতঃই একটা প্রশ্নের উদয় হয় যে যখন ভগবান সর্ব্বব্যাপী, নিত্য সত্য বস্তু,—দৃশ্য অদৃশ্য সবই তিনি, বস্ত্রের সহিত কার্পাসের যে সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত জগতের যখন সেই সম্বন্ধ, তখন তাঁহাকে পরিচ্ছিন্নভাবে উপাসনা করিব কেন? কেন সেই বিরাট বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিতে—কেন তাঁহাকে তীর্থস্থানে, হৃদয়ে বা মস্তকে সীমাবদ্ধ করিয়া চিন্তা করিব? আকাশ বাতাস, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ নদী সাগর, জরায়ুজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ সবই তিনি। আমি, আমার হাত পা মস্তক হৃদয় এবং এই সমগ্র দেহকে চালিত করিবার কেন্দ্রস্থিত শক্তিও তিনি। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়, "যাহা তুমি দেখ শোন বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি—আরো ঠিক বলিতে হইলে বলিতে হয় তাঁহারই পরিণাম, আরো ঠিক বলিতে হইলে বলিতে হয় প্রভু স্বয়ং।" "প্রভু স্বয়ং" কথাটী বড়ই চমকপ্রদ। স্থূলভাবে দেখিলে অধিকাংশ বস্তুই জড় বটে—কিন্তু এক চিৎসত্তা ভিন্ন সত্তা অসম্ভব। সবই চৈতন্যময়—চৈতন্যই সবার মূল। কোন বস্তুটা জড়? আকাশে প্রাণশক্তির স্পন্দন-বেগের আধিক্য বশতঃ বায়ু; বায়ুতে প্রাণের স্পন্দন হেতু অগ্নি; অগ্নিতে স্পন্দন হেতু জল; জলে স্পন্দন হেতু ক্ষিতির উৎপত্তি। শুধু প্রাণশক্তির স্পন্দন দ্বারাই আকাশ পরমাণুর সংহতি হেতু কঠিন হইয়াছে। প্রাণের কম্পনাভিঘাতে যাহা কঠিন হইয়াছে, তাহা আবার কম্পনাভিঘাতে আকাশে পরিণত হইবে। সেই আকাশের মূল আবার চৈতন্য। যে পরমাণুর সংহতিকে এখন জড় বলিয়া মনে হয়, প্রাণের কম্পনে আবার তাহার প্রত্যেক পরমাণু স্বতন্ত্র হইবে। সেই প্রত্যেক পরমাণুতে প্রাণশক্তি বিদ্যমান। জগতে এমন কি আছে, যাহাতে প্রাণ নাই? তুমি হয়ত তাহা বুঝিবে না, কারণ তোমার ইন্দ্রিয়বর্গ কত সীমাবদ্ধ। সেই সসীম ইন্দ্রিয়েরই বা কয়টী লইয়া তুমি জগতে আসিয়াছ। আজ যদি তোমার আর একটী ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়, যদ্দ্বারা জীবের ও উদ্ভিদের প্রতিনিয়ত তিল মাত্র বৃদ্ধিও তোমার দৃষ্টিমাত্রে উপলব্ধি হইবে—তাহা হইলে সমগ্র জগৎ তোমার নিকট অন্য প্রকার বোধ হইবে। জীবের ইন্দ্রিয় সসীম বলিয়া বস্তুর স্বরূপ আমাদের প্রতীত হয় না। যে পরমাণু দ্বারা বিপুল বিশ্ব রচিত, তাহা শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তির পরিণাম মাত্র—সময় হইলে তাহাও তাঁহার শক্তিতে লীন হইয়া যাইবে। জগৎ ভগবৎশক্তিরই রূপান্তর মাত্র। শক্তি ত্রিগুণাত্মক; ত্রিগুণ বলিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃকে বুঝায়। প্রাণের স্পন্দনের তারতম্য বা স্পন্দনের বিশেষ বিশেষ অবস্থানই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই ত্রিগুণের একটীরও অভাব হইলে এই বিশ্ব রচিত হইতে পারে না। কিন্তু এই সত্ত্ব, রজঃ ও তম বলিতে কি বুঝায়?

১। তমের স্বরূপ অজ্ঞান; অজ্ঞান জড়ত্ব, নিদ্রা ও অহঙ্কারের মূল।

"তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥"
—গীতা ১৪।৮

"জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।"
—গীতা ১৪।৯

"অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥"
—গীতা ১৪।১৩

২। রজোগুণের ফলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি, লোভ, অভিমান, কাম, ক্রোধ, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য, মানসিক অধৈর্য্য, কামিনীকাঞ্চনে স্পৃহা, তদপ্রাপ্তিতে দুঃখ।

"রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥"
—গীতা ১৪।৭

"রজঃ কর্ম্মণি (সঞ্জয়তি)" —গীতা ১৪।৯

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥"
—গীতা ১৪।১২

৩। সত্ত্বগুণের ফলে প্রকাশ এবং আনন্দ।

"তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥"
—গীতা ১৪।৬

"সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি" —গীতা ১৪।৯

"সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" —গীতা ১৪।১৭

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সত্ত্বগুণের বিরুদ্ধ বা শত্রুপক্ষ রজঃ ও তমোগুণ। সত্ত্বের প্রকাশ অংশের বিরুদ্ধ তমের অজ্ঞানতা এবং আনন্দাংশের বিরুদ্ধ রজগুণজনিত দুঃখকষ্টাদি। তাহা হইলে সত্ত্বগুণকে রজঃ ও তমোগুণ সব সময়েই অভিভূত করিতে চেষ্টিত। মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে এই সত্ত্ব গুণের উৎকর্ষের প্রয়োজন। তবে কি রজঃ ও তমোগুণ নিকৃষ্ট? রজ ও তমোগুণ যে নিকৃষ্ট, তাহা বলা যায় না। কারণ প্রত্যেক গুণেরই বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, নিদ্রা না হইলে জীবশরীরের পুষ্টি হয় না। একেবারে নিদ্রামুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে শরীরের মাত্র ক্ষয়ই হইয়া থাকে। এই পুষ্টি বা বৃদ্ধিলাভ করিবার জন্যই শিশুগণ এত অধিক নিদ্রা গিয়া থাকে। এই নিদ্রা তমের আধিক্য হেতু হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে ও নিদ্রার একটা বিশেষ উপকারিতা আছে, তাহা গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥"
—গীতা ৬।১৬

"যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।"
—গীতা ৬।১৭

এতদ্ব্যতীত ত্রিগুণের একটা গুণের অভাবে এই জীবজগৎ চলিতে পারে না। ত্রিগুণের প্রত্যেকটীরই বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন আছে। রজোগুণের ফলে জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি। কর্ম্ম ত্যাগ করিলে জীবের জীবন ধারণ হইবে না। আবার সত্ত্বগুণের অভাবে অন্য গুণকে পরিচালিত করিবার জ্ঞান এবং এই জীবলীলার মূলে যে আনন্দ, তাহার অভাবে জগৎ চলিতে পারে না। ত্রিগুণের যে কোনটীর অভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে যে, সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ শ্রীভগবানের লীলাপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দেশকালপাত্র ভেদে বস্তুর গুণাগুণ লক্ষিত হইয়া থাকে। মনে করুন ভালবাসা। কোন মানব কোন বারনারীকে ভালবাসে,

তখন সে ভালবাসা তামসিক; নিজ ধর্ম্মপত্নীকে ভালবাসিলে, তখন সে ভালবাসা রাজসিক; আবার সে ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিলে তাহা সাত্ত্বিক; আবার যখন নিজেকেই প্রেমস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি হইবে, তখন নির্গুণ অবস্থা। যে ভাবেই হউক জীবের এই তিন গুণের ভিতর দিয়া যাইতেই হইবে এবং তাহার মনোবিকাশের অবস্থা অনুসারে প্রতি গুণই তাহার নিকট সত্য। কোন হীন প্রকৃতি যদি ভূত প্রেতের পূজার্চ্চনা করে—তাহা তাহার পক্ষে খুব সত্য। কারণ যতদিন না প্রকৃত সত্যে পৌঁছান যায়, ততদিন সবই আপেক্ষিক। মানব মনের অভিব্যক্তির সহিত তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ। সবার ধর্ম্ম সমান নহে। একমাত্র প্রকৃত সত্যে পৌঁছাইলে সবই এক হইয়া দাঁড়ায়। সত্ত্বগুণের চরমে উপনীত হইলেই নিস্ত্রৈগুণ্য আসিয়া পড়ে। কারণ আত্মার স্বরূপই নির্গুণ-চৈতন্য সত্তা মাত্র। প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই নির্গুণের দিকে অগ্রসর হইতেছে—তবে প্রায় সবই অজ্ঞাতভাবে নির্গুণের দিকে অগ্রসর হয়; কেবল যাঁহারা জ্ঞাতসারে নির্গুণের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিতেছেন, তাঁহাদিগকেই সাধনা করিতে হয় এবং দ্রুত সত্ত্বগুণে পৌঁছাইতে অন্যান্য গুণকে সত্ত্বগুণের প্রভাব দ্বারা অভিভূত করিতে হয়। সত্ত্বের প্রভাব বৃদ্ধি করিতে হইলে তীর্থমাহাত্ম্য ও দেহের স্থানবিশেষের মাহাত্ম্য প্রথমে বুঝিতে হইবে।

মানবদেহে হৃদয়ে সত্ত্বগুণের স্থান এবং অনাহত বায়ুকেন্দ্রে বিষ্ণুগ্রন্থি। ভগবান জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও হৃদয়ে যে স্থানে সত্ত্বগুণের প্রভাব, সেই স্থানেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা প্রতিবিম্বিত হন। তাই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে মানবের প্রথমে হৃদয়েই চিন্তা করিতে হয়। পরে তাঁহারই কৃপায় সময় আসিলে ধ্যান সহস্রারে গমন করে। ভগবান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কার্পাসের সহিত বস্ত্রের সম্বন্ধের ন্যায় ওতপ্রোত থাকিলেও গৃহে সহস্র দর্পণ থাকা সত্ত্বেও যে দর্পণটা উজ্জ্বল বা পরিষ্কার, তাহাতেই বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়—সত্ত্বগুণের সহিতও ভগবদ্রূপশক্তির তদ্রূপ সম্বন্ধ।

কিন্তু মানব সব সময় সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ করিতে পারে না—তাহাকে রজে ও তমে নামিয়া আসিতে হয়; কারণ এই যে দেহ, ইহা পিতামাতার সঙ্গম হইতে জাত, কাজেই মানবের মনে কুভাব অন্তর্নিহিত। মনে কুভাব আসিবেই—ইহা স্বাভাবিক। এই কুভাব কামিনীকাঞ্চনস্বরূপ জড় বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে থাকে। কামিনীকাঞ্চনই সাধারণতঃ মানবের জীবভাবকে সজীব রাখিয়াছে। সে সতত উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় বিভোর হইয়া থাকিতে চেষ্টিত হইলেও অন্যের সঙ্গ ব্যতীত উচ্চভাব রাখিতে সমর্থ নহে। উন্নতের সংস্পর্শে আসিলে নিজের ভিতর সুপ্ত সংস্কার জাগরিত হয় ও উন্নত ভাব প্রস্ফুটিত হয়। এইজন্য ধর্ম্মপিপাসু জনগণ তীর্থস্থানের এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তীর্থস্থানে স্মরণাতীত কাল হইতে কতশত আত্মদর্শী মহাপুরুষের তপঃ প্রভাবে প্রতি অণুপরমাণু প্রভাবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। তীর্থস্থানের তপঃ প্রভাব এমনই পুঞ্জীভূত যে, সামান্য একটা তৃণ দেখিলেই ভগবানের নাম মনে হয়—প্রতি তরুলতা, প্রতি গৃহদ্বারের সহিত যেন একটা দিব্যভাব মাখান রহিয়াছে। সে অতীত দিনগুলি যেন কত কথা বলিয়া মনে হয় এবং নিজের ভিতর সুপ্তভাব জাগাইয়া

দেয়। কারণ, মানুষের চরিত্র বহুল পরিমাণে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। একজন মহামনা ব্যক্তি বলিয়াছেন—

"মানুষমাত্রেই প্রায় বাহ্য অবস্থার দাস, স্থূল জগতের অনুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ। মানসিক ক্রিয়াসকল বাহ্যিক অনুভূতিকেই আশ্রয় করে, বুদ্ধিরও স্থূলের সঙ্কীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম।"

এই জন্যই দেহের স্থানবিশেষে মন সংলগ্ন করণ এবং তীর্থস্থানে বাস প্রভৃতি সত্ত্বগুণোৎকর্ষ করিতে এত সাহায্য করে। যখন রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ মানবের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখনই সাধক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। সত্ত্বগুণের ফলে প্রকাশ ও আনন্দের মধ্যে যাহার ভিতর যে ভাব অন্তর্নিহিত থাকে, সে সেইদিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। প্রকাশের ফলে "অহং" এর জ্ঞান হইবে। আমিই সব—অহং ব্রহ্মাস্মি। আমিই চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র হইয়াছি। আমিই বামন, রাম প্রভৃতি অবতার হইয়া এই ধরাতলে আসিয়াছিলাম—ইত্যাদি জ্ঞান হয়। জ্ঞানী আত্মাতিরিক্ত সত্তা স্বীকার করেন না। তিনি স্বতন্ত্র—তিনি ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করেন না, কারণ তিনি নিজেকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পান। তিনি কিছু বিশ্বাস করেন না; তিনি বিচার চান—কারণ বিশ্বাসের মূলে কল্পনা এবং কল্পনা অপ্রমাণ।

সত্ত্বের আনন্দাংশের ফলে "ত্বং" এর জ্ঞান হয়। আমি কিছুই নই—তুমিই সব। কারণ যদি আমি ভিন্ন আর কিছুই না থাকে—আমিই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" হই, তবে আনন্দ হয় কি প্রকারে? একাকী কেহ আনন্দিত হইতে পারে না। আনন্দ লাভ হয় ভালবাসিয়া। আমি নিজেকে ভালবাসিতে পারি না। ভালবাসিতে হইলে আমি আর এক জনকে চাই—এমন জনকে চাই—যে আমারই মত বা আমার চেয়ে ছোট—মহীয়ান গরীয়ান কাহাকেও চাই না—কারণ তাহাকে ভালবাসিতে পারি না। যাহাকে চাই, তাহার রূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক হওয়া চাই, আমার মনের মতন হওয়া চাই, যাহাতে তাহাকে আমার প্রাণের ঠাকুর করিয়া হৃদয়ের নিভৃত স্থানে তাহাকে রাখিয়া চুপি চুপি অন্যের অলক্ষ্যে, পূজা করিয়া নিজে তৃপ্ত হইতে পারি, যেন তাহার জন্য কাঁদিতে পারি—তবেই না আনন্দ পাইব। যে কাঁদিতে পারে না, তাহার আবার আনন্দ কিসের? প্রেমাস্পদের জন্য ভিন্ন কেহ কাঁদিতে পারে না। এই জন্য সাধকগণ নিজকে স্ত্রী ভাবিয়া ভগবানকে পতিরূপে উপাসনা করেন। কারণ পতিপ্রেমই সর্ব্বোচ্চ ভাব। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

"ভগবানকে পিতা বলা হইতেও উচ্চতর ভাব আছে, তাঁহাকে সাধকেরা মাতা বলিয়া থাকে। তদপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব আছে—তাঁহাকে প্রিয়সখা বলে। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাব আবার প্রেমাস্পদ বলা। ইহার কারণ এই, প্রেম ও প্রেমাস্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্ব্বোচ্চ ভাব।"

তাহা হইলে জ্ঞানী স্বতন্ত্র এবং ভক্ত পরতন্ত্র। জ্ঞানী নিজের ভিন্ন অন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কারণ আত্মাতিরিক্ত সত্তা অসম্ভব। যদি সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহার কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, তিনি তাহা যুক্তি তর্ক ও বিচার দ্বারা দূর করিতে চেষ্টা করেন এবং দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় পৌঁছিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু দেহ থাকিতে তিনি যত বড়ই জ্ঞানী

হউন, সাময়িকভাবে দুঃখের ছাপ তাঁহাতে পড়িবেই; তবে তিনি অসাধারণ মানস শক্তি দ্বারা দুঃখের অতীত অবস্থায় থাকিতে চেষ্টা করেন।

আনন্দলিপ্সুর ঠিক অন্য ভাব। তিনি পরতন্ত্র। তিনি ঈশ্বরাধীন। যে কোন ঘটনাই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হউক, যে কোন বিপদই তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসুক—তিনি সব সময় তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরশীল। তিনি মনে করেন, সে সব ঘটনা তাঁহার মঙ্গলেরই নিমিত্ত। প্রকৃত ভক্তের যে ভাব, তাহা নিম্নলিখিত উক্তিতে ব্যক্ত হইবে।

"এমন ঘটনা নাই—সেই ঘটনা মহান্ হোক বা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হোক্, যাহার দ্বারা কোনও মঙ্গল সম্পাদিত হয় না। প্রায়ই তিনি এক কার্য্য দ্বারা দুই চারি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। আমরা জগতে অনেকবার অন্ধশক্তির খেলা দেখি, অপব্যয়ই প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া ভগবানের সর্ব্বজ্ঞতাকে অস্বীকার করিয়া ঐশ্বরিক বুদ্ধির দোষ দেই। সে অভিযোগ অমূলক। ঐশশক্তি কখনও অন্ধভাবে কার্য্য করে না। তাঁহার শক্তির বিন্দুমাত্র অপব্যয় হইতে প্যারে না। বরং তিনি এমন সংযতভাবে অল্প ব্যয়ে বহু ফল উৎপাদন করেন যে তাহা মানুষের কল্পনার অতীত।"

ইহাই হইল ভক্তভাব। ভক্ত সব সময় প্রভুর সকল প্রকার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত এবং যে কোনও ঘটনা তাঁহার পরীক্ষা হেতু উপস্থিত মনে করেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ঘটিবে, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। এরূপ ভক্তকেই ভগবান প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন যে—

"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।" ভক্তকে তিনি উদ্ধার করিবেন আর জ্ঞানীকে কি তিনি উদ্ধার করিবেন না? না। জ্ঞানী ত তাঁহার স্বরূপ—তাহাকে আর উদ্ধার করিবেন কি? জ্ঞানী ও ভগবান অভেদ। তবে কি জ্ঞানীর আনন্দাংশ এবং ভক্তের প্রকাশ অংশ চিরকাল রুদ্ধ থাকিয়া যায়? না। জ্ঞানী বিদেহ কৈবল্য লাভ করিলে, তিনি ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যান এবং একমাত্র অনুভূতির স্বরূপ লাভ করেন। অনুভূতি ও আনন্দ স্বরূপতঃ এক।

ভক্ত প্রথম ভগবানকে পৃথকভাবে বা সগুণভাবে উপলব্ধি করিলেও যে ভক্ত সগুণকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তিনি নিজেই নির্গুণ স্বরূপ হওয়ার পর মূর্ত্তি লয় হইয়া যায়—প্রকৃতিপুরুষ বিশ্ব ছাড়াইয়া যায়। তখন তিনি নির্গুণ সাক্ষিস্বরূপ; বৈষ্ণবেরা যাহাকে গোপীভাব বলে, সেই নির্গুণ সাক্ষিস্বরূপ বা চিৎস্বরূপ লাভ করার অখণ্ড জ্ঞান উপস্থিত হয়। তখনই উভয়ের নিস্ত্রৈগুণ্য উপস্থিত হয়। ভক্তের পথ কুসুমপেলব; কারণ তিনি পরতন্ত্র, শ্রীভগবান তাঁহার হাতধরা, আর জ্ঞানীর পথ বন্ধুর, কারণ তিনি স্বতন্ত্র।

শাসক

শিক্ষাক্ষেত্রে শাসনসমস্যা একটা বড় রকমের সমস্যা। শাসন করবার অধিকার কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, এ সম্বন্ধে মতভেদ ও রুচিভেদ দুই-ই আছে। যেখানে নাড়ীর সম্পর্ক আছে, সেখানে এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয় না, কেননা প্রকৃতির কোনও নিগূঢ় নিয়মে মাত্রাধিক্যটাও সেখানে ক্ষমার্হ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যেখানে নিঃসম্পর্ক শিক্ষকের হাতে শাসনভার পড়ে, সেখানেই শাসনের মাত্রা ও প্রকারসম্বন্ধে নানা দিক দিয়ে ভাববার কথা আছে। শাসন যে নিষ্প্রয়োজন এ কথা বলতে পারি না, যদিও কেউ কেউ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা রাখতে গিয়ে শিক্ষার এলাকা হতে শাসনকে নির্ব্বাসিত করতে চান। কিন্তু শাসনকে রাখতে গেলে তার মূল নীতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষকের মনে থাকা খুবই প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে শাসনের একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা দরকার। আদর্শের দিক দিয়ে শাসনের যে একটা পারিভাষিক অর্থ আছে, এ কথা আমরা "শাসনের স্বরূপ" নামের প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করেছি (কার্ত্তিক, ১৩৩১)। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শাসন বলতে তার ব্যবহারিক অর্থটাই লক্ষ্য করছি। ধীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শাসনের যত বিভিন্ন মূর্ত্তিই দেখি না কেন, তার মূলে কিন্তু শাসকের পীড়নেচ্ছাটাই সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এ শাসন অর্থে ছেলেকে কোনও একটা স্বাচ্ছন্দ্য হতে বঞ্চিত করা। এর পরে আমরা যা বলব, তা মুখ্যতঃ শাসনের এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বলব।

খুব সহজ কথায় বলতে গেলে শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ছেলেকে অন্যায় হতে বিরত করা। অবশ্য এটা হল শাসনের "নেতি"র দিক। যাঁরা শাসনকে আরও একটু উঁচু নজরে দেখেন, তাঁরা এর একটা positive valueও স্বীকার করবেন। তাঁরা বলবেন, শুধু অন্যায় থেকে বিরত করা নয়, বাস্তবিক ন্যায়ের দিকে প্রণোদিত করাটাও শাসনের অঙ্গ হওয়া উচিত। প্রচলিত শাসন-পদ্ধতির যদি কোনও সংস্কার ও সমালোচনা প্রয়োজন হয়, তা এই দিক থেকেই করতে হবে।

অন্যায় করেছে, তার জন্ত শাস্তি দিলাম—এই হল শাসনের মূল নীতি। এ ধরে বলতে পারি, অন্যায় না করলে শাসনও করা চলে না। এই সহজ কথাটাও স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়ো-আছে, দেখতে পাই। কোনটা যে ন্যায় আর কোনটা অন্যায়, কোন আঘাতের মূলে শাসকের মঙ্গলেচ্ছা আর কোনটার মূলেই বা স্বার্থ-হানিজাত উত্তেজনা, নির্ণয় করা বড় কঠিন। বয়সে বড় হয়েছি বলেই যে আমরা ন্যায়ান্যায় খুব বুঝি, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করে বিচার-বুদ্ধিকে জাগ্রত করা বহু সাধনা সাপেক্ষ। শাসকমাত্রেই সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, এ কথা বলা চলে না। নিজ নিজ ছেলেবেলাকার কথা যদি কেউ মনে করে দেখেন, তা হলে এমন অবিচারে শাসনের কত গ্লানি স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে দেখতে পাবেন।

সে কথা মনে রেখে, ঠিক অন্যায় দেখতে পেলে তবে শাসন করাটাই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

এ হতেই সিদ্ধান্ত করতে পারি, যেখানে অন্যায় প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করতে পারছি না, সেখানে শাসনদণ্ডের প্রয়োগ করাও উচিত নয়। করলে তার ফল বিপরীত হবে। এ কথাটা আমরা আরও সহজে ভুলে যাই। জুলুম করবার প্রবৃত্তিটা আমাদের মাঝে স্বাভাবিক; মানুষকে ভাল ভাবার চেয়ে মন্দ ভাবার ঝোঁকটা আমাদের বেশী। অন্যায়ের সন্দেহকে উপেক্ষা করে বা সহ্য করে পাছে ঠকে যাই, এই ভয়ে আমাদের উপর যা মারাটাই আমরা সেয়ানার কাজ মনে করে থাকি। কিন্তু এই অসহিষ্ণুতা ও অতিসন্দিগ্ধ ব্যস্ততার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কত অনর্থপাত হয়, তা বলবার নয়। বরং ছেলে সত্য গোপন করছে এমন সন্দেহসত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করা উচিত, তবুও অন্যায়ভাবে বা প্রমাণাভাবে শাসন করা উচিত নয়। জানি, এ কথায় সকল শাসকের প্রাণ সায় দিতে চাইবে না। এ ক্ষেত্রে ক্ষমা করলে অনেকে অবিবেচনা ও দুর্ব্বলতা মনে করবেন। কিন্তু সন্দেহ ও প্রমাণকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করলে তার ফল কিছুতেই ভাল হতে পারে না। যেখানে সন্দেহ, সেখানে সতর্কতাই প্রয়োজন, শাসন প্রয়োজন নয়। এ ক্ষেত্রে ক্ষমা বহৎ হৃদয়ের শাসন। কোনও ক্ষেত্রেই সত্যকে নির্জ্জিত করে বুদ্ধির বাহাদুরীকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। যেখানে সন্দেহমাত্র জন্মেছে, সেখানে ততটুকু ধরেই প্রতীকার চেষ্টা করতে হবে, হাতের পাঁচ রাখবার বুদ্ধিতে অন্যায় করলে চলবে না। আপাততঃ ক্ষতির আশঙ্কা জেনেও শাসক যদি সন্দিগ্ধ ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্যকেই বহন করবার মত সহিষ্ণুতা ও তেজস্বিতা হৃদয়ে সঞ্চয় করতে পারেন, তবে তাতে যে শুধু তাঁরই কল্যাণ হবে, তা নয়, পরোক্ষভাবে তাঁর পুণ্য-প্রভাবে শিক্ষার্থীরও চিত্ত মার্জ্জিত হবে।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। ছেলেদের ন্যায়ান্যায়বোধ যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, এ কথা শাসককে সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে। তাদের মাঝে প্রবৃত্তির দিকটাই প্রবল। সুকৌশলে এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে আমাদের প্রৌঢ়বিচার-প্রসূত ন্যায়ান্যায় বোধ তাদের মাঝে সঞ্চারিত করা একেবারেই অসম্ভব। প্রবৃত্তিকে শুধু চাপবার চেষ্টা করলেও কিছু হবে না, মূল বিশ্লেষণ করে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে শুভ দিকে পরিচালিত করতে হবে; এর জন্য ধৈর্য্য, সমবেদনা, ক্ষমা ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার প্রয়োজন। শাসকের ও শাসিতের ন্যায়ান্যায়-বোধ যদি সমভূমিতে এসে না দাঁড়ায়, তাহলে শাসন করা বৃথা, বরং তা অকল্যাণেরই নিদান। ছেলে যদি জানে যে, সে অন্যায় বিচারে শাস্তি পেল, তা হলে সে বিচারককে প্রাণপণে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করবে। এই যে শাসকের সঙ্গে তার মনভাঙ্গাভাঙ্গি হবে, এ আর কিছুতেই জোড়া লাগতে চাইবে না। অন্যায় শাসনে যদি কোনও শিক্ষক শিক্ষার্থীর অশ্রদ্ধাই অর্জ্জন করে থাকেন, তবে সে তাঁর নিতান্ত দুর্দ্দৈব বলতে হবে। ছেলেরা কিছু দূর পর্য্যন্ত অকপটে সকলকেই বিশ্বাস করে, অন্যায়ের কথাটা খুলে বলতে কোনও শঙ্কা অনুভব করে না। যতদিন তাদের ন্যায়ান্যায় বোধটা আমাদের অনুরূপ না হয়, ততদিন এই ভাবটা প্রবল থাকে; কিন্তু অলক্ষ্যে কখন যে তারা শৈশবের অকপট ভাব ছেড়ে আত্মগোপনের আশ্রয় নেয়, তা অতি আশ্চ-

য়েরাও অনেক সময়ে বুঝতে পারেন না। এই সময়ে যে আঘাতটা তাদের বিচারে অন্যায় বলে মনে হয়, তাকে তারা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই এ একটা সঙ্কট মুহূর্ত্ত।

তারপর অন্যায় করলে যে শাস্তি দেব, সেটা কোন্ ভাব প্রণোদিত হয়ে, তাও বিচার করতে হবে। ভবিষ্যতে আর অন্যায় করবে না, এই জন্য শাস্তি দেওয়া চলে। কিন্তু অতীতে একটা অন্যায় করেছে, শুধু এইটুকু ধরে সব সময়ে শাস্তি দেওয়া চলে কি না, তা বিচার সাপেক্ষ। এখানে সাবধান হতে না পারলে শাসক ও শাসিত উভয়েরই ক্ষতি। উভয় ক্ষেত্রেই শাসিত বালক শাস্তিটা তুল্য ভাবেই ভোগ করবে বটে, কিন্তু শাস্তির ধরণ অনুযায়ী শাসক ও শাসিতের মাঝে যে সমস্ত মনোবৃত্তির খেলা চলবে, তার প্রভাব উভয়কেই স্পর্শ করবে। ভবিষ্যতের কথা ভাবলাম না, কেবল অন্যায় করেছে বলেই শাস্তি দিলাম—এটা হল প্রতিশোধ নেওয়ার মত। ছোট ছেলের ওপর "প্রতিশোধ নেওয়া" কথাটা খুব কটু শোনায় বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, অনেক সময়ে মা বাপের শাসনের মূলেও এই পশুভাবটাই প্রচ্ছন্ন থাকে। শাসকের মনে তার চেহারাটা সুস্পষ্ট নয় বলে সে এটাকে উপেক্ষা করতে পারে বটে, কিন্তু শাসিতের ক্ষুদ্র হৃদয়টা যে তারই বিষে জর্জ্জরিত হয়ে যায় এ কথা বোঝে কয় জনা?

এ সম্বন্ধে একটা সহজ সূত্র এই বলতে পারি, যেখানেই দেখব, শাসন করতে গিয়ে রাগ হয়ে গিয়েছে, সেখানেই বুঝব মূলে প্রতিশোধস্পৃহা জেগেছে—সে এখন যত সূক্ষ্ম আকারেই হোক না কেন। অবশ্য সঙ্গত শাসন করতে গেলেও রাগ হয় বটে, কিন্তু সে রাগে শাসক আত্মহারা হবে না—সে যে রাগের অভিনয় করছে, এ কথাটা সে বেশ বুঝতে পারবে। যেখানে ভবিষ্যতের বিচার নাই, কেবলমাত্র অতীতের অন্যায় ধরেই, শাসন—সেখানে ক্রোধে স্বরূপবিচ্যুতি না হয়েই যায় না। এমন ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ কিছুতেই ঠিক থাকতে পারে না—ঝোঁকের মাথায় পাঁচ ঘা'র জায়গায় দশ ঘা' আপনি হয়ে যায়। রুদ্ররসে শাসক প্রচুর পরিমাণে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন বটে, কিন্তু ন্যায়ের ওপর করগণ্ডা উপরিলাভ হল, শাসিতের অন্তর্যামী তার পাকা হিসাব রাখেন। শাস্তি অপরিমাণ হলেই সেটা অন্যায় হবে। তখন শাসিত বালক দোষী হওয়া সত্বেও এই অন্যায়টা হজম করতে চাইবে না।

প্রতিশোধস্পৃহা কতরকম ছদ্মবেশে আসতে পারে, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সকলের মূলেই এক নিদান—স্বার্থের অপঘাত। শুধু বৈষয়িক স্বার্থই নয়—মানসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি স্বার্থও আছে। এই ক্ষতির বেগটাও অনেক সময় নিরুপায় ছেলেপিলেকেই সইতে হয়। বলতে পারি, প্রতিশোধস্পৃহার এগুলো হল তির্য্যক রূপ। এর দু' একটা উদাহরণ দেব। প্রবাদ আছে, "ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।" এই হল তির্য্যকভাবে প্রতিশোধ নেওয়া। ছেলের ভাল সামলাতে পারছি না বলে বদনাম হবার সম্ভাবনা; সেক্ষেত্রে শাসনের মাত্রাটা চড়িয়ে দিয়ে "বদ্" ছেলেকে সায়েস্তা করা—এও প্রতিশোধের একটা তির্য্যক রূপ। এমনি আরও কত আছে। মূল কথা, ঠিক আত্মস্থ থেকে শাসন করা যে কত দুরূহ, তা বলবার নয়। যিনি প্রবৃত্তি জয় না করতে পেরেছেন,

সুখদুঃখে লাভালাভে মানাপমানে সমজ্ঞান হয়ে পরহিতপ্রতিপন্ন হতে না পেরেছেন, তাঁর শাসনে দুঃখ থাকবেই।

ভবিষ্যতে আর এমন কাজ করবে না, এই ভেবে যে শাসন করা, সেটা মন্দের ভাল। শাসিতের হিত করবার ইচ্ছা শাসকের মনে সুস্পষ্ট হয়ে জাগে বলে তার চিত্তস্থৈর্য্যের ব্যাঘাত হয় না এবং ফলে শাসনে ন্যায়বিচার হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী থাকে। অবশ্য এমন ক্ষেত্রে চিত্তবিক্ষেপ হতে আটক নাই, কিন্তু যথার্থ সমবেদনা ও হিতাকাঙ্ক্ষা যেখানে প্রবল, সেখানে সচরাচর এমনটা ঘটে না। আর যদিও বা কোথাও ঘটে, তবুও শাসকের মাঝে একটা দরদ, একটা আন্তরিক ভাব ভাব থাকে বলে আতিশয্যের বেলাতেও সে শাসন তেমন অসহনীয় হয়ে ওঠে না।

একটা বিষয়ে শাসকের বিশেষ নজর থাকা দরকার। অন্যায় দেখলে বা জানলে তৎক্ষণাৎ উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া মনুষ্যমনের ধর্ম্ম। কিন্তু উত্তেজনাকে শাসনের বাহন করলে তো চলবে না। এই জন্য অবিচলিত থেকে অন্যায় দেখবার—সইবার কথা বলছি না—অভ্যাস করা প্রত্যেক সুশাসকের পক্ষে অতি প্রয়োজন। অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যায়কে উপেক্ষা করা কিছুতেই চলে না; কিন্তু তা বলে অন্যায়ে বিচলিত হলেও মর্য্যাদাহানি অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষককে অনেক আঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই জন্য ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হতে হবে। "ছেলে ভাল করব"—এই কামনাই হল শাসনের পক্ষে সেরা ওকালতী। কিন্তু এই অভিমানটুকু না ছাড়লে নির্ব্বিকার হওয়া যাবে না—অন্যায় দেখলে অন্যায় উত্তেজনা আসবেই এবং সে জন্য শাসনের মাত্রা ও ফলে তারতম্য হবেই হবে। অন্যায় ও অকল্যাণ দেখবামাত্র শিক্ষক আত্মসম্বরণ করুন, ইন্দ্রিয়গুলিকে শান্ত করে চিত্তকে আত্মসংস্থ করুন, তার পর অবিক্ষুব্ধ হয়ে বিচার করুন; এর মাঝে সত্যস্বরূপের প্রতি প্রপন্নভাব থাকলে তিনিই অন্তর হতে নির্দ্দেশ করে দেবেন, কোথায় শাসন প্রয়োজন, কোথায় বা ক্ষমা প্রয়োজন। শাসন রুদ্রশক্তি; নিঃস্পৃহ হৃদয়ে সে শক্তিকে ধারণা না করতে পারলে তার পরিচালনায় বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী—শক্তি সেখানে মোঘা। জিতেন্দ্রিয়ের শাসনই অমোঘ শাসন।

রহস্য

মানুষের নিজের কিছু করবার ক্ষমতা নাই—ঠিকপথে চললে বা না চললেও একটার পর একটা অবস্থা ও তদনুযায়ী অভিজ্ঞতা তার আপনা আপনি আসে; তবে ঠিক পথে চললে সে সেটা বুঝে মাত্র।

আমার ভিতর কি আসছে আর কি যাচ্ছে, এ আমি ঠিক ধরতে পারি না—কাজেই বুঝি আমার ঠিকপথে চলা হচ্ছে না। এমন অবস্থায় আমার কোনও মতামত বা অভিব্যক্তি কি করে সত্য বলে গৃহীত হতে পারে? কেননা আমি প্রমাণ করতে পারি না, কোন্ ভাবটা আমার মাঝে সত্য, আর কোন্টা

সাময়িক। তা ছাড়া এ ও দেখ্‌ছি, ভাবের সাময়িক বিকাশই আমার মাঝে বেশী—চিরন্তন একরূপ তো কারু দেখ্‌লাম না—কেউ পরিক্ষীণ হচ্ছে, কেউ পরিপুষ্ট হচ্ছে; আমি আপন খুসীমত কাউকে ধরে রাখতেও পারি না বা বিদায় দিতেও পারি না।

কাজেই নিজে যেখানে নিজের ক্রিয়া বা "ব্যক্তি" বিশেষের কার্য্যকারণ পরম্পরা নির্দ্ধারণ করতে পারছি না, অতএব নিজের ইচ্ছামত সে ক্রিয়ার বেগ হ্রাস বা বৃদ্ধি কর্‌তে পারছি না—সেখানে একটা অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় কি?

আবার সে অদৃশ্য শক্তিকে আমা হতে বিচ্ছিন্ন বা আমার প্রয়োজকরূপে মান্‌লেও একটা কৃত্রিমতার আশঙ্কা আসে; কেউ আমাকে চালাচ্ছে আর আমি চলছি—এ হলে আবার দুটো সত্তা মানতে হয়; তা হলে আবার সামঞ্জস্য থাকে না।

কাজেই সেই অদৃশ্য শক্তিকে এমনভাবে স্বীকার করা উচিত—যাতে আমি চালাচ্ছি আবার আমিই চলছি, একটা ব্যষ্টির অনুভব ও একটা সমষ্টির অনুমান—এইভাবে একই রূপে পেতে পারি।

তা হচ্ছে স্বভাব। এই স্বভাবই আমাদের গতি এবং স্বভাবই আমাদের স্থিতি। স্বভাবের একটা দিক চলছে আর একটা দিক চালাচ্ছে। কাজেই আমরা যা করি, আমরা করাই বলেই করি।

এই জন্য নির্ভর একটা সমস্যা। বাস্তবিকই আমাকে যে করাচ্ছে, সে এত আপনার যে, আমার করাটাই যেন তার করানো। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে জগতের প্রযোজ্য-প্রয়োজকভাবের মাঝে এমন একটা বিরোধ দেখা যায়, বাক্যে যার মীমাংসা হয় না: এ রহস্যকে মানা যায় কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। এই রহস্যটুকুই তাঁর লুকাবার জায়গা—তাই তিনি স্বামী রামের ভাষায় "মিস্‌ও নন, মিসেস্‌ও নন—মিষ্ট্রী" অর্থাৎ চিরগোপন রহস্য। রহস্য বলেই কারো নির্দ্দিষ্ট এলাকায় তাঁকে কেউ প্রমাণ কর্‌তে পারে না,—তাই তিনি সার্ব্বভৌম। সাধুর চিত্তে তিনি ভরসারূপে জাগেন, আবার ভীতিরূপে তিনিই পাতকীর প্রাণে রন। তাঁকে শুধু মেনে নাও।

তিনি যত রহস্যময়, ততই তাঁকে বড় বলে মনে হয়—দিন দিন তাঁর সম্বন্ধে বিচিত্র বিচিত্র ভাব আস্‌ছে, রূপে-অরূপে অসংখ্য প্রমাণ তাঁর পাচ্ছি, কিন্তু শেষ যেন মিলছে না—তিনি রহস্য, রহস্য, রহস্য! তিনি আমাদের মাঝে "রহসি" সুপ্ত রয়েছেন—যে জাগ্রৎরূপে অনুভব করে, তারই প্রাণ তিনি ভাবে ভরে দেন; অথচ তাঁর শেষ কিছুতেই পাওয়া যায় না। তাঁর সম্বন্ধে যেদিন যা ভাবি, তাই সত্য, কেননা তিনি রহস্য, তিনি অপ্রমেয়, অনন্ত!

তাঁর সম্বন্ধে অর্থাৎ জগতের এই স্বভাবের সম্বন্ধে আমাদের অবস্থাভেদে যে দর্শন বা অনুভব, তাই আমাদের উপনিষদ্‌। শুধু তাই বা কেন, জগতে যেখানে যার বিকাশ ঘটছে, তাই তিনি। যে এই রহস্যময় স্বভাবকে বিচার করে বিশ্লেষণ করে বুঝ্‌তে চেষ্টা করে, সে দার্শনিক; আর যে সংশ্লেষণদৃষ্টিতে গোটা বিশ্বটাকেই একটা রহস্য বলে মেনে নিয়েই আনতহৃদয়ে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় তাঁতে প্রণতচিত্ত থাকে, সে হল পৌরাণিক। একজন সমষ্টির বিকাশে ও বিশ্লেষণে ব্যষ্টিকে বুঝে, অপরে ব্যষ্টির সংশ্লেষণে সমষ্টিকে স্বীকার করে। একই কথা।

এই উভয়বিধ ভাব হতেই আমাদের মাঝে কোথাও কাব্যের সৃষ্টি, কোথাও সাহিত্যের সৃষ্টি, কোথাও শিল্প, কোথাও নির্ম্মাণ—সমস্তকে জড়িয়ে সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্যবোধ বা জগতের সমস্ত বাস্তবের পিছনেই এক অবাস্তব রহস্যে বিশ্বাস করাই আস্তিক্যবুদ্ধি। এই আস্তিক্য সব সময় নিঃসন্দিগ্ধ নয়, অথচ ফেলে দিয়ে ভুলে যাবারও নয়। এই যে অপূর্ণতাটুকু, এই যে পেয়ে না পাওয়া, এই হচ্ছে জগতের গতিশক্তি। যদি পূর্ণ হয়েই যেত, তবে তো চল্‌ত না। আবার না চলেই বা কি করবে? কাজেই দেখি, আবার সেই রহস্য এসে পড়ে।

জগতের সমস্ত মীমাংসারই চরম হচ্ছে রহস্য। প্রাণের আবেগে যা বলি, তা সেই চরম রহস্যেরই প্রমাণ বা পূর্ব্বাভাস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মীমাংসা। দৈনন্দিন জীবনে যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ আস্‌ছে, চরম রহস্যকে স্বীকার করে তাদের যে আপেক্ষিক মীমাংসা, তাই নিয়ে আমাদের জীবনবেদ—তার আপেক্ষিক সত্যকে চরম সত্য মনে করলে অতিরিক্ত দাবি করা হবে।

দিনের পর দিন বিরোধ আস্‌ছে, মীমাংসা কর্‌ছি, লিখ্‌ছি, তাই জগৎটার মাঝে আমরা যে সজীব, তার প্রমাণ হচ্ছে। চরমে গিয়ে লবণের পুতুল লবণসমুদ্রে তলিয়ে যাব, তা তো জানিই। এক সময়ে ঐ সমুদ্রে দ্রব ছিলাম, কঠিন হয়েছি, আমাকে পুতুল হতে হয়েছে, আবার দ্রব হতে চলেছি। এই আবর্ত্তন বা গতিই লীলা—এ লীলা না থাক্‌লে কিছুই থাকৃত না। আবর্ত্তনের শেষ নাই, কাজেই জগৎ অপূর্ণ; আবর্ত্তনের শেষ নাই বলেই তা পূর্ণ—অথবা কোনটাই নয়, রহস্য, রহস্য, রহস্য!

* * *

বসে বসে শুধু এই মজা দেখ! কাজের ভূত বাঁশ বেয়ে উঠ্‌ছে, আর নামছে, এ আর ফুরোবে না কোনদিন। এই যে তুমি দেখছ—দৃষ্টিও তোমার ওঠানামা কর্‌ছে। এ করবেই—স্থির হয়ে শুধু দেখ আর ভাব, জগৎটা কি রহস্যময়, কি ফাঁকি অথচ কি মজা! শুধু আনন্দ, আনন্দ—এর মাঝে বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই।*

——*——

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৭১।৩

দোষ দর্শন প্রয়াস স্বভাবসিদ্ধ। অন্যের দোষ দেখিয়ে নিজেকে কালিমামুক্ত করা যায় না। নিজে দোষ গুণের অতীত না হলেও অন্যের দোষ ঠিক ঠিক ধরা যায় না। অবস্থাভেদে দেখা যায়, দোষেও গুণ আছে, গুণেও দোষ আছে। আবার গুণমাত্রেই দোষ। গুণময় থাক্‌তে নির্দ্দোষী হতে পারবে না। তুমি তো ছার, হরি হর বিরিঞ্চিও দোষযুক্ত হওয়ায়

সম্যক দর্শনের অধিকার হতে বঞ্চিত। তোমাকে দোষ গুণের পরপারে দাঁড়িয়ে বিচার করতে হবে। যার দোষ গুণ বিচার করতে চাও, তার স্থলাভিষিক্ত হও। একবার এদিক থেকে দেখ, আবার অন্যদিক থেকেও দেখ, তবে তো তোমার দর্শন সম্যক দর্শন হবে। সংস্কার অঞ্জনে চক্ষু রঞ্জিত করো না। সংস্কার বিমুক্ত হয়ে প্রশান্ত গম্ভীর চিত্তে শুধু সত্যাবধারণ উদ্দেশ্যে বিচার করে যাও, যথার্থ জ্ঞান আপনিই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

*

স্বার্থই সর্ব্ব অনর্থের মূল। স্বার্থেই তুমি অন্ধ। তুমি যাকে স্বার্থ বলছো, ও তো ঠিক স্বার্থ নয়, ওই হচ্ছে অনর্থ। অনর্থশূন্য হতে হলে তোমায় ঐ স্বার্থ পরার্থপেক্ষিত করতে হবে। তুচ্ছ স্বার্থবিঘ্নে তোমায় এত অধীর হলে চলবে না। তোমার হৃদয় এত ক্ষুদ্র করো না। তুমি যে সত্য পথের পথিক, অনন্তের যাত্রী—পরার্থই তোমার প্রকৃত স্বার্থ।

*

তুমি অভিমানে অভিভূত মূঢ়; তোমার দ্বারা সুষ্ঠু বিচার সম্ভবে না। বিচার বুদ্ধি দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মোহে বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটা স্বাভাবিক। মুগ্ধ আত্মার স্বরূপবিচ্যুতিতে মেধার বিকার ঘটে। প্রমাদশূন্য অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে তোমায় সংস্কার শূন্য হয়ে অভিমান ত্যাগ করে শুদ্ধসত্ত্বযুক্ত বুদ্ধি নিয়ে তবে বিচারকের আসনে বসতে হবে।

*

জ্ঞান ও আনন্দ আত্মার স্বভাব। তোমার জীবনে যখন এই জ্ঞান ও আনন্দের সামঞ্জস্য হবে, তখনই তোমার জীবন পরিপূর্ণ মহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠিবে। এই জ্ঞানের বিকাশ মননে, আর আনন্দের বিকাশ ভালবাসায়। ভালবাসা জিনিষটা বড় মধুর, বড় পবিত্র, একটি মানুষকে যদি নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসতে পার, তা হলে দেখবে সৃষ্টির একটী জীবও তোমায় সেই ভালবাসার সোহাগ থেকে বঞ্চিত হবে না। এই ভালবাসাই বুদ্ধ ও গৌরাঙ্গকে পাগল করে ঘরের বাহির করেছিল।

*

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে এক বিরাট্ সত্তা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। তাঁহাকে পুরুষ কিম্বা নারী, মানুষ বা দেবতা প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া চলে না। জলের মত তিনি যখন যে আধারে আসিয়া আমাদের কাছে ধরা দেন, তখন আমরা তাঁকে তাই বলি। সর্ব্বভূতে তিনি আছেন বলিয়াই জগতের একজন আঘাত পাইলে অপরের প্রাণ কাঁদে। আবার তিনি আছেন সর্ব্বভূতে। যে আধারে তাঁর বিকাশ যত বেশী, তার ভিতর হইতেই অপরের দুঃখে তিনি তত বেশী কাঁদিয়া ওঠেন। তাই জগতের দুঃখে মহাপুরুষদের এত করুণা। সাত্ত্বিক শরীরেই তিনি অধিক প্রকটিত হন। এখন তোমার যে আধারে অবস্থিতি, সেই আধারই দিন দিন পবিত্র কর। তাঁর শক্তি যত ফুটবে, তাঁকে তত বেশী চিনবে।

*

আনন্দ তোমার লক্ষ্য। তুমি চিরসুখী হতে চাও, দুঃখ চাও না। এই সুখ আনন্দ পেলেই হয়। নিরানন্দই দুঃখ। কিন্তু এই আনন্দ, চিরশুদ্ধ শান্ত ও শিব অর্থাৎ মঙ্গল জনক হওয়া চাই। অপবিত্রতা থেকে যে

সুখ উদ্ভূত, তা ক্ষণস্থায়ী। যত পবিত্র ও শুদ্ধ হবে, আনন্দ ততই স্থায়ী ও গভীর হবে। চাই এই শুদ্ধ শান্ত শিব ভাব। অশিব থেকে যদি ধ্বংসের পথে যেতে না চাও, তবে প্রতি কথাবার্ত্তা, আচারব্যবহার ও চিন্তায় এই শুদ্ধ শান্ত ভাবের অনুসরণ কর।

*

ভালবাসা খাঁটী কখন হবে, নিজে তা জানা যাবে না। কেননা প্রেমিক কখনও প্রেমের অন্ত দেখিয়ে বড়াই করতে পারেন না। যতই ভালবাসা বা প্রেম গাঢ় হয়, ততই নিজের অস্তিত্বজ্ঞান হ্রাস হতে থাকে। আমার ভালবাসা দিয়ে তার সমস্ত দিক পূর্ণ করতে পারলাম না—এ আক্ষেপ প্রেমিকের চিরদিনই থাকে। আর একজায়গায় গিয়ে চিত্ত যদি অমন সরস হয়ে যায়, তাহলে তখন বাইরের সমস্তই মধুময় হয়ে ওঠে। ভালবাসা তখনই সার্থক—যখন দেখি, সৃষ্টির প্রত্যেক জিনিষই আমার ভালবাসায় রসময় হয়ে উঠ্ছে। তখন আর দেশ কাল পাত্রের মধ্যে সে ভালবাসা আবদ্ধ থাকবে না, অথচ সেই একটী স্থানকে কেন্দ্র করেই চিত্ত বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। স্বয়ং বিশ্বনাথই তখন সে চিত্ত জুড়ে বসবেন। জ্ঞানের লক্ষ্য অদ্বৈত ভাবে প্রেমের ভিতর দিয়ে এমনি করে সাধককে পৌঁছিয়ে দেয়। চরমে জ্ঞানী ও প্রেমিক উভয়ে একই ভূমিতে গিয়ে পৌঁছেন। পার্থক্য শুধু পথের। জ্ঞানী অহংএর বিরাটত্বের মাঝে সব লীন দেখেন; আর প্রেমিক প্রেমাস্পদের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজেরও অস্তিত্ব ভুলে এক অপরিসীম আনন্দে আত্মহারা হন।

*

স্থির চিত্তের বেগ বেশী গভীর। সেখানে শক্তি সংহত রয়েছে। প্রয়োজন মত সেই সঞ্চয় থেকে শক্তি আসবে। যে অফুরন্ত শক্তিতে এই জগৎ, সেই শক্তিময়ীর অধীশ্বর স্বয়ং শিব অটল হয়ে বসে আছেন। তিনি চির শান্ত স্থির উদাসদৃষ্টি নিয়ে এই জগৎ দেখছেন, আর তাঁরই শক্তিরূপিণী মহামায়া চঞ্চল জগৎকে নাচাচ্ছেন। যদি এ নৃত্যের রঙ্গভূমি হতে দূরে যেতে চাও, তবে এ মায়ার ঊর্দ্ধে ঐ শিবত্বে তোমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সেখান থেকে শান্ত দ্রষ্টা স্থির ও উদাসীন ভাব নিয়ে জগতের মঙ্গল কর। ক্ষুদ্র অহং নিয়ে জগতের কতটুকু উপকার তুমি করবে? শক্তি তোমার কতটুকু? যদি নিজকে দেহ-মনবুদ্ধির অতীত করে সংস্কারমুক্ত হতে পার, তবেই জগতের মঙ্গলামঙ্গল তুমি চিনতে পারবে—শক্তিধর হয়ে শক্তিচালনা করতে পারবে।

—*—

দানপ্রাপ্তি

—•—

(আশ্রমের সেবকগণ কর্ত্তৃক সাধারণ হইতে সংগৃহীত)

সারস্বত মঠে—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বরুয়া ৩৲, শ্রীলক্ষ্মীনাথ হাজারিকা ১৲, শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র বরুয়া ১৲, শ্রীআনন্দেশ্বর বরুয়া ১৲, শ্রীহরিপ্রসাদ কটকী ১৲, শ্রীগণেশ্বর শর্ম্মা বরদলৈ ।।০, শ্রীনবীনচন্দ্র তামুলী ১৲, শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা ।।০, শ্রীকেশবনাথ লিগিরি ১৲, শ্রীফণিধর বরদলৈ ১৲, শ্রীঅবনীকুমার তলাপাত্র ২৲।

ভাওয়াল সারস্বত আশ্রমে—

বাহুল্যভয়ে ২৲ টাকার অনধিক দাতাগণের নাম পৃথক ভাবে প্রকাশ না করিয়া স্থানের নামে সংগৃহীত বলিয়া প্রকাশ করা হইল।

(উড়িষ্যা হইতে)

ময়ূরভঞ্জ (বারিপদা)—ময়ূরভঞ্জাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও ৫০৲, ময়ূরভঞ্জের মহারাণী ৩০৲, মহারাজার খুল্লতাত রাউত রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শ্রীদামচন্দ্র ভঞ্জ দেও ২৫৲ এবং তাঁহার স্ত্রী রাউত রাণী শ্রীযুক্তা শান্তো দেবী ৫৲, জজ্ শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু ২৲, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ২৲, শ্রীবিদ্যাধর মহাপাত্র, ডিপুটী ২৲, শ্রীভগবানচন্দ্র দাস ২, শ্রীলালমোহন পতি, উকীল ২৲, শ্রীগোলাম জী ২৲, শ্রী মহম্মদ আবদুল রহিম ২৲, মিঃ এ, গড্ ফ্রে ২৲, ষ্টেশনমাষ্টার ২৲, সেটল্‌মেণ্ট অফিস ৩৸৵০, ফ্রেজার হোষ্টেল ২।।০, জনৈক হিতৈষী ২৲, সংগৃহীত ৬৩।।৶০। পুরী—মহারাজ সার্ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (কাশিমবাজার) ২০৲, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ২৲, শ্রীপূর্ণচন্দ্র নিয়োগী ২৲, সংগৃহীত ৬৲। কটক—নরসিংহপুর রাজমাতা ৫৲, নরসিংহপুর কুমার ২৲, ঢেকনর রাজমাতা ৪৲, মধুপুরের রাজা শ্রীযুক্ত বদুমণি দাস ৩৲, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু উকীল ৩৲, রেভেন্সা কলেজ হোষ্টেল ৩৷৶০, মেডিক্যাল কলেজ হোষ্টেল ১৫৷৶০, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোষ্টেল ৫৷৶০ এফ্, এইচ্ বিনিমোরিয়া এণ্ড কোং ৫৲, রেভেন্সা গার্‌ল্ স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ ৪৲, কটক ডিভিসন ৩৷৶০, ট্রেনিং স্কুল হোষ্টেল ২৷৵০, আর, সি স্কুলের শিক্ষকগণ ২।।৵০, ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষকগণ ২৲, গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ২৲, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় ২৲, শ্রীযুক্ত বিচিত্রানন্দ দাস উকীল ২৲, শ্রীশশিভূষণ রায় ২৲, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস ২৲, শ্রীযুক্ত রঘুবাবু, কণ্ট্রাক্টার ২৲, শ্রীবাঞ্ছানিধি সাহু ২৲, শ্রীরস্তমজী পেটেল ২৲, লেডী ডাক্তার শ্রীযুক্তা প্রভাবতী সিংহ ২৲, লেডী ডাক্তার শ্রীযুক্তা কুন্তলা সাবোধ ২৲, সংগৃহীত ১৩৩/০। বালেশ্বর—জমিদার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে ৫৲, শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার উকীল ২৲, জমিদার আর, সি, মণ্ডল ২৲, শ্রীযুক্তা সাবিত্রী দেই চৌধুরাণী ২৲, লেডী ডাক্তার বি, দাসী ২৲, সংগৃহীত ৬৲।

(বিহার হইতে)

জেমশেদপুর টাটানগর—

শ্রীব্রজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৲, শ্রীসুকুমার রায় ৫৲, শ্রীনীরেন্দ্রকিশোর রায় ৫৲, শ্রীনীরেন্দ্র নাথ প্রামাণিক ৫৲, শ্রীসতোশচন্দ্র গুপ্ত ৪৲, ডাক্তার সেন ৫৲ ডাক্তার চক্রবর্ত্তী ৫৲ মিঃ ডি, সি, গুপ্ত ৫৲ শ্রীধীরেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার ২৲, মিঃ এস্. সি, বসু ৫৲, শ্রীক্ষীরোদ-বিহারী চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার ২৲, শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় ২৲, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার ১৲, শ্রীব্রজনাথ দত্ত ২৲, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৲, শ্রীপঙ্কজনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲, শ্রীহরি চরণ দাস ২॥০, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৲, শ্রীপ্রফুল্লনারায়ণ গুহ ১৲, শ্রী সত্যাক্ষয় মল্লিক ২৲, শ্রীশোভনা দেবী ২৲, জনৈক হিতৈষী ২৲, ৬০ নং পি, রোড্ মেছ ৫৲, ৬২ নং পি, রোড্ মেছ্ ২৲, ৫৩ নং পি, রোড্ মেছ্ ২৲, ১৩ নং কিউ রোড্ মেছ্ ২৲, ১৯ নং চেনার রোড্ মেছ্ ১৲, এম্ বঙ্গবাসী ২৲, শ্রীইন্দ্র সিং ৫৲, শ্রীগোপী সিং ২৲, শ্রীবলদেব সিং ২৲, শ্রীকরতার সিং কন্ট্রাক্টার ২৲, পেরিণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের শিক্ষকগণ ৬৵০, শ্রীবৈদ্যনাথ ২৲, মিঃ কে, এম্ বরুচা ১০৲, মিঃ ডি সি আহুদা ৫৲, মিঃ জে এন্ দস্তুর ৫৲, মিঃ এন ডি ব্র্যাকেলওয়ালা ৫৲ মিঃ কে, এস্ পেগুরে ৫৲, মিঃ ডি এম্ মেডেল ৫৲ মিঃ এন বি পেটেল ৫৲ মিঃ তারিওয়ালা ৫৲ মিঃ এম্, দস্তুর ৫৲ মিঃ জে গান্ধি ৫৲, মিঃ রস্তমজী পেটেল ৫৲, মিঃ ডি ডি প্রিণ্টার ৫৲, মিঃ আর, এন, কার্জ্জু ৪।৵০, মিঃ এইচ টাটা ৩৲, মিঃ বি ডি ইছাপুরিয়া ৩৲, মিঃ আর বর্ম্মা ২৲, মিঃ বি চক্সী ২৲, মিঃ এস্ পেটেল ২৲, মিঃ এম্ পি পালামকোট ২৲, মিঃ আর, কোহাজি ড্রাইভার ২৲, মিঃ এম্, এস্, গোপালন ২৲ মিঃ জে সি ওয়ারগার ২৲ মিঃ আর আব মোদী ২৲, মিঃ কে এম্ বালাপুরিয়া ২৲, মিঃ কয়েজি ২৲, মিঃ ডব্লিও সওয়ার্ড ৫৲, মিঃ ডিকষ্টা ৪৲, মিঃ এ, লাকিন ৫৲ শ্রীযুক্ত আবদুল ছামেদ ২৲, সংগৃহীত ৩০৬৲।

খড়কুশমা সারস্বত-আশ্রমে—

শ্রীমতী শশীমুখী দে ॥০, শ্রীবিক্রমচন্দ্র দে ॥০, শ্রীগৌরীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীপদ্মদাসুন্দরী দেবী ১৲, শ্রীঅঘোরচন্দ্র দে ॥০, শ্রীমোক্ষদা দাসী ॥০, শ্রী ন্দ্রনাম দে ॥০, শ্রীচৈতন্যকুমার পাল ১৲ শ্রীশিবুপাত্র ।০ শ্রীমত্যা বিলাসী দাসী ॥০, শ্রীমত্যা শিবি দাসী ॥০, শ্রী নচন্দ্র দে ॥০ শ্রীমত্যা বিলাসকুমারী দে ॥০, শ্রীমত্যা মোক্ষদা দেবী ॥০, শ্রীউমেশচন্দ্র মল্ল ১৲, শ্রীদিনরাম দে ॥০, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য ২৲, শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ॥০, শ্রীভূতনাথ চক্রবর্ত্তী ॥০, শ্রীতারাধন দলই ॥০, শ্রীসীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ পাল ॥০, শ্রীতারাধন মাইতি ১৲, শ্রীধরণীধর পড়া ॥০, শ্রীমতী কুসুমকুমারী তাতুরক্ষী ২৲, শ্রীমত্যা শান্তময়ী তাতুরক্ষী ১৲, শ্রীমত্যা ক্ষীরোদাকুমারী তাতুব্রহ্মী ২৲, শ্রীধনঞ্জয় সেন ॥০, শ্রীঅর্জ্জুনকুমার পাণ্ডা ॥০, শ্রীহরিচরণ সাউ ॥০—মোট ২৩৲।

সংবাদ ও মন্তব্য

—*—

আশ্রম-সংবাদ

সারস্বত-মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বঙ্গদেশ পরিভ্রমণান্তে বিগত ২১শে কার্ত্তিক পুরীধামে পঁহুছিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি পুরীতেই অবস্থিতি করিবেন। তাঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা—নীলাচলকুটীর, স্বর্গদ্বার, পুরী।

সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব

আগামী ২৬শে অগ্রহায়ণ শনিবার আঁরতা সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমের ১২শ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। আমরা সাধু সন্ন্যাসী, ভক্তবৃন্দ, আর্য্যদর্পণের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকগণকে উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবার জন্য সাদরে আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করিতেছি।

ভক্তসম্মিলনী

আগামী পৌষমাসের ১১ই, ১২ই, ১৩ই তারিখে হালিসহর সারস্বত আশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর ১১শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। আমরা আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের শাখা আশ্রমসমূহের পরিচালক, পৃষ্ঠপোষক ও ভক্তগণকে সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য আবাহন করিতেছি। কাহাকেও পৃথক পত্র দেওয়া হইল না। সকলেই বিছানাপত্র সঙ্গে আনিবেন। আরতা মঠাধিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীমৎ পরমহংসদেব ঐ সময়ে হালিসহর সারস্বত আশ্রম অবস্থিতি করিবেন। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভক্তগণ কলিকাতার পথে রাণাঘাট হইয়া হালিসহর, কাঁচরাপাড়া কিম্বা গরিফা—এই তিন ষ্টেশনের যে কোনও ষ্টেশনে নামিতে পারেন। ভক্তসম্মিলনীর বিগত অধিবেশনসমূহ এ যাবৎ পূর্ব্ববঙ্গেই হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এইবার নূতন অনুষ্ঠান। সুতরাং এ বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভক্তগণের বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় আশা করি, তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণের কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া সম্মেলনের উদ্দেশ্য সফল করিতে সচেষ্ট হইবেন।

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

৮ম বর্ষ } পৌষ { ৯ম সংখ্যা

মিত্রোঽগ্নিঃ

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।১।৫]

—*—

প্রত্যগ্নিরুষসশ্চেকিতানো
বোধি বিপ্রঃ পদবীঃ কবীনাম্।
পৃথুপাজা দেবয়দ্ভিঃ সমিদ্ধো
পদ্বারা তমসো বহ্নিরাবঃ॥

প্রেদ্বগ্নির্বাবৃধে স্তোমেভিঃ
গীর্ভিঃ স্তোতৃণাং নমস্য উক্‌থৈঃ।
পূর্ব্বী ঋতস্য সংদৃশশ্চকানঃ
সং দূতো অদ্যৌদুষসো বিরোকে॥

আধাগ্নির্য্যামিসুধীষু বিক্ষ্
পাং গর্ভো মিত্র ঋতেন সাধন্।
আ হর্য্যতো যজতঃ সাম্বস্থা
দভূদু বিপ্রো হব্যা মতীনা॥

মিত্রো অগ্নির্ভবতি যৎ সমিদ্ধো
মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ।
মিত্রো অধ্বর্য্যু রিষিরো দমুনা
মিত্রঃ সিন্ধূনামুত পর্ব্বতানাম্॥

উষার অরুণ কান্তি মাখি গায়, ওগো হুতাশন,
কবি-সরণীতে কর বিপ্র তুমি ক্ষিপ্র সঞ্চরণ;
মহাবীর্য্যে সমিন্ধিল দেববন্ধু যজমান দল—
দেবদূত-বহ্নি দেখ আধারের খুলিলে অর্গল।

তোমারি প্রসাদ যাচি স্তুতি রচি ঢালে তব পায়—
কত স্তোম উক্‌থ গাথা—তারা তব মহিমা বাড়ায়;
দীপ্ত হোক্ কর্ম্ম যত তব তেজে—এই তুমি চাও,
তাই বুঝি দেবদূত উষালোকে বিদ্যুতিয়া যাও।

মানুষের ঘরে তব ওগো বন্ধু পেতেছে আসন,
জলগর্ভশায়ী, কর ঋতবলে হিতের সাধন,
তোমারে সকলে চায়; বেদিকায় তব অধিষ্ঠান—
তোমারি মহিমা গায় হে মেধাবী, যত মতিমান্।

এই যে জ্বলিছে বহ্নি, জেনো তিনি মিত্র সবাকার—
মিত্র-হোতা, জাতবেদা—বরুণের লভি অধিকার;
তিনিই অধ্বর্যু মিত্র, দাতা-তাঁরে; বায়ু বলে চিনি,
বহে সিন্ধু অবিচল রহে গিরি—তারো মিত্র তিনি।

——*——

দর্শন

—*—

কর্ত্তাও নয়, ভোক্তাও নয়—দ্রষ্টা—এই হচ্ছে খাঁটী ভাব। করব না কিছুই। বাস্তবিক কিছুই তো করছিও না; মনটা যখন সজাগ থাকে, তখন হাতে পায়ে করাটাকে আর করা বলে মনে হয় না, সবটা চাপ তখন পড়ে মনের উপর। ঠিক এই ধারা ধরে, মনের ওপারে যদি মুহূর্ত্তের জন্যও গিয়ে দাঁড়াতে পারি, তাহলে দেখব, মন যে কর্ত্তা, তাও তো নয়। কর্ত্তার থাকে স্বাধীন ইচ্ছা; সে যদি আইনেই বাঁধা থাকে, তাহলে আইনই তো তার কর্ত্তা হল। মনকে ছাড়িয়ে গেলে দেখি, সে ও তো অমনি আইনে বাঁধা, সুতরাং সে ও তো করছে না। এমনি করে কর্ত্তৃত্বের বোঝা ছাড়িয়ে যেতে যেতে শেষ কালে দেখব—কেউ তো করছে না। তবে কর্ত্তৃত্ব এল কোথা থেকে? এর সবটাই ভ্রম, সবটাই অনির্ব্বচনীয় মায়া।

মনের মাঝে কর্ত্তার রূপ ইচ্ছার বিকাশে। হাতে পায়ে কিছু না করলাম—অমনটা হোক্—এই যে ইচ্ছা মনের ভিতর জাগিয়ে তুলছি, এও তো কর্ত্তৃত্ব। কল্পনায় যে কত কিছু গড়ে তুলি, তাও ওই কর্ত্তামির মায়ায় ভুলে। বলতে পারি, আমার ইচ্ছার পেছনে একটা বড় ইচ্ছা রয়েছে, সেই কাজ জুটিয়ে আনছে। তবে সেটাই থাক না কেন—মাঝখান থেকে আবার আমার ইচ্ছা বলে একটা অহং জুটিয়ে তোলা কেন? ওতে লাভ তো কিছু হয়ই না কেননা যা হবার তা হবেই, আমি ইচ্ছা করলেও হবে, না করলেও হবে। শুধু আমার আমিটাকে মাঝখানে খাড়া করিয়ে একটা অতিরিক্ত ভাবনাচিন্তার বোঝা বয়ে মরি কেন? যা হবার তা হবেই; কোনও একটা বড় ইচ্ছার প্রেরণায় যদি তা হবার হয়, তা তো হচ্ছেই; মাঝখানে তবে আর কেন এই একটা অহমিকার বিভীষিকা! ও তো কোনও কিছুকে আপনার অনুকূলও করে নিতে পারে না, প্রতিকূলও করতে পারে না—শুধু শুধু বিষের জ্বলুনীতে চট্‌ফট্ করে মরে। তাই বলি, অহমিকা চাই না—মিছার কর্ত্তৃত্ব চাই না—ইচ্ছার তরঙ্গ মনের মাঝে তুলতে চাই না—চাই মনো নিবৃত্তিঃ।

তেমনি ভোগও চাই না—তার দাগা আছে বলেই চাই না। কর্ত্তৃত্বের শাস্তিটা মানুষ হাতে হাতে পায়, তাই দু'চার বার ঠেকলেই আর ওদিকের কামভাবনিটা থাকে না। কিন্তু ভোগের মাঝে মনটা অন্ধ হয়ে এলিয়ে পড়ে যেন; ভয় আছে বললেও সে কথা বিশ্বাস করতে চায় না, বা জেনে শুনেও চোক বুজে থাকতে চায়। এই যে দাগা পেয়েও ভুলে যাওয়া বা আপাততঃ যে রসটুকু হাতের কাছে এল, তাতেই মেতে যাওয়া—এই তো ভোগের বিষ। ভোগীর মাঝে বিচার কোথায়? রসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ভাটার টানে বয়ে যেতেই তো সে চায়। ভোগের মাঝে বিচার এসে জুটলে ওর অর্দ্ধেক স্বাদই নষ্ট হয়ে যায়। তাই ভোগী ভাবতে চায় না। ভোগের মাঝে বড় বড় ভাবনাও তলিয়ে যায়।

এই ভোগের নেশার মাঝে যে অপমান রয়েছে, এ বোধটুকু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জাগে, ততক্ষণ তার মায়া থেকে বাঁচা কঠিন। হনুম-

সব ভোগ যদি আমার কাছে হাজির হত, তাহলে সুখ ছিল। কিন্তু যখন দেখছি, ভোগের বস্তু আমার এক্তেয়ারের বাইরে পড়ে থাকে, অথচ তারি জন্য আমার ছটফটানির আর অন্ত নাই, তখন বিবেকীর আত্মা এই পরমুখাপেক্ষিতার অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে না কি? স্বারাজ্যসিদ্ধিই যে পুরুষের স্পৃহণীয়, সে কি করে এই হীনতা সহ্য করতে পারে? আমি কারু তোষামোদ করব না—কারু সঙ্গের ভিখারী আমি নই—এই তেজস্বিতা ভিতরে না জাগলে বাস্তবিক ভোগের নেশা হতে নিস্তার পাওয়া বড় কঠিন।

এই যে প্রকৃতির প্রলোভনকে পৌরুষের দর্পে প্রত্যাখ্যান করা—এটা সাধকের দিকের কথা। সাধকের মাঝে এই তেজ থাকা চাই। আমার বাইরে যা আছে, তা আপন খুসীতে চলুক—আমাকে আমার খুসীতে চালাবই—এই জেদ সাধকের। একেবারে সব ছেড়ে থাকা চলে না—বাইরের সঙ্গে ভিতরের একটু না একটু যোগাযোগ ঘটেই। সেই যোগাযোগের ফলে স্বাতন্ত্র্য ঘটাবার অধিকার আছে কেবল আমার অন্তরেই—বাইরটা আমার অনুকূল করবার চেষ্টায় সব সময় আমি সফল নাও হতে পারি। এই জন্য বিবেকী বাইরকে ছেড়ে অর্থাৎ ভোক্তৃত্বকে ছেড়ে নিজকে বজ্রদৃঢ় করবার জন্যই প্রয়াস করবেন। অন্তরের স্বাধীনতা ও স্বস্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বাইরের সব ছেড়ে যদি রিক্তও হতে হয়, তাতেও ক্ষতি নাই। শিবত্বের সাধনা যারা করবে, সংসারের চিতাভূমির ওপরেই যে তাদের আসন পাত্‌তে হবে—এই তাদের আনন্দময় নিয়তি।

কর্তৃত্ব আর ভোক্তৃত্ব ছাড়িয়ে থাকবে দ্রষ্টৃত্ব। দেখবার কিছু থাকবেই। আমি করি আর না করি, কিছু নিই আর না নিই—যা হবার তাতো হতে থাকবেই। এই হওয়ার সঙ্গে আমার যতটুকু যোগ, তা হতে নিজকে পৃথক রাখবার জন্য, বিবিক্ত রাখবার জন্য সাধক অবস্থায় আমার বৈরাগ্যের সাধনা। সে সাধনায় রুক্ষতা আছে, দর্প আছে, বিদ্রোহ আছে—আশঙ্কা আছে বলেই এগুলো আছে। যেখানে অজ্ঞান সেখানেই আশঙ্কা—কি জানি পাছে কি হয়। কিন্তু যার খেলা তাকে চিনতে পারলে আর ভয় থাকে না। তখন পাকা গুটী আর কাঁচবার ভয় নাই। বৈরাগ্য তখন স্নিগ্ধ ঔদাসীন্যে রূপান্তরিত হয়। কর্তৃত্বের পরিহার ভোক্তৃত্বের পরিহার তখন আর চেষ্টাসম্প্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি নয় - তা আত্মার স্বাভাবিক মহিমা। কর্তৃত্ব আছে দেখছি, দেখে খুসী হচ্ছি; ভোক্তৃত্ব আছে দেখছি, দেখে খুসী হচ্ছি। যে ভোগ করাচ্ছে, তার যে বিধানের স্বাতন্ত্র্য—সে যে নিমেষের এক ফুৎকারে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছে, আবার প্রলয় ঘটাচ্ছে—তার এই স্বাতন্ত্র্যের খেলাতে দ্রষ্টা তখন খুসী। দ্রষ্টা তো ক্ষুদ্র আধার আঁকড়ে পড়ে নাই; যে নিজের অধিকার বজায় রাখবার জন্য শক্তির সঙ্গে তার লড়াই প্রয়োজন। শক্তি যে দ্রষ্টারই অন্তরঙ্গ, তাই তার সঙ্গে বিরোধের আভাসমাত্রও নাই—আছে প্রেম। এই প্রেম সেতু হয়ে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করছে—পুরুষের নির্ব্বিকার স্বাতন্ত্র্য আর প্রকৃতির লীলা কুশল স্বাতন্ত্র্য।

ব্রহ্মচর্য্যসাধন

—*—

[শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস, বি, এ, ই, এ, সি]

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

অতঃপর আমরা শৌচ, বেশভূষা, আহার নিদ্রাদি বিষয়ে কতিপয় স্থূল স্থূল নিয়মের উল্লেখ করিতেছি।

শৌচ—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে মলমূত্রাদি ত্যাগ অভ্যাস করা উচিত। মূত্রত্যাগান্তে ধৌতি অভ্যাস একটি উত্তম অভ্যাস। মৃত্তিকা ও জল দ্বারাই শুদ্ধ হওয়া যায়, এজন্য সাবানের প্রয়োজন নাই। সূর্য্যোদয়ের মধ্যেই স্নান প্রশস্ত; শীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচারীর পক্ষে তৈল ব্যবহার নিষিদ্ধ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে ইংরাজীতে ঈশ্বরত্ব লাভের সোপান বলে।

বেশভূষা—বর্ত্তমানযুগে খদ্দরই ব্রহ্মচারীর পক্ষে প্রশস্ত; সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ। দিনের বেলায় কৌপীন বা জাঙ্গিয়া ব্যবহার অভ্যাস করিবে। বালিকাদের পক্ষে শেমিজ বর্ত্তমান কালোপযোগী উত্তম অঙ্গাভরণ।

ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদি প্রতিদিন ধৌত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে।

আহার—পানাহারের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিবে; অতি ভোজন ও অনিয়মিত ভোজন উভয়ই পরিত্যাজ্য। ব্রহ্মচারী সত্বপক সত্বগুণ বিবর্দ্ধক আহার্য্য ভক্ষণ করিবে, কদাচ পর্য্যুষিত অন্নব্যঞ্জন ভক্ষণ করিবে না। দিবসের প্রথমভাগে আর্দ্রকসহ মুষ্টিমেয় ভিজামুগ চিবাইয়া দুগ্ধ পান করা প্রশস্ত। গব্যঘৃত ও দুগ্ধই ব্রহ্মচারীর প্রধান আহার্য্য; উহা উপযুক্ত পরিমাণে খাইবে।

অতি—অম্ল, কটু, ঝাল, কষায় দ্রব্যাদি ব্রহ্মচারীর পক্ষে নিষিদ্ধ; লবণও নিষিদ্ধ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উহা একবারে উঠাইয়া দিতে পারা যাইবে কি না, তাহা বিবেচ্য বিষয়। পারা না গেলে সৈন্ধবলবণের ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু লবণ ব্যবহার না করিয়াও যে সুস্থ ও সবল থাকা যায়, চট্টগ্রামের জগৎপুর আশ্রম সেই দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন।

মৎস্য, ডিম্ব, পেঁয়াজ, রশুন, সর্ষপতৈল, মধু প্রভৃতি উত্তেজক ও উগ্র খাদ্য একেবারে বর্জ্জন করা উচিত। মাংসাহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া পুনরালোচনা করা গেল না।

নিদ্রা—নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিমিত নিদ্রার ব্যবস্থা করা উচিত। শিশুর পক্ষে ৮।৯ ঘণ্টা নিদ্রা প্রয়োজন; অপরের পক্ষে ৬।৭ ঘণ্টার বেশী প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মচারী দিবানিদ্রা একেবারে বর্জ্জন করিবে। শিশু ভিন্ন অপর কাহারও অন্যের সঙ্গে একশয্যায় শয়ন করা উচিত নয়। ব্রহ্মচারী কোমল শয্যায় শয়ন করিবে না।

পাঠের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থীর অঙ্গচালনার সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। দেশের অবস্থানুসারে আমাদের মনে হইতেছে, সন্তরণ, নৌকাচালন, অশ্বধাবন, সাইকেলচালন,

লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতি শিক্ষণীয়। যে ব্যায়ামাদি ব্যবস্থা করা যাউক না কেন, তাহা দক্ষ পরিচালকের অধীনে সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় ব্যায়াম করিলে তদ্দ্বারা অনিষ্টোৎপত্তি হয়; ব্যায়াম করিতে করিতে হাঁপ আসিলে ব্যায়াম হইতে বিরত হওয়া উচিত। তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে ব্যায়ামের মাত্রা রক্ষা করা যায় না; এ জন্য আমরা ফুটবল, রেইস্ প্রভৃতির পক্ষপাতী নহি। শোনা যায় আজকাল আমাদের দেশের বড় বড় ফুটবল খেলোয়াড় অনেকেই অজীর্ণরোগে ভুগিতেছে।

বালিকাগণেরও যে শিক্ষা প্রয়োজনীয়, তাহা আজকাল অনেকেই বুঝিয়াছেন। অতি অল্পলোকেই ইহার বিরোধী, সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। পূর্ব্বকালে যে এতদ্দেশে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন আছে; বৈদিকযুগের সময় হইতে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী রমণীগণের উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্ত্তী যুগেও সুলভা, চূড়ালাদির উপাখ্যান হইতে বুঝিতে পারা যায় যে নারীগণের পাণ্ডিত্যের সমধিক আদর ছিল। ধর্ম্ম ও জ্ঞানরাজ্যে নর-নারীর সমান অধিকার, ইহা যাহারা অস্বীকার করে, তাহারা কখনই মানবসমাজের প্রকৃত কল্যাণকামী নহে। নারীর শিক্ষাধিকার নাই ইহা অনার্য্যোচিত তুচ্ছ কথা।

বর্ত্তমানযুগের নেতৃগণের মনে বালক বালিকাগণের সম্মিলিত শিক্ষার কথা জাগিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে বিচ্ছিন্ন করিয়া শিক্ষা দিলে একে অপরের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক ভাব পোষণ করিতে অভ্যস্ত হয় এবং পরে স্বচ্ছন্দমনে মিলিত হইয়া কোন কার্য্য করিতে পারে না। শৈশব হইতেই একটা কৃত্রিম প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া নর-নারীর ভেদজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া দেওয়া অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। বালক বালিকারা যতদিন স্বাভাবিকভাবে মিশিতে পারে, ততদিন সেই মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া পরস্পরের প্রতি একটা প্রীতি ও সদ্ভাব পোষণের সহায়তা করাই উচিত। পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা না থাকিলে তাহা হইতে নানাপ্রকার কুফল উৎপন্ন হইতে পারে।

আমরা স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতার একান্ত পক্ষপাতী; কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অধঃপতিত অবস্থায়, এই বিষয়ে খুব ধীরতার সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত। বালকবালিকারা অনেকস্থলেই অসংযত পিতা মাতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিতেছে; তা ছাড়া গৃহে যে সকল আচার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে এবং যে আবহাওয়ার মধ্যে তাহাদের মনোবৃত্তি গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা প্রশংসনীয় নহে। এই কদাচারের মধ্যে অবস্থান করাতেই দশ এগার বৎসরের বালকবালিকাগণের মধ্যেও নানা-প্রকার কুৎসিৎ হাবভাব দেখা যায়। ব্রহ্মচর্য্য পরিপুষ্ট ধর্ম্মজ্ঞ সুগৃহস্থের সন্তান সন্ততি ভিন্ন অপর সাধারণের বালকবালিকা নিয়া এ ব্যাপারে অগ্রসর হইলে সুফল হইতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনাই অধিক। বর্ত্তমান সময়ে উপযুক্ত শিক্ষক ও পরিচালকেরও অভাব দৃষ্ট হইতেছে। ধর্ম্মাচরণক্ষেত্র বালয়া কোন বিদ্যালয়ও দেশে নাই। এমতাবস্থায় আমরা কেবল শিশু ভিন্ন বয়স্ক বালিকাগণের বালকদের এক সঙ্গে এক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সমর্থন করি না। সুগৃহস্থ প্রস্তুত না হইলে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না; সুগৃহস্থ প্রস্তুত করাই সম্প্রতি প্রয়োজন।

জননীশক্তির অপচয়

দেহের অর্দ্ধাংশ নারীশোণিত; সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নারী। যে সমাজে নারীর শিক্ষা, স্বচ্ছন্দতা ও স্বাস্থ্য উপেক্ষিত এবং যে সমাজে সন্তান সন্ততি প্রসব করা এবং পুরুষের ভোগ সাধনের সহায়তা করাই নারীজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই সমাজের কল্যাণের পথ রুদ্ধ, সেই সমাজ ধ্বংসোন্মুখ একথা বলিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। পূর্ব্বকালে এই দেশেই সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারী সভার্য্য ব্রত উদ্‌যাপন জন্য কৃতদার হইয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিত। ধর্ম্মার্থে নারীর সাহায্য বর্ত্তমান সময়ে প্রায় একটা উপহাসের কথা; ভার্য্যার সৌহার্দ্দ, ভার্য্যার সখিত্ব, ভার্য্যাব্রত এগুলি তেমন গৌরবসূচক কথা নয়। বর্ত্তমান সমাজে অনেকস্থলেই নারী অন্তঃপুরে দাসদাসীর কার্য্যে নিযুক্তা থাকে এবং পুরুষের ভোগের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয়। যাঁহারা নারীশিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রণয়লিপি লিখিবার মত, অথবা সংসারের বাজারহিসাব লিখিবার অথবা রামায়ণ মহাভারত পড়িবার মত শিক্ষা দিতে পারিলেই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের জন্য কাহারও তেমন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। সকলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গতানুগতিক পথে চলিতেছে। এমন কি যাঁহারা উচ্চশিক্ষার জন্য মেয়েদিগকে স্কুলকলেজে পাঠাইতেছেন, তাঁহারাও প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না। এখনও সমাজে নারী অতি হীন স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং নারীর প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা নাই। এখনো সমাজে অকালোচিত বিবাহ হইতেছে। পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি বিকাশের পূর্ব্বেই, বিবাহের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব বুঝিবার পূর্ব্বেই, একটা কৃত্রিম স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ সৃজন করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহার যে বিষময় ফল, তদ্দ্বারা সমাজদেহ অন্তঃসারবিহীন হইয়া পড়িতেছে। যে কন্যাগমন এককালে মহাপাতক বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহার প্রতি সমাজের আর তেমন ঘৃণা নাই। সম্মতি আইনের বিরোধিগণ তাঁহাদের আচরণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। তারপর বালিকাগণ অপরিপক্ক বয়সে সন্তান সন্ততি প্রসব করিতে গিয়া হয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, না হয় দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা ও বসন্তরোগে দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে বলিয়া দেশের লোক চীৎকার করিতেছে; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিতেছে না, ব্যক্তি ও সমাজদেহ কেন ক্রমশঃই রোগাধারে পরিণত হইতেছে। পূর্ব্বে এই দেশেই অনেকে সুস্থ দেহে শতায়ু জীবন যাপন করিয়াছে, এখনও বিধবাগণ সুস্থদেহে দীর্ঘকাল কর্ম্মঠ জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু প্রসূতি জননীগণের দেহ ও স্বাস্থ্য ভগ্ন কেন? এই দেশে এত অধিক প্রসূতমৃত্যু শিশুমৃত্যু কেন? আত্মপ্রতারণা না করিয়া কেহ ভাবিয়া দেখিলে অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইবেন, ইহার মূলে জননীশক্তির অপচয় ও অপব্যবহার।

রজোবীর্য্যাত্মক দেহ, পিতৃমাতৃ উভয় শক্তির সম্মিলিত ফল। দেহগঠনে শুক্রশোণিত উভয়েরই প্রয়োজন- উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধতা ও তেজস্বিতা থাকা আবশ্যক। একদিকে পিতৃদেহের স্বাস্থ্য ও শোণিতের উপর শুক্রের

বীর্য্যপ্রদান শক্তি যেরূপ নির্ভর করে, অপর দিকে মাতৃদেহের স্বাস্থ্য ও রক্তের বিশুদ্ধতার উপর আর্ত্তব শোণিতের ফলপ্রসূ ক্ষমতা নির্ভর করিয়া থাকে। পূর্ণশক্তি পূর্ণস্বাস্থ্য দেহে বিদ্যমান না থাকিলে নরনারীর সম্মিলন হইতে সুসন্তান লাভের আশা করা যায় না। দেশে পিতৃশক্তির যেরূপ অধঃপতন হইয়াছে, মাতৃশক্তিরও সেইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। প্রকৃতিতে যে উদ্দেশ্যে জননীশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, ধর্ম্মজ্ঞানবিলুপ্ত অপরিণামদর্শী মানবের হস্তে পড়িয়া তাহার কিরূপ অপচয় ও ধ্বংস হইতেছে, তাহা ভাবিলে প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। স্বভাবের ক্রোড়ে পশুপক্ষ্যাদির মধ্যে প্রজনন কার্য্য যে নিয়মে চলিতেছে, তাহা মানবের চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। ঋতুকালে মাত্র প্রকৃতিতে স্ত্রীপুরুষ সঙ্গত হইয়া থাকে ; জননীশক্তি আপনি সুরক্ষিত, নিরর্থক বা অকালগমন নাই। গাভীগণের মধ্যে দেখা যায়, কোন বৃষ যদি অকালে গাভীর পশ্চাদনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে শৃঙ্গাঘাতে তাড়িত হইতে হয়। ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম, ইহাই জীবধর্ম্ম। দৈহিক ব্যাপারে মানবও এই ধর্ম্মাধীন ; ইহার অন্যথাচরণ অধর্ম্ম বা পাপ। যে স্থলে এই ধর্ম্মের অন্যথাচরণ হয়, সেই স্থলে কি স্ত্রী কি পুরুষ প্রত্যেকেরই দেহক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

সুদূর অতীত হইতে ভারতবাসী ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শচ্যুত ; তিল তিল করিয়া যুগযুগান্তরের অবসাদ তাহার দেহ ও মনকে অধিকার করিয়াছে, মানসিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সে অনেক অনার্য্যোচিত কদাচারকে সদাচার বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের কীর্ত্তনাতিশয্যদ্বারা নারীর হৃদয়কে অভিভূত করিয়া তাহাকে পুরুষের ভোগসাধন সামগ্রীবৎ করা হইয়াছে। তাই আজ নারী অশেষ নিয়ম-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিতা—তাহার শিক্ষা নাই, শক্তি নাই, আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান নাই, আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই—আজও নারী-গণ উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত ; আজও তাহার স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার প্রতি কাহারও তেমন করুণ দৃষ্টি দেখা যায় না। নারীগণ অনেক স্থলেই অন্তঃপুরকোণে আত্মগোপন করিয়া নীরবে রোগযন্ত্রণা সহ্য করে, ভগ্নস্বাস্থ্য রুগ্ন-দেহ নিয়া সন্তানসন্ততি প্রসব করে। এই সকল সন্তানসন্ততি যে কখনও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না; তাহা অজ্ঞজনেরও বোধগম্য। জননীশক্তির এই অবনতি ও ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় দুর্গতির পরিণাম যে কোথায় হইবে, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন ?

উদ্বাহ সংস্কার

মহাভারত পাঠে দেখা যায় পুরাকালে প্রজনন কার্য্যে নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতা ছিল ; তৎকালে কোন বিবাহ বন্ধন ছিল না। জননীশক্তি সঞ্জাত হইলে অর্থাৎ ঋতুমতী হইলে নারী পিতৃশক্তির উপযাচক হইয়া ঋতু-রক্ষা করিত ; তদবস্থায় কোন পুরুষের প্রত্যা-খ্যান করা অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে তৎকালে নরনারী সম্পূর্ণ রূপে স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিত। স্বভাবের অনুবর্ত্তন বা স্বাভাবিকতাই ধর্ম্ম। কল্পনা-ভ্যস্ত জীবের পক্ষে একথা ধারণা করা অসম্ভব। মহাভারত বনপর্ব্বে বলা হইয়াছে, "সমুদয় স্ত্রী ও পুরুষ যে অবারিত থাকে, ইহাই লোকদিগকে স্বভাব ; বিবাহাদি নিয়ম কেবল স্বভাবের বিকার মাত্র বলিয়া স্মৃত হইয়াছে" (৩০৫অ)। "সত্যযুগে কোন বিধির প্রয়োজন

ছিল না, যেহেতু তৎকালে এই প্রবৃত্তি (ধর্ম্মপ্রবৃত্তি) স্বতঃসিদ্ধ ছিল" (শান্তিপর্ব্ব ২৩১অ)। ধর্ম্মই সত্যযুগের একমাত্র রক্ষক ছিল, এজন্য স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বৈরচারিতার কোনও আশঙ্কা ছিল না। পূর্ব্বকালে কোন কোন ঋষি যে কেবল মাতার নামে পরিচিত ছিলেন, বেদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আদিপর্ব্বের ২২শ অধ্যায় দেখা যায় উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু স্ত্রীপুরুষ মর্য্যাদা (বিবাহ-বন্ধন) স্থাপন করেন। বিবাহবন্ধন যে অনেক পরবর্ত্তী কালনিক যুগের বিধি, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। (ক্রমশঃ)

———*———

যজ্ঞরহস্য

—*—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রেসিডেণ্ট ডেভিড ষ্টার জর্ডন আজকালকার একজন নামজাদা ক্রমবিবর্ত্তনবাদী। তিনি বলছেন, "সামাজিক বিবর্ত্তনের আলোচনা করবার সময় একটী কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাজসংস্থানের পূর্ণাঙ্গতামাত্রই তার অপূর্ণতার দ্যোতক। যে সমাজ যত বেশী উন্নত হবে, সে ততই জঙ্গম হবে। স্থাবর সমাজে বুঝ্‌তে হবে, উন্নতির পথ অবরুদ্ধ রয়েছে। যে সংঘাতকে সব চেয়ে পরিণত ও পরিপুষ্ট বলে আমরা মনে করি, তাতেই সব চেয়ে বেশী অপূর্ণতা দেখতে পাই।" অবস্থার সঙ্গে যে সব চেয়ে বেশী খাপ খাইয়েছে, তাকেই আবার সব চেয়ে দ্রুত পরিবর্ত্তন করতে হয়, কেননা অবস্থার পরিণাম তো কথনও অবরুদ্ধ থাকে না। মানুষকে, সংসারকে যে ভাবে চল্‌তে দেখ্‌ছি, তাতে এমন সুবর্ণযোগ যে কথনও উপস্থিত হবে, যাতে সব নিশ্চল স্থাণু হয়ে যাবে, সংঘর্ষ বা পরিবর্ত্তন বলে কিছু থাকবে না—সবাই সুখী হবে, নিরাপদ হবে—এ একটা বাজে কল্পনা।

কাজেই আমাদের কর্ম্মকাণ্ডকেও আমাদের অবস্থার অনুকূলে পরিবর্ত্তিত করতে হবে। বৈদিক ঋষিদের জীবনে যে সব অভাব অভিযোগ দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে আমাদের অভাবঅভিযোগের মিল নাই। যে "যদি"র কীলকে কর্ম্মকাণ্ডের চক্র ঘুরত, তা আজকাল সরে গেছে। আজকালকার যুগে এই কথা বল্‌লে চল্‌বে না যে, "যদি পশু চাও, ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহুতি দাও" বা "যদি সন্তান চাও, প্রজাপতির হোম কর।" আজকালকার কর্ম্মকাণ্ডের ধুয়া এই পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা দিয়েছে—"শিল্পবাণিজ্যের এই ক্রমবিবর্দ্ধমান উন্নতির যুগে যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষয়রোগে মৃত্যুর পথে না এগিয়ে বাঁচতে চাও, তবে বিদ্যুৎরূপী মাতরিশ্বাকে আয়ত্ত কর, ষ্টিমরূপী বরুণকে বশীভূত কর, কৃষিবিজ্ঞানরূপী কুবেরকে

আত্মীয় কর।" যে পুরোহিত এই সমস্ত দেবতার সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটিয়ে দেবেন, তিনি হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী—যিনি এই সমস্ত বিদ্যা তোমায় শিখাতে পারেন।

রাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা বলছেন বলে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করো না। জগতে সবই পরিবর্ত্তনশীল। দেশের একেবারে সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। রাষ্ট্র বদ্‌লেছে, ভাষা বদ্‌লেছে, অধিবাসীদের বর্ণ বদ্‌লেছে—এ যুগে বৈদিক দেবতাদের এখনো শৈশবদোলায় দুলিয়ে দোল খাওয়ানো কেন? শৈশবশয্যা ছেড়ে তাঁরাও বড় হয়ে উঠুন, চোখ মেলে চেয়ে দেখুন—আমাদের মাঝে নেমে আসুন—তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনাত্মীয়তা দূর হয়ে যাক্।

ভাই ভারতবাসী, তোমরা এমন কথা মনে করো না যে বজ্রে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, বায়ুতে, অগ্নিতে, জলে, স্থলে পরমপূজ্য ঋষিরা যে একং সৎকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁকে দেখতে রাম মানা করছেন। হাঁ, বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্রহ্মকে সেইরূপেই দর্শন কর, বরং তার চেয়েও বেশী কিছু দেখতে বলছি- বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারেও তাঁকে দেখতে শেখ, যজ্ঞবেদীকে যেমন শ্রদ্ধা কর, রাসায়নিকের যন্ত্রাগারকেও তেমনি শ্রদ্ধাপূত দৃষ্টিতে দেখ। সেই প্রাচীন যুগের যাগ যজ্ঞ আর ফিরাতে পারবে না, বৈশ্বানরকে আর তেমনি করে সমিদ্ধ করতে পারবে না—কিন্তু প্রাচীন যুগের প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা তো আবার ফিরিয়ে আনতে পার—এবং তা তোমাদের ফিরিয়ে আনতেই হবে। আর যুগপ্রয়োজনে যে কর্ম্ম তোমায় আজ বাধ্য হ'য়ে করতেই হবে, তার মাঝে সেই মহৎ ভাব সঞ্চারিত করতে হবে। আগাসী বলতেন, "প্রকৃতি অধ্যয়ন করা তো ভগবানেরই কল্পনার ধারাকে আবার অনুসরণ করা—নয় কি?" তোমার সমস্ত কর্ম্মে একটা পবিত্র শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠুক। আজ যদি হোমকুণ্ডকে আবার তেমনি করে জ্বালিয়ে না তুলতে পারি, তবে কর্ম্মশালার অগ্নিকুণ্ডে সেই শ্রদ্ধা সঞ্চারিত করি না কেন?" তাই, রাম যে দৃষ্টিতে দেখছেন, সেই দৃষ্টি নিয়ে দেখলে তবে কৃষকের লাঙ্গল আজ ইন্দ্রের রথে পরিণত হবে। বাস্তবিক এই জ্ঞানদৃষ্টি অর্জ্জন করতে পারলেই যজ্ঞরহস্য আয়ত্ত হবে।

আজ জাতির যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তা যে তুমি ভাবছ না, এতে তোমার পরবর্ত্তী জীবনকেই অস্বীকার করা হচ্ছে শুধু। এমন ভয়ানক নাস্তিক কি তোমরা হবে? এই জীবনের মহৎ কর্ত্তব্যই হচ্ছে—পরবর্ত্তী জীবনকে উন্নত করা। এমনভাবে বর্ত্তমান জীবন গড়ে তোল, যাতে তোমার পরবর্ত্তী জীবন, তোমার সম্ভাবিত মনুষ্যত্বের ভূমিকা তোমার পক্ষে বাস্তব হয়ে ওঠে। এমনভাবে চল, যাতে পঞ্চাশ বৎসর পরের "তুমি" আর তোমার জন্য লজ্জা না পায়। এমনভাবে চল, যাতে তার ভাবী সন্তানের মাঝে তোমার আত্মার সমস্ত মহিমা সার্থক হয়ে ওঠে, কোথায়ও তার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়।

ভাই গোঁড়া হিন্দু, তোমার সংস্কারের বোঝা নামাও, ভুই কর্ত্তার হুকুম তামিল করতে যেও না। যে পোষাক আজ তোমার [illegible] তার উপর আর বাপদাদার [illegible] অদরকারী ও অসাময়িক পোষাকের বোঝা চাপিও না। তাঁরা অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্নরূপে তাঁদের যে নিদর্শন রেখে গেছেন,

তাকে সেই ভাবেই রাখ। মানুষ বা একটা জাতি দেউলিয়া হয় কিসে জান? সে যখন তার মূল উদ্দেশ্য ভুলে ফেঁকড়ির পেছনে ছোটে। যে সঙ্কল্পী পুরুষ, অদরকারের ডাককে সে হাঁকিয়ে দেয়।

যজ্ঞ অর্থ দেবোদ্দেশ্যে ত্যাগ। বৈদান্তিকের ভাষায় (এমন কি বেদের ভাষাতেও) "দেব" বল্‌তে কি বুঝব? দেব অর্থ যে শক্তি আলো আনে, জীবন দেয়। আবার বহুবচনে দেবতা (দেবতাঃ) শব্দের অর্থ বহিরঙ্গশক্তি বা অন্তরঙ্গ বৃত্তিরূপে ব্রহ্মশক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ। একটা শক্তিকে বিশ্বের সঙ্গে অন্বিত ভাবে দেখলে তাকেও দেবতা বলা চলে—যেমন অধিদৈবত শব্দে (আধ্যাত্মিক শব্দের সহিত তুলনায়) দেবতা শব্দের ব্যবহার; চক্ষু বল্‌তে বিশেষ একজনের দৃষ্টিশক্তিকেই বুঝি; কিন্তু দৃষ্টির মূলে দেবতা বলতে বুঝব সমস্ত প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি—যাকে বলা হয়, আদিত্য —বাহিরে জগচ্চক্ষুঃ সূর্য্যরূপে যার প্রতীক দেখতে পাচ্ছি। হস্তকে ইন্দ্রিয়রূপে দেখলে বুঝি এক জনের হাতের শক্তি মাত্র; কিন্তু দেবতা রূপে দেখ্‌লে বুঝি, যে শক্তি সমস্ত হাতকে নড়াচ্ছে। বিশ্বশক্তিরূপে এর নাম দেওয়া হল ইন্দ্র।

এমনি করে ইন্দ্রিয় দেবতা বল্‌লে বুঝতে হবে, দেবতাকে আমরা বিশ্বশক্তির অর্থেই ব্যবহার করছি। তাই যদি হয়, তাহলে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞের সঙ্গত অর্থ কি হয়? তার অর্থ দাঁড়ায়, আমার ব্যষ্টিশক্তিকে বিশ্বশক্তিতে আহুতি দেওয়া—আমার ব্যষ্টি আত্মাকে সর্ব্বাত্মকরূপে অনুভব করা, আমার প্রতিবেশীদিগকেও আত্মস্বরূপ বলে জানা—আমার ইচ্ছাকে ভগবানের ইচ্ছায় মিশিয়ে দেওয়া। আদিত্যের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার অর্থ তাহলে এই হল যে কোনও কলুষিত আচরণে কোনও চক্ষুর কাছে অপরাধী হব না—এমনিতর দৃঢ়সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা। যে চক্ষুই তোমার দিকে তাকাক্ না কেন, তাকেই ভালবাসা দাও, মিষ্টি হাসি দাও, আশীর্ব্বাদ দাও—সমস্ত চক্ষুতে ভগবানকেই প্রত্যক্ষ কর। এই হচ্ছে আদিত্যের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ।

ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের অর্থ, দেশের সকল কর্ম্মী হস্তের মঙ্গলকামনায় কর্ম্ম করা। যার যা খাদ্য, সে যদি যথাযথভাবে তা গ্রহণ করে, তবেই তার পুষ্টি হয়। হাত পা মাংসপেশী সবই পরিচালনে পরিপুষ্ট হয়—আর তাদের পরিচালনা হয় কর্ম্মে। তাহলে ইন্দ্রকে আহুতি দেওয়া অর্থে, এই যে দেশে লক্ষ লক্ষ গরীব দুঃখী বেকার হয়ে কাজের খোঁজে ঘুরছে, তাদের হাতে কাজ জুটিয়ে দেওয়া। হাঁ, এমনি করে ইন্দ্রকে যদি আহুতি দিয়ে তৃপ্ত করতে পার, তাহলে দেশ লক্ষ্মীমন্ত হবে বই কি? সব হাতেই যদি কাজ থাকে, তাহলে দারিদ্র্য থাকবে কোথায়? ইংলণ্ডে কোনও শস্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তবুও দেশটা ধনী। কেন?—না হস্তাধিপতি ইন্দ্রকে সেখানে এত হব্য আহুতি দেওয়া হয় যে শিল্পবাণিজ্যের আতিশয্যে তাঁর অগ্নিমান্দ্য হবার যোগাড় হয়েছে। সমষ্টির হিতকামনায় যদি সব হাত এক হয়, তবে তাই হবে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে আহুতি। সমষ্টির মঙ্গলেচ্ছায় সকলের বুদ্ধিকে নিয়োজিত করাই বৃহস্পতির যজ্ঞ। সকল হৃদয়কে দেশহিতোদ্দেশ্যে এক করা হল মনঅধিপতি সোমের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ। এমনি করে দেবতার যজ্ঞ করতে হবে।

সোজা কথায় দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞ অর্থে আমার এই হস্তকে সমস্ত হস্তের। অর্থাৎ সমগ্র দেশের উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া; আমার চক্ষুকে সমষ্টি দৃষ্টির কাছে আহুতি দেওয়া; আমার মনকে সমষ্টি মনের সঙ্গে যুক্ত করা; আমার স্বার্থকে দেশের স্বার্থে লীন করা; সমগ্র দেশকে আত্মস্বরূপ বলে মনে করা;—আরও সোজা কথায় বলতে গেলে "তত্ত্বমসি" এই মহাসত্যকে বাস্তবজীবনে অনুভব করা। অহংযুক্ত দেহপিণ্ডকে এমনি করে ত্যাগের ক্রুশে বিদ্ধ করে আবার সমষ্টি-আত্মারূপে জেগে ওঠা—এই তো খৃষ্টের পুনরুত্থান। এই হচ্ছে বেদান্তপ্রতিপাদিত ধর্ম্ম।

"হে প্রভু, আমার প্রাণ তুমি নাও, তোমার উদ্দেশ্যে একে আহুতি দিলাম। হে প্রেম, আমার হৃদয় তুমি নাও, তোমাতে তাকে অনুষিক্ত কর। হে ভগবান্, আমার নয়ন তুমি নাও, তোমার রসে তারে মাতাল কর। হে সত্য, আমার পাণিগ্রহণ কর, তোমার কর্ম্মে তারা সর্ব্বদা নিয়োজিত থাক।"

এখানে প্রভু বল্‌তে তোমরা যে কল্পনায় একজন ঈশ্বর মেঘের আড়ে বসিয়ে রেখেছ, তাঁকে কিন্তু লক্ষ্য করা হচ্ছে না;—এই প্রভু—এই সব—যারা তোমার নিত্য সঙ্গী! এই যজ্ঞ সবাইকে করতে হবে। এই হল বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। হে ভারত, এই ধর্ম্ম আচরণ কর, নতুবা তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে।

রাম বলেন কি, এই যে শাস্ত্রে আছে যজ্ঞের সময় দেবতা প্রত্যক্ষ হন, একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এতে এই প্রমাণ হয়, সংঘের ঐকান্তিকতার মহাশক্তি জাগে। মনোবিজ্ঞানের অনুশীলনে সম্প্রতি জানা গিয়েছে; যে কোনও ক্ষেত্রে একচিত্ত লোকের সংখ্যা যত হবে, তার বর্গের অনুপাতে সংঘে ঐকান্তিকতাও জাগ্‌বে। এই হচ্ছে সৎসঙ্গের ফল॥ এখন ভেবে দেখ, একা রাম যদি ঐকান্তিকতার বলে যে কোনও ভাবকে মূর্ত্তি দিতে পারেন, তাহলে লক্ষ লক্ষ লোক এক চিত্ত হয়ে যদি একই ভাব ধরে, একই মূর্ত্তি ভাবে, তাহলে দেবতার আবির্ভাব হতে কতক্ষণ?

কিন্তু এতে কি প্রমাণ হয়? এতে এই বুঝি, তুমি আত্মস্বরূপে সমস্ত দেবশক্তির ধাতা ও জনক। এই দেবতারা তোমার ভাবের ঘনীভূত মূর্ত্তি ছাড়া তো আর কিছুই নয়—তাঁরাই তোমার মিথ্যা সংকীর্ণ অহংকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করছেন। তোমরাই তোমাদের ভাগ্যবিধাতা। এখন হয় দাসত্বসুলভ ভয়ের বশবর্ত্তী হয়ে আস্তাকুঁড়ে গড়াগড়ি যাও—নয়ত তোমার আজন্মসিদ্ধ গৌরবের মুকুট মাথায় পর। যেটা খুশী, বেছে নিতে পার; কেবল নিজকে সেই ছাঁচে ঢালতে হবে।

আবার মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করে রাম একথাও বেশ বুঝতে পেরেছেন যে, একটা ভাবকে দৃঢ়মূল করবার পক্ষে যথোপযুক্ত সঙ্কেত বা প্রতীকের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। আত্মাহুতির অটুট সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত কোনও সাধক যদি পরিণয়ের মঙ্গলসূত্রে বিশ্বাত্মার হস্তের সঙ্গে নিজের হস্ত আবদ্ধ করেন, তাঁর হৃদয় যদি উৎসর্গের আনন্দে আতট পূর্ণ থাকে, এই শুভ সঙ্কল্পের বৈদ্যুতী যদি প্রাণের শিরাকে কাঁপিয়ে তোলে—আর সেই সময় স্থূলেও যদি তিনি অগ্নিকুণ্ডে হস্তের আহুতি দেন আর এই ক্রিয়াকে বিশ্বশক্তিতে আত্মাহুতির প্রতীক রূপে গ্রহণ

করেন; অবশেষে নিজের সঙ্কল্পের প্রকাশক মন্ত্রের উচ্চারণান্তে উদাত্তকণ্ঠের স্বাহাকারে যজ্ঞের পরিসমাপ্তি করেন—তাংলে প্রতীকা গ্রন্থে এই পবিত্রলিপি কি গম্ভীর মুদ্রায় অঙ্কিত হবে! কিন্তু যেখানে লিপি নাই, আছে শুধু মুদ্রা—সেখানে এই প্রসঙ্গে কি রূপ হবে? যেখানে ভাব নাই, শুধু অর্থহীন অনুষ্ঠানের প্রতীকটা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে--সেখানে প্রাণহীন দেহটাকে আঁকড়ে পড়ে থাকা শুধু! শবকে এখনি দগ্ধ কর—এর শুশ্রূষা নিষ্প্রয়োজন; এ ভয়ানক–মৃত্যুর দূত এ! 'জীবন্ত নরবিগ্রহের' আপ্যায়ন কর!

লোকে বলে পুরাণো খাতে নদীর স্রোত সহজে বয়, তাই প্রাচীন আচারে আবার নবীন প্রাণ সঞ্চার করাই প্রয়োজন। রাম বলেন, এটা অস্বাভাবিক হবে। আমার কাছে এমন একটা নদীর নাম কর, যা একবার খাত ছেড়ে আবার সেই খাতে বয়েছে; এমন একটা উদাহরণ উপস্থিত কর, যেখানে প্রাণ দেহ ছেড়ে গেলে পরেও আবার সেই দেহেই প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছে। পুরোণো বোতলে নূতন মদ ঢাললেই হবে না। আখের সবটুকু রস যদি একবার নিঙড়ে বের করে থাক, তাহলে আর শুকনো আঁশে রস হবে না—তখন তা দিয়ে জ্বালানী করাই উচিত। সব জিনিষেরই আকার প্রকারের পরিবর্ত্তন হয়, আর একবার বদল হলে আবার তা ঘুরে আসে না। আমাদের এখন জ্ঞানযজ্ঞে আহুতি দিতে হবে। বর্ত্তমান কালোপযোগী যজ্ঞ বিধির অনুবর্ত্তন করে যজ্ঞ রহস্য আয়ত্ত করতে হবে। শামুকের মত পুরোণো ঘরের বোঝা পিঠে করে নূতন আব্‌হাওয়ায় গিয়ে হাজির হবে! দেউলিয়া মহাজনের মত সেই কবেকার পুরোণো খতিয়ান নিয়ে মাথা ঘামাবে! ভারত একদিন কি ছিল, সে চিন্তায় সময় নষ্ট করছ কেন? তোমার শক্তি যে অনন্ত, সেই শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে ভারত কি হবে, তাই ভাব—সমস্ত প্রাণ নিয়ে ভাব! (ক্রমশঃ)

স্বামী রামতীর্থ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

তীর্থরামের ছাত্রজীবন হইতে আমাদের আরও কয়েকটা বিষয় শিখিবার রহিয়াছে। আমরা তাঁহার ছাত্রজীবনের বিশেষ আলোচনা করিতে চাই এই জন্য যে, সর্ব্বত্রই ছাত্রজীবনের শিক্ষাই জীবনের একমাত্র নিয়ামক—শুধু ব্যষ্টি জীবনের নয়, সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের পক্ষেও এই কথা খাটে। পরবর্ত্তীকালে স্বামী রামতীর্থ যখন ভাস্বর মহিমায় ফুটিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার দিকে চাহিয়া আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া গেল;—তাঁহার অনুকরণ করা বা তাঁহার সমভূমিতে আরোহণ করা আমরা দুঃসাধ্য বলিয়া কল্পনা করিয়া রাখিলাম।

এইরূপে তিনি আমাদের ভক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের বস্তু হইয়া গেলেন, অনুশীলনের বস্তুরূপে তিনি আর আমাদের অধিগম্য রহিলেন না। কিন্তু মধ্যাহ্ন তপনের তেজ দুঃসহ হইলেও উষার স্নিগ্ধরাগ বা বালারুণের কোমল আভা চক্ষুর পক্ষে নিতান্ত অসহন নহে। সেই জন্যই কি ভাবে তীর্থরামের বাল্য ও কৈশোর জীবন তাঁহার গৌরবময় যৌবনজীবনে পরিণত হইল, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহার আদর্শে আমাদের জীবনকেও সম্পূর্ণ না হোক্, অন্ততঃ কিছু না কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিব—এমন ভরসা স্বতঃই জাগে। ছাত্রেরাই দেশের আশাভরসা; এই জন্যই একটী আদর্শ ছাত্র-জীবনের আলেখ্য—সমাজের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন—ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

আমরা তীর্থরামের ছাত্রজীবনের নিয়ামকের কথা এখন তুলিব—তাহার ভিতরের তাৎপর্য্যটাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। তীর্থরাম পরবর্ত্তী জীবনে যাহা হইয়াছিলেন, ছাত্রজীবন হইতেই তদনুকূলে তাঁহার চিত্তবৃত্তিসমূহ বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, ইহা যিনি সমগ্রভাবে তাঁহার জীবনকে দেখিতে চেষ্টা করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। প্রত্যেক জীবনে পূর্ব্বাপর একটা সামঞ্জস্য থাকিবে—ইহা সাধারণ বুদ্ধির কথা; কেননা স্রষ্টার সৃষ্টিতে একটী নিগূঢ় অভিপ্রায়ই প্রকাশিত হয়, উহার একটী মাত্র তাৎপর্য্যই থাকে। আমাদের জীবনেও তেমনি একটী ভাবেরই বিকাশ হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষ বলিয়াই আমাদের মাঝে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কারপ্রবণতার ভাব বেশী। তাই স্রষ্টার অভিপ্রায়কে আপাততঃ ঢাকিয়া ফেলিয়া আমাদের অবান্তর প্রয়োজনগুলিকে কিম্বা প্রবৃত্তির যথেচ্ছাচারকে অনেক সময় বড় করিয়া তুলি। ইহাতে বাহির হইতে আমাদের জীবনের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হয়ত শিক্ষার সময় জীবন যে ভাবে কাটে, পরবর্ত্তী জীবনে তাহার কোনও নিদর্শন থাকে না। ছাত্ররূপে মানুষটা যেভাবে গড়িয়া উঠিতেছিল, কর্ম্মীরূপে তাহাকে আর সেরূপ দেখিতে পাই না। এই জন্য ছাত্র-জীবনটাকে অনেক সময় অতীতের সুখ স্বপ্ন বা অনুশোচনার নিদান বলিয়া মনে হয়।

এই গেল এক কথা। তাহা ছাড়া আরও একটা কথা এই যে, জীবনের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য তখনই সুস্পষ্ট হওয়া সম্ভব, যখন জীবনের একটা সার্ব্বভৌম আদর্শ আমরা অনুসরণ করিয়া চলি। বাহিরের অবস্থা সকলের পক্ষে এক নয়; সুতরাং মানুষের সংস্কার যে বিচিত্র হইবে, ইহাও আশ্চর্য্য নয়। শিক্ষার্থীর জীবনে এই সংস্কারের ছাপ কিছু না কিছু পড়িবেই। ইহাতেই একের জীবনের সহিত অপরের জীবনের ভেদ হইয়া যায়, একের প্রয়োজন অপরের প্রয়োজনের বিরোধী হওয়াতে সমাজে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। সমাজ হইতে এই দ্বন্দ্ব দূর করিবার জন্য শিক্ষার্থীর জীবনে এমন কোনও সত্যের অনুশীলন প্রয়োজন, যাহা ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ব্বাপর বিরোধ তো মিটাইবেই, তাহা ছাড়া সমষ্টিগত জাতীয় জীবনের মাঝেও কোথায়ও বিক্ষোভ উপস্থিত করিবে না।

সুসমঞ্জস ও সার্ব্বভৌম ভাবে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইলে জীবনের আদর্শটী সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের আদর্শই যে একমাত্র অনুশীলনযোগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মনুষ্যত্ব বলিতে কি বুঝিব, তাহা ততক্ষণ সুস্পষ্ট হয় না,

যতক্ষণ পর্যান্ত আমরা মুমুক্ষুত্বকে তাহার সঙ্গে অঙ্গীভূত না দেখি। আবার মহাপুরুষসংশ্রয় ব্যতীত মুমুক্ষুত্বও সফল হয় না। সুতরাং প্রাচীন পরিভাষার অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি, মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষ-সংশ্রয়—ইহারাই মানবজীবনের নিয়ামক। শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহাদিগকে বর্জ্জন করিলে চলিবে না। মনুষ্যত্বের পরিচয় ত্যাগে ও সংযমে, মুমুক্ষুত্বের পরিচয় ভক্তির আকুলতায় এবং মহাপুরুষসংশ্রয়ের উদ্‌যাপন আচার্য্যের নিকট আত্মসমর্পণে।

নিতান্ত ক্ষোভের কথা এই যে আমাদের দেশের বর্ত্তমান ছাত্রসমাজে এই তিনটী আদর্শের অনুশীলন এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। ছাত্র ত্যাগী ও সংযমী হইবে, সে তো দূরের কথা, বরং অধিকাংশস্থলে নানা কৃত্রিম প্রয়োজন উদ্ভাবন করিয়া দরিদ্র অভিভাবকের কষ্টসঞ্চিত অর্থের অপব্যয়ে তাহাদের বিলাস ব্যসনের চরিতার্থতা করিতেই দেখা যায়। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে বরং বিশেষ অনুকূল। তার পর বিধর্ম্মী রাজা ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই অজুহাতে ধর্ম্মকে শিক্ষার ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে; সুতরাং ছাত্র জীবনে মুমুক্ষুত্বের অনুশীলন করিবার অবকাশই বা কোথায়? তারপর উদরান্নের জন্য লালায়িত বৃত্তিভুক্ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে গিয়া আত্মনিবেদনের স্পৃহা উদ্বুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, বরং ছাত্র ও শিক্ষকের মাঝে অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও অনাত্মীয়তার ভাব দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। সমাজ বা পরিবারের পারিপার্শ্বিক হইতে অপর দুইটী অঙ্গের অনুশীলন হওয়া যদিও বা কোনও ক্ষেত্রে সম্ভব, কিন্তু আত্মনিবেদনের শিক্ষা কোথাও ঘটিবার সুযোগ নাই—একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। অথচ শিক্ষার্থীর জীবনে যদি কোনও বিষয়ের মর্ম্মান্তিক প্রয়োজন হয়, তাহা এই আত্মনিবেদনের। আচার্য্য যদি ছাত্রে আত্মাহুতি দিয়া নিজকেই নূতনরূপে তাহার মাঝে ফুটাইয়া না তুলিতে পারিলেন, তবে শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? জীবনপ্রভাতে বিদ্যাময় মানুষের প্রেরণা ব্যতীত দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিবার মত শক্তির সঞ্চয় সে কোথায় পাইবে? কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য, আজ শিক্ষাজীবনে এমন একনিষ্ঠ সাধনার ক্ষেত্র কোথায়!—আজ শিক্ষকেরা অর্থের দাস, অনাত্মীয়, অজ্ঞাতকুলশীল—খেয়াঘাটের মাঝির মত কেবল ছাত্রের দল এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীতে পার করিয়া দিতেছেন!

এই তো বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থা। কালের প্রভাবে তীর্থরামকেও ঠিক এমনি অবস্থার বিপাকে পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদে এই দুর্ব্বিপাকের মাঝেও তিনি সাধনার উপকরণ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার তরুণ জীবনেই তিনি মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও আত্মসমর্পণের সাধনায় কৃতার্থ হইতে পারিয়াছিলেন। বাহ্যতঃ তাঁহার ছাত্রজীবন আধুনিক সাধারণ ছাত্রজীবনের সঙ্গে অনেকাংশে এক হইলেও এই অন্তরঙ্গ সাধনার ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে তাঁহার ভেদ অতি সুস্পষ্ট। এই যায়গায় তিনি একা এবং এই জন্যই তিনি সাধারণের বহু ঊর্দ্ধে। আমরা তাঁহার ছাত্রজীবনের এই অন্তরঙ্গ দিকেরই একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

আচার্য্যের নিকট আত্মসমর্পণ তাঁহার জীবনে যে কি মাধুর্য্য বিস্তার করিয়াছিল,

সে কথা আমরা পূর্ব্বে আরও বলিয়াছি; সুতরাং সে সম্বন্ধে বিস্তার করার সম্প্রতি কোনও প্রয়োজন নাই। তবে সত্যের খাতিরে আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য যে চরিতকার শ্রীযুত পূরণ সিং তীর্থরামের ছাত্রজীবনের এই বিশেষত্বটুকু নিতান্ত উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার কাছে তীর্থরামের উপর ধন্নামলের প্রভাব একটা তাচ্ছীল্যের বিষয় মাত্র। আমরা একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, ধন্নামলের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই এবং তাহা করিয়াও আমাদের কোনও লাভ নাই। তবে তীর্থরামের দৃষ্টি দিয়া তাঁহার আচার্য্যকে দেখিতে চেষ্টা করিলে তাঁহার জীবনের একটা নিগূঢ় প্রেরক শক্তির সন্ধান আমরা পাইতে পারি। আর এই কথাটা বর্ত্তমান উদ্ধত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে একটু বিশেষ করিয়া তলাইয়া দেখিবার বিষয়। আমরা শুধু এই কথাটা ভাবিয়া দেখিতে বলি যে, বালকের সুকুমার হৃদয়াবেগ যখন আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন তাহার পক্ষে একটি উদ্বুদ্ধ চিত্তের সঙ্গ নিতান্তই প্রয়োজন এবং ইহাকে শিক্ষার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য না করিলে জীবনের লক্ষ্য কখনও সুস্থির হইতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাও নিষ্ফল হয়।

তীর্থরামের আত্মসমর্পণের মূলে ছিল তাঁহার মুমুক্ষুত্ব। আধুনিক ছাত্রজীবনে ইহার বড় একটা সন্ধান পাওয়া যায় না। কেননা বর্ত্তমান শিক্ষা মুক্তিকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া ভোগকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে। তীর্থরাম যেরূপ আবেষ্টনে যেরূপ দেশকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারও অপরাবিদ্যার ছোঁয়াচ হইতে রক্ষা পাওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর হয় নাই; তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা প্রথমতঃ অন্য কোনও পথ না পাইয়া মুখ্যতঃ এই অপরাবিদ্যার চর্চ্চাকেই আশ্রয় করিয়াছিল—এ কথা সত্য। এখনকার যুগে আর প্রাচীন কালের মত কেহ আসিয়া নারদ যেমন সনৎকুমারকে বলিয়াছিলেন, কিম্বা সত্যকাম যেমন গৌতমকে বলিয়াছিলেন, তেমন করিয়া আচার্য্যের নিকট আসিয়া বলে না "হে ভগবান্! আমি সত্য লাভ করিতে আসিয়াছি—আমাকে সত্য বস্তু চিনাইয়া দিন!" কিন্তু তীর্থরামের অন্তরের অন্তর হইতে যে এই সত্য লাভের ব্যাকুলতা বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার দিনলিপি হইতেই পাই। এ দিনলিপি শুধু তো তাঁহার নিজের কাছে জবাবদিহী নয়—এ তাঁহার দেবতার কাছে আত্মনিবেদন। ইহার মাঝে অভিমান আছে, আব্দার আছে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনায় উদ্বেগ আছে—কিন্তু সকলের মাঝেই সেই এক আকুলতাভরা সুর—একটা ভক্তি-বিগলিত হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুরিমা। যাঁহার কাছে তিনি আপনার কাহিনী বলিতেছেন—তাঁহাকে তিনি জীবনের নিয়ামক বলিয়া জানেন এবং এই আত্মনিবেদন ও একান্ত অনুবর্ত্তিতার ফলে ইহজীবনেই তাঁহার ঈশ্বর দর্শন ঘটিবে, এই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। নানা ঘাত প্রতিঘাতে এই ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতাই তাঁহার মনের মাঝে বর্ষণোচ্ছ্বসিত নদীবেগের মত কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে এবং পরিশেষে তাঁহাকে কূলের বাহির করিয়াছে।

এই আকুলতা যে আকস্মিক নহে, তাঁহার ছাত্রজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত জীবনে তাহা চরম সার্থকতায় মণ্ডিত

হইয়াছে—ইহার প্রমাণ এই যে কোথায়ও ইহার আমরা ছেদ দেখিতে পাই না, কিম্বা একটা বিশিষ্ট ক্ষণে ইহার কোনও অনিমিত্ত উদ্বেলতারও সন্ধান পাই না। বাহিরে তিনি এমন কোন আঘাত পান নাই বা এমন কোনও আকস্মিক ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে তাঁহার বৈরাগ্য সহসা উদ্রিক্ত ও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে। যেমন অপর দশ জনের স্বাভাবিক জীবন স্রোত বহিয়া যায়—তীর্থরামেরও তেমনি বহিয়া চলিয়াছিল; ভাবষ্যতে কি করিবেন, না করিবেন—তাহা নিয়া কোনও কল্পনা জল্পনা পর্য্যন্ত তিনি করেন নাই। অথচ এই অনাড়ম্বর সরল জীবনের মাঝেই একদিন ভাবের জাহ্নবী ধারা এমন উচ্ছ্বসিত আকারে দেখা দিল যে, যাহারা তাহা দেখিল, তাহারা অবাক হইয়া গেল। কিন্তু সে জ্বালা যে কতদিন ধরিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তরের মাঝে ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা কেবল তীর্থরামই জানিতেন, আর জানিতেন তাঁহার সাধ্বী পত্নী। এ কথা তিনি নিজেও পরে বলিয়াছেন। তাঁহার প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ যে কোন আকস্মিক বিক্ষোভে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, ইহাই তাঁহার স্বাভাবিক পরিণতির প্রমাণ এবং এই দিক হইতে ইহা আমাদের জীবনেও অনুকরণীয়। আমরাও চাই, ভগবৎপ্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত আমাদের উষর জীবনক্ষেত্র সরস করিয়া বহিয়া যাউক—শিক্ষার আদিমুহূর্ত্তে বৃত্তিগুলি যখন নমনীয় ও কমনীয় থাকে, তখন হইতেই ইহা হৃদয়কে সিক্ত করিয়া উৎসারিত হউক।

তীর্থরাম ছাত্ররূপে শুধু বিদ্যাই চাহেন নাই—তিনি চাহিয়াছিলেন ভগবানকেও। আবার এই যে বিদ্যা চাহিয়াছিলেন, তাহাও তিনি নিজের জন্য চাহেন নাই। অবশ্য তাঁহার প্রবল জ্ঞানস্পৃহা মুখ্যতঃ তাঁহাকেই আনন্দদান করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহাকেই তিনি তাহার চরম সার্থকতা মনে করেন নাই। যাহা নিজে পাইয়াছেন, আর দশজনের মাঝে তাহা বিলাইয়া দিবার আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। তাই যখন তাঁহার অধ্যাপক বলিলেন, "এর পর তুমি কি করিবে?" তীর্থরাম উত্তর করিলেন, "জানি না, তবে মানুষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব, আমি যা জানি, তাহাই শিখাইব; গণিত জানি, গণিত শিখাইব।" তখন কে জানিত গণিতের অভ্রান্ত সত্যও যে সত্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, সেই সত্য প্রচার করিয়া জীবসেবা করাই তাঁহার নিয়তি হইবে।

এই বিদ্যাকে কিরূপ শিক্ষার বহিরঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন, তাহা তাঁহার আচার্য্যের প্রতি একটী উক্তিতেই প্রমাণ হয়। ধন্নামল তাঁহাকে ডাকিতেছেন; তীর্থরাম উত্তরে বলিলেন, "তুমি ব্যস্ত হইও না, আমি তোমারই—রাজার সিপাহী যখন যুদ্ধ করে, তখন সে রাজার কথা মনে রাখে না; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইলেই সে আবার তার রাজার কাছেই ফিরিয়া যায়। আমিও যুদ্ধ শেষ হইলে আবার তোমার কাছেই ফিরিয়া যাইব।"

ছাত্রজীবনের যে অর্জ্জনকে আমরা মুখ্য মনে করি, তাহাকে তিনি কি প্রকার অবান্তর দৃষ্টিতে দেখিতেন—ইহাই তাহার প্রমাণ। তিনি অধ্যয়নজীবনকে যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন; এইখানে শক্তির পরিচালনা করিয়া বিপক্ষের সঙ্গে লড়িয়া তাঁহাকে মহত্তর জীবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে—ইহা তাঁহার কাছে মনুষ্যত্ব সাধনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র মাত্র।

(ক্রমশঃ)

নায়ক

—❀—

এ পর্য্যন্ত আমরা শাসন সম্বন্ধে যে আলোচনা করলাম, তাতে শাসনকে মুখ্যতঃ পীড়ন অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে—অর্থাৎ এ শাসন মানে, ছেলেকে একটা কিছু অধিকার হতে বিচ্যুত করা বা কোনও দিক দিয়ে তাকে সোয়াস্তি হতে বঞ্চিত করা। বলা বাহুল্য, এটা হল শাসনের Negative দিক। এর যে একটা Positive দিকও আছে, সে কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে আরও আলোচনা করেছি। প্রচলিত শাসন হচ্ছে, অন্যায়টা ঘটতে দিয়ে তার পর তার প্রতীকার চিন্তা। কিন্তু কাদা মেখে ধোয়ার চেয়ে মোটেই কাদা না মাখাই ভাল নয় কি?

তা করতে হলে আমাদের কিন্তু একেবারে গোড়া বেঁধে কাজ করতে হবে। শাসনের প্রয়োজন হচ্ছে ব্যবহারের ক্ষেত্রে। একটা অ-দৃষ্ট শক্তি ছেলের মাঝে ক্রিয়া করছে—ছেলের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা ন্যায় বা অন্যায় দুইয়েরই বাইরে, কেননা তার কাছে সেটা স্বভাবের প্রেরণা; সুতরাং তার জন্য তার কাছে জবাবদিহী চাওয়া বৃথা। শাসককে এই অদৃষ্ট শক্তির সঙ্গে লড়তে হয়; ন্যায়ান্যায়বোধবর্জ্জিত বলেই এই শক্তির প্রকাশে আমাদের ক্ষুব্ধ হওয়া সাজে না; যদি কোথাও তার মাঝে অন্যায় দেখি, তাহলে ধীর স্থির হয়ে তার প্রতীকার করতে হবে; রাগের মাথায় ছেলে ঠ্যাঙালেই চলবে না——শাসককে এই কথ টী মনে রাখতে হবে।

যেখানে বিচারবিমুক্ত স্বভাবের প্রেরণায় কাজ হয়, সেখানে আনুষঙ্গিক হৃদয়বৃত্তিগুলিও ঠিক স্বভাবের অনুকূলেই ক্রিয়া করবে—এটা সহজ বুদ্ধির কথা। এই জন্যই দেখি, পীড়নাত্মক শাসনের ফলটা দূর ভবিষ্যতে যত মধুময়ই হোক না কেন, প্রথমতঃ ছেলের মাঝে তা কেবল পীড়নজনিত সন্তাপটাই জাগিয়ে তোলে—সে কিছুতেই শাসনকে ন্যায্য পাওনা বলে স্বীকার করতে চায় না। এই যে শাসকের শুভেচ্ছার প্রতি শিশু মনের আদিম বিদ্রোহ, শিক্ষক আর ছাত্রের পরবর্ত্তী সম্পর্কটা এর দ্বারাই নিয়মিত হয় এবং শিশুসুলভ জেদের বশে তার ফলটা কখনও ভাল হয় না। কঠোরতায় শিশুমনের সুকুমার দেববৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে গিয়ে ভয়, কুটিলতা, প্রতিশোধস্পৃহা, অক্ষমতার ক্ষোভ, মিথ্যা আপ্যায়নের অভিনয় ইত্যাদি দানবীয় বৃত্তিগুলি প্রশ্রয় পায়। হয়ত পীড়নে একটা কু অভ্যাস দূর হতে পারে, কিন্তু তার স্থলে শিশুর কচি বুকে এতগুলি অশুভ শক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে যে তখন বাস্তবিকই সন্দেহ হয়, "তাড়নে বহবো গুণাঃ"—কথাটা ঠিক কিনা। এই জন্যই অনেকেই পীড়নের পাঠ একেবারে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী।

এটা হল আদর্শের কথা। বাস্তব জগতে কাজ করতে নেমে কিন্তু দেখি, ঠিক ঠিক আদর্শটা বজায় রেখে শুধুই কোমল হওয়া বা শুধুই কঠোর হওয়া—কোনটাই সাজে না। মানুষের প্রকৃতি এত বিচিত্র ও এত জটিল যে কোনও-রকম একঘেয়ে ব্যবস্থাই তার পক্ষে সুসঙ্গত হয়

না। কঠোরতারও দরকার আছে; পশু-শক্তিকে নিরস্ত করবার জন্য ওটা হচ্ছে প্রকৃতির সরাসরি উপায়। আমরাও তো প্রকৃতি মাতার শিশু; শুধুই আদর পেলে দিব্যি গা ঢেলে দিয়ে আহাম্মকের পথে নেমে যেতে কোনও আপত্তিই নাই; মাঝে মাঝে দুটা চারটা আঘাত পেলে তবে না একটু চেতনা হয়। তাই চেতনা জাগাতে হলে আঘাতেরও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে বই কি। তবে তার মাত্রা ঠিক রাখা হচ্ছে সুবিবেচনার কথা—দরদের কথা।

আবার আঘাতের ফলে প্রতিঘাত—এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমও তো দেখ্‌তে পাই। সেখানেও দেখি, শাসনের মাঝে দরদ থাকার ফলে বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। মা যদি ছেলেকে মেরে আধমরাও করে ফেলে, তবুও ছেলে মাকে জড়িয়ে ধরেই কাঁদে, একটু পরে চোখ মুছে আবার সেই মায়ের কাছে গিয়েই দাঁড়ায়। অথচ বাইরের কোনও লোক যদি ছেলের গায়ে একটু হাতও ছোঁয়ায়, ছেলে তা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না—শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর চিত্তটা ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়েই থাকে। কেউ বলেন, এটা রক্তের টান। কিন্তু রক্তসম্পর্ক থাকলেই যে এমন হয়, তাও বল্‌তে পারি না—খুঁজলে বিপরীত দৃষ্টান্ত ঢের পাওয়া যেতে পারে। তবে শৈশবের সংস্কার-প্রবলতাতে এমন হয়, একথা বল্‌তে পারি। মা ছাড়াও ছেলে অপরের ভাওটা হয়, শুধু শৈশব সাহচর্য্যের ফলে।

এই সাহচর্য্যের প্রকৃতিটা একটু তলিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারি, যেখানে আপন জ্ঞান, সেখানেই সহিষ্ণুতা, সেখানেই ক্ষমা। মাকে ছেলে আপন মনে করে, তাই তাঁর শাসন মুখ বুজে সহ্য করে; তোমাকে সে আপন মনে করে না, তাই তোমার শাসন সইতেও পারে না। এটা খুবই সোজা কথা; আর এ কথা থেকে আমরা এমনও অনুমান করতে পারি যে, অনাত্মীয় লোকের যদি শাসন করবার অধিকার পেতে হয়, তবে আগে তাকে মায়ের অধিকার অর্জ্জন করতে হবে। অর্থাৎ মায়ের ওপর ছেলের যতটা বিশ্বাস, অনাত্মীয় ব্যক্তিও যদি তাঁকে উপলক্ষ্য করে ছেলের মাঝে তেমনি ভাব জাগিয়ে দিতে পারেন, তবে তাঁরও শাসক হবার অধিকার জন্মাবে। এখন কি করে এই অধিকার পাওয়া যেতে পারে, তারই আলোচনা প্রয়োজন।

গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখা ভাল, শিক্ষার মাঝে কোথায় মেকী চলবে না; যেখানে ফাঁকী থাক্‌বে, অন্তর্য্যামী সেখানটা ঠিক ঠিক ধরে ফেলেন। মা হতে গিয়ে শুধু মাতৃত্বের বাহ্য অভিনয় করলেই হবে না, ঠিক মায়ের দরদটা পাওয়া চাই। আর সমাজে হরঘড়ি আমরা যেমন ছাঁচের মা দেখতে পাই—যাদের স্নেহে তেজ নাই, কল্যাণ নাই—আছে শুধু মোহ আর মাদকতা—তেমন মায়ের আচরণ অনুকরণ করলেই ঠিক মা হওয়া যায় না। মা হতে হলে জগজ্জননীর অভিমান আনতে হবে। একেবারে ছেলের স্থূল আবরণ হতে অন্তরের মজ্জাগত প্রকৃতিটা পর্য্যন্ত, তার জন্মজন্মান্তরীণ সুদূর সম্ভাব্যতা পর্য্যন্ত সবটুকু নজরে আনা চাই। এই ভাবের মননে সিদ্ধ হয়ে ব্যবহার-জগতে নাম্‌তে হবে—তবে ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষা হবে, শিক্ষা কল্যাণ-প্রসূ হবে।

এই মাতৃত্বের মনন হল আত্মের কথা।

এখন একে ধরেই দু'চারটা অবান্তর উপায়ের কথা বলি। প্রথমতঃ ছেলেদের হৃদয় জয় করা চাই। মা ছেলের হৃদয় জয় করেন, কতকটা প্রকৃতির অনুকূলতায়, কতকটা বা নিঃসহায় অবস্থায় ছেলেকে আশ্রয় দিয়ে। আগের দিকে ভালবাসার প্রয়োজন মায়ের, শেষের দিকে প্রয়োজনটা ছেলের। এই শেষের দিকের কথাটাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃতির অনুকূলতা যে কোনও মায়ের পক্ষে যেমন সহজলভ্য, অপরের পক্ষে তেমনি সেটা অত্যন্ত কঠিন। যে পর্য্যন্ত মায়ের প্রকৃতি না পাবে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃতিদত্ত শাসনাধিকার মিলবে না—এটা হচ্ছে তপঃ-সিদ্ধির কথা; আর এ স্থলে শাসনযন্ত্রের ও শিক্ষানীতির সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। সুতরাং এই দিককার অনুশীলন শিক্ষকের মনন সাধনার উপর বরাত রেখে, ছেলের প্রয়োজনের দিক্ থেকেই কতটা মায়ের স্থান অধিকার করতে পারা যায়, তারই উপায় দেখতে হবে। ছেলের আশ্রয় স্থল হয়ে তার নির্ভরপরায়ণতাটুকু অর্জ্জন করবার চেষ্টা সকলের পক্ষেই সম্ভব ও অপেক্ষাকৃত সহজ।

যদি ছেলের আশ্রয় স্থল হতে চাও, তবে প্রথমতঃ তার অভাবের অনুসন্ধান কর। সে কি চায় আর তুমিই বা তার কাছে কি চাও, এ দুটোই খুঁজে দেখতে হবে। সে যা চায়, সেটার দিকেই আগে দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তার অভাব পূরণের অন্তরালে তোমার দাবীগুলিও আস্তে আস্তে সুকৌশলে এগিয়ে দিতে হবে।

প্রথমতঃ একবার যদি তুমি কতকটা তার মতে মত দিয়ে চলতে পার, তবেই সে তোমায় বিশ্বাস করতে সুরু করবে। ছেলের সঙ্গে মিশতে হলে ঠিক ছেলেদের ভাব ধরতে হয়। ছেলেতে ছেলেতে যে কি করে ভাব হয়, তা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। ছেলেদের মাঝে বিবাদ বিসম্বাদই বেশী হয়, এই কথাটাই আমরা বিশেষ করে মনে রাখি, কিন্তু কি করে তাদের মাঝে অকৃত্রিম ভাবও জন্মে, সেটা বড় নজরে আসে না। এদের বন্ধুত্বের মাঝে একটা নূতনত্বের প্রতি ঔৎসুক্য থাকে। প্রথম দফাতেই একটা ছেলে আর একটা ছেলের দিকে তেড়ে গিয়েছে, এমন বড় একটা হয় না। পরস্পর পরস্পরের কাছে নূতন বলে তাদের মাঝে একটা বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহলের ভাব জাগে। এই সময় তাদের ভদ্রতাজ্ঞানও বেশ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। প্রত্যেক ছেলের মাঝে একটা জেদ আছে, যাতে সে যা বুঝেছে, তা সহজে ছাড়তে চায় না। কিন্তু নূতন বন্ধুত্বের খাতিরে ছেলেরা এই জেদ কতক পরিমাণে ছেড়ে দিয়ে পরস্পরের মতকে গ্রহণ করবার মত ঔদার্য্যও দেখিয়ে থাকে। এই সময়টাতে যে পক্ষে মনের জোর বেশী, নিঃসংশয়ে আপন মত প্রকাশ করবার ক্ষমতা বেশী, কিম্বা একটা সংঘের শক্তি পেছনে আছে বলে অনুভব করে, সেই পক্ষই অপরের উপর আধিপত্য করে থাকে। মতের অনৈক্যও এই সময় হতে সুস্পষ্ট হতে সুরু করে, এবং তাতে ভবিষ্যতে বিসম্বাদের বীজ উপ্ত হয়ে থাকে। শিক্ষককে তখন সাবধান হয়ে সামঞ্জস্যের পথ দেখিয়ে দিতে হয়।

ছেলেদের মাঝে ভাব করবার যে রীতি রয়েছে, তারই অনুবর্ত্তন করে শিক্ষককেও তাদের বিশ্বাস ও প্রীতি আকর্ষণ করতে হবে। ঠিক সমযোগ্য না হলে বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভবপর

হয়। তাই ছেলের দরদ পেতে হলে, তার ভাব অভাব বুঝতে হলে শিক্ষককেও ছেলের সঙ্গে ছেলে হতে হবে।

এইখানেই অনেকে তাল ঠিক রাখতে পারেন না। ছেলে হওয়াকে কেউ চপলতা মনে করে, নিজের গাম্ভীর্য্য বিসর্জ্জন দিতে নারাজ হন; কেউ বা অতিরিক্ত চপলতায় ছেলের মন ভুলাতে গিয়ে নিজকে হালকা করে ফেলেন। দুটাতেই বাড়াবাড়ি আছে। এস্থলে বিশেষ বিবেচনা করে মধ্যপথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

ছেলের সঙ্গে ছেলে হওয়ার মাঝে যতটা বিপদ আমরা কল্পনা করি, বাস্তবিক ততটা বিপদ তার মাঝে নাই। প্রথমতঃ ছেলের সঙ্গে ছেলে হতে গেলেই যে একেবারে অধম ছেলে হতে হবে, এমন কোনও কথা নাই। হৃদয় বুঝবার জন্য সমানুভূতি বা মতানুবর্ত্তন যেমন প্রয়োজন, তেমনি স্বাতন্ত্র্যও প্রয়োজন। ছেলেতে ছেলেতে যখন ভাব হয় তখন কেউ তাদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেবার কল্পনা করে না;—স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখেই পরস্পর পরস্পরের মতানুবর্ত্তী হয়ে থাকে। শিক্ষককেও তেমনি নিজের স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখতে হবে। কেবল ছেলেকে ভোলাবার জন্য তার সবতাতেই আপন ইচ্ছা বলি দিলে চলবে না। বরং এই স্বাতন্ত্র্যকে অবলম্বন করেই শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়ার অবসর খুঁজে বের করতে হবে।

শিক্ষক যখন ছেলেদের দলে মিশবেন, তখন তিনি হবেন নেতা। এ কথা অবশ্য সকলে লক্ষ্য করেছেন, ছেলেরা নেতার কতখানি ভক্ত। অতি ভাল ছেলেও নেতার ইঙ্গিতে তার বিবেকবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সুতরাং ছেলেদের মাঝে এক নেতৃভক্তিকে অবলম্বন করে তাদের হৃদয় জয় করবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। অথচ এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, নিজের মাঝে স্বাতন্ত্র্যপ্রীতি না থাকলে অপরের সুসহ স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করা কখনও সম্ভব নয়—নেতা ও অনুবর্ত্তীর সম্বন্ধ এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ছেলের দলে নেতা হতে হলে চাই তৎপরতা, উদ্ভাবনী শক্তি, আর চাই নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করা। সবাই বোধ হয় দেখেছেন, ছেলের দলে যে সবচেয়ে চটপটে যে নূতন নূতন ফন্দী বার করতে ওস্তাদ এবং যে নিঃসংশয়ে প্রভুত্ব করতে পটু, সেই নেতা হয়ে সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে থাকে। যদি শিক্ষক এই তিনটী গুণের সাহায্যে ছেলেদের মাঝে একবার আধিপত্য স্থাপন করতে পারেন, তবে তাঁর কাজ বহুদূর এগিয়ে গেল বলতে হবে। তবে প্রথমতঃ উদ্ভাবনী শক্তি ও তৎপরতার পরিচয় দেওয়া চাই। শিক্ষক ছাত্রদের চেয়ে বেশী ওস্তাদ—এই ধারণাটা একবার তাদের মাঝে বদ্ধমূল হয়ে গেলে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা কঠিন হয় না। কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে, দুর্গজয় না করে যেন কেউ প্রভুত্ব না করতে যান।

আর এই আধিপত্য যখন করতে হবে, তখন চূড়ান্তভাবেই করতে হবে। একটু ইতস্ততঃ ভাব, লেশমাত্র সংশয় যদি কথায়-বার্ত্তায় চাল-চলনে প্রকাশ পায়, তবেই ছেলেদের নেতার ওপর শ্রদ্ধার ভাব শিথিল হয়ে যাবে। যাঁরা অতিরিক্ত সতর্কতায় পা গুণে গুণে ছেলেদের সঙ্গে চলতে চাইবেন, তাঁরা বয়সের দরুণ একটা মান সম্ভবতঃ

তাদের কাছে পেতে পারেন, কিন্তু তাদের হৃদয় জয় কখনও করতে পারবেন না। অর্থাৎ তাঁদের চেয়ে তরুণ অথচ তৎপর ও নিঃসংশয়-প্রকৃতির ব্যক্তির সঙ্গেই তাদের আত্মীয়তা বেশী হবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হবার কোনও সুযোগ না উপস্থিত হয়, এইদিকে শিক্ষকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিতে হবে। এ শুধু নেতৃত্বের প্রয়োজনে বলছি না—এটা শিক্ষার একটা মূলনীতি হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকের কাছে অন্যায়ের ক্ষমা আছে, কিন্তু অবাধ্যতার ক্ষমা নাই—এই নীতিটী সর্ব্বদা অনুসরণ করে চলতে হবে। এই জন্য ছেলে যাতে অবাধ্য হবার সুযোগ না পায়, কিম্বা অবাধ্য হলেও কোথা-ও তার ন্যায়সঙ্গত শাসন হতে রেহাই না পায়, এ দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। একদিনের অবাধ্যতার জের বজায় রেখে ছেলে যদি শিক্ষকের উপর জয় লাভ করে, তবে শিক্ষকের সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হয়ে গেল বলতে হবে। এই জন্য আদেশ উপদেশের সময় এ-ও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে অন্যায় ব্যবহার দ্বারা শিক্ষক ছেলের চিত্তকে বিদ্রোহী করে তুলে তাকে অবাধ্য হবার অবকাশ না দেন। অবশ্য একজন যদি আর দশজনকে চালনা করে, সেখানে কখনও এমন হতে পারে না যে সবাই একমত হবে; প্রচ্ছন্নভাবে হলেও মতের অনৈক্য কিছু না কিছু থাকবেই, এবং এই স্বাতন্ত্র্যটুকু না থাকলে শুধু কল টিপে কলের পুতুল চালানো গোছের নেতৃত্বে কোনও সুখ নেই। যা ছেলেদের কাছে রুচিকর নয়, এমন কাজও অনেক সময় তাদের দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। এ স্থলে কেবল রূঢ়তা করে ও ভয় দেখিয়ে তাদের মনুষ্যোচিত স্বাতন্ত্র্যবোধকে নষ্ট করে ফেললে আপাততঃ কাজের সুবিধা হলেও ভবিষ্যতে তারা নিস্তেজ ও নির্ব্বীর্য্য হয়ে যাবে। এই-খানেই যথার্থ নেতৃত্বের পরিচয়—নেতাকে এখানে সম্মোহনশক্তির প্রভাবে অনুবর্ত্তীদের চিত্তকে বশীভূত করে ফেলতে হবে। এই সম্মোহন যাতে সফল হয়, একদিকে যেমন তার অনুকূল পারিপার্শ্বিক গড়ে তুলতে হবে, অপরদিকে তেমনি নেতার ইচ্ছাশক্তির মাঝে অমোঘ বৈদ্যুতিক প্রেরণাও সঞ্চার করতে হবে।

এইখানেই বালকবুদ্ধির সঙ্গে নেতার বুদ্ধির তফাৎ হবে। ছেলেদের নেতা হয়েও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের উপর আপনার স্বাতন্ত্র্যবোধকে এমন গম্ভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে নেতার পরিচালনে অনুবর্ত্তীরা কোনও অস্বাচ্ছন্দ্যও অনুভব না করে, অথচ প্রচ্ছন্ন কিম্বা অপ্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ দ্বারা নেতৃশক্তিও কোথায়ও পর্য্যুদস্ত না হয়ে যায়।

মোট কথা, শক্তির পরিচয় দেওয়া চাই। জগতে সবাই শক্তির ভক্ত—বিশেষতঃ বালকদের তো কথাই নাই। এই শক্তি যদি উৎপীড়নে ব্যয়িত না হয়ে নেতৃত্বে ব্যয়িত হয়, তবে শাসন সম্পর্কে একটা মস্ত বড় সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়। মা যে ছেলের আশ্রয়, তা এই শক্তিরই প্রকাশে। যে মা শক্তি পরিচালনা করতে পারেন না, তিনি ছেলেকে অফুরন্ত স্নেহ দিয়েও বশ করতে পারেন না। আবার যিনি এই শক্তির অযথা পরিচালনা করে একে আতঙ্কের ব্যাপার করে তোলেন, তিনিও সুবিবেচনার কাজ করেন না।

তাহলে মোট কথাটা দাঁড়ায় এই যে,

বাইরে থেকেও ছেলের আশ্রয় স্বরূপ হয়ে যিনি তার হৃদয় জয় করতে চান, তাঁকে নেতৃত্ব কৌশল শিখতে হবে। তার পর এই নেতৃত্বের পত্তন করতে হবে, ছেলের অভাবের দিকে তাকিয়ে। ছেলেরা নিজের গরজেই কিছু না কিছু চায়। তাদের এই আপন ইচ্ছাটুকু খুসীমত খেলিয়ে নেওয়াতেই হচ্ছে নেতৃত্বের ওস্তাদী। ছেলেদের নিজের ইচ্ছা কতক পরিমাণে বহাল রাখতে হচ্ছে বলে যে তারা উচ্ছৃঙ্খল হবে, এমন কথা নয়। ওরা কতটুকুই বা চাইতে জানে? ওদের শাদা মন, কি করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে হয়, তা না শেখালে বুঝতে পারে না। ওদের অভাব আর অভিযোগ সাধারণতঃ দৈনন্দিন সুখ দুঃখ নিয়ে। তার সঙ্গে জন্মার্জ্জিত সংস্কারের কিছু কিছু যোগ আছে বটে। আচার্য্যকে ওইগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আচার্য্যগিরির যত কিছু কসরত, তা ওই সংস্কারমূলক ইচ্ছাগুলির সংস্কারের ওপর। প্রয়োজনমত ওগুলিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে বা খর্ব্ব করতে হবে। কিন্তু তা এমনভাবে করতে হবে যাতে ব্যাপারটা আগাগোড়া সহজ বলে অনুভব হয়। ছেলেদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে পথ চালাতে হবে—চলার আনন্দে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, তা যেন ওরা বুঝতে না পারে। সু-ইচ্ছাগুলিকে যেমন সহজ আনন্দে পরিপুষ্ট করতে হবে, কু-ইচ্ছাগুলিকেও তেমনি সহজ আনন্দে দমন করতে হবে।

কিন্তু কথাটার আর একটা দিকও আছে। নায়কত্বের মাঝে শুধু ছেলের ইচ্ছাটাই তো সবখানি নয়, নায়কের নিজস্ব ইচ্ছাও তো একটা আছে। অনেকগুলি বৃত্তি আছে, যা নাকি ছেলের মাঝে স্ফুরিত হয়নি; অর্থাৎ সে সম্বন্ধে ছেলে কোনও অভাব অনুভব করছে না। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সমস্ত অভাব কি করে জাগানো যায়? এটা হলে অভাবের মাঝে আচার্য্যের গরজের কথা, আর নেতৃত্বের অন্তরঙ্গ দিকটাই এর মাঝে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

এর দুটী উপায় হচ্ছে, ধৈর্য্য ও আত্ম-প্রত্যয়। প্রথমতঃ ধৈর্য্যের কথাই বলি। যে বৃত্তিরই স্ফুরণ আমরা দেখতে চাই না কেন, তার ক্রমবিকাশের একটা ইতিহাস আছে। আমরা অনেক সময়ই তার পরিণত ভাবটাকেই আদর্শ মনে করে ছেলেদের মাঝে তাই ফুটিয়ে তুলতে চাই এবং তদনুকূলে হয়ত ব্যবস্থাও করি। কিন্তু আমি যতটুকু ছেলেদের কাছে দাবী করছি, ততটুকু ওরা দিতে পারবে কিনা, কিম্বা সেই দাবীর জোরে যে বিধি-ব্যবস্থাগুলোর প্রবর্ত্তন করলাম, সে-গুলো ছেলের পক্ষে পীড়াদায়ক হবে কিনা, সেটা ধীরভাবে বিবেচনা করবার বিষয়। এসম্বন্ধে একটা সহজ মীমাংসা এই দিক থেকে হতে পারে যে, প্রত্যেক মনোবৃত্তির একটা বহির্ব্যক্তিও আছে, যার উপর নাকি আমাদের আচারের ভিত্তি। বাইরে ভিতরে একটা যোগাযোগ আছে বলেই একথা আমরা বিশ্বাস করি, যেখানে স্বভাবতঃ মনোবৃত্তির উন্মেষ হয়নি, সেখানে তদনুকূল আচারের অনুশীলন করলে তা হতে বৃত্তিস্ফুরণ সম্ভব হ'তে পারে। এই জন্য শিক্ষার মাঝে আচারনিষ্ঠার একটা মুখ্য স্থান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তা বলে আচারের আড়ম্বর বা প্রাণহীনতা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। অনেক সময় যে আদর্শের মোহে আমরা শক্তি অশক্তির কথা ভুলে যেতে পারি, এ কথাটা খেয়াল করতে হবে। আচারের মূলে যে ভাব রয়েছে,

আচার্য্য স্বয়ং তাতে ডুবগুপ্ত হয়ে, তাতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে তাঁর অন্তঃশক্তি প্রয়োগের ফলে ছেলেদের মাঝে আচারানুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করবেন, এবং অশক্তির কথা স্মরণ রেখে আশা ও ধৈর্য্যের সহিত অতিবাদকে পরিহার করে মধ্যপথ অবলম্বন করবেন।

তারপর হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়ের কথা। বলতে পারি, নেতৃত্বের মাঝে যে সম্মোহন শক্তির প্রয়োজন, তার উৎসই হল সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয়বলে আচার্য্য আপনার মনোগত আদর্শকে যেমন অপরের মাঝে সফল করে তুলতে পারেন, তেমনি কোথায়ও তার বিফলতা দেখলেও গম্ভীরবেদী হয়ে তা সয়ে যেতে পারেন। আদর্শ প্রচারের কথা উঠলেই এই মনে হয় যে, সবাইকে ঠিক এক জায়গায় এনে দাঁড় করানো বাস্তব জগতে কখনও সম্ভবপর হতে পারে না —অধিকার ভেদে আগু পিছু থাকবেই। এরূপ স্থলে অনধিকারী হয়ে যারা পেছনে পড়ে রইল, তারা উন্নত অধিকারীর পক্ষে কি বাধা স্বরূপে হবে না? আর যেখানে এমনি অধিকারী অনধিকারী সংমিশ্রণে ছাত্র সংঘ তৈয়ারী হবে, সেখানে কি করে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যেতে পারে?

এর দুটো জবাব হতে পারে। প্রথমতঃ বিভিন্ন স্তরের অধিকারী রয়েছে বলেই যে তারা পরস্পরের বাধা হতে পারে, এমন কথা ঠিক নয়। জগতের সর্ব্বত্র বৈষম্য আছে —শিক্ষার ক্ষেত্রেও যে থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই বিষমতার ক্ষেত্রে আমরা যদি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করি, তাহলেই বিপদের আশঙ্কা। কিন্তু প্রতিযোগিতার স্থলে সহযোগিতার শিক্ষা দিলে বৈষম্যের বিষময় প্রভাব থাকতে পারে না। একটা মহৎ লক্ষ্যের দিকে যদি সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এবং যে নীচে রয়েছে, সে যদি যে উপরে রয়েছে তাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে শেখে ও বিনিময়ে তার করুণা এবং সমবেদনা লাভ করতে পারে, তাহলে বৈষম্যজনিত বিক্ষোভে বিদ্যার্থী সংঘের কোনও ক্ষতিই করতে পারে না। আদর্শের উচ্চতা ও আচার্য্যের প্রাণবন্ত প্রেরণার সংঙ্গে এই ভাবের উন্মেষ হতে পারে—একথা মিথ্যা নয়। এই দিক দিয়েও আচার্য্যকে আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিশালী পুরুষ হতে হবে।

তারপর আর একটা কথা হচ্ছে এই যে, যেখানে মূলে একটা সত্যভাব মানুষের প্রাণের মাঝে সর্ব্বদা স্পন্দিত হচ্ছে, সেখানে অদৃষ্ট শক্তিও সে অনুকূল হবে—নিজের ভাবশুদ্ধির ওপর এমন একটা দৃঢ় বিশ্বাসও থাকা চাই। প্রাচীন কালে ঋষিরা অন্তরে সত্যকে অনুভব করে অপরকে তাই অনুভব করাবার ব্যাকুলতা নিয়ে যেমন উদাত্তকণ্ঠে ব্রহ্মবাদীদের আহ্বান করে আনতেন, তেমনি যে আচার্য্য তাঁর বিদ্যাপীঠকে একটা সত্যভাবের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইবেন, প্রকৃতি কখনও তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতাকে বিপর্য্যস্ত করবেন না —ঠিক তাঁর ভাবের বাহন হবার যোগ্য যারা, তাদেরই তাঁর কাছে টেনে আনবেন। নিজের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে নিয়তির কাছে এই দাবী চলে না, তা আমরা জানি এবং এ-ও জানি, আজকালকার প্রচলিত বিদ্যাপীঠে এই ভাবব্যূঢ় আত্মপ্রত্যয়ের একান্ত অভাব। জাতকে জাগাতে হলে কেবল সংখ্যাবলে বলী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করলেই চলবে না—আত্মবলে বলী প্রতিষ্ঠানেরই মুখ্য প্রয়োজন।

ভাবের অঙ্কুর

—•—

[শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর]

গুণাখ্যানে আসক্তি

নামে রুচির কথা বলিয়াছি। ইহার পর অষ্টম ভাবাঙ্কুর হইল—"আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে" —শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী ইহাকে ভাঙ্গিয়া বলিতেছেন—"কৃষ্ণগুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।" ইহার স্বরূপ এবং অনুভব কি প্রকার, এক্ষণে তাহাই আলোচ্য।

নামে রুচির প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, উহা অখণ্ডৈকরসপ্রত্যয়। নামে চিত্ত তন্ময় হইয়া যায়, বহির্জ্জগৎ ভুলিয়া ভাবুক ব্যক্তিকে লইয়া অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করেন, সেখানে বঁধু আর তিনি ছাড়া আর কেহ নাই। মর্ম্মের মর্ম্মস্থল হইতে উৎসারিত নাম যখন গানে অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহার বহির্ব্যক্তি ঘটে বটে, কিন্তু সেখানে নামী ছাড়া আর কেহ তো উপলক্ষ্য থাকে না। ভাবে বিভোর হইয়া যে নামগান করে, সে কি জানে, কেহ তাহার গান শুনিল কি না। নাম স্মরণে নিমজ্জিত, তাহার অন্যাপেক্ষা নাই।

এই অন্তর্ম্মুখীনতা ও তল্লীনতা ভাবুক স্বভাবের একটা দিক। শুধু ভাবুকই বা বলি কেন, মানুষমাত্রেরই, এমন কি সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেরই ইহা একটা স্বভাব। কিন্তু তদ্বিপরীত বহির্ম্মুখীনতাও জীবের একটা স্বভাব। গুণাখ্যানে আসক্তি এই বহির্ম্মুখীনতাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, নামে রুচি হইতে ইহার এই ভেদ। আমরা বলিয়া থাকি, জীব স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখী, অন্তর্ম্মুখী হইবার জন্যই তাহার সাধনা; এবং এই জন্য বহির্ম্মুখীনতাকে একটু ছোট নজরেও দেখিয়া থাকি। কিন্তু ভাবের তরঙ্গ হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠিলে এমন ভাবে অন্তর-বাহিরকে ভাগাভাগি করিয়া রাখা তো চলে না। তখন দেখি, বহির্ম্মুখীনতাও জীবের মতখানি একান্ত, অন্তর্ম্মুখীনতাও যে তাই; আর মর্য্যাদায় কেউ তো কারু চেয়ে কম নয়। প্রিয়জনের নামটী শুধু লইয়া তাহারই ভাবনায় যে অন্তরের অন্তরে ডুবিয়া যাই—ইহা কি কম ঐকান্তিক, কম স্বাভাবিক, কম মধুর? আবার এই যে তদগত ভাব উপচিয়া উঠিয়া বাহিরের জগৎকে পরম সোহাগে জড়াইয়া ধরিতে চায়, জীবস্বভাবের এই মাধুর্য্যকেই বা কোন বিরাগী নিন্দা করিবে?

যাহাকে ভালবাসি, তাহার সবখানিই যে আমার কাছে ভাল লাগিবে—এ তো সহজ অনুভবের কথা। ভালবাসায় মাঝে আর খুঁতের বিচার কোথায়? তাই বঁধুর আমার সবটুকুই গুণ। যে নিজের স্বারসিকী অনুভূতি ছাড়া আর কিছু জানে না দেখে, গুণ দোষের বিচার সেই করিতে পারে। আমার সম্মুখে যে রহিয়াছে, তাহার মাঝে এইটা দোষ আর এইটা গুণ—এই বিচার যদি আসে, তাহা হইলে বুঝিব, যে তদ্গতদৃষ্টি দিয়া বঁধুকে দেখিতে হয়, তাহা এখনো পাই নাই; এখনও বিশ্লিষ্ট দ্বৈতবুদ্ধিই আমার মাঝে প্রবল, তাই

গুণদোষের পার্থক্য চোখে পড়িতেছে। আমাকে আমি ভালবাসি—এ সোজা কথা; তাই তো আমার কোনও দোষের কথা মনে জাগে না; অপরে যদি দোষের কথা বলিতে যায়, আমি তাহাতে রুখিয়া উঠি; পরম সন্তর্পণে ও মমতায় সকল কলঙ্ক হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখি; আমার অবগুণের মাঝেও যে আমার কতখানি দরদ, তাহা অপরে বুঝিল না বলিয়া অভিমান করি। এই নিবিড় আত্মপ্রীতি যখন ভালবাসার জনের মাঝে সঙ্কারিত হয়, তখন দোষদর্শনের কোনও অবকাশ থাকে কি? সেখানে বিচ্ছিন্ন দ্বৈতবুদ্ধিই কি আছে? বঁধুর মাঝে দোষ দেখি না কেন? আমারে আমিকেই যে তার মাঝে আস্বাদন করি; অথবা তাহাকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া আপন হৃদয়ের উদ্বেলিত মাধুরী দিয়া তাহার রূপমূর্ত্তি গড়িয়া তাহারই পূজা করি। তোমরা যাহাকে বল খুঁত, তাহা কি আমার চোখে পড়ে না? পড়ে; কিন্তু সে যে আমার চোখে কি মাধুরী বুলাইয়া দেয়, যদি আমার চোখে তাহাকে তোমরা দেখিতে পাইতে, তবে বুঝিতে পারিতে।

* * *

"তোমরা তাহাকে বল কালো; সে কি আর আমি জানি না? কিন্তু কালো বলিয়াই যে মুখ বাঁকাইয়া লইতে হবে, এ তোমরা পার, আমি পারি না; তোমাদের বর্ণবিচার আছে, গৌরকে তোমরা ভাল বল, কালোকে বল মন্দ। আমি যে বর্ণপরিচয়হীনা, এত বিচার-পাণ্ডিত্য আমার মাঝে কোথায়? আমি দেখি যাহা, কালোর বুক আলো করিয়া রহিয়াছে যে মাণিক, সেইটী; এ কালো যে তারা বরণের কালো, যাকে আমি ভালবাসি; তার সুকুমার অঙ্গখানি বেড়িয়া আছে বলিয়াই এ কালো আমার চোখে আলো জালিয়াছে—নইলে কালো যে কালো, সে কথা তোমরা আর নূতন করিয়া আমাকে কি বুঝাইবে?

"আর তোমরা ও কথাই বা বল কেন? মেঘশূন্য হেমন্তের প্রোজ্জ্বল নীল আকাশ কি দেখ নাই? তাহাকেও কালো বলিয়া মুখ বাঁকাইবে? বর্ষণমুক্ত তরুপল্লবে রৌদ্রকিরণ পড়িয়া শ্যামল স্নিগ্ধতা ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পার কি? কালো বলিয়া চোখ বুজিয়া থাক কি? তবে আর আমার এ-কালোকে কালো বলিয়া গাল দিবে কেন? আমি মিথ্যা-কথা বলি নাই, ভালবাসি বলিয়া তাহার গুণ একতিলও বাড়াইয়া বলি নাই—বাস্তবিকই আমার মত মোহমুক্ত নির্ম্মল দৃষ্টি নিয়া তাহার দিকে একবার তাকাইয়া দেখ তো—এ কালোতে মন ভুলে কি না; ভালবাসার অশ্রুনির্ঝরে স্নাত করাইয়া সোহাগের দৃষ্টিখানি তাহার অঙ্গে বিছাইয়া দিয়া একবার চাহিয়া দেখ তো—শ্যামকে তোমার ভাল-লাগে কি না।

"বল, সে ত্রিভঙ্গ, সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও পারে না—এই বলিয়া উপহাস কর; কিন্তু কই, এমন ভঙ্গী করিয়া কাহাকেও দাঁড়াইতে তো দেখিলাম না। পল্লবিনী লতার মত কার তনু এমন সুকুমার, যে লাবণ্যের ভার সহিতে না পারিয়া অমন ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছে? আর অপরের সঙ্গে তুলনাই বা দিব কি ছাই?—সে ছাড়া আর কিছু তো দেখিতে পাইতেছি না যে যাচাই করিয়া বলিব, কে ভাল আর কে মন্দ। তোমরা বিজ্ঞ অনেক দেখিয়াছ, হয়ত সুপুরুষ কেউ থাকিতে পারে;—কিন্তু এ তনু যৌবনে আমার মন ভুলাইয়া কুলের বাহির যে করিল, সেই যে

সুপুরুষ—হোক্ সে কালো, হোক্ সে বাঁকা—তরুণীচিত্তের এই অনুরাগের অরুণিমাটুকু তোমাদের চোখে রোষের রক্তআভায় ফুটিয়া উঠিল কেন, অবাক হইয়া শুধু আমি তাই ভাবি।

"যাক্, এই প্রিয়া আর তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করিব না। আমি জানি সে যে শুধু আমারই মন ভুলাইয়াছে, তা নয়; অমন করিয়া আরও কতজনকে সে মজাইয়াছে; তারা তাকে ভাল বলে, কেউ তো কালো বলে না। তোমরা বলিবে, সে লম্পট; কিন্তু তাহাকে দেখিয়া যে তরুণীর মন ভোলে, সে কি তাহার দোষ? কমলের কোমল শোভায় তো সবার চক্ষু জুড়ায়—তবে তাহাকে লম্পট বল না কেন? সে কি যাচিয়া কাহাকেও ভুলাইতে গিয়াছিল? সে যখন আমাকে ছাড়িয়া অপরের মন রাখিতে যায়, তখন আমার ক্ষোভ হয় কিনা, জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? ক্ষোভ যদি হয়, সে তো আমারই হয়, তার জন্য তোমাদের তো গঞ্জনা দিতে যাই না। আর সে কথা আতিপাতি করিয়া খুঁজিবার তোমরা কে? সে যদি আমায় কাঁদায়, তবে তোমরা তাহাকে গালি দিবে কেন? তোমরা যদি তাহাকে ভাল বলিতে, তবে তোমাদের গালি সহিতাম; ঈর্ষার কুটিল দৃষ্টিতে চিরকাল তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছ, আজ তাহাকে গালি দিবার অধিকার তোমাদিগকে কে দিল!

"দেখ, ভুলিয়া আবার তাহার কথা লইয়া তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতেছি। তার যে কত গুণ, সে কেবল আমিই জানি—আর জানে যাহারা আমায় ভালবাসে; তাহার গুণের কথা যদি বলিতে হয়, তবে তাহাদের কাছেই বলিব; আবার পালটিয়া তাহাদের মুখেই শুনিব। তোমরা যাহারা ভালবাসিতে জান না, তাহারা গুণের কদর কিই বা বুঝিবে, কিই বা শুনিবে?"

* * *

আস্বাদনের বস্তুতে তন্ময় হইয়া গেলে যে মাধুর্য্য অনুভব হয়, তাহাকে আবার তিল তিল করিয়া আস্বাদন করিলেও সেই রসের অনুভূতি হয়। বরং অন্তর্জগতের তন্ময়তা হইতে আবার বহির্জগতের বৈচিত্র্যের মাঝে ফিরিয়া আসিবার জন্য ভাবুকের চিত্তে স্বতঃই একটা লালসা জাগে। ভাবের উচ্ছ্বাসে যখন বুক পুরিয়া যায়, তখন তাহাকে ধরিয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়ে—ইচ্ছা হয়, আপনজনের মাঝে এ আনন্দ বাঁটিয়া দিই। গুণাখ্যানের ইহাই নিদান। প্রিয়জনকে শুধু একা একা ভোগ করিয়া তৃপ্তি হয় না; আমি যে জিনিষটাকে ভাল বলি, সেটাকে যদি অপরেও ভাল বলে, তবে আমার অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তির উদয় হয়। কেন হয়, বলিতে পারি না। বোধ হয় যেন, ভালবাসার ধনকে এতদিন বুকে পুরিয়া লুকাইয়া ফিরিতেছিলাম, কাহাকেও তাহার কথা বলি নাই, কেননা জানি, এ জগৎ বড় নিষ্ঠুর। যদিই বা কেহ তাহাকে অনাদর করে? কিন্তু বুকের মাঝে আর কতদিন এ অমৃত লুকাইয়া রাখিব? আশায় আশঙ্কায় এতদিন আন্দোলিত হইয়া একদিন আপ্তজনের সম্মুখে নিভৃত নিরালয়া বুকের সম্পুট খুলিয়া দেখাইলাম, কি মাণিক সেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছি। দেখিয়া সে যদি তাহাকে ভাল বলিল, তবে আমার মস্ত একটা উদ্বেগ কাটিয়া গেল—মনে মনে গর্ব্বও হইল, এমন রতন পাইয়াছি, যাহা অপরের চোখেও ভাল লাগে। হৃদয়ের কবাট তখন খুলিয়া গেল। এতদিন

যত কথা বুকের মাঝে বাসা বাঁধিয়াছিল, তরল আনন্দে তাহারা উৎসারিত হইয়া চলিল। এই জন্যই বুঝি, আমি যে জিনিষটীকে ভালবাসি, অপরেও তাহাকে "ভাল বলিলে খুসী হই, আর খুসীর কবাট একবার খুলিয়া গেলে শতমুখে তাহার গুণের কথা আপজনের কাণে কাণে বলি। তাহাকে ভালবাসিয়া কত তুচ্ছ নিমিত্ত হইতেও যে কি বিপুল সুখ পাইয়াছি— এ তাহারই অফুরন্ত কাহিনী।

এই যে আপজনের কানে প্রিয়জনের অফুরন্ত গুণের কাহিনী ঢালিয়া দেওয়া— ইহার মাঝে একটা মাদকতা আছে। সঙ্কোচের আবরণ যদি একবার কাটিয়া যায়, তবে ইষ্টগোষ্ঠীর মত এমন রসায়ন কি জগতে আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায়? ভাবের স্নিগ্ধ আলোকে তখন জগৎ যেন চন্দ্রিকারজনীর মত মায়াময় হইয়া দেখা দেয়—বস্তমাত্রের অস্পষ্টতা যেন সেখানে চিত্তকে আরও আবিষ্ট করিয়া রাখে—যাহা অপরের কাছে অতি তুচ্ছ, ভাবুকের কাছে তাহারও যেন একটা বিশিষ্ট অর্থ সেই অস্পষ্টতার আলোকে ধরা পড়ে। তুচ্ছকে এমনি মহৎ করিয়া তোলার মাঝে যে একটা মাদকতা আছে, ভাবুকের মাঝে আপনার বেগে তাহা বাড়িয়াই চলে, যে কাহিনী একবার আরম্ভ হয়, তাহা যেন আর কিছুতেই শেষ হইতে চাহে না। অথচ একরস আনন্দের অনুভূতিকে তখন ভিন্ন ভিন্ন ভাঙ্গিয়া আস্বাদন করিয়াও যেন তৃপ্তি হয় না। নির্ব্বিশেষকে বিশেষের মাঝে নামাইয়া আনিয়া আপন হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় সুধারসে তাহাকে সিক্ত করিয়া ভাবুক তখন বিচারকুশল পণ্ডিতের কাছে প্রমাণ করেন—"তর্ক যারে উপহাসে, মর্ম্ম তারে সত্য বলে জানে।"

আবার যাহাকে ভালবাসি, তাহার গুণপনার কথা বিনাইয়া বিনাইয়া কত বলিব? যে দৃষ্টিতে আমি তাহাকে দেখিয়াছি, অপরের চোখে সে আলোক কি করিয়া ফুটাইয়া তুলিব? শুধু এইমাত্র বলিতে পারি—সে মিষ্টি, বড় মিষ্টি; কেমন মিষ্টি তাহা তুমি নিজে অনুভব না করিলে বুঝিতে পারিবে না। আবার সে যে মিষ্টি, এক নিশ্বাসে এই কথাটা বলিয়া ফেলিলেও যেন তৃপ্তি হয় না; আপনার অনুভূতিকে চিরিয়া চিরিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে হয়, "তার সবই মিষ্টি—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

"—এই যে সে আমার বুক জুড়িয়া রহিয়াছে—মধুর, মধুর তার তনুর পরশ; আবার এই সুতনুর অমিয়া ছানিয়া কে তাহার ওই মুখখানি গড়িল—সে যে আরও মধুর, আরও মধুর, আরও মধুর!—আবার সেই তো মধুর বদনে আধফোটা মুচকিহাসি—এই যে সে আলসে বিভোর অঙ্গখানি আমার বুকে এলাইয়া দিয়া, মধুর দুখানি বাহুর বাঁধনে কণ্ঠ বেড়িয়া, মধুর মুখখানি আমারই মুখের পানে আনমিত করিয়া চুম্বনস্ফুরিত আরক্ত অধরের সুধাসম্পুট বিলাইয়া দিতে চাহিতেছে—তার এই মৃদুস্মিতমাখা ব্যাকুল আরতির মধুগন্ধে যে আমায় পাগল করিয়া তুলিল।—তার ওই হাসি মধুর, ওই বাঁশী মধুর—তার সকলই যে মধুর, মধুর, মধুর—অতি মধুর।"

গুণাখ্যানের বিহ্বলতায় এমনি করিয়া ভাবুককে মাধুর্য্যের সায়রে ডুবাইয়া মারে— শেষে কে আর বলিতে পারে, যাকে ভালবাসি,

সে কেমন? স্বপ্ন-জাগরণের লোকে তখন ভাবুকের যাতায়াত—যেন নির্ম্মল প্রদোষে চতুর্থীর জ্যোৎস্নায় বাহিরে অবান্তরে তাঁহার হৃদয়ে সন্ধি হইয়াছে—একবার উগ্র চক্রিম-গ্রামের তীক্ষ্ণ আস্বাদনে তিল তিল করিয়া বঁধুকে আস্বাদন করিতেছেন, আবার ভাবের বিহ্বলতায় অদ্বৈতকরসপ্রভাবে ডুবিয়া যাইতেছেন। এই জন্য বিনাইয়া বিনাইয়া বন্ধুর গুণপনাও আর তাঁহার বলা হইয়া ওঠে না—বলিতে বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়, অশ্রুজলে নয়ন ছাইয়া ফেলে, এক কথা স্মরণে গিয়া আর এক মাধুর্য্যের স্মৃতিতে কথার ছেদ হইয়া যায়—শেষে মনের কথা চোখের ভাষায়, অঙ্গের ইঙ্গিতে আধেক ফুটিয়া উঠে—সেই আধ আধ ভাবেই প্রকাশের দ্যোতনা অনির্ব্বচনীয় হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া শ্রোতাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। গুণাখ্যানতৎপর ভাবুকের সঙ্গের মাঝেও এমনি একটা সম্মোহকারী মাদকতা আছে।

আর একটা কথা—এই যে মত্ততা, তরুণ বয়সের মত্ততা—তাই ইহার মাধুর্য্যের আর তুলনা নাই। অবশ্য প্রেমের প্রৌঢ়ত্বেও নিতুই নতুনেরই লীলা বটে—কিন্তু সে আস্বাদন অলৌকিক। আর ভাবুকের হৃদয়ে ভাবোচ্ছ্বাসের স্ফুরণ একটা অভিনব বিস্ময়ের ব্যাপার, স্বর্গের সুধা হইলেও মর্ত্ত্যের ভাণ্ডে তাহাকে আস্বাদন করিতে হয়, কিনা—তাই লৌকিক সংস্কারের দিক দিয়া তাহার এমন একটা অপরূপ বিশেষত্ব আছে, যাহা বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয়। পরশরতসের প্রথম হিল্লোলে প্রাণ যেমন করিয়া কাঁপিয়া ওঠে, পরে বুঝি সে আর তেমন করিয়া কাঁপে না—মর্ত্ত্যের প্রাণ বলিয়াই আর তেমন করিয়া কাঁপিতে পারে না। সেই পুলক স্পন্দনেই তাহার মরণ ঘটে কিনা—তাই সেই বারে সে যাহা পায়, তাহাই তাহার চরম সার্থকতা—ইহার বাড়া আরও কিছু আছে কি না তাহা সে জানে না।

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৭১।৩

যা কিছু করবার আগে তাঁকে স্মরণ করে আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করব। তার ফলে যাই হোক না কেন, সবি তাঁর ইচ্ছা বলে জানব। যদি কাজটা সিদ্ধ হয়, তবে তা আমার বাহাদুরীতে নয়, তাঁরি শক্তিতে। কেননা তাঁকে স্মরণের ফলে অলক্ষ্যে আমার ভিতর দিয়ে তাঁর শক্তিই যে কাজ করছে—তাকে আমার বলে ছাপ দেব কেমন করে? আর যদি অসিদ্ধ হয়, তবে জানব, আমার কোথায়ও ত্রুটী ছিল। তখন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানে নিজকে বিচার করব। যদি গলদ ধরতে না পারি, তবে জানব যে এই অসিদ্ধির মাঝেও তাঁর কোন গূঢ় মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত রয়েছে। চেষ্টা ব্যর্থ হবে না কখনও। যে

ঢিল আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছি, যখনি তোর আমার দেওয়া বেগের গতি শেষ হলেই সে ফি'রে আসবে। সময় হলে আমার সিদ্ধি আসবে।

*

বুদ্ধি শুদ্ধির উপায় কি? বুদ্ধি শুদ্ধ না হলে পরমার্থ দূরে থাক্‌ এই জগতের কাজেও ঠকতে হয়। এর একমাত্র উপায় সংস্কার বর্জ্জন করা। সংস্কার দ্বারা মন আচ্ছন্ন থাকে বলেই বিচার সুষ্ঠু হয় না। এই সংস্কারকে তাড়াতে হবে। চাই অভিমান ত্যাগ। অভিমান ত্যাগই সব চেয়ে বড় ত্যাগ। বৈদান্তিককে সব ছেড়ে প্রথমে এই কাজটী করতে হয়। তারপর বিচার। আগে শ্রীগুরুচরণে অভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ বুদ্ধিলাভ, তার পর তাঁর সংস্কার নিয়ে বিচার।

*

প্রেমের অঞ্জন চোখে না লাগা পর্য্যন্ত বিচার। শুষ্ক বিচারে দেহ মন অবসন্ন হয়। কিন্তু যদি সত্যানুসন্ধিৎসা পিছনে থাকে, তাহলে এই বিচারই তিলে তিলে আনন্দ দিয়ে প্রাণে এক অপূর্ব্ব রস সঞ্চার করে। প্রেম তখন আসে। জগতের উপর যতদিন সেই প্রেমদৃষ্টির পরিবর্ত্তে স্বকপোলকল্পিত বিচারের ছাপে ভালমন্দ নির্দ্ধারণ হয়, ততদিনই দুঃখের শেষ দেখা যায় না। এ জন্যও সরল প্রার্থনা চাই। বুদ্ধিটা অনেক সময় ঠুঁটো হয়ে কেবল শুষ্ক হাড় চিবিয়ে নিজের রস নিজে আস্বাদন করে। তাই বুদ্ধি শুদ্ধির জন্য প্রার্থনা দরকার। মোট কথা, বিচারের পরিণামে মন উদ্বুদ্ধ হবে—জ্ঞান আসবে; প্রেম আসবে তার পরে।

*

আমার মাঝে যে তাঁর শক্তি নিয়ত কাজ করছে, এই জেনে যে কাজ করব, তার ফলে সিদ্ধি অসিদ্ধি নিয়ে লাভলোকসানের বিচার করলে ভুল করা হবে। তাঁকে মেনে যে কাজ হবে, তার ফলে লাভ হবে নির্ভরতা বা ভক্তি। আর কল্পনা দিয়ে যে কাজ আমার শক্তিতে হচ্ছে বলে জানব, তাতে লাভ হবে খানিকটা অভিমানসঞ্চয়। সেটা লোকসানই।

*

এক মুহূর্ত্তের জন্য যে ভাগবতের মুখপানে চাওয়া, তাই সারা জীবনটাকে সরস করে রাখতে পারে—তাঁকে পাওয়া এমনি সহজ। তাই গীতা বল্‌ছেন—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"

*

কর্ত্তব্য যখন সহজ হয়ে যায়, তখনি আমি অ"কিঞ্চন"—আর তখনি "বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।" নইলে "প্রকৃতৈর্গুণৈঃ" যে কর্ম্ম বা ডিউটী—তা কি তৃপ্তি দিতে পারে?

*

বুঝবো কি করে—তিনি কি করাতে চান?—এ প্রশ্নটাই একটা ভুয়ো প্রশ্ন। বুঝবে কি করে আবার—বুদ্ধ কি তোমার খুসীতে চলছে? বাস্তবিক তাঁর অধীন যে হয়েছে, সে তাঁর বুদ্ধি দিয়েই বোঝে, কোনটা পথ, কোনটা অপথ। হয় পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে, নয় অভিমান বিসর্জ্জন দিতে হবে—দুটোর একটা চাই-ই।

*

আদর্শ কি, এক কথায় তার জবাব দেওয়া কঠিন—কেননা কোন কিছুরই চরম একটা সীমাবদ্ধ কিছু নয়: তুমি যাতে বাস্তবিকই খুসী হও, তাই তোমার আদর্শ। তোর কি

চুরী করে খুসী হয় বলেই চুরী করে ?—তা তো নয়। প্রবৃত্তির দায়ে পড়ে সংস্কারে অন্ধ হয়ে মানুষ যাতে খুসী না হয়, তাও করে বসে। কাজেই খুসীর মত খুসী চেনাও দায়। প্রবৃত্তি বা সংস্কারের অধীন হয়ে আছ বলেই কিসে খুসী হও, তা বুঝতে পারছ না। এগুলোকে অধীন কর, ঊর্দ্ধে ওঠ—স্বরাট্ হয়ে তোমার যথার্থ খুসীকে চিনে নাও—তাই তোমার স্বরূপ।

*

তাঁর পথ কি ?—নিজের প্রকৃত রূপ চেনা। নিজকে তাতে প্রতিষ্ঠিত করা। আমি মানুষ—কাজেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব আমার অর্জ্জন করতে হবে। খাঁটী জিনিষ সর্ব্বসমঞ্জস—যার মাঝে খাদ আছে, তার সঙ্গেই কারো মিলন হয় না। নিজের স্বরূপ অনুসন্ধান কর—কিসে স্বরূপ আবৃত হয়েছে, খুঁজে বের কর। স্বরূপ-বিরোধী জিনিষ নিরানন্দ। যাতে চিত্ত অস্বস্তি আনে, তাকে দূর কর—তবেই মনুষ্যত্ব অর্জ্জিত হবে। মানুষ মানুষ না হলে তাঁকে পায় না—সর্ব্বত্র এরি প্রমাণ পাচ্ছি। কেন পায় না, তার যুক্তি নাই—একথা বিশ্বাস করতে হবে শুধু।

*

আত্মানুধ্যানে রত হব, ভাবতে ভাবতে আকুল হব—তার পর শুধু মীমাংসা যে হয়েছে, এইটুকু জানিয়ে দেবার জন্যই যেন শাস্ত্রের বচন মনে আসে; না বুঝে না শুনে শুধু শাস্ত্র আওড়িয়েই যারা বড় হতে চায়, ঐ আওড়ানোই সার হবে তাদের। আগে ভাবতে হবে; নিজের ভিতর শাস্ত্রলিখিত সত্য সবি আছে, ধ্যানে তাকে বুঝতে হবে;—শুধু প্রকাশের প্রমাণস্বরূপ থাকবে শাস্ত্রবচন। যারা সত্যলাভ করতে চায়, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস তাদের থাকা চাই। বিশ্বাস থাকবেই—তাঁরা যে বাস্তবিকই ভাল ছিলেন; সত্য, মঙ্গল এবং প্রেমময়কে প্রকাশ করবার চেষ্টাই যে তাঁদের প্রাণ ছিল। শাস্ত্র তাঁদের প্রাণের রসে ডোবান জিনিষ। শাস্ত্রপাঠ আত্মানুধ্যানের একটী প্রধান সহায়। নিজের সম্বন্ধে ভাবতে শিখা না পর্য্যন্ত আবৃত্তি। কিন্তু যখন ভাবতে শিখবে, তখন বুঝে বুঝে আবৃত্তি—তা নিজে নিজেই হোক্, আর পরের কাছেই হোক্।

*

ধ্যান ধরে যাকে পান, সেই পাকবে। চিন্তার টানে এসে পড়ে কত কিছু—তার সবই কি কাজে লাগে ? জগতে মিথ্যা কিছুই নাই। কোনটা আমার কাজে লাগে, কোনটা লাগে না। যেটা লাগে না, সেটাই তুচ্ছ; তাকে ছেড়ে চললেই হল। এমনি করে ছাড়তে ছাড়তে দেখা যায় চিরদিনের কিছুই না—তবে দু'দনের বটে। দু'দিনেরটা দু'দিনেরই মনে কর—চিরদিনের মনে করাটাই আসক্তি—আসক্তিই বন্ধন।

*

কল্পনায় যদি তিনি ফুটে উঠেন—তবে তাঁকে অবিশ্বাস কর্ব্ব কেন ? কেন। কল্পনার অতীত যে আনন্দস্বরূপটী, সেটী তো তখন প্রত্যক্ষ। তাই তাঁর অস্তিত্বে আর সংশয় থাকে না—কল্পনা যদি তাঁর বলে হয়, তবে তাকেই আমি চাই।

*

জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—এ তিনটী আলাদা আলাদা পথ নয়। যেমন পরস্পরের সঙ্গে না মিশে ত্রিগুণ থাকতে পারে না—তেমনি

একে অন্যের আশ্রয় না নিয়ে এ তিনটীও থাকতে পারে না। আমরা আপনার করে জানলেই ভালবাসবো—ভালবাসলেই অতি নিগূঢ় ভাবে জানবো—অমনি সে জানা আর ভালবাসা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে—কায়ে, মনে আর বাক্যে।

*

জীবনে সত্য কি?—যা অযাচিতে আমাকে পূর্ণ করে, যা অকারণে আমায় পুলকিত করে—সহস্র বিপদের মাঝেও তার সম্পদময় স্মৃতি জাগিয়ে রাখে। এমন কোন ভাব যদি পেয়ে থাক যা তোমাকে গর্ব্বিত করেনি, গৌরবান্বিত করেছে; ঘৃণা করতে শিখায়নি, ভালবাসতে শিখিয়েছে; নিজের সম্বন্ধে নির্ব্বিচার পক্ষপাত আনেনি, বজ্রকঠোর ভর্ৎসনায় অন্যায়নিরত তোমায় বিরত করেছে; যেখানে পাপ, সেখানে ডুবে যায়নি, আশায় প্রেরণাবলে উর্দ্ধপথে তোমাকে প্রচোদিত করেছে;—তবে জানবে এই ভাবই সত্য। সত্যই তোমার সর্ব্বসমগ্রাসী দৃষ্টি খুলে দেবে—অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সকলের অন্তর দেখিয়ে দেবে—সাম্প্রদায়িকতার মোহ দূর ক'রে প্রেমের ক্ষেত্রে সকল মতবাদের ঐকান্তিকবাদন শোনাবে। তার বিশেষত্বই এই যে কেউই তার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না। সত্য তো পক্ষপাত জানে না; কোন কিছুতেই সে মজায় না—অথচ নিখুঁতভাবে সবকে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ করে। সত্যবাদী হও, সত্যকৃতি হও, যা ভাববে, সত্যি করে ভাব - যেন বুকে হাত দিয়ে বলতে পার, আমি এই ভাবছি এবং যা ভাবছি, তাই করছি।

সংবাদ ও মন্তব্য

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতৃ শ্রীমৎ পরমহংসদেব বিগত ৯ই পৌষ ভক্তসম্মিলনী উপলক্ষে ঢালিসহর সারস্বত আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার অরুতা সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমের ১৫শ বার্ষিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

দানপ্রাপ্তিস্বীকার

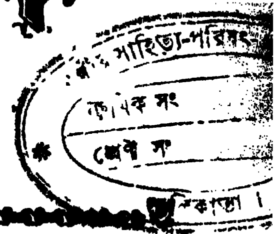
ঢাকা জেলার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্র সারস্বত মঠের আকৃতি ও উন্নতিকল্পে ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আরও ১৬০০৲ শত টাকা দিয়াছিলেন। ভগবান্ জগদ্গুরু দাতার মঙ্গল করুন।

জনৈক হিতৈষী, এলাহাবাদ ২৫৲, হিতৈষী ডিব্রুগড় ২৲, হিতৈষী, গৌহাটী ৷৷০, শ্রীযুক্ত গুণকান্ত পাটঙ্গ ১৲, শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর শর্ম্মা ২৲, শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৷৷০, শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত শর্ম্মা ১৲, শ্রীযুক্ত কালীরাম গগৈ ৷৷০, শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর গোস্বামী ২৲, বীরখেতি সেবকমণ্ডলী ৪৲, শ্রীযুক্ত ভদ্রকান্ত দাস ।০, শ্রীযুক্ত মাধোরাম কোঁওর ।০, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন শুপ ১৲, শ্রীযুক্ত সোমধর বরকটকী ১৲, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গগৈ ৷৷০, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বরুয়া ৷৷০, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গগৈ ৷৷০, নকাছারীতে সংগৃহীত ১৶০, শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর শর্ম্মা ১৲, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ শর্ম্মা ।০, ডিব্রুগড়ে সংগৃহীত ১৶০।

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)



১৮শ বর্ষ } মাঘ { ১০ম সংখ্যা

জাতবেদাঃ

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।১।৫]

—*—

আ রোদসী অপৃণা জায়মান
উত প্ররিক্‌থা অধ নু প্রযজ্যো।
দিবাশ্চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যা
বচ্যন্তাং তে বহ্নয়ঃ সপ্তজিহ্বাঃ॥ ।

দ্যৌশ্চ ত্বা পৃথিবী যজ্ঞিয়াসো
নি হোতারং সাদয়ন্তে দমায়।
যদী বিশো মানুষীর্দেবয়ন্তীঃ
প্রযস্বতীরীলতে শুক্রমর্চ্চিঃ॥

ব্রতা তে অগ্নি মহতো মহানি
তব ক্রত্বা রোদসী আততন্থ।
ত্বং দূতো অভবো জায়মান-
স্ত্বং নেতা বৃষভ চর্ষণীনাং॥

"অত্যা বা কেশিনা যোগ্যাভি

ঘৃতস্রুবা রোহিতা ধুরি ধিষ্ব।

অথা বহ দেবান্ দেববিশ্বান্ত্

স্বধ্বরা কৃণুহি জাতবেদঃ॥"

যখনি জনম নিলে আপূরিলে রোদসীর বুক,
অসীম সম্পদ্ তব—কাঙালের নাও পূজাটুক্ ;—
দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপি দীপে তব মহিমার জ্যোতিঃ,
সপ্তজিহ্বা শিখা তব নিখিলের লভুক আরতি।

তোমার প্রসাদ যাচি, হে দেবতা, মানবসমাজ
কত উপচারে হের শুভ্র অর্চ্চি পূজে তব আজ ;—
দ্যাবা আর পৃথিবীর সাথে যত যজ্ঞভাগিগণ,
তোমারেই হোতা জানি সে পূজায় করে আপ্যায়ন।

আছে কত মহাব্রত, তারো চেয়ে তুমি যে মহৎ—
সুমহতী কীর্ত্তি তব ছাইল যে নিখিল জগৎ।
যখনি জনম নিলে, দূত হলে নর হতে সুরে—
তোমারি নিদেশ পালি যাজকের মন-আশা পূরে।

আছে তব দীপ্তকায় রোহিতাশ্ব অতি সুশোভন,
যজ্ঞভূমি পুরোভাগে তাহাদের কর নিয়োজন ;—
তারপর বহি আন যেথা যত আছে দেবগণ—
জানি তো সবারে তুমি—যজ্ঞভাগ কর বিতরণ।

———*———

যজ্ঞরহস্য

—*—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইতিহাস থেকে এ কথা প্রমাণ হয়, আর নিজের অভিজ্ঞতা হতেও দেখেছি, মানুষ যখন সংঘবদ্ধ হয়ে এক দৃষ্টি নিয়ে এক কর্ম্ম করে, তখন সবার হৃদয়ে একই সুর বেজে উঠ্‌বার একটা সু-সুযোগ ঘটে; জ্ঞাতসারেই হোক্, আর অজ্ঞাতসারেই হোক্, পরস্পরের মাঝে তখন চিন্তা ও ভাবের বিনিময় হতে থাকে, মানুষ একই ভাবের আওতায় গিয়ে যেন তখন ঝুঁকে পড়ে—সবার মাঝে তখন একই স্তরের চিন্তা, একই আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ হয়ে থাকে। এমনি করে সমবেদনা ও ঐক্যের উদ্ভব হয়। নিরক্ষর মুহম্মদ আরবদের যে মহম্মদ অন্ততঃ দিনের মাঝে পাঁচবার করে ভগবানের নামে এক জায়গায় আনতে পেরেছিলেন, এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। এমনি করেই কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল মানুষকে তিনি একটা সুসংহত জাতিতে পরিণত করেছিলেন।

যজ্ঞ, তীর্থ, মেলা, মন্দির, আদালত, সরাইখানা, বিবাহসভা বা শ্রাদ্ধসভা—সাধারণ সভাসমিতি, বৈষ্ণবী সভা, আজকালকার কংগ্রেস, কনফারেন্স ইত্যাদিতে ভারতবাসীরা এক হবার সুযোগ পেয়েছে। গির্জ্জা, হোটেল, প্রদর্শনী, সৈর-সফর, বিশ্ববিদ্যালয়, বক্তৃতাসভা, ক্লাব, রাজনৈতিক সম্মেলন ইত্যাদির সহায়ে পাশ্চাত্য জাতিগুলি সংঘবদ্ধ হয়। কিন্তু সংঘশক্তির সব চেয়ে পরিস্ফুট বিকাশ হয়, যখন আমরা প্রাণভরা প্রীতি নিয়ে কোথায়ও একত্র হই—তখন প্রেমের শান্তিবারির অভিষেকে ঐক্যবন্ধন আরও দৃঢ় হয়। যেখানে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে, সেখানেই যথার্থ স্থায়ী মিলন ঘটে। নইলে শুধু কতকগুলি দেহপিণ্ড একত্র হলেই ফল ভাল হয় না, বরং সেরূপ ক্ষেত্রে ঈর্ষ্যা ইত্যাদির ভাবই বেশী জাগে। রাসায়নিকেরা জানেন, ভিন্ন প্রকৃতির পদার্থের সংমিশ্রণে অনেক সময় বিস্ফোরণ হয়ে থাকে; যেখানে প্রাণে প্রাণে মিল নাই, সেখানে বন্ধুত্ব করতে গেলেও অনেক সময় ফল এমনি হয়। কেবল হাঁটাহাঁটি করলেই দুই প্রাণ কখনও এক হয় না। আর কেবল শিষ্য-বন্ধুর সান্নিধ্য খুঁজে বেড়ালেই চলবে না; বরং সর্ব্বপ্রাণের মূলাধার অব্যয় পুরুষ যিনি, তাঁর সামীপ্য যদি লাভ করতে পারি, তাহলে সবখানেই শিষ্য-বন্ধু জুটে যাবে। বেতস নদীর তীরে থেকে জলের দিকে শিকড় মেলে দেয়। অফুরন্ত প্রাণের উৎস যিনি, তাঁর মাঝে নিমজ্জিত হও—কত বেতস তোমার পানে শিকড় মেলবে। কেবল সত্যের উৎসকে আশ্রয় করতে হবে।

একটা দূরবীণে যতগুলি কাচ থাকে, তাদের কেন্দ্রবিন্দুগুলি যদি যথাযথ ব্যবধান অনুযায়ী সাজান থাকে, তবেই তারা সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে। সৌরজগৎটা একটা সুসংবদ্ধ সংহতি বলতে পারা যায়, কেননা তার গ্রহনক্ষত্রের পরস্পরের দূরত্বের মাঝে

একটা সামঞ্জস্য আছে। বন্ধু-বান্ধবদের মাঝেও এমন কেউ কেউ থাকে, যাদের একটু বেশী কাছে আন্‌লে বা একটু বেশী দূরে ঠেলে দিলে বনে না। বন্ধুত্বের সৌরজগতেও আধ্যাত্মিক ব্যবধানের একটা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন, তবেই প্রীতি ও ঐক্য স্থায়ী হবার সম্ভাবনা। মানুষ ভ্রমবশতঃ অতিরিক্ত মেশামেশি বা অতিরিক্ত ছাড়াছাড়ি করার ফলে অনেক সময় অপরকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখে থাকে। পরস্পরের মাঝে সুসঙ্গত ব্যবধান রক্ষা করে চল্‌তে পারলে তবেই একতা, প্রীতি ইত্যাদি সম্ভবপর হয়।

আমাদের যে সমস্ত জাতীয় উৎসব আছে, সেগুলোর এমন ভাবে সংস্কার করা প্রয়োজন, যাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক সেখানে একত্র হবার সুযোগ পায় আর পরস্পরের মাঝে আধ্যাত্মিকতার সাজাত্য বশতঃ আপন জনদের খুঁজে তাদের সঙ্গে মিশতে পারে, প্রাকৃতিক নিয়মেই পরস্পরের সম্বন্ধের ব্যবধান যথাযথ বজায় থাকে। শীতকালে জাতীয় উৎসবেগুলোর ব্যবস্থা দাক্ষিণাত্যের মৃদু আবহাওয়াতে হলে ভাল হয়, আর গ্রীষ্মকালে উত্তর ভারতের পার্ব্বত্য শোভার লীলাভূমিতে। বসন্তের উৎসবগুলো বাংলাতে, আর শরতের উৎসব গুলো পশ্চিম ভারতে হলে ভাল হয়। এই সমস্ত উৎসব সর্ব্ব প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব বর্জ্জিত হয়ে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে, সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা এগুলি পরিচালিত হবে। সেখানে কলা ও শ্রমজ শিল্পের প্রদর্শনী, পণ্য বীথি, অজায়বঘর, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, ক্রীড়াভূমি, বক্তৃতামঞ্চ, সামাজিক সম্মেলন, কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্স মণ্ডপ এবং জাতীয় রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি সবই থাক্‌বে, আর তারই আকর্ষণে বিভিন্ন প্রদেশ হতে বিভিন্ন ধর্ম্মের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সবরকম লোক সেখানে একত্র হবে।

সেখানে জীবনের গুরু ও লঘু উভয় দিকেরই চর্চ্চা হওয়া প্রয়োজন। বোন সেখানে ভায়ের সঙ্গে ঘুরুক ফিরুক, খেলা করুক, স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে স্বচ্ছন্দ চিত্তে চলাফেরা করুক— যেমন প্রাচীন ভারতে করত; আজও বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে যেমন দেখা যায়, তেমনি করে জননীরা সন্তানপরিবেষ্টিত হয়ে বিচরণ করুক। আর সর্ব্বশ্রেণীর বক্তার জন্য একটা সাধারণ বক্তৃতামঞ্চ থাকা প্রয়োজন—সেখানে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক একত্র হয়ে উচ্ছ্বসিত ভাষায় পরস্পরের প্রতি প্রীতি জ্ঞাপন করবে।

জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি ও উৎকর্ষ বিধান ও প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে সংঘবদ্ধ করা ভারতের জাতীয় উন্নতির আর একটা অনুকূল পন্থা।

নানাস্থানে ওঙ্কার মন্দির স্থাপন করা প্রয়োজন; সেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা একত্র হয়ে ধ্যান ধারণা অধ্যয়নাদি করবে আর পরস্পরে প্রেম ও সহানুভূতিসূচক দৃষ্টি বিনিময় করবে—কিন্তু কথা বলবে না।

রামের প্রদর্শিত পন্থায় যুবকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম চর্চ্চা করতে পারে— তাতে প্রত্যেকটী অঙ্গহারকে একটী অর্থপূর্ণ আধ্যাত্মিক সঙ্কেতের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যাবে—যেমন নাকি আহুতির মানসিক ভাবনার ওপর একটা আধ্যাত্মিক ছাপ ফেলার কথা আগেই বলেছি। স্নানের সময় আমরা প্রসঙ্গোপযোগী শুদ্ধভাবপূর্ণ স্তোত্রাদি পাঠ করব—কিন্তু যে ভাষা বুঝি না, সে ভাষায় নয়।

যুবকেরা নদীর তীরে গাছের তলায়,

শ্যামল প্রান্তরে, অথবা আকাশের অবস্থা যদি প্রতিকূল না হয়, তবে মুক্ত বায়ুতে একত্রে সে আহার বিহার করুক। প্রত্যেকটী গ্রাস মুখে তুলবার সময় মুখেও বলুক,—ওম্ ওম্ — মনেও জপুক—ওম্, ওম্। তা ছাড়া জ্বালাময়ী ভাষা ও জীবন্ত ভাবপূর্ণ জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্কীর্ত্তনও জাতীয় একতার একটা প্রধান অঙ্গ

হবনের জন্য কৃত্রিম আগুন না জ্বালিয়ে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ যুবক প্রাতঃসূর্য্যের প্রদীপ্ত মহিমা অথবা সন্ধ্যারবির রক্তিমগুলকে হবনাগ্নি কল্পনা করে সঙ্কীর্ণ আমিত্বকে তার মাঝে বিসর্জ্জন দিক। "জাগো, বৎস, অতন্দ্রিত হয়ে ছুটে চল প্রভাতসূর্য্যের পানে, তার রক্তোচ্ছ্বাসে বুক পূরে নাও।" সবিতার মহিমাসমুদ্রে একবার ডুবে যাও না ভাই, আবার জ্যোতিঃপ্লাবনরূপে তা হতে বেরিয়ে এস—তোমার দিব্যজ্যোতিতে নিখিল জগৎ প্লাবিত হয়ে যাক। এই তো হল হবন।

জনসাধারণের মাঝে, বিশেষতঃ শিশু ও নারীদের মাঝে (আর এরাই ভবিষ্যতের আশা ভরসা) প্রীতি ও ঐক্যের উদ্বোধন করবার পক্ষে একটী সার্থক উপায় হচ্ছে নগরকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করা। কীর্ত্তনের দল সহর বয়ে লোকের দুয়ারে দুয়ারে যাবে—নির্ভীক হৃদয়ে সত্যের মহিমা প্রচার করবে।

সত্যের জন্য যদি কোনও জাতীয় নেতা উৎপীড়িত হয়ে শহীদের মৃত্যুকে বরণ করে নেন, তাহলে জাতীয় একতাকে আর কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে স্বার্থ বলিদান করে জীয়ন্তে মরা হতে পারলে শুধু একটা জাতি নয়—সকল জাতিকেই এক করা যায়। "ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ" হয়ে যিনি জীবন যাপন করবেন, সমস্ত জাতি তাঁর নির্দ্দেশে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হবে।

শক্তির চর্চ্চা করলে তবে না সাহস, সত্যনিষ্ঠা, আত্মত্যাগের প্রেরণা প্রভৃতি সদ্‌গুণ অর্জ্জিত হবে। স্ত্রীজাতি, শিশু ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষাকে অবহেলা করলে আমরা যে ডালে বসে আছি, সেই ডালকেই কাটা হবে—শুধু তাই বা বলছি কেন, এতে জাতীয় উন্নতির মূলেই কুঠারাঘাত করা হবে।

হে বিংশশতাব্দীর ঋষিবংশধর, যদি তোমার শ্রুতির শিক্ষা অধিগত হয়ে থাকে, তবে স্মৃতির বিধানে জাতিধর্ম্মের যে সঙ্কীর্ণ আবরণ তোমার ওপর আরোপিত হয়েছে, তাকে বিদীর্ণ করে একদিন তোমাকে বেরিয়ে আসতেই হবে। আর যদি আত্মস্বরূপ জানবার ব্যাকুলতা তোমার মাঝে না জেগে থাকে, শ্রুতিবাক্যে যদি তুমি কর্ণপাত না করে থাক এবং এই নিদারুণ গ্রীষ্মে অতীতের শীতবস্ত্রের বোঝা বইবার আগ্রহ যদি না ছাড়তে পার—তবে তোমার জ্ঞানী পূর্ব্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে বলছি—একবার ভেবে দেখ, তুমি কি অবস্থায় আছ! মানুষ তো শুধু কালকে আশ্রয় করে থাকে না—দেশ আশ্রয়ও তাকে করতে হয়। কালের বিচারে তোমরা হিমাচলবাসী ঋষিদের বংশধর, কিন্তু দেশের বিচারে ইউরোপ আর আমেরিকার বাস্তব জগতের বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধরগণের সঙ্গে যে তোমাদের সম্বন্ধ আছে, তা কি অস্বীকার করতে পার? প্রাচীন উপনিষদের জ্ঞান আহরণ করবে বই কি? কিন্তু এই স্থূল জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে জাপান ও আমেরিকার কর্ম্মকৌশল তোমায় আয়ত্ত করে নিতে হবে, তবে না তোমার বাঁচবার ভরসা! কচি বটগাছ যদি কেবল বীজের গুণের বড়াই

জন্মাতে থাকে, চারদিককার আলো মাটী জল হতে উপাদান সংগ্রহ করে তাকে প্রাণশক্তিতে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা যদি না করতে চায়, তবে সে তো মরবেই। স্বপ্নেও ভেবো না যে রাম তোমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করতে বলছেন; কিন্তু এ কথা রাম তোমাদের নিশ্চয়ই বলছেন যে, অতীতের সঙ্গে বর্তমানকেও তোমরা আপন করে নাও—পাশ্চাত্য জগৎ যেমন তোমাদের প্রাচীন কালের দিব্যজ্ঞান আহরণ করছে, তোমরাও তেমনি তাদের বিজ্ঞানকে আপন করে নাও।

(সমাপ্ত)

ব্রহ্মচর্য্যসাধন

[শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস, বি, এ, ই, এ, সি]

উদ্বাহ-সংস্কার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বাধীনতা প্রত্যেক নরনারীর জন্মগত ন্যায্য অধিকার; উহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। বিবাহ দ্বারা যে নারীর স্বচ্ছন্দতা ও স্বাধীনতা অপহরণ করা হইয়াছে, তাহাকে শৃঙ্খলিত করা হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। বিবাহ যে একটা বন্ধন, স্বর্ণময় হইলেও উহা যে শৃঙ্খল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য পুরাকালে বিবাহ বন্ধনের নিগড়ত্ব ঘুচাইবার জন্য কতকগুলি সুব্যবস্থা ছিল; কিন্তু কালের কুটিল গতিতে তাহার প্রায় কিছুই নাই। পক্ষান্তরে নিগড়ের কঠোরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহার ফলে জননীশক্তির অপচয়, অপব্যবহার এবং ধ্বংস সাধিত হইতেছে।

যে আকর্ষণবশে জীব স্ত্রীপুরুষ তাবে জড়িত হয়, উহা সিসৃক্ষা বা প্রজননেচ্ছা। বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রজনন; উহার অন্তরালে কাম বা কামনা। সেকালে কামকে ধর্ম্মার্থে নিয়োগ দ্বারা কামের কামগন্ধ বিদূরিত করা হইত। অশ্বমেধপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—"তুমি সেই কামকে বিবিধ প্রকার দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞদ্বারা তোমার ধর্ম্মে নিয়োগ কর, তাহা হইলে সে তোমারই হইবে।" (১৩শ অধ্যায়)। ধর্ম্মাচরণই প্রাচীন গার্হস্থ্য আশ্রমের উদ্দেশ্য। এ জন্য সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারী ধর্ম্মপত্নীসহ উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেন, এই সাহচর্য্যব্রতের একদিকে ছিল পাতিব্রত্য এবং অপরদিকে ছিল ভার্য্যাব্রত বা স্বদারনিষ্ঠা। উহা পরস্পরের ধর্ম্মবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায়, সেকালের আদর্শ গৃহী ও গৃহিণী উভয়েই ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার পর ধর্ম্মাচরণার্থ

বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতেন। তার পর যে প্রজনন বিবাহের উদ্দেশ্য এবং যাহা একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমেরই কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত ছিল, তাহারও উদ্দেশ্য ছিল পিতৃতর্পণ। মানব জন্মগ্রহণ করিয়াই দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণের নিকট ঋণবান্ হয়েন, এ জন্য সেই ঋণশোধ করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণমুক্ত হইবার বিধান ছিল; সুতরাং প্রজাকাম হইয়া ঋতুকালে মাত্র ভার্য্যাগমন করিবার বিধি ছিল। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গ হইত না, পক্ষান্তরে প্রজাসৃষ্টির সহায়তা করা হইত। যথাকালে ভার্য্যাগমনের বিধি থাকায় যথেচ্ছাচার সম্ভবপর হইত না। প্রাচীন গৃহীর ধর্ম্মবুদ্ধি ও সংযম যে কতদূর দৃঢ় ছিল, তাহা একমাত্র গর্ভাধান মন্ত্রটির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

গর্ভাধানকালে পতি পত্নীকে বলিতেছেন—

ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু
ত্বষ্টা রূপাণি পিংষতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতি-
র্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥
ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি
গর্ভং ধেহি সরস্বতি।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা
বা ধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥

"সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু তোমার গর্ভস্থানকে প্রসব সমর্থ করুন। দেবশিল্পী ত্বষ্টা তোমার রূপ প্রকাশ করুন; যাবন্মাত্র বীজে গর্ভ হয়, প্রজাপতি তোমার জননেন্দ্রিয়ে তাবন্মাত্র বীজ প্রক্ষেপ করুন; আদিত্যদেব পুত্রার্থে তোমার গর্ভ রক্ষা করুন। হে ভগবতী সিনীবালী, তুমি এই বধূতে গর্ভাধান কর; হে সরস্বতী, তুমি ইহাতে গর্ভাধান কর। যাহাদের অধিষ্ঠানে সমুৎপন্ন সন্তান সর্ব্বদা দেবগণ দ্বারা অভ্যুদিত, স্বতঃ বিনয়নম্র, সত্ত্বগুণবান্, নারী-বিভূষণ, স্বরূপসম্পদ্‌যুক্ত ও আনন্দময় হয়, সেই পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারযুগল তোমার গর্ভাধান করুন।"

অতঃপর আর একটি চিন্তনীয় বিষয় এই যে, পুরাকালে বিবাহবন্ধনের মধ্যেও নারীর স্বাচ্ছন্দ্য স্বীকৃত হইত; এজন্যও বন্ধনের কঠোরতা ছিল না। নরনারী স্বাধীনচিত্তে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলে, সেই বন্ধনের মধ্যে বাধ্যবাধকতার যাতনা বা ক্লেশ থাকে না। স্বয়ম্বরই ভারতীয় আর্য্যগণের আদিম বিবাহ প্রথা; ভারতবাসী কোন যুগে সেই আর্য্যাচার ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুদুষ্কর। তবে ইহা অনুমেয় যে জনসমাজের যে অবস্থায় নারীর সেই স্বাধীনতা অপহৃত হইয়াছিল, উহা এক তামসযুগ। তৎকালে নারীগণ শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা ছিলেন; ধর্ম্মের আদর্শ ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, গৃহস্থাশ্রম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল ও সমাজে ব্যভিচার দেখা দিয়াছিল। ধর্ম্মাচরণে নারীর যে উচ্চ অধিকার ছিল, জ্ঞানাভাবে তাহা লোপ পাওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। কিন্তু ধর্ম্মাচরণ বা ধর্ম্মসাধনে একদা যে নারীর উচ্চ অধিকার ছিল তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান সমাজেও আছে; এখনো নারী ধর্ম্মগুরুর আসন গ্রহণ সমর্থা। মহাভারতে নারীর যোগাধিকার স্বীকৃত হইলেও তাহার উল্লেখ যেরূপভাবে করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, তাহার অনেক পূর্ব্বেই শূদ্রের এক পর্য্যায়ে নারীর ধর্ম্মাধিকার স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল, কেননা, উক্ত হইয়াছে—

"অপি বর্ণাবকৃষ্টস্তু নারী বা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী।
তাবপ্যেতেন মার্গেণ গচ্ছেতাং পরমাং গতিম্।

শান্তিপর্ব্ব ২৩৯ অঃ।

"অপকৃষ্ট বর্ণ শূদ্রও যদি এই পথে পদার্পণ করে, এবং ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী নারী যদি যোগাভ্যাস নিরতা হন, তবে তাঁহারাও এই মার্গ অবলম্বন দ্বারা পরমাগতি প্রাপ্ত হইবেন।"

এই হীনতা সাধিত হইতে অনেক যুগযুগান্তর কাটিয়া গিয়াছিল। ধর্ম্মাচরণে যখন তাহার যোগ্যতা বা অধিকার লোপ পাইল, ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করাই যখন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইল, তখন নারীগণ কেবলমাত্র শূদ্রোচিত গৃহকর্ম্মেই নিযুক্তা থাকিতেন। ইহাই ভ্রষ্টাচারের তামসযুগ।

জনসমাজ ধর্ম্মের আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িলে লৌকিক আচার ব্যবহারাদি নানা প্রকার কলঙ্কদুষ্ট হইয়া পড়ে। উদর উপস্থের চিন্তাই ধর্ম্ম চিন্তার প্রতিদ্বন্দ্বী; সুতরাং ধর্ম্মের গ্লানি দেখিলেই মনে করা যায়, উদর উপস্থ চিন্তা প্রবল। উদর উপস্থের চিন্তা যতই প্রবল হইতে লাগিল, সামাজিক কার্য্যকলাপ আচার ব্যবহারগুলি ততই তমভাবাপন্ন হইতে আরম্ভ করিল; এইরূপে পুরাকালের সাত্তর্যব্রতের অধঃকরণ সাধিত হইয়াছে। যে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নরনারী একদা জীবনের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম কর্ত্তব্য সম্পাদন করতঃ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিত, তাহাই কালক্রমে উদর উপস্থ ভোগের হেতুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পুত্রকন্যার বিবাহ দ্বারা লোকে অর্থ, বিত্ত, যশ, পদমর্য্যাদাদি ক্রয় করিয়া থাকে; তন্মধ্যে কাহারও প্রকৃত কল্যাণ চিন্তা নাই, আছে একমাত্র ভোগসাধনোপায় চিন্তা।

মনে হয় সমাজস্থিতির কোন কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া বাল্যবিবাহের প্রচলন হইয়াছিল; কিন্তু এতদ্দ্বারা নারীর স্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন স্পৃহাকে যে নির্ম্মমরূপে নির্য্যাতিত করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ যে নারী এত অসহায়, এত পরমুখাপেক্ষী, পথে ঘাটে চলিতে ফিরিতে এত লাঞ্ছনা, তাহার মূলে তাহার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব; তাহার আত্মনির্ভরশক্তি জাগ্রত থাকিলে তাহাকে এত নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইত না। অন্ধকারে অথবা ছায়াতে তৃণগুল্ম লতাদি উৎপন্ন হইলেও উহাদের স্বাভাবিক পুষ্টিলাভের ব্যাঘাত জন্মে। অজ্ঞানান্ধকারে অথবা পরাশ্রয়ে নারীর আত্মবোধকে অঙ্কুরিত হইতে না দিয়া, অথবা অঙ্কুরিত হইলেও তাহাকে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতে না দিয়া পরাশ্রতাসাধন শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে একটা কৃত্রিমতা ও অস্বাভাবিকতা আছে অনৈসর্গিক উপায়ে পরাশ্রতার প্রতিমূর্ত্তি করিতে গিয়া যাঁহারা কেবল নারীর হৃদয়ের উৎকর্ষসাধনই চিন্তা করেন, তাঁহারা নারী প্রতিভার সম্যক্ মর্ম্মগ্রাহী নহেন। যাহার মধ্যে আত্মবোধের উন্মেষ নাই, সে তো একটা যন্ত্র বিশেষ। তাহার পক্ষে পরাশ্রতাসাধন অর্থহীন; সেই পরাশ্রতার কোন মূল্য নাই। অন্তরে প্রেরণার অভাব হইলে স্নেহ ভালবাসা আত্মীয়তা কিছুই স্থায়ী হইতে পারে না। এ জন্য আত্মবোধশক্তিকে স্বাভাবিকভাবে বিকসিত হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য, উহাকে জব্দ করিয়া রাখিবার প্রয়াস অস্বাভাবিক। নারীর স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য

হইতে যাঁহারা কেবল বিপ্লবই আশঙ্কা করেন, তাঁহারা একদেশদর্শী। নারীপ্রতিভার সর্ব্বতোমুখী বিকাশ হইলে, তদ্দ্বারা সমাজদেহে নবশক্তি নবজীবনের সঞ্চার হইবারই অধিক সম্ভাবনা। তবে যে একবিষয়ে সাবধানতা আবশ্যক তাহা এই যে, তাহার শিক্ষা, ধর্ম্মোদ্দেশ্যক হওয়া উচিত; ধর্ম্মবর্জ্জিত শিক্ষা প্রদান করিলে বিপরীত ফল হইবে।

যাহা অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক—তাহা টিকে না। প্রকৃতির প্রতিশোধ বলিয়া একটা প্রতিক্রিয়া আপনি হয়। রাজদ্বারে সময় সময় যে সকল অভিযোগ হইতেছে, তাহার মধ্যে দেখা যাইতেছে যে নিষ্পেষিত নারীশক্তিও এই সামাজিক কুপ্রথার বিদ্রোহাচরণ করিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। অনেকে তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেও সকলে তাহাদিগের অন্যায় প্রতিরোধ চেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। সমাজে ধীরে ধীরে নারীশিক্ষার দাবী স্বীকৃত হইতেছে; শিক্ষিত পিতামাতা কন্যার মতামতকে একবারে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইতেছেন না।

নারীর সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে সকল অনার্য্যোচিত অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস ও নীচভাব আছে, তাহার সংস্কার হওয়া উচিত এবং নারীশিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাহ সম্বন্ধের মধ্যে নারীর স্বাচ্ছন্দ্য স্বীকৃত হওয়া উচিত। নারী কামাধার, চঞ্চলমতি, তাহার স্বাধীনতা বিপজ্জনক; অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকিয়া সন্তান-সন্ততি প্রসব করা এবং পতিপুত্রের পরিচর্য্যা করাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা অতি অনার্য্যোচিত কথা। সত্য বটে, অনেক সময় কামুকের সতৃষ্ণ দৃষ্টিকে তিরস্কার করিতে গিয়া সাধু মহাপুরুষগণ অলক্ষিতে নারীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা নারীর অধঃকরণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু পুরুষের পুরুষার্থকে জাগ্রত করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। নারী কোনমতেই অবজ্ঞার পাত্র হইতে পারে না। নারীর হৃদয় উদার, নারীর ত্যাগ অতুলনীয়; নারী পরার্থে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। যাহা সুন্দর, যাহা শোভন, তাহাতে নারী দেবতার আবির্ভাব দেখে এবং তাহাকে সরল অন্তঃকরণে ভালবাসে ও পূজা করে। সাধুর প্রতি নারীর শ্রদ্ধা অচল এবং দেবতার প্রতি তাহার ভক্তি প্রগাঢ়।

নরনারী প্রথম যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, উহা কামজ; উহার কামভাব বিদূরিত করিতে অনেক ত্যাগ, অনেক সংযম, অনেক সদাচার অভ্যাস প্রয়োজন এবং উহা কেবল ধর্ম্মের অনুশাসনেই সহজসিদ্ধ হয়। এজন্য ধর্ম্মোদ্দেশ্যে উদ্বাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া উচিত। যাঁহারা প্রেমকে বিবাহের ভিত্তি বলেন, তাঁহারা যদি প্রেমের স্বরূপ চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে দেহাত্মবোধ নিয়া প্রকৃত প্রেমসাধন হইতে পারে না; দেহাত্মবোধ থাকিতে কেহ প্রকৃত প্রেম আস্বাদন করিতে পারে না। দেহাসক্তি ও কাম, প্রেমের প্রধান অন্তরায়; কাম থাকিতে প্রেম নাই; প্রেমোদয় হইলেও কাম নাই, অভিলাষ নাই, বন্ধন নাই, বিশেষ বলিয়া কোন আত্মীয় নাই। ধর্ম্মসাধনও এতদ্ভিন্ন অপর কিছু নয়।

প্রাচীন গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

পূর্ব্বমের ভগবতা ব্রহ্মণা লোকহিতমনুতিষ্ঠতা।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থমাশ্রমাশ্চত্বারোঽভিনির্দ্দিষ্টাঃ॥

—শান্তিপর্ব্ব, ১৯১ অঃ

অর্থাৎ লোকসকলের হিতানুষ্ঠানকারী ভগবান ব্রহ্মা পূর্ব্বে ধর্ম্মসংরক্ষণার্থ চারিটী আশ্রমের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

অন্যত্র বলা হইয়াছে,

* * *

গৃহস্থানব্যপাশ্রিত্য নাশ্রমোঽন্যঃ প্রবর্ত্ততে॥
যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গার্হস্থ্যমাশ্রিত্য বর্ত্তন্ত ইতরাশ্রমাঃ॥

—শান্তিপর্ব্ব, ২৬৮ অঃ

অর্থাৎ কেহই গৃহস্থের আশ্রম ব্যতীত কোন ধর্ম্মপালনে সমর্থ হয়েন না। জীব-সমুদয় যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তদ্রূপ অন্যান্য আশ্রমনিবাসী ব্যক্তিরা একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রমে জীবন ধারণ করে।

এইরূপ আরও বহুস্থলে গার্হস্থ্যাশ্রম সম্বন্ধে গৌরবসূচক বহুবিধ উক্তি আছে। এই সকল প্রশংসোক্তির কারণ কি? আশ্রম ধর্ম্মাচরণ ক্ষেত্র—যে ক্ষেত্রে মানবত্ব বিকাশোপযোগী অনুশীলন করা হইয়া থাকে। মানবের কর্ম্মভূমি সংসার ক্ষেত্রে অহরহ যে সকল অশোভন দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হইতে স্বতঃই এই চিন্তার উদ্রেক হয়, ইহাতে মানবত্ব বিকাশোপযোগী এমন কি আচরণ আছে, যাহার জন্য ঋষিগণ ইহাকে 'আশ্রম' সংজ্ঞায় গৌরবান্বিত করিয়াছেন? সাংসারিক জীবনের কদর্য্যতা, জঘন্যতা, নৃশংসতা, স্বার্থপরতাদির বিষয় চিন্তা করিলে সন্দেহ জাগে, এই ক্ষেত্রে কেমন করিয়া মানবত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে? যুগে যুগে সর্ব্বদেশেই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী সাংসারিক জীবনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক উদাসীন জীবন যাপন করাকেই শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছেন। পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া গাত্রলগ্ন পঙ্ক প্রক্ষালন অপেক্ষা পঙ্কস্পর্শ না করাই ভাল, ইহাই যেন বিজ্ঞগণের অভিমত।

আমাদের মনে হয়, শাস্ত্রকারগণ যে গার্হস্থ্যাশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা কৃত-বিদ্য স্নাতকের আশ্রম—অজ্ঞানীর সংসার নহে। প্রকৃত গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস—কোন আশ্রমই অজ্ঞানীর আচরণ দ্বারা বিচার্য্য হইতে পারে না। অজ্ঞগণ বিজ্ঞের অনুকরণে অনেক কার্য্যই করিয়া থাকে এবং তাহার ফল তাহাদের জ্ঞানানুযায়ীই হইয়া থাকে; তদ্দৃষ্টে কোন আশ্রম প্রতিষ্ঠানের দোষ গুণ বিচার করিলে, উহার সম্যক্ বিচার করা হইতে পারে না। গৃহস্থাশ্রম কাহার জন্য বিহিত, তদুত্তরে বলা হইয়াছে—

"সমাবৃত্তানাং সদাচারাণাং সহধর্ম্মার্য্য-
ফলার্থিনাং গৃহস্থাশ্রমো বিধীয়তে।"

—শান্তিপর্ব্ব, ১৯১ অঃ

ব্রহ্মচর্য্য পালনান্তর গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তবে গৃহস্থাশ্রমে অধিকার জন্মে। সুতরাং যে যে স্থলে গার্হস্থ্যের প্রশংসাসূচক বাক্য আছে সেই সেই স্থলে বুঝিতে হইবে, সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারীর গার্হস্থ্য, অপরের গার্হস্থ্য নহে। গার্হস্থ্যের আদর্শ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে এবংবিধ গৃহীর আচরণ অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য।

প্রাচীনেরা মনে করিতেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ সাধনক্ষেত্র গৃহ। এই জন্য যৌবনে গুরুকুলবাস সমাপ্ত হইলে যাঁহারা সেই চতুর্ব্বর্গ ফল কামনা করিতেন, তাঁহারাই দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গার্হস্থ্য অবলম্বন

করিতেন। ধর্ম্মে, অর্থে, ভোগে কদাচ যথা-পরিণীতা যজ্ঞসম্বন্ধবতী ভার্য্যার সহিত বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইতেন না। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্মই গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। গৃহস্থ ব্যক্তি দিবাভাগে, পূর্ব্বরাত্রে এবং অপর রাত্রে কদাচ নিদ্রা যাইতেন না; দিবা ও বিভাবরীতে ভোজনের জন্য যে সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার মধ্যভাগে আর ভোজন করিতেন না। অহিংসা, সত্যকথন, ক্রোধরাহিত্য, শৌচ, সন্তোষ, তিতিক্ষাদি সর্ব্বাশ্রমসাধারণ ধর্ম্ম গৃহস্থেরও অবশ্য পালনীয় ছিল।

অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত গার্হস্থ্য আশ্রমের কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই জন্য ন্যায়োপার্জ্জিত ধন ধর্ম্মার্থে নিয়োগ করাই শাস্ত্রীয় বিধি ছিল। অধর্ম্ম দ্বারা ধন সংগ্রহ করা এবং ভোগের নিমিত্ত ধনোপার্জ্জন করা উভয়ই নিষিদ্ধ ছিল। পরদিনের জন্য সঞ্চয় করিবার ব্যবস্থাও ছিল না; কপোতী অর্থাৎ উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকা আহরণের ব্যবস্থা ছিল। সেকালের গৃহীর উপার্জ্জিত অর্থ ব্রাহ্মণ, অতিথি, অনুগত ও আশ্রিত ব্যক্তিগণের ভরণ পোষণার্থ ব্যয়িত হইত। পুরাকালে ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক প্রভৃতির স্বয়ং পাক করিয়া অন্নগ্রহণ করিবার বিধি ছিল না, এ জন্য তাঁহারা গৃহীর উপর নির্ভর করিতেন। বান-প্রস্থিগণের নিমিত্তও ফলমূলাদি সম্পাদন গৃহস্থ আশ্রমেই নির্ব্বাহ হইত। যতি, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি নিরগ্নি ব্যক্তিগণকে ভক্ষ্যাদি দ্রব্য প্রদান গৃহস্থের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাহার আপনার নিমিত্ত অন্নপাক করাইবার এবং বৃথা পশু হত্যা করিবার বিধি ছিল না; গৃহপতি, পিতৃদেব ও অতিথিগণের ভোজনাবসানে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নগ্রহণ করিতেন। বিশ্বের সংবর্দ্ধনাই গার্হস্থ্যাশ্রমের লক্ষ্য; এ জন্য গৃহস্থব্যক্তি বিবিধ দ্রব্যময় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন।

"বহুস্যাং প্রজায়েয়" এই আনন্দের আকাঙ্ক্ষা সকল প্রাণীতেই আছে; প্রাণিমাত্রই অপত্যোৎপাদন দ্বারা সুখী হয়। অপত্যোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতি প্রীত হয়েন; গার্হস্থ্যাশ্রম ব্যতীত অপরাপর আশ্রমে কোন-প্রকারে সন্তানোৎপাদন সম্ভবপর নয়, এ জন্য প্রজাপতিব্রত পালনপূর্ব্বক গৃহস্থের অপত্যোৎপাদন করিবার বিধি ছিল। ভোগের নিমিত্ত দার পরিগ্রহ অথবা ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার জন্য নারীগমন পাতক বলিয়া গণ্য হইত। স্বভাবের নিয়মে পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণ যেমন কেবল ঋতুকালেই স্ত্রীগমন করিয়া থাকে, তাহার অন্যথা করে না; সেইরূপ প্রাচীনকালের গৃহস্থ ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে পত্নীকে আহ্বান করিতেন না। এইরূপ প্রজাপতিব্রত-পরায়ণ স্বদারনিষ্ঠ গৃহস্থগণ ব্রহ্মচারী বলিয়াই কথিত হইতেন। তাঁহাদের পক্ষে বীর্য্যস্খলন মলমূত্রাদি ত্যাগের ন্যায় একটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

মহাভারতে প্রাচীন গৃহস্থাশ্রমের যে চিত্র দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় তথায় আচার্য্য, ঋত্বিক, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন পূজিত; আর্ত্ত ও অতিথি সৎকৃত; কুলকামিনীগণ সম্মানিত ও জ্ঞাতিবর্গ সমাদৃত। পুরাকালের যে একটি ভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় তাহা এই যে, প্রাচীনেরা মনে করিতেন যে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াই দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের নিকট ঋণবান্ হয় এবং সেই ঋণ পরিশোধ করাই তাহার সমস্ত গার্হস্থ্য-

জীবনের কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ স্থূলদেহের জন্য পিতৃগণের নিকট যে ঋণ, যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ না করিয়া অপত্যোৎপাদন দ্বারা সেই ঋণমুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়তঃ যে ঋষিগণ আধ্যাত্মিকতার মূলীভূত কারণ, তাঁহাদের তর্পণার্থ স্বাধ্যায়নিরত থাকা এবং ঋত্বিকগণকে দক্ষিণাপ্রদান করা কর্ত্তব্য; তৃতীয়তঃ যে দেবগণ মেঘ, বৃষ্টি, আলোক উত্তাপাদি দ্বারা বসুন্ধরাকে ফলশস্যশালিনী করিতেছেন, তাঁহাদের তর্পণার্থ বিবিধদ্রব্যময় যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা ও ত্যাগই যজ্ঞের প্রাণ। প্রাচীন গৃহিগণ যে বিবিধ যজ্ঞে শ্রদ্ধার সহিত আহুতিপ্রদান বা ত্যাগকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। ভাগবতকার যাহাকে পরাত্মতা সাধন বলিয়াছেন, প্রাচীন গৃহীর লক্ষ্য তাহাই ছিল। ত্যাগই আত্মজ্ঞান লাভের উপায়; সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে। এই জন্যই বোধ করি ব্রহ্মজ্ঞানে গৃহস্থের অধিকার সমর্থিত হইয়াছে।

পুরাকালের আর একটি বিশেষত্ব এই লক্ষিত হয় যে, তৎকালে জনকের ন্যায় জ্ঞানিগণও এ কথা বলিতেন না যে "আমি যখন আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি তখন আমি দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ অথবা ভূতগণ কাহারও নিকট ঋণী নহি, কাহারও কিঙ্কর নহি।" প্রাচীন কালের জ্ঞানিগণও লোকশিক্ষার জন্য মমত্ববুদ্ধিবিহীন হইয়া বিশ্বহিত সাধনে রত থাকিতেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, এহেন গৃহীর কর্ম্মভূমিকে আশ্রম বলিতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে কি না। সাধারণভাবে যাঁহারা উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত ও সংগ্রামের পথকেই মানবত্ব বিকাশের পথ বলিয়া মানেন, তাঁহারা কখনও গার্হস্থ্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। মহাভারতকারও একস্থলে বলিয়াছেন—

তপোবনেষু যে জাতাস্তত্রৈব নিধনং গতাঃ।
তেষামল্পতরো ধর্ম্মঃ কামভোগমজানতাম্॥
যস্তু ভোগান্ পরিত্যজ্য শরীরেণ তপশ্চরেৎ।
ন তেন কিঞ্চিন্ন প্রাপ্তং তন্মে বহুমতং ফলম্॥

শান্তিপর্ব্ব ৩২১ অঃ

—অর্থাৎ যাঁহারা তপোবনে জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক ভোগের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া তথায় [illegible]পরত হয়, তাহাদিগের অল্পমাত্র ধর্ম্ম[illegible] হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা গৃহাশ্রমে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভোগের আস্বাদগ্রহণ পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ ও তপোনুষ্ঠান করিতে পারে, তাহাদের নিশ্চয়ই সমধিক ধর্ম্ম লাভ হয়, এবং কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না।*

(কালী প্রসন্ন সিংহ)

কপিল গার্হস্থ্যের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করিলে স্যূমরশ্মি বলিয়াছিলেন—"শ্রদ্ধাহীন, প্রজ্ঞাবিহীন, সূক্ষ্মদর্শন বিবর্জ্জিত প্রতিষ্ঠাশূন্য, অলস, শ্রান্ত এবং নিজকর্ম্মদ্বারা সন্তাপসমন্বিত কাণত্বাদি দোষজন্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিপালনে অসমর্থ অপণ্ডিতগণই প্রব্রজ্যাধর্ম্মে শমগুণের

---

* এই বাক্যকে ভোগাস্বাদনের সমর্থকরূপে গ্রহণ করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে। অধিকারিভেদ সর্ব্বত্র। যাঁহারা ভোগাস্বাদন করেন নাই, তাঁহাদের কৃতকৃ[illegible] [illegible] করিলে জ্ঞানমূর্ত্তি শুকদেবের সম্বন্ধে [illegible] হইবে? এ বিষয়ের নিরপেক্ষ মীমাংসার জন্য ম[illegible]তন্ত্র জনক ও শুকের সংবাদ দ্রষ্টব্য।

—আঃ দঃ সঃ

আভিশয্য প্রদর্শন করিয়া থাকে।" (শান্তিপর্ব্ব ২৬৮ অঃ)*

জ্ঞানমার্গী কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানলাভের অসম্ভাবনা প্রদর্শন করিলেও ত্যাগ দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির সম্ভাবনা অস্বীকার করেন না। উদারচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, শমদমনিয়মাদি সম্পন্ন প্রাজ্ঞ গৃহস্থ ব্যক্তি ত্যাগী সন্ন্যাসিতুল্য ; এজন্য পুরাকালে তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার ছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

ত্যাগের শেষই চরম জ্ঞানসিদ্ধি, ইহাই প্রাচীনগণের অভিমত। এজন্য সর্ব্বাশ্রমেই এই ত্যাগাভ্যাস করা হইত। গুরুকুল হইতে সমাবৃত্ত হইয়া সকলেই যে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, এমত নহে ; কেহ কেহ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াই জ্ঞানের যে পরিপক্কতা লাভ করিতেন, তাহাতে অপর আশ্রমের প্রয়োজন বোধ করিতেন না ; একেবারেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন। যাঁহারা গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিতেন, তাঁহারা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্য দিয়া ত্যাগাভ্যাস করিতেন এবং তদ্দ্বারা তৃতীয় অথবা চতুর্থাশ্রমের (সন্ন্যাসের) যোগ্যতা লাভ করিতেন। গৃহস্থের ত্যাগে সমধিক বিচার ও পুরুষার্থের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় ; ভোগের সামগ্রী করায়ত্ত থাকিতেও ভোগকে নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া চলা সামান্য ত্যাগ নহে। এজন্য ত্যাগী গৃহী প্রশংসার্হ। প্রাচীন গৃহী ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা থাকিয়া বিহিত ভোগ দ্বারা সুখ কামনা করিতেন ; আর বর্ত্তমানে গৃহী ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষাভ্রষ্ট হইয়া যথেচ্ছ ভোগসুখ কামনা করিয়া থাকে। ধর্ম্ম যে ধ্রুবই কোন নিত্য সত্য পদার্থ—সে বিষয়ে কেহই কৃতনিশ্চয় নহে ; এজন্য ভোগের মাত্রা অনির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। গার্হস্থ্যের জন্য যে কোন ত্যাগমূলক প্রস্তুতি আবশ্যক অথবা গৃহিজীবনে যে শম দম নিয়মাধীনতার আবশ্যকতা আছে, তাহা কার্য্যতঃ কেহই মানিতে প্রস্তুত নহে। (সমাপ্ত)

* পাত্রভেদে এ কথা সত্য স্বীকার করি। অসমর্থ অপণ্ডিতেরা প্রব্রজ্যায় অনুরাগ দেখায়—স্বার্থের প্ররোচনায়। কিন্তু সমর্থ পণ্ডিতেরাও কেন প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাও দেখিতে হইবে। আঃ দঃ সঃ



শ্রীগুরু ও সেবা

যে বিষয়ে যত উৎকর্ষ হয়ে থাকে, সে বিষয়ে তত বৈচিত্র্যও দেখা দেয়। আমাদের দেশে ধর্ম্মানুশীলনের যে উৎকর্ষ হয়েছিল, তার প্রমাণ ধর্ম্মমতের বৈচিত্র্য। ভগবানকে পাবার জন্য অনেকে অনেক রকমেই চেষ্টা করেছেন এবং তার ফলে অনেক নূতন নূতন পথও অধিকারভেদে আবিষ্কার হয়েছে। এই সমস্ত পথের মাঝে যেমন অনৈক্য আছে, তেমনি আবার এক দিকে ঐক্যও আছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্মসমূহের প্রকৃতি যিনি লক্ষ্য করেছেন, তিনি জানেন, এখানে ঐক্যের মূল কেন্দ্র হচ্ছেন গুরু। বহু সম্প্রদায়ে পরম্পর-

বিরোধী বহু মত প্রচারিত হয়েছে বটে, কিন্তু গুরুকরণ সম্বন্ধে সর্ব্বত্রই এক মত—সব সম্প্রদায়ই গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে থাকেন। এক দিক দিয়ে আমরা বলে থাকি হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, অর্থাৎ এ ধর্ম্ম মানুষের স্বভাবের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এর প্রতিষ্ঠাতা বলে কাউকে দাঁড় করানো যায় না। এক প্রমাণ দাঁড় করানো যায় বেদকে; কিন্তু তাও হিন্দুর চোখে অপৌরুষেয় সনাতন সত্যের প্রকাশ, তারও কেউ কর্ত্তা নাই—দ্রষ্টা আছে মাত্র। ধর্ম্ম যে ফরমাইস মতো বানানো যায় না, অনুকূল পারিপার্শ্বিকের সন্তাপে মানুষের হৃদয় হতে তা স্বভাবের প্রেরণায় ফুটে ওঠে—ওই সমস্ত সিদ্ধান্ত এই সাধনলব্ধ অভিজ্ঞতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এহেন সনাতন ধর্ম্মেও যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের স্থান নাই, পদে পদে গুরুর অনুশাসনের বন্ধন রয়েছে, এটা একটা আশ্চর্য্য রহস্য বটে। যারা বিশ্বাসী, তারা এ কথাটা সহজেই মেনে নেয়, সুতরাং গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা পূর্ব্বসংস্কার অনুযায়ীই নিঃসন্দিগ্ধ ভাব পোষণ করে থাকে। কিন্তু কালের বশে আজকাল সংশয়েরও উদয় হয়েছে, সেই জন্যই এই সমস্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তি অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সনাতন ধর্ম্মীরা বলে থাকেন, মনুষ্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম উপধর্ম্ম; তা সনাতন ধর্ম্মেরই বিকৃতি বা প্রকারভেদ (অবশ্য 'বিকৃতি' কথাটা এখানে মীমাংসকদের পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করছি)। সুতরাং এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে অন্যান্য ধর্ম্মের বরং গোড়াতেই অধিকারসঙ্কোচের একটা প্রসঙ্গ রয়েছে—সনাতন ধর্ম্মে তা নাই। জগতের চারটী বড় ধর্ম্মের মাঝে বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্ট এই তিনটী ধর্ম্মই মহাপুরুষপ্রবর্ত্তিত। সুতরাং একেবারে সাক্ষাৎভাবে গুরুবাদ মেনে গোড়া থেকেই পত্তন করছে বলতে গেলে এই তিনটী ধর্ম্মের একটীকেও বাদ দেওয়া চলে না; বরং এদের তুলনায় সনাতন ধর্ম্মে (এবং তদাশ্রিত বৌদ্ধধর্ম্মেও কতকপরিমাণে) গোড়ার দিকে মস্ত বড় একটা স্বাতন্ত্র্যের সুযোগ রয়েছে। অথচ এ হেন স্বতন্ত্র ধর্ম্মও যখন আবার গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং পদে পদে গুরুর দোহাই দেয়, তখন বুঝতে হয়, সনাতনধর্ম্মীর কাছে ধর্ম্ম শুধু আত্মা, জগৎ বা পরকাল সম্বন্ধে কতকগুলি থিওরী নয়; তার অনুশীলন চলে, সাধন দ্বারা সত্য মিথ্যার যাচাই চলে এবং সেই জন্যই একজন করিতকর্ম্মা ওস্তাদেরও প্রয়োজন হয়। অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে সনাতন ধর্ম্মের প্রভেদ এই যে তারা গোড়াতেই একজন গুরু স্বীকার করে বসে আছে (অবশ্য বিচার করলে এ কথাটাও আংশিক সত্য বলে প্রমাণিত হবে, উপধর্ম্মগুলিতেও যে হাতেকলমে গুরু স্বীকার করা হয়েছে, তার প্রমাণ পেতেও বেশী দেরী হয় না), কিন্তু সনাতন ধর্ম্ম অধিকারের বৈচিত্র্য স্বীকার করে নূতন নূতন পথে পরিচালনা করবার জন্য পদে পদে জীবন্ত গুরু স্বীকার করছে। কাকে হুঁসিয়ার বলব?

এ কথাগুলো বলবার উদ্দেশ্য এই যে, গুরু স্বীকার করাটা শুধু হিন্দুরই একচেটিয়া নয়, সুতরাং তার জন্য জগতের যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর কাছে তার লজ্জিত হবার কোনও কারণ নাই। আজকাল নূতন শিক্ষার আলোকে এ বিষয়ে লজ্জাও দেখা দিয়েছে

কিনা। স্ত্রীস্বাধীনতা বিস্তারের প্রচণ্ড উৎসাহে কেউ কেউ নারীর সতীত্ব ধর্ম্মটাকে উড়িয়ে দিতে চান, বলেন ওটা পরাধীনতার শৃঙ্খল; বোধ হয় সতীমায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা অপৌরুষ বলেই মনে করেন; কিন্তু এ কথা ভাবেন না যে, সতীত্ব নিয়ে যাঁরা এত কসাকসি করেছেন, তাঁরা নিখিল নারীপ্রকৃতির মর্ম্ম সত্যকে আশ্রয় করেই কথা বলেছেন— নিজেদের সুবিধার খাতিরে নয়। তেমনি ধর্ম্মজগতে স্বাধীনতা আনবার জন্য গুরুর অধীনতার পাঠ যাঁরা তুলে দিতে চান, তাঁরা সাধকস্বভাবের কোনও খবরই রাখেন না, এমন কি ধর্ম্ম যে অলৌকিক, বিশ্বাস যে তার প্রমাণ এবং সেই বিশ্বাসের যে একটা আশ্রয় প্রয়োজন—সাধনজীবনের এই তিনটী সত্যকে এক করলে কি দাঁড়ায়, তার অনুসন্ধান করবার সময়ও তাঁদের হয়নি। এঁদের জন্য বলা যে গুরু স্বীকার করে যদি নরকে যেতে হয়, তাহলে শুধু সনাতন ধর্ম্মীই যাবে না, বরং সে আশঙ্কাটা অন্যান্য ধর্ম্মীদেরই বেশী, কেননা তারা গোড়াতেই ওই গলদটা রেখেছে।

এ সম্বন্ধে যুক্তির কথা তুললে, অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু এখন সে আলোচনা থাক্। ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা সহজ সাধনার কথাই কিছু বলব। গুরুর সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে বলেই সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলাম। এই সহজ সাধনা হচ্ছে গুরু সেবা। কেমন সহজ, সেই কথাই বলছি। যারা গুরুবাদে বিশ্বাসী, অথচ সেবা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পায়নি, তাদের জন্যই এই অবতারণা। সুতরাং এর মাঝে সরল অভিজ্ঞতার কথাই থাকবে, তর্কের কথা নয়।

প্রথমতঃই বলি, সাধন সম্বন্ধে কিম্ভূত কিমাকার ধারণা আমাদের সমাজে অল্প বিস্তর আছে। যোগ, তন্ত্র ইত্যাদিতে অনেক রকম অদ্ভুত সাধনার কথা হয়ত পড়েছি কিম্বা শুনেছি, সুতরাং ভগবানকে পাবার জন্য সহজ পথটা ছেড়ে বালকের মত ওই অদ্ভুত পথগুলোর ওপরেই আমাদের ঝোঁক হয় বেশী। তাই সত্যলাভের জন্য যখন মহাপুরুষ গুরু আশ্রয় করি, তখন অনেকের মনেই এই আশা থাকে, গুরু এমন একটা উপায় বাৎলে দেবেন, যাতে আপাততঃ ভগবান লাভ না হোক্, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এমন কিছু অদ্ভুত কসরৎ দেখানো যাবে, যাতে লোকের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু গুরু হয়ত তেমন কিছু বললেন না, হয়ত বললেন, সৎভাবে থেকো, এইটী জপ করো ইত্যাদি। কিম্বা কেউ একেবারে আশ্রয় নিতে চায়, তাকে বললেন, আচ্ছা, তুমি আমার কাজ কর। সে কাজের মাঝে উৎকট বা কিম্ভূতকিমাকার সাধন কিছুই থাক্‌ল না—সাধারণ গৃহস্থালীর কাজ যা, গুরুর সেবাও তাই। এত সহজ পথ দেখে, সাধারণতঃ দু'রকম ভাব উপস্থিত হয়। কেউ ভাবে, দূর ছাই, এ সব করলে ভগবানকে পাওয়া যাবে কেন? বাড়ী ঘরে থাকতেও তো এইগুলো করে এসেছি। এই ভাব থেকে তার মনে অবিশ্বাস আসে; তার দরুণ সে সেবার পথ ছেড়ে দেয়। আবার কেউ কেউ গুরু যা বলছেন, তাই মেনে নিয়ে সেবাতে লেগে যায়। কিন্তু কিছু দিন পরে কর্ম্মের গুণে তাকে চেপে ধরে, সেবাকে আর সাধারণ কাজকে সে এক কাঁটায় তুলে ওজন করে। তাই গুরুর কাজকে আর সে সাধন হিসাবে গ্রহণ করে না; তার মাঝেও আরাম-বিরামের ফাঁক খোঁজে, নিজের বুদ্ধির কেরামতী ঢোকায়। অথচ ভাবে, এটা আমার

আত্মসমর্পণ; তাঁর কাজ করছি, কাজেই হাল ছেড়ে দিয়েছি, যা হবার, তা হবে আমার কি? কথাটা খাঁটী বটে, কিন্তু ওর আড়ালে অনেক সময় স্বার্থবুদ্ধি লুকানো থাকে। হয়ত কর্ম্মে ভয় আছে বা মতলবী আছে—কিন্তু সেটাকে চাপিয়ে রেখে লেফাফা-দুরস্ত কাজ করে যাচ্ছে। এরাও সেবাত্যাগী, সুতরাং ধর্ম্মে পতিত।

কিন্তু আমরা বলি, গুরুকে যে ঠিক গুরু বলেই বুঝেছে - তিনি দয়া করে আমাকে যা বলে দিচ্ছেন, আমার পক্ষে তাই সত্যলাভের পর্য্যাপ্ত সাধন—এ ধারণা যার আছে, তার কাছে সেবাধর্ম্মের মর্য্যাদা কখনও খাটো হতে পারে না। ভগবত্তত্ত্বও যেমন আশ্চর্য্য, তাঁকে লাভ করবার উপায় স্বরূপ এই যে গুরুসেবার বিধান রয়েছে, এও তেমনি আশ্চর্য্য। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, সেবার সাধন এত সহজ যে, তা বুঝবার জন্য বুদ্ধি খাটাতে হয় না, করবার জন্য প্রচুর সামর্থ্যের প্রয়োজন হয় না—শুধু সহজ আনন্দের স্রোতে সহজ কর্ম্মে নিজের দেহমনপ্রাণ সঁপে দিলেই হল। গুরু-গৃহের এই সরল কর্ম্মসাধনায় চরম তত্ত্ব লাভ হবে—এ অধ্যাত্মজগতের এক পরমাশ্চর্য্য নিয়তি। উপনিষদের ঋষিযুগে এর অনেক প্রমাণ পাই। কেউ গুরুর গরু চারিয়েছেন, কেউ তাঁর ক্ষেতের আল বেঁধেছেন—আর এই সমস্ত সহজ কর্ম্মের ফলে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন। এর মাঝে সাধনের জটিলতা কোথায়, বার্থতার বিভীষিকাই বা কোথায়? আমরা ভাবি, গরু চরানো, চাষ করা, ভিক্ষা মাগা—এ ও আবার একটা কাজ? আর এই কাজ করে ভগবান মিলবে? তা নিজের কাজে না মিলতে পারে, কিন্তু গুরুর ঘরে এই কাজ করেই যে মিলে, তার প্রমাণ শুধু প্রাচীনযুগে কেন, যার চোখ আছে সে এ যুগেই দেখতে পায়।

যদি বল এ কি করে সম্ভবপর হয়, বলব —তা জানিনা। তবে যে হয়, একথা জোর গলাতেই বলতে পারি—কেননা হতে যে দেখেছি। এর রহস্যটা হয়ত কাজের মাঝে নয়—যে কাজ করে তার মাঝে কিছু, আর যে কাজ করায় তার মাঝে পুরোপুরি। এত সহজ সাধন দিয়ে অসাধনের ধন যিনি মিলিয়ে দিতে পারেন, তাঁকেই না বলি গুরু। এর মাঝে রহস্য যদি কিছু থাকে, সে হচ্ছে তাঁরই অনির্ব্বচনীয় মহিমা। ভগবানকে পাওয়া যে এত সহজ, সে কথা তুমি আমি বুঝিনা, কেননা আমরা তো পাইনি। গুরু বলেন, তাঁকে পাওয়া সহজই বটে—কেননা তিনি যে পেয়েছেন। তাই সহজ পথটা তিনিই দেখিয়ে দিতে পারেন।

সরল বিশ্বাসে গুরুর কথা গ্রহণ করতে হবে। আমি চেয়েছিলাম, সত্য বস্তু। এই চাওয়াটুকু আমার গরজ। তারপর তাঁকে এসে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, পাওয়ার পথ কি? তিনি প্রাচীন যুগের ঋষির মতই এক পাল ধেনু দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এইগুলো নিয়ে যাও—হাজারটা না হওয়া পর্য্যন্ত ফিরে এসো না—সত্যলাভ করবার এই পথ। আমি যদি ঠিক শিষ্য হই—তাহলে ওই কথাই আমার বেদ। আমার তো আর দ্বিরুক্তি করা চলে না। ভগবানকে কেমন করে পেতে হয় জানি না বলেই তো গুরুর শরণ নেওয়া। শরণ যখন নিয়েছি, তখন আর আমি কিছু জানি না, তিনিই সব জানেন। আর আমি যদি কিছু জানতামই, তবে আর

তাঁর কাছেই বা আসব কেন? উপায় জানি না বলেই যে উপায় জানে তার কাছে আসি, তার কথায় প্রাণ ঢেলে বিশ্বাস করি। ভগবান সম্বন্ধে আমার বুদ্ধির দৌড় যতটুকু, তাতে গুরু যদি ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে প্রাণায়াম করতে বলতেন, তাও আমার কাছে যা, আর এই যে গরু চরানোর ভারটা আমার কাঁধে দিলেন, তাও তো আমার কাছে তাই। আজব তপস্যাতে যে ভগবান মিলে, সেও কি আমার জানা কথা, না শোনা কথা? আর এই যে সমিধসংগ্রহে, ভিক্ষাটনে, গোচারণে ভগবান মিলবে, এও তো আমার শোনা কথাই। তবে দু'য়ে ভেদ হয় কেন? আজব সাধনার দিকেই বা রুচি হয় কেন, আর এই গুরুর সহজ সেবাতেই বা রুচি হয় না কেন? আগেই যে বলেছি, যে যত বোকা, আজব চিজের দিকে তার তত ঝোঁক। সহজ সেবাতে যদি আমার রুচি না হয়, আর আজব সাধনার দিকেই টান থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, এখনও চিত্ত সরল হয়নি, 'ভগবান সম্বন্ধে আমি কিছু জানি'—এ অভিমান দূর হয়নি। তবে আর ওস্তাদের কাছে যাওয়া কেন? নিজের বুদ্ধির অনুপাতে প্রিন্সিপল্ খাটিয়ে গেলেই হয়। বলা বাহুল্য, আজকাল অমন বুদ্ধিমানের অভাব নাই; অবশ্য তাতে যদ্রূপ ভাব, তদ্রূপ লাভ।

ভাল ওস্তাদের কাছে গান শিখতে গেলে, তারা নাকি বলে, "আগে যা শিখেছিলে তা ভুলে যাও, তবে না আমার শিক্ষা তোমার মাঝে খুলবে; নইলে কিছু তোমার কেরদানী, আর কিছু আমার কালোয়াতী, এ দু'য়ে তো বাবা কখনও সন্ধি হবে না।" কথাটা তারা ঠিকই বলে। গুরু দিতে চান, একেবারে আনকোরা নূতন জিনিষ। পাত্রের মাঝে পুরোণো পচামালের গন্ধটুকু থাকতেই বা তিনি কি করে তা ঢালবেন? অমন ভাল জিনিষটা পচা জিনিষের ছোঁয়াচে নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে তাঁর একটু মমতাও কি হবে না? জীবন-পটের উপর তুমি যে ছবি এঁকেছ, তিনি তা মুছে ফেলে নূতন শিল্পকলা ফোটাবেন। তাহলে পুরোণো জমীনটা তো শাদা রঙের প্রলেপে বেমালুম বে দাগ করে ফেলতে হবে।

তাই ঠিক এমনি বোকা হলে, তবে শিষ্য হওয়া যায়, আর তাতেই গুরুর শক্তি খেলে, নইলে তোমার অহং আর তাঁর কৃপা, দু'য়ে কেবল টানটানিই সার। তাঁর কাছে উপায় যখন জানতে যাব, তখন বোকা ছেলের মতই যাব। পাওয়ার পথ আমি কিছুই জানি না—তিনি যা বলেন। নাক টিপতে বলেন, তাও আচ্ছা, কোদাল ধরতে বলেন, তাও আচ্ছা। এই হচ্ছে সহজ সাধনার পথ। এত সোজা পথ যে আছে, একথাটা বিশ্বাস করাই কঠিন। কিন্তু বলব, হুঁ, পাওয়ার খুব সোজা পথই আছে—সেবার পথ, কর্ম্মের পথ। একথা ভুয়ো নয়, শোনা কথা নয়, সোণার কথা—একেবারে প্রাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করা কথা।

আর, তাই যদি হয়, গুরুর হুকুমই যদি চরম হয়, তবে সমস্ত প্রাণ ঢেলে দাও তাঁর সেবায়। যোগ, জপ, তপ ও প্রাণায়ামে যদি নিষ্ঠা রাখা প্রয়োজন হয়, তবে সেবাতেও নিষ্ঠা প্রয়োজন। তোমার সংসার কাজের ধারার বাইরে বলে, যোগের কাজে তোমার আগ্রহ বেশী হয়। তাতে মন মজে, সে সাধনায় এক তিল ফাঁক যেতে পায় না—আর গুরুর ঘরের কাজ, তোমার আপন ঘরের কাজের মতই সহজ বলে তাতে এত ঔদাস্য, রুচি-

বিকার বা তন্দ্রা আসে কেন ভাই? ওটাও কি সত্য লাভের উপায় বলে মান না, না ভুলে গেছ? আজব সাধনে প্রাণ পণ করতে পার, সেবায় বা পার না কেন?

সেবার মহিমা অফুরন্ত। সেবার আনন্দ যে পেয়েছে, সে জানে কেমন করে তার মাঝে নিত্য নূতন রসের সায়র উথ্‌লে ওঠে। সেই রসের সায়রের দু'একটী তরঙ্গের পরিচয়ই দেব—তার বেশী বলার আর সাধ্য নাই। প্রথমতঃ সেবাকে—শ্রীগুরুর সহজ সেবাকে তত্ত্বের দিক দিয়েই দেখি। বলেছিলাম, ব্রহ্মবিদ্‌ গুরুর সেবা ব্রহ্মতত্ত্বের সাধন। এর প্রমাণ হাতে-কলমেই পাই। প্রাচীনকাল হতেই আগে বলি, গুরুগৃহের কর্ম্ম বিচিত্র; তা আপিস্‌-আদালতের ডিউটি খাটা নয় বা বর্ণভেদে বৃত্তিভেদের ব্যবস্থা সেখানে নাই। গুরুর আশ্রম বিশ্বসংসারেরই প্রতীক। মানুষের সহজ সরল জীবনযাপন করবার পক্ষে যা কিছু প্রয়োজন, সবই সেখানে আছে; সেগুলি করতে হলে সেখানে সব নিয়ে কারবার করতে হয়। বৃত্তিভেদের বিচার নাই বলেই ব্রাহ্মণ হয়ে যে বৈশ্যের কাজ গোচারণকে ছেড়ে যাবে, তা পারবে না। প্রয়োজন হলে গরুও চরাতে হবে, কাঠও বইতে হবে, আবার বেদও পড়তে হবে। কিন্তু সবই করতে হবে আনন্দের সঙ্গে—অভিমান না রেখে। রাজার ছেলের আভিজাত্যের গর্ব্ব সেখানে খাটবে না, বামুনের ছেলের সতর্ক বৃত্তিবিচার চল্‌বে না। যখন এইভাবে কাজ করি, তখন কি মনে হয়? মনে হয়, ব্রহ্ম কি, তা গুরু যেন হাতে কলমে শেখাচ্ছেন। ঋষি বায়ুকে ব্রহ্ম বলে স্তুতি করে বলছেন, "ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি, ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি" (তৈত্তিরীয় ১।১)। তেমনি সেবানিরত শিষ্যকেও যেন বলছেন, "তুমিই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম—তোমাকেই যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বল্‌ছি। কেননা, ব্রহ্ম কেমন, না 'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব, একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ' (কঠ ২।৫।৯)—যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবেশ করে রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন, তেমনি তিনিও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মারূপে এক হয়েও বাইরে রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন। হে কুশলী শিষ্য, তুমিও তাই। তুমিও এক হয়েও সেবার ব্যাপদেশে রূপে রূপে বহুরূপ ধারণ করেছ। তুমি কখনো গোপাল, কখনও তক্ষক, কখনও কৃষক, কখনও বা বেদপাঠক। বাইরে এই ভেদ শুধু—কর্ম্মের ভেদ; কিন্তু অন্তরে তুমি তো সেবার আনন্দানুভূতি দিয়ে সবার সঙ্গে একই বাঁধনে বাঁধা পড়েছ।"

তন্ময়তা ছাড়া সেবা হয় না। গুরুগৃহের বিচিত্র কর্ম্মে যখন তুমি তন্ময় হয়েছ, তখন তুমি যখন যে রূপ ধারণ করেছ, তখন যে তাই হয়েছ। অথচ এই হওয়ার মাঝে বন্ধন নাই—আছে অনাবিল আনন্দ। একরূপের সঙ্গে আর একরূপের মর্ম্মান্তিক ভেদ নাই—তোমার আনন্দসরস চিত্ত সমভাবে সবার মাঝেই সঞ্চরণ করতে পারে। সুতরাং যে আনন্দে ব্রহ্ম এক হয়েও বহু হয়েছেন, সেই আনন্দে তুমিও এক হয়েও বহুরূপে সেবা করছ। বৃত্তির ভেদ লৌকিক জগতের কথা। সেখানে ভেদের অনুশীলন করে সংস্কার পরিপুষ্ট করা হয় এবং তাতে সমাজের স্থিতিকে দৃঢ়মূল করা হয়। কিন্তু এই ভেদের মূলে যদি অভেদের জ্ঞান না থাকে, তবে ব্যষ্টির কর্ম্মে সমষ্টির পুষ্টি অসম্ভব। সেই অভেদের শিক্ষা হয় সেবা দ্বারা, বিশেষ করে গুরুগৃহের সেবা

দ্বারা। গুরুগৃহের কথা বল্‌ছি এইজন্য যে, সেখানে জীবন সহজ ও অনাড়ম্বর। ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষের প্রেরণা সেখানে সর্ব্বদাই সেবকের অন্তরে বিদ্যুৎ সঞ্চার করছে। যখন মানব শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল, বৃত্তিবিকল্পের কঠিনতা যখন চিত্তকে আড়ষ্ট করেনি, তখন থেকেই যদি গুরুগৃহে গুরুসেবায় তোমার জীবনের এবং শিক্ষার উদ্বোধন হয়ে থাকে. তাহলে নিখিল মানবজাতির, শুধু মানব জাতিরই বা বলি কেন, কর্ম্মজনিত সমানুভূতির বলে নিখিলভূতের অন্তরাত্মায় প্রবেশ করে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করবার সুযোগও তুমি পেয়েছ। ব্রহ্ম কি করে বহু হয়েছেন, তা তুমিই বুঝ্‌তে পারবে।

জ্ঞানপন্থীরা বলে থাকেন, কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান লাভ করা যায় না। কথাটা দার্শনিক বিচারের হিসাবে ঠিক এবং তার একটা সূক্ষ্ম অর্থও আছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু এই কর্ম্ম যদি সেবায় রূপান্তরিত হয়, তাহলে সত্যের আর একটা দিক ভেসে ওঠে। "আমি" কেন্দ্র করে যে কর্ম্ম, তা আত্মার বন্ধন—এ কথাটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু সেই কর্ম্মই যদি আমাকে কেন্দ্র না করে পরের উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহলে ফল কি দাঁড়ায়? সেই তো ব্রহ্মের স্বরূপ। আমি কর্ম্মে জড়িত বা লিপ্ত নই—কেননা আমি সেবক। অতএব "আমি" টুকু নির্ব্বাধই রইল। এই তো আমার নির্ব্বিকল্প রূপ। আবার সেই আমির ঈক্ষণ বা প্রেরণা বশতঃ এই যে বিচিত্র সেবার মাঝে পুঞ্জে পুঞ্জে কর্ম্ম উৎসারিত হয়ে উঠেছে, এই তো জগতের রূপ এবং সেবার তন্ময়তায় আমিও তারই মাঝে অনুপ্রবিষ্ট। সুতরাং শ্রীগুরুর উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মের কামনাহীন কর্ত্তারূপে আপনাকে যখন অনুভব করি, তখন যুগপৎ আমার মাঝে নির্গুণ ও সগুণ, নির্ব্বিকল্প ও সবিকল্পের আনন্দময় সংহতি অনুভব করি। এর মাঝে যদি অভিমানবশে কর্ম্মে জড়িয়ে পড়তাম, তাহলে আমার সাক্ষিস্বরূপের অনুভব হত না, আর যদি কর্ম্মবিরতিকেই চরম ধরে হাতপা গুটিয়ে বসে থাকতাম, তাহলে জগদ্বিবর্ত্তনের আনন্দ বা লীলা আস্বাদন করতে পারতাম না। সেবক হয়ে আমি দুটোই আস্বাদন করছি—এবং গুরুগৃহের সহজ কর্ম্মের মাঝে অতি সহজ ভাবে, এমন কি আমার অজ্ঞাতে আমি সেই ব্রহ্মতত্ত্বের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি। ভেবে দেখ দেখি, কর্ম্মও একটা কত বড় সাধন—বিশেষতঃ গুরুসেবারূপ সহজ কর্ম্ম। গুরুর কথা বিশেষ করে বলছি, এই জন্য যে, মনে হয়, অন্যত্র এভাব সহজে ফুটে না। গুরু স্বয়ং জগতের সেবক কিনা, তাই সেবাধর্ম্মটা কি, তা তিনি বেশ ভাল করেই শিষ্যের মাঝে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। তিনি যা পেয়েছেন, যেমন করেই হোক, তা তিনি শিষ্যের মাঝে সঞ্চারিত করবেন। এই জন্যই না তাঁর সংসার পাতা। সুতরাং তাঁর সংসারের যে কোনও কাজে শিষ্য তাঁর মতই হউক, এই মঙ্গল কামনা প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁর হৃদয়ে থেকে উঠ্‌ছে। এই জন্য তিনি যদি কাউকে দিয়ে পা টিপিয়ে বা তামাক সাজিয়ে নেন, তাও বৃথা কর্ম্ম হবে না; তাও ব্রহ্মতত্ত্বের দিকে শিষ্যকে এগিয়ে দেবে। শুধু কর্ম্মের গুণে নয়—বস্তুর গুণে। এই জন্য বলেছিলাম, কর্ম্ম সর্ব্বত্র থাকলেও গুরুগৃহের কর্ম্মের বিশেষত্ব আছে। কর্ম্মে যে সংস্কার প্রবল করে, সেখানেই তো তার সফলতা। কর্ম্মে বহুরূপী অনেকেই হতে পারে—কিন্তু এ যে সেই ব্রহ্মরূপী আসল বহুরূপীর প্রতীক, একথাটা ব্রহ্মবিদ্ গুরুর প্রসাদে গুরুসেবকই বুঝতে পারে, ধারণা করতে পারে—এবং প্রাণ ঢেলে খাটতেও পারে। তাই বলেছিলাম গুরুসেবা ব্রহ্মতত্ত্বের সহজ সাধন।

———*———

স্বামী রামতীর্থ

—*—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

যে সমস্ত অন্তরঙ্গ শক্তি তীর্থরামের ছাত্র-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে মোটামুটী আলোচনা করিয়াছি। জন্মান্তরীণ সুকৃতিবশতঃ এই শক্তির ভাণ্ডার অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রেরই অন্তরে সঞ্চিত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের বিশ্বাস, যদি ভারতবর্ষের প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়া আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকূল পারিপার্শ্বিক গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে অনেকেই এই সুকৃতি অর্জ্জনের অবকাশ পাইবে এবং শিক্ষার ফলে দুই চারি পুরুষ পরে গত্যন্তরহীন কেরাণীকুল অপেক্ষা উপায়কুশল মানুষের সৃষ্টি অধিক হইবে। কোন্ শক্তির প্রেরণায় শিক্ষাক্ষেত্রে মানুষের সন্তান যথার্থ মানুষ হইবার অবকাশ পাইতে পারে, তীর্থরামের ছাত্রজীবনের আলোচনা করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধসমূহে আমরা তাহাই বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এবিষয়ে তীর্থরামের জীবনকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। তীর্থরামের ছাত্রজীবনে উৎকট বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই, সুতরাং এমন জীবনকে অননুকরণীয় বলিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখিবারও কোনও উপায় নাই। সাধারণ ভাবে আলোচনা করিলে দেখি, আমাদের দেশের অধিকাংশ দরিদ্র ছাত্রের মতই তাঁহার জীবনেও ঘটনা-বৈচিত্র্যের নিতান্ত অভাব অথচ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম নিতান্ত কঠোর। কিন্তু এই সহজ সরল জীবনের অন্তরালেও এমন একটী তেজস্বিতা ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ ভাবব্যূঢ় হৃদয় অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল, যাহা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকের জীবনকে আর দশের জীবন হইতে বিশেষ করিয়াই পৃথক করিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমরা ইহাই বলিতে চাই, পারিপার্শ্বিক যদি সর্ব্বপ্রকারে অনুকূল করিবার সুযোগ নাও থাকে, তবুও শিক্ষাক্ষেত্রে ভাবের বন্ধনে যদি হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের যোগ ঘটিবার সুযোগ কোথায়ও থাকে, তাহা হইলে যে কোনও ছাত্রজীবন যে মনুষ্যত্বের মহিমায় মণ্ডিত হইতে পারে, ইহা দুরাশা নহে। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে,ছাত্রজীবনে অন্ততঃ ইহপরকালের নিয়ামক, নির্ভরের পরমাশ্রয় শ্রীগুরুর হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া চাই—গুরুগৃহে বাস করিয়া শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিলে তো কথাই নাই।

আমরা জানি, দেশের বর্ত্তমান যে অবস্থা, তাহাতে এমন আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্র সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ হইতে এখনও বহু দেরী। দেশের বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত অধ্যাত্মশক্তিকে তপস্যার দ্বারা কেন্দ্রীকৃত না করিতে পারিলে এমন শিক্ষাক্ষেত্র শুধু প্রাচীন আদর্শের অক্ষরশঃ অনুকরণ করিলেও কখনো সম্ভবপর হইবে না। এই জন্যই বলিয়াছিলাম যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে যথার্থ মানুষের স্পর্শে কাহারও অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হইবার যদি অবকাশ ঘটে, তবে সে নিতান্তই জন্মান্তরীণ সুকৃতিবশতঃ—দেশের অবস্থা এখনও এমনই প্রতিকূল। তথাপি অনুকূল হাওয়া এখন হইতেই

বহিতে সুরু করিয়াছে, যাঁহারা প্রকৃত দেশ-হিতৈষী, বিধাতার এই ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া তাঁহারা শিক্ষার গতিকে এই সনাতন পথেই পরিচালিত করিতে বদ্ধপরিকর হউন—ঔদ্ধত্য ও অবিনয়, অর্থলোলুপতা ও বহির্ম্মুখীনতা বর্জ্জন করিয়া ছাত্রেরাও শাস্তার শাসন মাথা পাতিয়া লইয়া জীবনকে মনুষ্যত্বে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রস্তুত হউক।

•

পাশ্চাত্যভাবের সংস্পর্শে আসিয়াও যাঁহাদের ছাত্রজীবন ভারতীয় সাধনার সনাতন জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন দুইটী মহামনীষী ছাত্রের আলেখ্য আদর্শরূপে আমাদের ছাত্রদের সম্মুখে রহিয়াছে, দেখিতে পাইতেছি। বলিয়া দিতে হইবে না, এই ছাত্রদের মাঝে একজন স্বামী বিবেকানন্দ ও আর একজন স্বামী রামতীর্থ। অবকাশমত ভারতাকাশের এই দুইটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের তুলনায় আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে। আজকাল ভারতীয় ছাত্রসম্প্রদায়ে বিবেকানন্দের যুগ চলিতেছে বলা যাইতে পারে। কার্য্যে যতটা পরিণত হউক না হউক, অন্ততঃ ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের সগোত্র বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা অনেক ছাত্রেরই হৃদয়ে আছে। দেশের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। যুগব্যাপী নিদ্রার পর নবজাগরণের প্রারম্ভক্ষণে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভেরই প্রয়োজন, নতুবা তামসিকতার ঘোর কিছুতেই কাটিতে চাহে না। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ আমাদের যুবক-সম্প্রদায়ের ভাবের রাজ্যে এইরূপ একটা বিক্ষোভ আনিয়া তাহাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই জাগরণের কোলাহলেই জাতীয়তার চরম সার্থকতা নহে, ইহা দৃঢ়মূল অবিক্ষুব্ধ কর্ম্মজীবনের সূচনা মাত্র। স্বামী রামতীর্থের যুগ এখনও আরম্ভ হয় নাই। উত্তর ভারতে তাঁহার প্রভাব সবে মাত্র উন্মেষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার ছাত্রজীবনে এখনও তাহার রশ্মিপাত হয় নাই। অথচ কেহ কেহ বলিতেছেন, আজ যেন তাঁহার মতই ব্রহ্মগতপ্রাণ নীরব কর্ম্মীর বড় প্রয়োজন। আকস্মিক বিক্ষোভে যে চিত্ত জাগিয়া উঠিয়াছে এবং নবজাগরণের বিপর্য্যস্ত ভাব কাটাইয়া শক্তিকে সংহত করিতে পারিয়াছে, সে এখন প্রশান্ত ও অনুদ্বিগ্ন কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান চায়। তাহার জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের বিশিষ্ট প্রেরণার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন স্বামী রামতীর্থের উদার প্রেরণার প্রয়োজন।

উভয়ের ছাত্রজীবনের আপেক্ষিক তুলনাতেও একটী বিশিষ্ট অর্থের সঙ্কেত পাই। ছাত্র নরেন্দ্রনাথ সন্ধানী সাধক, প্রতিভার তীব্র আলোকে সমস্ত বস্তু চিরিয়া চিরিয়া তিনি তাহার মর্ম্মসত্য নিষ্কাশন করিতে চাহেন। এই জন্য তিনি, চঞ্চল, দুঃসাহসী ও প্রচণ্ড। অবসন্ন মূঢ়চিত্ত যেখানে বিশ্বাস ও নির্ভরতার ভানে শুধু আপনার অন্তরের অক্ষমতাকেই সঙ্গোপন করিয়া রাখিয়াছে, নরেন্দ্রনাথ সেখানে সংশয় করিয়াছেন, প্রশ্ন করিয়াছেন—তাঁহার জ্বালাময়ী দৃষ্টির সন্ধানী আলোতে হৃদয়ের অন্ধকার কোনে পুঞ্জপুঞ্জ পুঞ্জীভূত অসত্য কিলবিল করিয়া উঠিয়াছে। নরেন্দ্রনাথের মাঝে যেন সনাতন ভারতবর্ষের আত্মা সহসা নূতন পারিপার্শ্বিকের মাঝে জাগিয়া উঠিয়া নিজের অবস্থা বুঝিবার জন্য চারিদিকে কেবল প্রশ্নবাণ বর্ষণ করিয়াছে—প্রাচ্যের জড়তা এবং প্রতীচ্যের মোহে

উভয়কেই সে তুল্যভাবে সংশয়ের দৃষ্টিতেই দেখিয়াছে। এই নরেন্দ্রনাথ যখন সংশয়ের মীমাংসকের সন্ধান পাইলেন, তখন তাঁহার ছাত্রজীবনের শেষ পর্ব্ব। কিন্তু তীর্থরামের নিয়তি অন্যরূপ। তাঁহারও অসামান্য প্রতিভা ছিল, তীব্র মনোব্যাকুলতা ছিল, কিন্তু তাহা মমতায় স্নিগ্ধ ও সুকুমার। তিনি সংশয়ী সন্ধানী নহেন, তিনি বিরহোৎকণ্ঠিত। আশ্রয়ের অভাবে তাঁহাকে ভাসিয়া বেড়াইতে হয় নাই, যাত্রাপথের প্রথমেই তাঁহার সাথী মিলিয়া গিয়াছিল। আপনার সহিত তাঁহার নিতান্ত কম দ্বন্দ্ব করিতে হয় নাই, কিন্তু এই সমস্ত দ্বন্দ্বের ফল সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তে কোনও অনিশ্চয়তা ছিল না তিনি জানিতেন, কালের ভ্রূকুটি যতই ভীষণ হউক না কেন, তাঁহার শুভ নিয়তি হইতে কেহই তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। আশ্রয়লাভে এইরূপ নিঃশঙ্ক হওয়াতেই তাঁহার ছাত্রজীবনে তেজস্বিতা ও স্নিগ্ধতা, দ্বন্দ্ব ও মীমাংসা, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসমর্পণের অপরূপ পরিণয় সম্ভবপর হইয়াছিল। এইদিক হইতেই নরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের উত্তরবর্ত্তী রূপে আমরা তীর্থরামের ছাত্রজীবনকেই অনুকৃত ও প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই।

দেশের প্রয়োজন ও পরিণতি অনুযায়ী ছাত্র নরেন্দ্রনাথের পরেই আমরা ছাত্র তীর্থরামকে আদর্শরূপে দেখিতে পাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের সনাতন ছাত্রজীবনের বিবর্ত্তন এখানে আসিয়াই থামিয়া যায় নাই। নরেন্দ্রনাথের জীবনে দেখি, ছাত্রের আত্মা জাগ্রত হইয়াছে, কিন্তু অনুকূল পারিপার্শ্বিক পায় নাই, বা সময়ে অন্তরঙ্গ শক্তির প্রচোদক শ্রীগুরুর সন্ধান পায় নাই—বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তবে তাহার পথের সন্ধান মিলিয়াছে। ইহাতে ছাত্রের মনোজীবন দ্বন্দ্ববহুল ও অশান্তিপূর্ণ হওয়া খুবই সম্ভব। আজকালকার অধিকাংশ ছাত্রজীবনে আমরা ইহাই প্রতিফলিত দেখিতে পাই। ইহাকে বিবর্ত্তনের সূচনামাত্র বলিতে পারি। তীর্থরামের ছাত্রজীবনে বিবর্ত্তনের পরের ধাপ দেখিতে পাই; সেখানে ছাত্রের আত্মা উদ্বুদ্ধ, ছাত্রজীবনের প্রারম্ভেই সন্ধানীর আশ্রয় মিলিয়াছে—কিন্তু পারিপার্শ্বিক এখনও অনুকূল হয় নাই। ইহাতেও ছাত্রজীবনে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হইবে, কিন্তু সে দ্বন্দ্ব তত উগ্র নয়। ইহার মাঝে কেবল নিজকে কুরিয়া কুরিয়া খাওয়া নয়; যত দ্বন্দ্ব তাহা কেবল প্রতিকূল পারিপার্শ্বিককে অনুকূল করিবার চেষ্টাতেই বিশেষ করিয়া দেখা দিয়াছে। এইরূপ ছাত্রজীবনও আজকাল দেশে দেখা দিতেছে, কিন্তু ইহাতেই ছাত্রজীবন সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না। আত্মা উদ্বুদ্ধ, শ্রীগুরু সহায়, পারিপার্শ্বিক অনুকূল—শিক্ষাক্ষেত্রে যেদিন এই ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটিবে, সেইদিনই সেই মহাতীর্থে অভিষিক্ত হইয়া ভারতের ছাত্র নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের সিংহদ্বার সম্মুখে মুক্ত দেখিতে পাইবে। নরেন্দ্রনাথ ও তীর্থরাম অগ্রদূত—তাঁহাদের ছাত্রজীবন প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই ধ্রুবতারা। কিন্তু শিক্ষামন্দিরে দেবছাত্রের আবির্ভাব হইতে এখনও বাকী—আমরা সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি—আশা সফল হইবে না কি ?

তীর্থরামের ছাত্রজীবনে যেখানে প্রতিহত হইয়াছিলেন, সেই পারিপার্শ্বিকের বাধার সহিত এই যুগে আমাদের ছাত্রদিগকেও সংগ্রাম করিতে হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রের সর্ব্বত্র আমরা

এই সংগ্রামের সূচনা দেখিতে পাইতেছি। বুকের রক্ত জল করিয়া কেবল কতগুলি প্রাণহীন কসরত শিক্ষাকেই আর কেহ শিক্ষা বলে না—এখন শিক্ষার্থী চায় প্রাণবস্ত মানুষের স্পর্শ! যিনি আমাদের প্রাণের মানুষ, তিনিও আর আড়াল হইয়া থাকিবেন না, তাঁহার আগমনীর সঙ্গীত আজ কত হৃদয়তন্ত্রীতেই না ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার আবির্ভাবকে সত্য করিবার জন্য আমাদের এখন প্রাণপণ করিয়া অনুকূল পারিপার্শ্বিক গড়িয়া তুলিতে হইবে, এবং তাহার জন্য বর্ত্তমান প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়িতেও হইবে। যুদ্ধের প্রেরণা নরেন্দ্রনাথ দিয়াছেন, জয়ের সঙ্কেত আমরা তীর্থরামের নিকট পাইব; তাঁহার নিপুণ নায়কত্বে বর্ত্তমান যুগের ছাত্রকাহিনী যে অসত্যকে পরাজিত করিয়া সত্যকে জীবনে জয়যুক্ত করিবে—এমন আশাকে আর অলীক বলিতে পারি না। তবে আমাদের লড়াই যুদ্ধকৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে, এ কথা নিশ্চয়। তীর্থরামের ছাত্রজীবনের বহিরঙ্গ সাধনাই সে বিষয়ে আমাদের উপদেষ্টা। অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

আরণ্যক

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন ঋষিষু প্রাবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৭১।৩

প্রেম যদি জীবনের আদর্শ না গড়ে তুলতে পারল, তবে তো তাকে প্রেম বলবো না। দম্ভ যেখানে প্রেমিকের উপর কর্ত্তৃত্ব করতে যায়, প্রেম সে ঐরাবতের কাছে বাহুবন্ধনে ধরা দেয় না। পায়ে লুটিয়ে পড়েই আমরা ভালবাসি—নিঃশেষে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়েই প্রেমে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করি।

*

তাঁর প্রমাণ কি? প্রমাণ আমি—আমার গতি। প্রাণে অনুভব করছি—আমি ভালবাসতে পারি, প্রেম দিয়ে অপরকে আপন করতে পারি; আর আমার গতির অন্ত নাই—এ যদি সত্য হয়, তাহলেই তো প্রমাণ হল যে আমার প্রিয়, সচ্চিদানন্দ—আমার মাঝেই তাঁর প্রকাশ! তাই বলি—"যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ!" আজ তাঁকে না পেয়ে যে কেমন করে বাঁচছি—তাই আশ্চর্য্য!

*

হাজারখানা স্মৃতি ঘেঁটে এ মনকে বাঁধবার জন্য যত দড়াদড়ি জোগাড় করব—মন কিছুতেই তাতে রাশ্ মানবে না। কিন্তু প্রেমের সেই কুসুমপেলব গ্রন্থিটীতে সে শান্ত সহজ ভাবে আপনাকে ধরা দেবে।

*

নিজকে জানাই হইল জীবনের লক্ষ্য। সমস্ত জানার তপস্যা এরই জন্য। যেমন উঁচু দিকে সমস্ত জানার চরম জানা ওই,

তেমনি নীচের দিকেও তোমার ভিতর যে সমস্ত গুণ বীজাকারে লুকায়িত রহিয়াছে, সেই গুলিকে সন্ধান করে পূর্ণরূপে বিকাশ করাই তোমার জীবনে পূর্ণ আদর্শ, আর এই আদর্শ কার্য্যকরী করা তোমার প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। কত মহাপুরুষ কত ভাবে সত্য লাভ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অনুসন্ধান কর, দেখিবে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জীবনের গুপ্ত বীজটাই জন্মজন্মান্তর ধরিয়া সাধনা করিয়া শেষ জীবনে তাকে পরিপূর্ণ রূপে বিকাশ করিয়াছেন। এই বিকাশই তাঁদের জীবনের সত্যলাভ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এখন দেখ তোমার ভিতরে কি বীজ লুকান আছে। যত মত ও পথ দেখ না কেন, আগে তার সঙ্গে মিলাইয়া বিচার কর, তারপরে যাহা মিলে তাহাকেই প্রাণের আবেগে জড়াইয়া ধর। যেটী তোমার জীবনের পূর্ব্বাপর অবস্থার অনুকূল হয়, এমন একটা পথ বাহির কর। যদি অন্য কাহারও জীবনে তার সাদৃশ্য দেখ, তবেই তাঁর কাছে সাহায্য নিতে পার, কিন্তু একথা সর্ব্বদা মনন করিবে যে তোমার জীবনের উন্নতি সব চেয়ে বেশী নির্ভর করে তোমারই উপর। কাজেই কখনও কোনও অবস্থাতেই নিজকে অবসন্ন করিবে না। কিছুতেই যেন মনমরা করিয়া না দেয়। বেশ জানিবে উহা বৈরাগ্য, আকুলতা বা নির্ভরতা প্রভৃতি কোনও উন্নতিরই পূর্ব্বভাস নয়। দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার অমনি দপ্ করিয়াই নিভিয়া যায়। কাজেই ওসব কেবল তামসিকতা, জড়ত্ব ও হতাশা ও পরিণামে বিনাশের সূচনা মাত্র।

*

জগৎ কখনও তোমার মনমত হয়ে চলবে না। আমাকেই প্রথমতঃ জগতের যেটুকু পেয়েছি, তাই নিয়ে জোর ধরে ব্যবসায়-সহায়ে লেগে যেতে হবে। বাধা বিপত্তি পদে পদে আসবেই। তাতে বিরক্ত হয়ে, চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেলে ক্ষতিটা নিজের ছাড়া আর কারও হবে না। সম্মুখে অটল পাহাড়, সে তো নড়বে না কিছুতেই—কিন্তু তাকে অতিক্রম করতেই হবে। কাজেই বীর হতে হবে। কোনও দিকে বিন্দুমাত্র দুর্ব্বলতা থাকলেও সত্যলাভের পথে বাধা জন্মায়। দেহে, মনে সর্ব্বাবস্থায় তোমায় বীর হতে হবে। যদি একটী ছিদ্র বন্ধ করতে পার, তবে বাকীগুলিও ক্রমে বন্ধ হবে। তাই একাজ আয়াসসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ জীবন যেখানে বাধা বিপত্তিতে অঙ্কিত হয়ে জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেখানে সব সম্ভব। আমার জীবন শুধু দেহান্তেই পর্য্যাবসিত নয়, দেহে বিদেহে সর্ব্বাবস্থায় আমার ইষ্টসিদ্ধির দিকে প্রবল গতি—পাব তবে ছাড়ব।

*

বীরত্ব পরপীড়নে, ঔদ্ধত্যে বা উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়, তাতে পরোক্ষে দুর্ব্বলতা প্রবেশের পথ পরিষ্কার করে মাত্র। শান্ত গাম্ভীর্য্য, অমোঘ বীর্য্যের পক্ষেই সম্ভব। যুদ্ধ অপরের সঙ্গে নয়, নিজের সঙ্গে। অবস্থা বিপর্য্যয়ে শান্ত বাক্তিই সমাহিত চিত্ত। বীরত্বের নিদর্শন আত্মজয়ে। অনধিকারীই এমন উজ্জল রত্নকে আয়ত্তে রাখতে না পেরে, বাইরে অপব্যয় করে ফেলে। নৈষ্ফল্যের দুঃখ, নিন্দা, ভয় প্রভৃতি আবর্জনার মত নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ত্যাগ করতে পারলে, তবেই চিত্ত উষালোকের অরুণস্পর্শে রঞ্জিত হয়ে উঠবে। এগুলি হচ্ছে সব চেয়ে নীচের সিঁড়ি। এই সোপান শ্রেণী উত্তীর্ণ হলে তবে সেই চির বাঞ্ছিত হর্ম্ম্যতলে তোমার আপন আসন পাবে। নিজের অবস্থান যে পর্য্যন্ত না চিনবে, ততদিন দুঃখে টলাবেই। তাই সকল অবস্থায় আপন আসনটী চিনে নিবে; তাতেই বীরত্ব সার্থক।

ভক্তসম্মিলনী

—ঃ{❀}ঃ—

একাদশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—দক্ষিণবঙ্গীয় সারস্বত আশ্রম (হালিসহর)



কার্য্যবিবরণী

—❀—

গত ১১ই পৌষ শনিবার হইতে ১৩ই পৌষ সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ২৪ পরগণা হালিসহর সারস্বত আশ্রমে ভক্ত সম্মিলনীর ১১শ বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার সমস্ত অঞ্চল হইতে জমিদার, পণ্ডিত, হাকিম, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরাণী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর ভক্তগণই উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। সুদূর আসাম ও বিহার হইতেও ১০।১২ জন ভক্ত আসিয়াছিলেন। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এবার ভক্ত সংখ্যা অধিক হইয়াছিল।

১ম দিবস ভগবান জগদ্‌গুরুকে সভাপতিরূপে আহ্বান করিয়া বন্দনা গীত ও স্তোত্রাদি পাঠান্তে বেলা ১২টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস নন্দী বি, ই, ভক্তগণকে অভ্যর্থনা করিয়া একটী লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। অনন্তর ভক্তসম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও গত বৎসরের কার্য্যপ্রণালী আলোচিত হয়। মঠ ও আশ্রমগুলির আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শিত হয়। সেবক, বিভাগীয় ও জেলার সদস্যগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বেলা ৪টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

২য় দিবস বেলা ২টার সময় একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। আলিপুরের সব্‌জজ্ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বন্দোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও নদীয়ার সব্‌জজ্ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাসগুপ্তের অনুমোদনে এবং সর্ব্বসাধারণের সমর্থনে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই; এম্, এ; এফ্, এ, এস, বি (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রেসিডেণ্ট) মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় স্থানাভাববশতঃ বহুলোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত বি, এ, শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় এল, টি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ বি, এল, এবং সমাগত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ দে প্রভৃতি সৎশিক্ষা প্রচারকল্পে আশ্রমাদর্শে ঋষিবিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, বর্ত্তমান শিক্ষার অসারতা,

সারস্বত মঠ ও শাখাআশ্রমগুলির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সম্মিলনী সভাপতি মহাশয় আশ্রম সম্বন্ধে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেন।* অনন্তর হালিসহর "সুহৃদসঙ্ঘ" কর্ত্তৃক ঐক্যতানবাদন ও সঙ্গীতান্তে সন্ধ্যার পর সভাভঙ্গ হয়।

৩য় দিবস পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ ৯.০টার সময় অনুপস্থিত সদস্য ভক্তগণের পত্রাদি পাঠ ও ভক্তগণের মধ্যে কাহার দ্বারা কিরূপ কার্য্য হইতেছে এবং অর্থ সামর্থ্যে কে কিরূপ সাহায্য করিতেছে, বিবৃত করিয়া ভক্তগণের মধ্যে পরস্পর পরিচয় করাইয়া দেন। ভক্তগণ মধ্যে পরস্পর আলাপন ও আলিঙ্গনাদি অন্তে বেলা ২টার সময় সভাভঙ্গ হয়। আগামীবর্ষে বর্দ্ধমান বিভাগের খড়কুসুমা সারস্বত আশ্রমে ভক্তসম্মিলনীর ১২শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

* সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্য অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

———*———

অভিভাষণ*

—*—

শ্রীশ্রীগুরুপ্রসাদে আজ আমাদের ভক্ত সম্মিলনী একাদশবর্ষে পদার্পণ করিল। ভ্রাতৃবৃন্দ, আপনারা নানা দেশদেশান্তর হইতে নানাপ্রকার অসুবিধা সহ্য করিয়া আমাদিগের এই হালিসহর আশ্রমে শুভাগমন করতঃ যথেষ্ট অনুগৃহীত করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি; শ্রীশ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণামান্তর আপনাদিগের নিকট এই আশ্রম সম্বন্ধে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

গত বৎসর কুমিল্লায় ভক্ত সম্মিলনীতে যখন হালিসহর আশ্রমে অদ্য মিলিত হইবার জন্য আপনারা আহূত হইয়াছিলেন, তখন হালিসহর আশ্রমের কোন চিহ্নও ছিল না। কেবল শ্রীগুরুকৃপা ভরসা করিয়াই আমরা ঐরূপ দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলাম, এবং তাঁহারই কৃপাবলে বলীয়ান্ হইয়া আজ আমরা আপনাদের অভ্যর্থনা করিতে সমর্থ হইয়াছি। ১৩২৯ সালের চৈত্রমাসে পরলোকগত ভ্রাতৃবর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে যখন শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের শুভ পদার্পণ ঘটে, তখন এই গ্রামের ১৫।১৬টি যুবক তাঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন। সেইদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ তাঁহার মঠ ও আশ্রমের ইতিবৃত্ত আমাদিগকে প্রদান করেন ও যাহাতে প্রেসিডেন্সিডিভিসনের আশ্রম হালিসহরে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হালিসহরে আশ্রম স্থাপনের জন্য স্থাননির্দ্দেশের বিশেষ কারণ স্থানমাহাত্ম্য। এই প্রসিদ্ধ গ্রামই পুরাতন পুতভূমি কুমারহট্ট। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আবাসস্থান এই গ্রামেই ছিল। মহাপ্রভুর পদধূল এ গ্রামের ধূলিকণার সহিত

* একাদশবার্ষিক ভক্তসম্মিলনী উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস নন্দী বি, ই, দ্বারা পঠিত।

ওতপ্রোতভাবে মিলিত। সাধকপ্রবর শ্রীরামপ্রসাদ সেনও এইগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে পবিত্র করিয়াছেন। হালিসুহর শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাধারণ তীর্থস্থান। ইহা ছাড়া, প্রেসিডেন্সীবিভাগের মধ্যে এই স্থানেই আমাদের গুরুভাইয়ের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সকল কারণ নিবন্ধন এই স্থানেই আশ্রম স্থাপনের চেষ্টা যুক্তিযুক্ত স্থির হয়। অনেকে অস্বাস্থ্যকর ও অত্যন্ত পতিত গ্রাম বলিয়া এ স্থান বর্জ্জন করার যুক্তি দেওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ বলেন, পতিত গ্রামের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে দেওয়া উচিত। আমাদের অগ্রণী যদুদাদা, যাঁহার অভাব আমরা এখন বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি, এস্থানে আশ্রম স্থাপনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজও আমাদিগকে উৎসাহিত করেন এবং তাঁহার সেই উৎসাহবাণী আমরা তাঁহার মঙ্গলময় আদেশবাণী বলিয়া মানিয়া লই। যদু দাদার উপদেশাদিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাদের গুরুভাই শ্রীপ্রভাত চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার মাতাকে সম্মত করিয়া স্বীয় বসতবাটী আশ্রমোদ্দেশে দান করেন। কিন্তু পরে তাঁহার মাতার মত পরিবর্ত্তন হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের আদেশানুসারে সে বাড়ী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হয়। তৎপরে নানা চেষ্টা করিয়া বর্ত্তমান আশ্রমবাড়ী সংগৃহীত হয়। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বালিয়াটী নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোপাল সাহার অতুলনীয় ত্যাগ ও মহানুভবতার ফলেই এই বাড়ী ক্রয় করা সম্ভব হইয়াছে।

গত বৈশাখ মাসে এই বাড়ী ক্রীত হইয়াছে। এখনও আশ্রমকার্য্য বিশেষভাবে আরম্ভ হয় নাই। ক্রমশঃ আমরা দেশবাসীর যেরূপ সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছি, তাহাতে আমাদের আশার সঞ্চার হইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে আশ্রমের কার্য্য বিশেষ প্রসার লাভ করিবে। আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য সৎশিক্ষার প্রচার, গৃহস্থাশ্রমের উৎকর্ষসাধন ও প্রকৃত সন্ন্যাসীর সৃষ্টি। এতদুদ্দেশে একটি "ঋষি বিদ্যালয়" শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। এস্থলে সাধারণের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ইহার আবশ্যকতা কি?—আর্য্যসভ্যতার মূল ভিত্তি সত্ত্বশুদ্ধি ও তাহার দ্বার স্বরূপ ব্রহ্মচর্য্যব্রতই শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্র। বর্ত্তমান শিক্ষানুষ্ঠানগুলিতে এই সত্যের মর্য্যাদা আদৌ রক্ষা করা হয় না। স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হইয়াও যাঁহারা শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারাও শিক্ষাকে বৈশ্যবৃত্তির সোপানস্বরূপেই দেখিয়াছেন; ব্রাহ্মণ্যভাবে তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন নাই। বর্ত্তমান টোলগুলিতেও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আদর দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব টোলগুলিও যে ঋষিনির্দ্দিষ্ট পন্থায় চলিতেছে, তাহা বলা যাইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে, পুরাতন ঋষিনির্দ্দিষ্ট পন্থায় বর্ত্তমানযুগেও যে আমাদের চলিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে সেকেলে পথে চলিলে আমরা আরও পিছাইয়া যাইব। এখন আমাদের স্থির হইয়া বিচার করা উচিত, আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিয়া যে পথে চলিতেছি, তাহাতে বাস্তবিক জাতীয় ও আধ্যাত্মিকজীবনে অগ্রসর হইতেছি, না আরও পশ্চাৎপদ হইতেছি। কোন সুধী ব্যক্তি বলিতে পারেন না যে পুরাতন পথ ছাড়িয়া নূতন পথে চলিয়া আমরা অধিকতর সুখ শান্তির অধিকারী হইয়াছি। পাশ্চাত্যদেশগুলিও তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছে। সত্য বটে, বুদ্ধিবলে তাহারা নানাবিধ ভোগ-

বিলাসের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছে ও অশেষবিধ ঐহিক সুখসুবিধার আয়োজন করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কি তাঁহারা শান্তিলাভে সমর্থ হইয়াছে? হৃদয়ের উৎকর্ষসাধন না হইলে প্রকৃত শান্তিলাভ অসম্ভব। হৃদয়হীন বুদ্ধির উৎকর্ষ ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে—ইহা অভাব-মোচনে পরশান্তিদানে অক্ষম। হৃদয়ের উৎকর্ষে মহাজ্ঞানের স্বতঃস্ফুরণ হয়। জ্ঞানের আলোকে হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইলে পরাশান্তি লাভ হয়। যে পথে আমরা চলিয়াছি, তাহাতে হৃদয়ের উৎকর্ষ মোটেই হয় না, অতএব এ পথ যে ভ্রান্ত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভিতর দিয়া মনুষ্যজীবন গড়িয়া না উঠিলে হৃদয়ের সমধিক উৎকর্ষ হইতে পারে না। বাল্যকালে নানারূপ ভোগ-বিলাসের মধ্যে থাকিলে চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক স্ফুরণ অসম্ভব। এই জন্যই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রয়োজন। আধুনিক ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রের ক্রিয়াকলাপের সহিত কোন ব্রহ্মচারী বালকের ক্রিয়াকলাপ তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, কাহার মধ্যে স্বভাবের অবাধ ক্রিয়া হইতেছে। যেখানেই অস্বাভাবিকতা সেখানেই পাপ। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই মনুষ্যজীবনের ভিত্তি হওয়া উচিত। ইহার অভাবেই আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা। এই অভাব দূরীকরণ মানসেই আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের আদেশানুযায়ী সৎশিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করা। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের সহিত হৃদয়ের উৎকর্ষ যে শিক্ষায় হয়, তাহাই সৎশিক্ষা।

সারস্বত আশ্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য ভ্রান্ত পথগামী ভাইগণকে সত্যপথে পুনরানয়ন করা। সনাতন শাস্ত্রাদি প্রোক্ত পথ ছাড়িয়া আজ আমাদের এই দুরবস্থা। ব্রাহ্মণ্যভাব ছাড়িয়া আমরা কেবল বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তিরই অন্বেষণ করিতেছি। ধর্ম্মের ভিতরেও বৈশ্যবৃত্তি চালাইয়াছি। দক্ষিণার চুক্তি না করিয়া পুরোহিত যজমানের ক্রিয়া আরম্ভ করেন না। এমন তীর্থ নাই, যেখানে দেবদর্শন করিতে অর্থ লাগে না। যে গৌরাঙ্গ পথে পথে আপনাকে বিলাইয়াছিলেন, আজ নবদ্বীপে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবার নিঃস্ব ব্যক্তির অধিকার নাই। আবার বৈরাগীদিগের কাণ্ড দেখুন। গৌরার সার্ব্বজনীন প্রেমের কি ভীষণ অপব্যবহার! প্রেমের নামে তাহারা অবাধে সমাজের মাঝে ব্যভিচার চালাইয়াছে! এদিকে আবার শাক্তদের ভিতরও দেখুন, পঞ্চমকার সাধনের নামে কি বীভৎসকাণ্ডই তাহারা না করিতেছে। সুখের বিষয়, এ বিষয়ে সুধীজনের নজর পড়িয়াছে। সাধু মহাপুরুষগণও কৃপা করিয়া পতিত নরনারীকে সৎপথে ফিরাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা দেখাইতেছেন। তাঁহারা আর হিমাচলের নিভৃত গিরিগুহায় ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন নাই। আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁহারা আবার আমাদের মধ্যেই নামিয়া আসিয়া অমৃতময় উপদেশাদির দ্বারা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু হতভাগ্য আমরা—সর্ব্বত্যাগী সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষগণের সমাদর শিখি নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে এ শিক্ষার একান্ত অভাব। অথচ পাশ্চাত্যদেশের ধর্ম্মযাচকগণের সমাদর দেখুন। এক একজন ধর্ম্মযাচকের জন্য তাঁহার দেশবাসিগণ অগণিত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। আর আমাদের দেশে কম্বলমাত্রৈকসম্বল সাধু সন্ন্যাসী—যাঁহারা জীবের মঙ্গলের জন্য সদাব্যস্ত—গৃহস্থের আলয়ে আসিলে কোথায় নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া প্রাণভরে তাঁহার সেবা করিয়া লইবে—না স্বীয় ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত থাকিয়া অলস ও

সমাজের অনাবশ্যক ভার বলিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ধিক্ আমাদের শিক্ষা! যাহা সৎ, তাহা অসৎ ও যাহা অসৎ তাহা সৎ—এই আমরা শিখিতেছি। আসুন ভাই সকল, আর কালহরণের সময় নাই, আমাদের ভ্রান্তপথ ছাড়িয়া সত্যপথে চলিতে হইবে, শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করিতে হইবে।

আর এক কথা—সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন করিতে হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের উদ্দেশ্যও তাহাই। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ভাই সকল আজ একই শ্রীচরণ ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া কেমন মনের আনন্দে পরস্পর পরস্পরের সহিত আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি। এ শুভ সংবাদ সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করা আমাদের উচিত। এ সাম্যের দিনে কোনরূপ দ্বেষাদ্বেষির স্থান নাই। আমাদের গুরুভাই ভিন্ন অপরে কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন করিতে গিয়া এক নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের সে ধারণা একান্ত ভ্রান্ত। আমাদের বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা অযথা আশঙ্কা করিতেছেন। সত্য বটে, আমাদের পূজার একটু বিশেষত্ব আছে, কিন্তু ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা নাই, ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত অবাধে যোগদান করিতে পারেন। আমরা সকল পূজার সার গুরুপূজারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। এ পূজায় বিন্দুমাত্র সাম্প্রদায়িকতা নাই। কেহ কেহ আসনে প্রণাম করিতে বা আমাদের আশ্রমে প্রসাদ লইতে কুণ্ঠিত হন। কারণ কি? তাঁহারা হয়ত মনে করেন, ইহাদের গুরুর আসনে আমরা প্রণাম করিব কেন? ইহাদের গুরুর প্রসাদ আমরা লইব কেন? ভাই সব, আমরা সকলেই হিন্দু, হিন্দুমাত্রেরই গুরু সেই এক গুরুব্রহ্ম। যেখানেই গুরুপূজা হয়, সেখানেই সেই জগদ্গুরুর পূজা হইয়া থাকে, অপর কাহারও পূজা হয় না। জগদ্গুরুকে প্রণাম করিবে না ত কাহাকে প্রণাম করিবে, তাঁহার প্রসাদ লইবে না ত খাইবে কি? সাধারণের আর একটি ভ্রান্তধারণা, আমরা নাকি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী। আমরা বলি - না, না, না। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই হিন্দুত্বের মূল ভিত্তি—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে এ সাম্যের দিনে ছুঁৎমার্গ পরিহার ও গোঁড়ামি ত্যাগ করা দরকার। ছুঁৎমার্গ পরিহারে কেহ যেন মনে না করেন, ব্রাহ্মণ আচণ্ডালের পক্কান্ন ভোজন করিবেন। তাহা হইলে আর বর্ণাশ্রম রহিল কোথায়? ছুঁৎমার্গ পরিহার অর্থে, "ও নিম্নজাতি, উহাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হইবে," কিম্বা "আহারের সময় উহার দর্শন লাভ ঘটিলে আহারীয় নষ্ট হইবে"—এইরূপ ধারণা ত্যাগ। আমাদের আশ্রমের উদ্দেশ্য, পরস্পর ভ্রাতৃভাব স্থাপন ও অন্যায় অনিষ্টকর লোকাচার পরিবর্ত্তন। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের অবহিত হওয়া দরকার। শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজের বিশেষ আদেশ "সঙ্ঘবদ্ধ হও, দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া যাও,, পতিত ভাইদের হাতে ধরিয়া কাঁধে করিয়া মায়ের কোলে তুলিয়া দাও।" এ আদেশবাণী আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। অতএব আর বসিয়া থাকিবার সময় নাই, জাগ ভাই, সব, জাগ—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্ নিবোধত।

গৃহস্থাশ্রমের উৎকর্ষসাধন শ্রীশ্রীগুরুদেবের আর এক বিশেষ লক্ষ্য। বর্ত্তমান গৃহস্থাশ্রম কি অবস্থায় অবনত হইয়াছে দেখুন। ছোট ভাই

বড় ভাইকে মানে না, পুত্র পিতাকে অগ্রাহ্য করে। উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমানে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অশ্রুনীরে ভাসিতে হয়। এ সকলের মূলেও সেই সৎশিক্ষার অভাব বর্ত্তমান। বর্ত্তমান যুবকগণই দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। তাঁহাদের প্রত্যেককেই আদর্শ হইতে হইবে। পিতার আদর্শে পুত্রের চরিত্র গড়িয়া উঠে। সেই জন্ম প্রত্যেক পিতার উচিত, অতিশয় সংযত হইয়া আচার নিষ্ঠা মানিয়া চলা ও আদর্শ গৃহস্থ হইতে চেষ্টা করা।

গৃহস্থাশ্রমের উৎকর্ষের উপরই আমাদের জাতীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ নির্ভর করিতেছে। অতএব, ভাইসব, আমাদের উচিত, এসম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর মহারাজ যে সমস্ত উপদেশ দিয়া আসিতেছেন তাহা বর্ণে বর্ণে আমরা মানিয়া চলি। বর্ত্তমান যুগ কর্ম্মযোগের যুগ। ফলাফল তাঁহাতেই সমর্পণ করিয়া তাঁহার আদেশ মানিয়া চলাই কর্ম্ম-যোগ সাধন। অতএব এস ভাইসব, আমরা তাঁহাতেই অসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করি। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই আমাদের পূজার সামগ্রী হউক, তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিই আমাদের ধ্যানের বস্তু হউক, তাঁহার আদেশবাণীই আমাদের মন্ত্র হউক, তাঁহার কৃপা হইলেই আমরা তাঁহারই শ্রীচরণে লীন হইব।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সঙ্গীত

(ভক্ত সম্মিলনী উপলক্ষে হালিসহর "সুহৃদসঙ্ঘ" কর্তৃক রচিত ও গীত)

হিন্দোল—চৌতাল

নিখিল জগত সৃজন শকতি বিরাজিত সদা ভকতি মূলে,
গতি মাত্র জেন শ্রীগুরু চরণ, চাহ যদি কূল দুস্তর অকূলে ॥
মনে উঠে যদি সন্দেহ অশেষ, গুরু পদে মন করিও নিবেশ,
আনন্দ অপার পাইবে হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষিত ধনে পাবে অবহেলে ॥
সদা থাকে মন কুকার্য্যে মগন, স্বার্থ অন্বেষণে সদা আকিঞ্চন,
রহ মদ ভরে আপন অন্তরে, ভাবনা জীবন রবে কতক্ষণ।
স্বরচিত তব সাধের শৃঙ্খলে, বাঁধি আপনারে ঝাঁপ দেছ জলে,
তীরে উঠ এবে মোহ মায়া ভুলে, পাবে মোক্ষ ফল গুরুকৃপাবলে ॥

ভক্তসম্মিলনীর সাধারণ সভার

মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের মন্তব্য

—*—

**Mahamahopadhyaya
Haraprasad Shastri
C I E, M A, F A, S B.**

26. Pataldanga Street.
Calcutta.

ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি শিক্ষার প্রথম আমলে লোকে চীৎকার করিয়া বলিত, Down with Hinduism, Down with Brahmanism, Down with Sanskrit Education which closes the eyes—আরও এই রকম অনেক কথা বলিত। একশত বৎসর ধরিয়া এই চাল চলিয়া আসিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে লোকের শ্রদ্ধা নাই। ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পাইয়া বসিয়াছে। সংস্কৃতের বাঙ্গলা-ইংরাজিই লোকে পড়ে। ভারতবর্ষের পুরাণ কথা লোকে ইংরাজের কাছেই শোনে।

হিন্দুর এই দুর্গতির দিনে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অধোগতির দিনে যিনিই হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপনের চেষ্টা পান, তিনিই আমাদের শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র হন। পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী আসামের পূর্ব্বপ্রান্তে আশ্রমস্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের আবার প্রাণসঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র আসামেই নিবদ্ধ নহে, তিনি বাঙ্গালায়ও আপন কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করিতে চাহিতেছেন এবং বাঙ্গলার পূতভূমি কুমারহট্টে আশ্রম স্থাপনের জন্য প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দকে পাঠাইয়াছেন। ইনিও বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আশ্রমস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন এবং কতকগুলি স্থানীয় উৎসাহী যুবক তাঁহার সহায় হইয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য। যিনিই হিন্দুধর্ম্মের বন্ধু, তাঁহারই এই উদ্যমে সহানুভূতি থাকা উচিত। আমি আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিই এবং হিন্দু বলিয়া গৌরব করি, সুতরাং ইহাতে আমার সহানুভূতি নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একজনের সহানুভূতিতে কিছু কাজ হয় না। দেশস্থ সকল হিন্দুর নিকটই আমি প্রার্থনা করিতেছি, স্বামী শুদ্ধানন্দ যাহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন, সকলে মিলিয়া তাহার জন্য অগ্রসর হউন।

(স্বাক্ষর), শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

———*———

সাম্বৎসরিক হিসাব

আসামবঙ্গীয় সারস্বত মঠের অন্তর্গত শ্রী-গৌরাঙ্গসেবাশ্রমে ও অন্যান্য শাখাশ্রমগুলিতে গত বৎসর মোট ১২৮৫১৸৭॥ ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৩৫৬৩৷৵১৫ এবং আশ্রমগুলির আয় ৪৫৩৬৸৶১৭॥ বাদে বাকী ৪৭৫ / ৫ মঠের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। সমগ্র প্রচারবিভাগে ৫৮১৬৸১০ আয়, তন্মধ্যে ২১১১৸১৫ ব্যয় বাদে ৩৭০৩৸৶১৫ লাভ হইয়াছে; সুতরাং ১০৪৭৵০ মঠের পক্ষ হইতে নগদ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে ব্যয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গসেবাশ্রমের

মোট ব্যয় ৫৩০৪।/১৫

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ১৭৮৵০)

১। খোরাকী মোট	১০৮১৸৶৫
আশ্রমবিভাগে	২০৩১৸৶৫
অতিথি অভ্যাগতের জন্য	৫০৲
২। পরিধেয় ও শীতবস্ত্রে মোট	১৮৪৸১০
৩। সেবাবিভাগে মোট	১৮৪৸১০
ঔষধপথ্যাদিতে	১৭৪৸১০
বাহিরের রোগীদের জন্য	১০৲
বিপন্নকে সাহায্য	—
৪। শিক্ষাবিভাগে	১১৩/১৫
৫। গৃহনির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে	১০৯২৵১০
৬। সেবকগণের সেবা ও ভিক্ষার্থ যাতায়াত খরচ	২৩৷৶
৭। উৎসবাদিতে	২০৯॥
৮। তৈজসপত্রাদিতে	৮৪॥/১৫
৯। ছাপাখরচ ও ষ্ট্যাম্পাদিতে	২৭৶০
১০। জমিজমাতে	১০৩৯।১০

মধ্যবঙ্গীয় সারস্বত আশ্রমে

ব্যয় ২৫৬৯৸৶২॥

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ১৫৩১৸০)

পূর্ব্ববঙ্গীয় সারস্বত আশ্রমে

ব্যয় ১৪৯৬॥৵৫

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ২২৯৵১০)

উত্তরবঙ্গীয় সারস্বত আ[illegible]

ব্যয় ১৬২৯॥/০

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ১২৬৯।৶১

দক্ষিণবঙ্গীয় সারস্বত[illegible]

ব্যয় ২১৪৭৸১০[illegible]

(সাধারণ হইতে প্রাপ্ত ৩৫

মোট ব্যয় ১[illegible]

মঠ হইতে প্রদত্ত [illegible]

আশ্রমসমূহের আয় [illegible]

সাধারণ হইতে [illegible]

আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামেই অবস্থিতি করিতেছেন।

মন্তব্য

এই সংখ্যায় স্থানাভাববশতঃ "দানপ্রাপ্তি-স্বীকার" প্রকাশিত হইল না।

ওঁ তৎ সৎ

আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)



১৮শ বর্ষ } ফাল্গুন { ১১শ সংখ্যা

শিতিপৃষ্ঠঃ

—*—

[ঋগ্বেদ-সংহিতা—৩।১।৭]

—*—

প্র য আরুঃ শিতিপৃষ্ঠস্য ধাসে-

রা মাতরা বিবিশুঃ সপ্তবাণীঃ।

পরি ক্ষিতা পিতরা সঞ্চরেতে

প্রসর্স্রাতে দীর্ঘমায়ুঃ প্রযক্ষে ॥

জানন্তি বৃষ্ণো অরুষস্য শেব-

উত ব্রধ্নস্য শাসনে রণন্তি।

দিবো রুচঃ সুরুচো রোচমানা

ইলা যেষাং গণ্যা মাহিনা গীঃ ॥

ঋষায়ন্তে মহে অত্যায়পূর্ব্বী-

রা ষে চিত্রায় রশ্ময়ঃ সুষামাঃ।

দেবহোতম প্রতরশ্চিকিত্বান্

মহো দেবান্ রোদসীঃ এহ বক্ষি ॥

পৃক্ষ প্রযজ্যো দ্রবিণঃ সুবাচঃ
সুকেতব উষসো রেবদূযুঃ।
উতো চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যাঃ
কৃতং চিদেনঃ সংমহে দশস্য ॥

সিতপৃষ্ঠ সর্ব্বাধার হে দেবতা, রশ্মি তব ধায়—
ভূলোকেরে বেড়ি আর সপ্তসিন্ধু—দ্যুলোকেরে ছায় ;—
সে আলোকে দিকে দিকে কাঁপে যেন রোদসীর হিয়া—
দীর্ঘ করি আয়ু তব যজ্ঞকাল দেয় পসারিয়া।

বরষ যে কাম্যফল, হে মহান্, নাহি জান রোষ—
তোমার শাসন তাই বিশ্বচিতে আনে পরিতোষ ;
তোমারি মঙ্গলগানে মহাকাব্য হল যার শুচি,
দ্যুলোক-আলোক সে যে, সুশোভন, নিত্য শুভরুচি।

বৃষ তুমি, সুমহান্, চিত্ররূপ—তব রশ্মিগণ
লঙ্ঘিয়া সকল সীমা, বৃষসম করে বিচরণ ;—
দেবহোতা আনন্দের দূত তুমি, জ্ঞানদীপ্তকায়—
নিখিল দেবতা সাথে রোদসীরে আনগো হেথায়।

সুরের কেতন বহি, উষা ওই বিবিধ রতনে,
কত হবি উপচারে যজ্ঞভূমি সাজাল যতনে ;
জ্বালাময়ী দীপ্তি তব উত্তরিয়া ভূলোকের সীমা—
ভক্তচিত্তদুরিতের, হে পাবক, মুছাক্ কালিমা।

———*———

ব্রহ্মচর্য্যসাধন

—*—

[শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস, বি, এ, ই, এ, সি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য

প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে চরম জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও সকলে তল্লাভে সমর্থ হইত না; তথাপি ব্রহ্মচর্য্য পালনের অন্ততঃ যে একটি সাফল্য ছিল, তাহা লাভ করিবার পক্ষে কাহারও কোন অন্তরায় ছিল না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা ধর্ম্মপ্রাণতা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিত, অর্থাৎ ধর্ম্মের ভাবটি প্রকৃতিতে স্বাভাবিক হইয়া যাইত। এবংবিধ সফলতাযুক্ত সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারীই গার্হস্থ্যাশ্রমের যোগ্যপাত্র, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। এই যোগ্যতার স্বরূপ সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক হইতেছে। বলা বাহুল্য যে বহু শাস্ত্রালাপ, ভূরি অধ্যয়ন অথবা পাণ্ডিত্যপরিচায়ক কোন উপাধিলাভের সঙ্গে ইহার কোন সংস্রব নাই। এই যোগ্যতা একটি অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চয়—যদ্দ্বারা ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হওয়া হয়।

স্বাভাবিকতাই ধর্ম্ম; ধর্ম্মের সঙ্গে স্বভাবের কোনও বিরোধ নাই; অস্বাভাবিকতা বা কৃত্রিমতার সঙ্গেই ধর্ম্মের বিরোধ। মানুষ স্বীয় প্রকৃতি হইতে যে পরিমাণে কৃত্রিমতার প্রভাব বর্জ্জন করিতে পারে, সেই পরিমাণে তাহার স্বভাবে বা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা হয়। প্রকৃতি ধর্ম্মানুগত বা ধর্ম্মের অনুকূল হইলে, ধর্ম্মানুশাসন মানিতে কোনপ্রকার অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে পারে না। নিয়মাধীনতার মূলে আন্তরিকতা না থাকিলে উহা সুফলপ্রসূ হয় না। প্রবেশার্থী গৃহী আশ্রমোচিত কর্ত্তব্যগুলি জানিতেন; তিনি জানিতেন যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সেগুলি সম্পাদন করিতে হয় এবং অন্যথাচরণে প্রায়শ্চিত্ত অনিবার্য্য। সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই তিনি গুরূপদেশে নিয়মাধীনতাকে বরণ করিয়া লইতেন। প্রাচীন গুরুগণ যথাবিধি গার্হস্থ্যকর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য প্রবেশার্থীকে পারদর্শী পুরোহিতের অধীন করিয়া দিতেন। এতদ্দ্বারা গার্হস্থ্যজীবনে তাহার যে কোন প্রকার স্বচ্ছন্দতার অসদ্ভাব হইত তাহা নহে, অন্তরের গঠনই ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে এরূপ হইয়া পড়িত যে এই নিয়মাধীনতার মধ্যেই গৃহী প্রভূত আনন্দ লাভ করিত। ফলতঃ বিহিত ভোগসুখই গৃহীর লক্ষ্য; স্বেচ্ছাচারের কামনা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইত না।

স্বাধ্যায়, পরপীড়াবর্জ্জন, সত্যপালনাদি সর্ব্বাশ্রমসাধারণ কর্ত্তব্য যেমন ব্রহ্মচারীর পক্ষে পালনীয়, তেমনি গৃহীর পক্ষেও পালনীয় ছিল। স্বাধ্যায় তাহার অন্তর্দৃষ্টি জাগরূক রাখিত; অহিংসা-সত্যপালন দ্বারা তাহার আচরণ বিশুদ্ধ থাকিত। পরের পীড়া জন্মে এমন কার্য্যে গৃহী কদাচ লিপ্ত হইতেন না;

অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন ঘৃণিত কার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই শম দমাদি অভ্যাসরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গ গৃহীর নিত্যকর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ যে বীর্য্য-ধারণ, যাহাকে কেহ কেহ "অমূল্যনিধি"র সংরক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইত ?

এই প্রসঙ্গক্রমে যাহা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য, তাহা গৃহস্থের প্রজাপতিব্রত নিষ্ঠা। আত্মোন্নতির পথ অবারিত রাখিতে হইলে এই ব্রতে যেমন নিষ্ঠা প্রয়োজন, সুসন্তানলাভ করতঃ বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে হইলেও এই ব্রতনিষ্ঠা তেমনি প্রয়োজন। প্রজাপতির প্রজা-সৃষ্টির সহায়তা করা প্রত্যেক গৃহীর কর্ত্তব্য; এ জন্য প্রজাকাম হইয়া গৃহী কেবল মাত্র ঋতুকালে ভার্য্যাগমন করিবে ইহাই প্রজাপতি ব্রতের লক্ষ্য। নিষ্ঠার সহিত এই ব্রত পালন করিলে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ হয় না। এই ব্রতোদ্যাপনের উপর আপনার, পরিবারের ও সমাজের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অশেষবিধ কল্যাণ নির্ভর করিয়া থাকে। সন্তান সন্ততি জন্মিলেই যে তদ্দ্বারা সৃষ্টিপ্রবাহ সুচারুরূপে চলিতে পারে এমত নহে, শারী-রিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন সুসন্তান জন্মগ্রহণ না করিলে তদ্দ্বারা সমাজ হীনবল হইতে থাকে। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি যে ধ্বংসোন্মুখ, ইহা অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করি-তেছেন এবং তাহার প্রতীকারোপায় চিন্তা করিতেছেন। বিষয়টি বর্ত্তমান অবস্থায় জটিল হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই; কোন এক কারণই যে এই ধ্বংসের মূলীভূত কারণ, তাহা বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, আর আর যে কারণ থাকুক না কেন, অসংযত গার্হস্থ্য-জীবন এই ধ্বংসের পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। এই ধ্বংসের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে দৃঢ়তার সহিত প্রাচীন দাম্পত্য-বিধি সকল পালন করা নিতান্ত আবশ্যক।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বের ১০৪ অধ্যায়ে দেখা যায়, "সমস্ত বর্ণের মধ্যে কদাচ পরদার কর্ত্তব্য নহে; পুরুষের পরদারসেবন যেরূপ আয়ুক্ষয়কর, লোকে তাদৃশ অনায়ুষ্য আর কিছু নাই।" গৃহী সতত স্বদারনিষ্ঠ হইবেন।

দেশকাল অবস্থাভেদে প্রাচীনেরা ভার্য্যা গমনের অনেকানেক বিধিব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আমরা সে সমুদয়ের উল্লেখ না করিয়া স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিমাত্র এস্থলে বিবৃত করিব।

রজোদর্শনের পর ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের রজঃকাল। ঋতুমতী ভার্য্যাকে প্রথম চারি রাত্রি সম্ভাষণ করা নিষিদ্ধ। আর্ত্তব শোণিতস্রাব নিবৃত্তি হইবার পূর্ব্বে সহবাস করিলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নানাবিধ উৎকট ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা; পক্ষান্তরে সেই সহবাসকালে সন্তানোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। এজন্য উহা একেবারে নিষিদ্ধ। রজ-স্বলা রমণী অস্পৃশ্যা, তাহা দ্বারা সম্পাদিত অন্ন অভক্ষ্য ইত্যাদি সংস্কার এখনও অনেকের মধ্যে আছে। ইহা যে একটী সদাচার, তাহা বলা বাহুল্য। অগ্ন্যুত্তাপে রজস্বলা রমণীর স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা; পক্ষান্তরে তাহার সঙ্গে কোনপ্রকার সংস্রব থাকিলে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা; এমতাবস্থায় তাহার সঙ্গে অস্পৃশ্যবৎ আচরণ অসঙ্গত নহে। যাহা-দের মধ্যে এ বিষয়ে শিথিলতা দেখা দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ব্যাধি পীড়াও দেখা দিয়াছে।

ঋতুস্নানের পর চতুর্থ রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত সহবাসকাল; এতন্মধ্যে একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি নিন্দিত। এই বিহিত কালে মাত্র প্রজাকাম পূর্ণবিঙ্ক সুস্থকায় দম্পতী পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগযুক্ত হইয়া রাত্রিকালে উত্তম শয্যায় সংগোপনে সহবাস করিবেক। এই কালমধ্যেও পঞ্চ পর্ব্বদিন অর্থাৎ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও সংক্রান্তি বর্জ্জনীয়। এই পঞ্চপর্ব্ব বর্জ্জনের কথা বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, বৃহস্পতি, পরাশর, শঙ্খ প্রভৃতি সকল ঋষিই একবাক্যে অনুমোদন করিয়াছেন। এই জন্য সুগৃহস্থের জন্য মনুর ব্যবস্থা এই—

নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত নিন্দিত ছয় রাত্রি (প্রথম চারি, একাদশ ও ত্রয়োদশ) ও অন্য রাত্রিগুলির মধ্যে আট রাত্রি (পর্ব্বদিনাদি) স্ত্রী বর্জ্জন পূর্ব্বক প্রতি ঋতুর মধ্যে মাত্র দুই রাত্রি যাহারা স্ত্রীসঙ্গ করিবে, তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে না থাকিলেও ব্রহ্মচারী বলিয়া কথিত হইবে।

মনুসংহিতায় ও অন্যান্য স্মৃতিতে ঋতুকাল ভিন্ন অন্যকালে স্ত্রীসঙ্গ করা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষেও নিন্দিত হইয়াছে।

গর্ভিণীগমনও নিষিদ্ধ; তদ্দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণের সমূহ অকল্যাণ সাধিত হয় এবং কখনও কখনও গর্ভপাত হইয়া গর্ভিণীর প্রাণ সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

কন্যাগমন, দিবামৈথুন, রজস্বলাগমন বর্জন করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন।

পীড়িত নরনারীর সহবাস একেকালে নিষিদ্ধ। অভুক্তাবস্থায়, অতিভোজনান্তে, ক্লান্ত শ্রান্তদেহে, মলমূত্রবেগ ধারণ করতঃ, প্রাতে ও সায়াহ্নে স্ত্রীসম্ভোগ করা কোন মতেই উচিত নহে। ইহা ছাড়াও অনেকানেক স্থল আছে, যে যে স্থলে দম্পতীর মিলন নিষিদ্ধ।

এই সকল বিধি নিষেধের হিসাব নিকাশ করিয়া কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি সরল ভাষায় ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন—

"মাসে এক, বছরে বার,
ইহার কমে যত পার।"

আজকাল যে স্বেচ্ছাচারের স্রোত প্রবাহিত, তাহাতে অনেক সদাচার সন্নীতি কুসংস্কার বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তাহার বিষময় ফল ফলিতেও আরম্ভ করিয়াছে। গৃহস্থমাত্রেরই সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য পালনে আমরা স্বাধ্যায়, সঙ্গ ও আহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ইহা বলিয়া আসিয়াছি। গৃহস্থের আহার তাহার পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুরূপ না হইলে চলিতে পারে না। এজন্য তাহার পক্ষে রজোগুণবর্দ্ধক খাদ্যের প্রয়োজন। গৃহীর পক্ষে মাংসাহার বিধেয়, এতদ্দ্বারা নষ্টবীর্য্যাকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে এবং কর্ম্মোৎসাহ অক্ষুণ্ণ থাকে।

উপসংহার

শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিষয়েই ভারত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, সে আজ বহুদিনের কথা; ইহাতে যাহাদের প্রত্যয় নাই, তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। শক্তিহারা না হইয়া ভারতবাসী শক্তিপূজায় প্রবৃত্ত হয় নাই, একথা ধ্রুব সত্য। বৃথা বাহ্যপূজায় যে কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, তাহা কে নির্ণয়

করিবে? ইতিমধ্যে অনেক শক্তির অপচয় ও ধ্বংস হইয়া ভারতবাসী আরও অন্তঃসার-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। দেবতার শক্তি নামিয়া আসিয়া যে ভারতকে নবজীবন প্রদান করিবে, একথা আর আজকাল প্রায় কেহ বিশ্বাস করে না। তথাপি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে শক্তি সাধনাই বর্ত্তমান যুগের সাধনা; কিন্তু সেই সাধনার ক্রম ও প্রণালী ভিন্নরূপ। বাহিরের শক্তির ভরসায় কালক্ষেপ না করিয়া ভিতরের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন দ্বারা শক্তি সঞ্চয় ও শক্তি সংরক্ষণ হয়, ইহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি; ইহাই আত্মশক্তি লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। বর্ত্তমান যুগ সমস্যার শুভ মুহূর্ত্তে আমরা স্বদেশবাসীকে এই উপায়টিকে বরণ করিয়া লইতে বলিতেছি।

আমরা এই উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এস্থলে সংক্ষেপে তাহার পুনরালোচনা করা যাইতেছে।

যৌবন সীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই কোন কোন সুকুমারমতি বালক কুসঙ্গে পড়িয়া অনৈসর্গিক উপায় রেতঃস্খলন করিতে অভ্যাস করে এবং তাহার ফলে ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন হইয়া দুর্লভ মানব জীবনের বিবিধ সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে দেশাচারের অধীন হইয়া কোন কোন যুবক অপরিণত বয়সে পাণিগ্রহণ করিয়া অকালোচিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হয় এবং তদ্দ্বারা একদিকে স্বীয় দেহমনের অবসাদ আনয়ন করে, এবং অপরদিকে স্বল্পায়ু সন্তান সন্ততি উৎপাদন করিয়া সমাজ ভারাক্রান্ত করে। এজন্য আমাদের প্রথম প্রস্তাব, বিদ্যার্জ্জনকালে বালককে ব্রহ্মচর্য্যাধীন করতঃ সর্ব্বপ্রকার কলুষিত প্রভাব হইতে রক্ষা করা। অক্ষত শারীরিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন যুবক সম্প্রদায় গঠিত না হইলে সমাজ দেহে নবশক্তি সঞ্চারের সম্ভাবনা দেখা যায় না।

আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব বালিকাগণকেও ব্রহ্মচর্য্যাধীন করতঃ নারীশিক্ষার বহুল প্রচলন করা এবং বিবাহবিষয়ে তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য স্বীকার করা। নারীর স্বাস্থ্য উপেক্ষিত; নারীর মানসিক শক্তি অবসাদগ্রস্ত। সমাজে নারীপ্রতিভার কোন প্রভাব নাই; ইহা এক অশোভন দৃশ্য। সুশিক্ষা দ্বারা নারীর মানসিক শক্তি বিকাশ করতঃ সমাজকে শ্রীসম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। "না জাগিলে সব ভারতললনা এ ভারত আর জাগে না জাগে না"—ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সমাজদেহে নবশক্তি সঞ্চার জন্য মাতৃশক্তির পুনরুদ্ধার যেরূপ প্রয়োজন, তেমন আর কিছুই নয়—ইহা এক মহাজনবাক্য। ক্ষেত্রের গুণে ক্ষীণশক্তি বীজও সুফলপ্রদানে সমর্থ হয়; আবার ক্ষেত্রের দোষে উত্তম বীজও বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। আসাম অঞ্চলের ভূমিতে মালদহ আম্রের বীজ কখনও সুফল প্রদানে সমর্থ হয় না, ইহা পরীক্ষিত সত্য। এ জন্য সর্ব্বাগ্রে মাতৃশক্তির পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। যে শিক্ষাদ্বারা নারীগণের দেহ, মন ও আত্মার পূর্ণ শক্তিলাভের সহায়তা হইতে পারে, তাহার বিধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সকল আচারব্যবহার এই শিক্ষার অন্তরায়, তাহা বর্জ্জন করিতে কাহারও কোনওপ্রকার দ্বিধা করা উচিত নয়। বালিকার বিবাহ একটী অনার্য্যোচিত নির্ম্মম প্রথা; উহার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধাহত হওয়া উচিত। তারপর বিবাহের ঐহিক পারত্রিক উদ্দেশ্যের প্রতি

অন্ধ হইয়া যে সকল পিতামাতা স্বার্থসিদ্ধির জন্য সন্তানসন্ততিকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের জীবনকে দুর্ভর করিয়া তুলিতেছেন, তাহাদের হস্ত যাহাতে সঙ্কুচিত হয়, তাহার বিধান করা'ও কর্ত্তব্য।

আমাদের তৃতীয় প্রস্তাব গার্হস্থ্যাশ্রমের সংস্কার সাধন। এস্থলেও ব্রহ্মচর্য্যমূলক সংযমের প্রয়োজন; প্রাচীনেরা সেই সংযমকে প্রজাপতিব্রত বলিতেন। এই ব্রতনিষ্ঠা হইতে অশেষ কল্যাণের আশা করা যায়।

আমাদের প্রস্তাব তিনটীরই মূলে রহিয়াছে **ব্রহ্মচর্য্য-সাধন**। নবশক্তি সাধনার ইহাই পথ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। এই সাধনায় সিদ্ধকাম হইতে পারিলে শারীরিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার অবসাদ ঘুচিয়া গিয়া সমাজদেহে পুনরায় ক্ষাত্র শৌর্য্যবীর্য্যের উদ্ভব হইবে এবং অন্তরে ঋষিশক্তির আবির্ভাব হইবে। ইহাই একমাত্র স্বারাজ্যলাভের উপায় এবং মুক্তির পথ। (সমাপ্ত)

যজ্ঞরহস্য

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইতিহাস আর বার্ত্তাশাস্ত্র থেকে প্রমাণ হয়, গাছকে যেমন সময় মত কেটে ছেঁটে দিলে তার স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তেমনি একটা জাতিরও কাটছাঁট দরকার—আর তা হয় দেশান্তরে অভিযান করতে পারলে। যে সব গরীব লোক এ দেশে কাজ না পেয়ে শুকিয়ে মরছে, তাদের যদি বিরলবসতি কোনও দেশে খেটে খেতে আমরা পাঠিয়ে দিই, তাহলে বেচারীরা প্রাণে বাঁচে এবং তাদের কল্যাণে ভারতবর্ষ জগতের দেশ-দেশান্তরে শিকড় গাড়তে পারে। আর এতে প্রাচীন ভারতের জড়ত্বও টুটে যাবে, কেননা তার বোঝা তখন হালকা হবে—তার বায়ুমণ্ডল দূষিত ও অবসাদগ্রস্ত করবার জন্য কার্ব্বণবাষ্পের পয়দাও কমবে। স্বেচ্ছায় যদি তোমরা এ কাজ কর তাহলে বুঝব, দেবশক্তিকে তোমরা কর্ম্মের রথে যুক্ত করলে। নইলে এই শক্তির চক্র নিয়ম নির্ব্বাধ গতিতে কেবল আবর্ত্তিত হয়েই চলবে, আর যে তার খপ্পরে পড়বে, তাকে পিষে মারবে শুধু; আর ঠিক জেনো, বদ্ধজলকে যদি স্বেচ্ছায় প্রবাহিত না কর, তাহলে করুণাময় ভগবান্ দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর কাঁচীতে তোমাদের কলমছাঁটা করবেনই—এখন তাতে তোমরা যাই বল না কেন। "কেউ যদি চেতন থেকে আইন মেনে চলে, তাহলে সে বেঁচে যায়, আর তারই প্রাণবস্তু

চেষ্টা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আকার ধারণ করে জীবনসংগ্রামে তাকে জয়যুক্ত করে।" প্রকৃতির কবল থেকে এমন লোকই রেহাই পায়।

কেউ হয়ত বলবে, "গরীব বেকার বেচারীরা দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হতে যাবে কেন?" স্বদেশের সম্বন্ধে যাদের ধারণা অতি সঙ্কীর্ণ, তারাই এমন কথা বলবে। তাহলে আমিও বলি, যে আঁতুরঘরে তোমার দেহটার জন্ম হয়েছিল, তা থেকেও বা বেরিয়ে আস কেন? ঘড় ছেড়ে রাস্তায় এসেই বা দাঁড়াও কেন? তুমি ধরিত্রীর ধুলার সন্তানই শুধু—উদার নীলিমার আত্মজন নও কি? তুমিও যে দিব্য-ধামবাসী, অমৃতের পুত্র—শুধু তাই বা কেন, তুমিই যে দিব্যধামস্বরূপ। তোমার 'স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্' শুধু এক জায়গায় মাটী আঁকড়ে পড়ে থেকো না। আজ ভারত নিজকে জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন করে ভিন্নপংক্তিতে বসতে পারে না। এক দিন ছিল, যখন ভারত একটা স্বতন্ত্র দেশ ছিল, পারস্য একটা দেশ, মিশর একটা দেশ ছিল। কিন্তু আজকালকার যুগে বাষ্প বিদ্যুতের কল্যাণে দেশকালের ব্যবধান ঘুচে গেছে; সমুদ্র আজ বাধা নয়—রাজপথ; প্রাচীন নগর আজ মহামানবের চলার পথ, দেশ আজ নগরের পর্য্যায়ভুক্ত আর বিশ্বজগৎ ক্ষুদ্র একটা দেশ মাত্র। কাজেই স্বদেশ বলতে যা বোঝায়, তার ভাবার্থকে প্রসারিত করবার সময় এখন এসেছে। তুমি জগন্মাতা জগৎ পিতার সন্তান—কাজেই সবই যে তোমার স্বদেশ; নিখিল মানবজাতি যে তোমার ভাই বোন্। কর্ম্ম করে যেখানে প্রাণে বাঁচবে, জগতের হিত করতে পারবে, এমন জায়গার সন্ধানে বেড়িয়ে পড়—'স্বদেশ' আঁকড়ে এই হিন্দুজাতির গলগ্রহ হয়ে আর এই লক্ষ লক্ষ কাঙ্গালীর সংখ্যাকে বাড়িয়ে তুলো না। ভগবানের নাম নিয়ে মানবজাতির কল্যাণে বেরিয়ে পড় আজ।

ভারতের দুঃখ দূর করাকে কেউ কেউ জাতীয় সমস্যা ভাবতে পারেন, কিন্তু রামের কাছে এ হচ্ছে আন্তর্জাতিক সমস্যা। কারু কাছে এটা দেশহিতৈষণা মাত্র—কিন্তু রামের কাছে এ হচ্ছে মানবহিতৈষণা। চোখের সামনে আমার ছেলেরা মরার চেয়ে আমায় ছেড়ে দূরে গিয়ে বেঁচে থাকুক্। তোমাদের বিদায় দিতে এসে রামের চোখে প্রেমের নিঝর অশ্রু হয়ে গলে পড়ছে।—যাও বাছারা।

বিদেশে গিয়ে শুধু নিজকে বাঁচাবার অধিক সঙ্গতি যদি হয় কখনো, তাহলে এদেশে ফিরে এসো। ফিরে এসে তোমার জন্মভূমিকে বিদেশে অর্জ্জিত জ্ঞানসম্ভারে সমৃদ্ধ করো। দেখনা, জাপানীযুবকেরা কেমন করে বিদেশের কর্ম্মকৌশল আয়ত্ত করে স্বদেশে তা প্রচার করছে। কিন্তু বিদেশে গিয়েও যদি কেবল নিজকে বাঁচাবার মত সঙ্গতিটুকুই শুধু হয়, তাহলে সেখানেই থাক। ভারতমাতার ব্যথাতুর বুকে কেবল জোঁকের মত কর্ম্মহীন হয়ে কিলবিল করবে—তার চেয়ে বরং আরব সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়—ভারতবর্ষে আবার ফিরে আসার চেয়ে আরব সমুদ্রের ভীষণ আতিথ্যই স্বীকার কর। স্বদেশপ্রীতি তোমার কাছে এইভাবেই সার্থক হোক্।

রাম সমস্ত জীবকেই ভালবাসেন—মানুষকেও তিনি যেমন ভালবাসেন, নির্জ্জীব প্রস্তর খণ্ডকেও তেমনি ভালবাসেন—বানরকে দেবতা বলতে তাঁর কুণ্ঠা হয় না। কিন্তু তবুও যা যেমন, তা ঠিক তেমন; যে মিথ্যাভাষী, তাকে শত ধিক্। জনবুলের বজ্রমুষ্টি হতে

আর্য্যরাও যে একটু নিষ্কৃতি পেয়েছে, তা শুধু বেচারীরা হাজারে হাজারে আমেরিকায় ছুটে গিয়েছিল বলে।

আমেরিকা বা অন্যান্য দেশকেও রাম ভালবাসেন। সুতরাং ভারতবর্ষের অকেজো আবর্জ্জনা দিয়ে তাদেরও তিনি বোঝাই করতে চান না। বাস্তবিক পক্ষে বিদেশযাত্রা তোমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল হবে। এক সঙ্গে কতকগুলি চারা জড়াজড়ি করে থাকলে তারা দুর্ব্বলই হয়, কিন্তু ঝাড় থেকে অন্য জায়গায় তাদের তুলে লাগাও, দেখবে এক একটী প্রকাণ্ড গাছ হয়েছে। তোমরা যদি অন্যদেশে যাও, তাহলে যে দেশে যাবে, যে দেশে বাড়বে, তোমরা সে দেশের গৌরব স্বরূপ হবে। আজকাল আমেরিকানরা এত বড় হয়েছে, কিন্তু তাদেরও ঠিক এই রকম হয়েছিল। তাহাদের অধিকাংশই একদিন ইউরোপের গরীব বাসিন্দা ছিল। কোনও জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাই, বিদেশনির্গমনে জাতির মাঝে কেমন শুভ একটা পরিবর্ত্তন এসে উপস্থিত হয়েছে।

যজ্ঞ সম্বন্ধে আর দুটি চারটী কথা বলবার আছে। যজ্ঞকে কখনও কখনও ত্যাগ বলে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু ত্যাগ একটী দিব্যভাবপূর্ণ কথা—তাকে কখনও অসার নিঃসহায়তা বা গা ঢেলে দেওয়া দুর্ব্বলতা বলে ভুল করলে চলবে না। কিম্বা তাকে মদান্ধ আত্মপীড়ন মনে করাও ঠিক নয়। এই দেহ ভগবানের মন্দির, নির্ব্বিবাদে একে শেয়াল শকুনের ভক্ষ্য হতে দেওয়াকে ত্যাগ বলে না। অন্যায় ও আতিশয্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার কি অধিকার তোমার আছে? যে কামনার দাস, তার কাছে দেহরূপ পবিত্র আধারটী সঁপে দেওয়া কি কোনও নারীর পক্ষে ত্যাগের মহিমা প্রচার করা বলে গণ্য হবে? ত্যাগ মানে সত্যের কাছে সব সঁপে দেওয়া। এই দেহ ভগবানেরই সম্পদ। হুঁসিয়ার থেকো, অন্যায় অবিচার যেন তোমার ন্যস্তসম্পদের উপর হস্তক্ষেপ না করে। সত্য হতে নিজকে পৃথক রেখে তার 'পর ধর্ম্মের নামে ত্যাগ দেখানো হচ্ছে পরস্ব আত্মসাৎ করা—এ হচ্ছে তহবিল তছরূপ। যা তোমার ধন নয়, তা নিয়ে দানখয়রাৎ করা কি পাপ নয়? সূর্য্যের মত সত্য স্বরূপে জ্যোতিষ্মান্ হও, স্বয়ং সত্য স্বরূপ হও। এই হচ্ছে যথার্থ ত্যাগ। একটু বিচার কর, একে কি ত্যাগ বলতে পারি? এ কি অমর মহিমা নয়? হাঁ, অমরত্ব আর ত্যাগ একই কথা। বৈদগ্ধ্য ও চারিত্র তার বহির্বিকাশ মাত্র।

ক্ষুদ্র অহংএর মাঝে যে কর্ম্মকাণ্ড শিকড় মেলেছে, তা কখনও মুক্তির পথ নয়, একথা বেদের যুগেও স্বীকার করা হত। জ্ঞান হতেই মুক্তি। তাই আজকাল যারা স্বার্থচিন্তার সুসভ্য গোলাম, গোলামীর বোঝা পিঠে নিয়ে যারা কেবল ছুটোছুটীই করে বেড়াচ্ছে, তাদের কর্ম্মকাণ্ড কখনও দুঃখ ও পাপ হতে তাদের বাঁচাতে পারে না। দুনিয়ার ধনদৌলত সে জড়ো করতে পারে, কিন্তু নিজকে সর্ব্বগত শিবস্বরূপ বলে না জানলে শান্তি কোথায়? জগতের সকল অবস্থার পরিণামের একটী মাত্র তাৎপর্য্য রয়েছে—তা হচ্ছে আত্মোপলব্ধি। বাস্তবিক যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের জীবন কেবল মাত্র ওপরভাসা কৃত্রিমতাতেই আবদ্ধ আছে, ততদিন পর্য্যন্ত যত সংস্কার যত পরিবর্ত্তনই হউক না কেন, সব কেবল শুকানো রাবিশের পরত খুলে দেয় মাত্র—আসল জমীনের সাক্ষাৎ

পাওয়া যায় না। স্বকে সর্ব্বগত জেনে যতদিন পর্য্যন্ত স্ব-স্থ না হতে পারছ, ততদিন শুধু দেহাত্মবোধের স্ফীত-ক্ষতের ওপর ন্যাকড়ার পটী ঢাকা দেবার চেষ্টাই করছ। বেদের এই জ্ঞানকাণ্ডই হল যথার্থ বেদ—ষড়দর্শনের কর্ত্তা ও বৌদ্ধ এবং জৈন আচার্য্যেরা একেই শ্রুতি নাম দিয়েছেন। ভাই হিন্দু, এই শ্রুতিকেই আশ্রয় কর। যুগপ্রয়োজন অনুযায়ী কর্ম্মকাণ্ড আর স্মৃতির পরিবর্ত্তন হোক না। তাহলেই তোমার হিন্দুয়ানীর বৈশিষ্ট্যও যেমন বজায় থাকবে, তেমনি জগতের গুরু ও নিয়ন্তারূপেও তোমরা আত্মপ্রসার করতে পারবে। এমনি করে স্থাণুত্বের অভিশাপ থেকে তোমরা মুক্তি পাবে আর নূতনের হাওয়ায় প্রাণবান্ হবে। আত্মজ্ঞানলাভ না করে যে কর্ম্মক্ষেত্রে নামে, সে যেন আঁধার ঘরে হাতড়ে বেড়ায়—কখনো দেওয়ালে ঠোকর খেয়ে, কখনো হাঁটুতে চৌকি বেধে, কখনো বা চেয়ার উল্‌টিয়ে—কত কিছু ধাক্কা গুঁতো খেয়ে। যে আলোতে চলে, তার তো কিছুতেই বাধে না। জ্ঞান লাভ না করে যে কাজ করে, সে রাস্তা চলে ঘোড়ার লেজ ধরে যেন—আর পথে পথে কেবল চাট খেতে থাকে। জ্ঞানী চলেন ঘোড়সওয়ার হয়ে—পরম আরামে, পরম আনন্দে। জ্ঞানীর কাছে কর্ম্ম তো কর্ম্ম নয়। অতি গুরুভারও স্থিতপ্রজ্ঞের কাছে নিদাঘ বায়ুতে ভেসে আসা ফুলের সৌরভের মতই লঘু। শঙ্কর বলেন, জ্ঞানী কিছু করেন না। হঁ, এ কথা তাঁর বিচারে ঠিক বলেছেন; কেননা, এমন কোনও কর্ম্মই নাই, যা জ্ঞানীর কাছে কোনও বোঝা হতে পারে; তাঁর যে সবই আনন্দ, সবই খেলা। তাঁর কাছে বাধ্যবাধকতার কিছু নাই, নিজের অবস্থার ওজন তিনি বেশ জানেন, তাঁর হা-হুতাশ নাই, আপশোষ নাই—তিনি নবীন, স্থির, কর্ম্মজ্বর হতে মুক্ত।

উপসংহার কালে ব্রহ্মযজ্ঞ সম্বন্ধে দুচার কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। মনু মহারাজ বলেছেন, এই ব্রহ্মযজ্ঞের ফলেই আত্মযজ্ঞ সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে স্বারাজ্য লাভ হয়—যা নাকি স্বমহিমার সিদ্ধ সম্পদ। জ্ঞানাগ্নিতে তোমার মমত্ববোধ আহুতি দাও; তোমার যা কিছু আসক্তি, সংস্পর্শ, আত্মপরভেদ, ঘৃণা, প্রীতি, উত্তেজনা, ভ্রূকুটী, প্রসাদ, বিলাসিতা, দেহ, মন, আত্মীয়, বান্ধব, শুভ, অশুভ, ঋণ, জিজ্ঞাসা, নাম, রূপ, লাভেচ্ছা, মোহ,—সব ছেড়ে দাও, কিছুই রেখো না। ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নিতে সব হব্যরূপে অর্পণ কর, তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বেদীতে আত্মাকে সমিদ্ধ করে এই অপরূপ হব্যের সুগন্ধে আত্মার তর্পণ কর।

তুমি যে ব্রহ্ম, এই অনুভূতিতে সব প্রলোভন ও দুর্ব্বলতা কাটিয়ে ওঠ। যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ, জগৎ তাঁর পথ ছেড়ে দূরে দাঁড়াবেই। তোমার জগতে তোমাকে রাজা হতে হবে। নইলে সে-ই তোমার ঘাড়ে চাপবে। যারা সংশয় ও সংস্কারের দাস, তাদের আর কোনও আশা নেই। তারা মিথ্যাবাদী, কেননা অহংকে তারা বৃথাই ফাঁপিয়ে তোলে। তুমি যে ব্রহ্ম—এ কথায় তোমার সংশয় আছে কি? তার চাইতে বরং গলায় দড়ি দিয়ে মর না কেন? বুক দুরু দুরু করছে? হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দাও! হাসিতে মুখর হয়ে সত্যের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়! ভয় পাচ্ছ? কিসের ভয়? ভগবানের ভয়? ও বাজে কথা। মানুষের ভয়? ও কাপুরুষতা। পঞ্চভূতের ভয়? তাল ঠুকে দাঁড়াও! নিজকে ভয়? নিজকে জান—বল, অহং ব্রহ্মাস্মি! (সমাপ্ত)

মুক্তি কি ?

—*—

[শ্রী জগচ্চন্দ্র দাস, বি, এ, ই, এ, সি]

বর্ত্তমানযুগে যাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে ধর্ম্মাচরণ দ্বারা ইহলোকে সুখস্বাচ্ছন্দ্য-সম্ভোগ করা যায় এবং পরলোকে সদ্‌গতি বা স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। পুণ্যবলে অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণের ফলে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে অপ্সরাদি সম্ভোগ করা যায় বলিয়াও কাহারো কাহারো বিশ্বাস আছে। সম্প্রদায়ভেদে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকার বিষয়ভোগকেই ধর্ম্মের পুরস্কার বলিয়া বুঝিয়া বসিয়া থাকে। ধর্ম্মসেবা দ্বারা কোনপ্রকার ভোগবাসনার চরিতার্থতা হয়, ইহা ধর্ম্মের অবমাননাসূচক কথা। ধর্ম্মের পথ ও ভোগের পথ পরস্পর বিরোধী; এক পথ উত্তর মেরুর অভিমুখে হইলে অপর পথ দক্ষিণ মেরুর অভিমুখে। ভোগের পথে ধর্ম্ম নাই; ধর্ম্মের পথেও ভোগ অসম্ভব। যাঁহারা কোনপ্রকার বিষয়ভোগকে ধর্ম্মের অব্যর্থ পুরস্কার বলিয়া বুঝিয়া ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাদের সেই বিশ্বাসের ভূমি নিরাপদ নহে; উহা একদিন না একদিন টলিবেই টলিবে।

ধর্ম্মলক্ষ্যে চিত্ত স্থাপিত হইলে উহা বিষয়-লক্ষ্যে ধাবিত হইতে পারে না। এই জন্য বাসনা বা প্রবৃত্তিমার্গে ধর্ম্মলাভের সম্ভাবনা নাই। ত্যাগের পথে, নিবৃত্তির পথেই ধর্ম্ম; যুগে যুগে ধর্ম্মান্বেষিগণ সেই পথেই ধর্ম্মের বিমলানন্দ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে প্রকৃত মুমুক্ষুর জ্ঞানের চতুঃসীমায় কোনপ্রকার লাভ বা প্রাপ্তি কামনা থাকিতে পারিবে না; এবং বাসনা ত্যাগ ক্রমেই সাধক ধ মার্গে আরূঢ় হইয়া থাকেন। সর্ব্বত্যাগের পথই ধর্ম্মপথ—ইহা সচ্ছাস্ত্রসকলের শিক্ষা।

তথাপি যে আমরা কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে স্বর্গনরকাদির উল্লেখ দেখিতে পাই—এবং তাহাতে ধর্ম্মের সেবাদ্বারা স্বর্গলাভ হয়, এবং অধর্ম্মাচরণ করিলে নরকভোগ করিতে হয় প্রভৃতি বাক্য দেখিতে পাই তাহার উদ্দেশ্য বা অর্থ—ভয় ও প্রলোভন প্রদর্শন দ্বারা অজ্ঞানীর হৃদয়ে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া। স্বর্গ ও নরক বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে (হয়ত) কোন দেশ বা স্থান নাই। ধাত্রী যেমন অবোধ বালককে শান্ত করিবার জন্য যক্ষ, ভূতাদির কল্পনা করিয়া থাকে, শাস্ত্রকারগণও সেই-প্রকার স্বর্গ, নরকাদির কল্পনা করিয়া থাকিবেন।

বস্তুতঃ স্বর্গ ও নরক বাক্যদ্বয় কোন দেশ বা স্থানকে না বুঝাইলেও উহারা অধ্যাত্মশাস্ত্রে আত্মার দুইটী অবস্থা লক্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়া আসিতেছে। নির্ব্বাসন বা বাসনাপরিশূন্য অপরিচ্ছিন্ন নিরতিশয় আনন্দের অবস্থাটিকে স্বর্গ বা স্বর্গসুখ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই স্বর্গই মোক্ষ বা মুক্তির ফল।*

* স্বর্গের পারিভাষিক অর্থও আছে—মীমাংসকেরা অক্ষয় স্বর্গ সুখের কথা বলিয়া থাকেন। উহার অক্ষয়ার্থ;

পক্ষান্তরে জীবাত্মার অষ্টপাশবন্ধন প্রসঙ্গে আমরা যে তাহার জন্মজন্মান্তর প্রসারিত অনন্ত দুঃখের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়াছি উহাই নরক। বাসনাকামনাজনিত বন্ধনই জীবাত্মার অশেষ যাতনাভোগের কারণ; সেই বন্ধন পাশ ছিন্ন করিতে পারিলেই মোক্ষলাভ বা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। এই বন্ধন ও মুক্তির বিষয়ই অষ্টাবক্রসংহিতা সংক্ষেপে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটিতে ব্যক্ত করিতেছে—

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্ণাতি কিঞ্চিৎ হৃষ্যতি কুপ্যতি॥
তদামুক্তি র্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥
তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তমসক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু॥
যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মা গৃহাণ বিমুঞ্চ বা॥

জন্মমরণাদি দুঃখভোগ আমোক্ষপ্রসারিত; কোন একজন্ম বা কোন এক মৃত্যুর সঙ্গে মোক্ষের কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। সুতরাং এই দেশের স্থায়িত্বকালের অপেক্ষায় যে ইহকাল পরকাল অথবা ইহলোক পরলোক অবধারিত হয়, তাহার সঙ্গে মোক্ষের কোন সম্পর্ক নাই। মানুষ মরিয়াই যে স্বর্গে যায়, অথবা পরলোকে মোক্ষলাভ করে, এরূপ সংস্কারও ভ্রান্তিমূলক।

মোক্ষসাধনের জন্য এই মানবদেহই বা মানবজন্মই প্রশস্ত এবং এই দেহে অবস্থান করিয়াই মোক্ষসাধন সম্ভবপর। অধ্যাত্মশাস্ত্রে সদেহমুক্তি বা জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি বা নির্ব্বাণমুক্তি বলিয়া দ্বিবিধ মুক্তির উল্লেখ দেখা যায়। সংসারের জীবিত ব্যক্তিদের যে বাসনাশূন্য জীবন, তাহাই জীবন্মুক্ত পদ। বর্ত্তমান দেহেই দেহকারণ একেবারে বিনষ্ট হইলে, দেহাবসানে আর দেহধারণ করিতে হয় না, ইহাই বিদেহ মুক্তি। "অপুনরাবৃত্তি স্বভাব নিত্য সুষুপ্তিকেই মুক্তি বলা যায়।" নিশাকালে বাসনার অভাব হইলেই সুষুপ্তি হয়; আর জাগ্রদ্দশায় বাসনার ক্ষয় হইলেই মোক্ষসাধন হয়।

বিচার দ্বারা ভ্রান্তির নিরসন হইলেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে বিষয়বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলেই অন্তর্মুখী বা আত্মাভিমুখী দৃষ্টি হয়। এই অন্তরাভিমুখ্য বা আত্মানুসন্ধানই ক্রমে ধর্ম্মসাহিত্যোক্ত ধ্যান, ধারণা এবং সমাধিতে পরিণত হয়। ধ্যান, ধারণা, সমাধিই মুক্তি-সোপান। ধ্যান, ধারণাদির দুইটি দিক আছে:—এক, বাহ্যাভিনিবেশ ত্যাগ ও অপর, অন্তর্লক্ষ্যে যোগ। বাহ্যাভিনিবেশ ত্যাগের দৃঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্লক্ষ্যে যোগের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইয়া থাকে। ধ্যান বলিলেই ধ্যেয় বা ধ্যানের লক্ষ্য আছে বুঝা যায়। স্বরূপসাধনে গুরুকে ধ্যেয় করিয়া জ্ঞানের নিরবলম্ব ভাব বা নির্ব্বিষয়ত্ব সাধন করিতে হয়। জ্ঞানের নির্ব্বিষয়ত্ব সাধিত হইতে হইতেই ধ্যানের অপর অঙ্গ স্বভাব সিদ্ধ হয়। তখন অমূর্ত্ত গুরু বা আত্মলক্ষ্যে ভিন্ন অপর লক্ষ্যে মন রসবোধ করে না*। এজন্য যোগবাশিষ্ঠ বলেন:—

"স্বরূপের অনুসন্ধান বা ধ্যান তৃষ্ণাদি কারণে বিচ্যুত হইয়া যায়; যাহার তৃষ্ণা একেবারেই নাই, সে স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া আর

*সম্বন্ধে অন্যান্য দার্শনিকরা আপত্তি করিয়াছেন। তাহাতে প্রতিপন্ন হয়—স্বর্গ ও মুক্তি এক বস্তু নহে। উভয়ের অধিকার স্বতন্ত্র। বাচস্পতির তত্ত্বকৌমুদীতে ইহার সংক্ষেপ বিচার দ্রষ্টব্য।—সঃ আঃ দঃ

কোথায় থাকিবে ? যদি ধ্যানশব্দের অর্থ নিজ স্বরূপের পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধানকে বল, তাহা হইলে উহা তত্ত্বজ্ঞানীর স্বভাবসিদ্ধ। তত্ত্বজ্ঞানী ত্রিবিধ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া বিতৃষ্ণ হইয়াছেন; তিনি সর্ব্বদাই আত্মনিষ্ঠ, তিনি ইচ্ছা না করিলেও তাঁহার ধ্যান আপনা আপনিই হইয়া থাকে।”

সুদৃঢ় ধ্যানের অবস্থাই সমাধি। সমাধি বলিলেই লোক নিশ্চল নিঃস্পন্দ কাষ্ঠপ্রস্তরাদির অবস্থাবৎ অবস্থাবিশেষকেই বুঝিয়া থাকে। এরূপ অবস্থা হঠযোগের ক্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানের সম্যক পরিবর্ত্তন না করিয়াও আনয়ন করা যাইতে পারে; উহা জড়সমাধি। জড়সমাধি ভঙ্গে বা ব্যুত্থানে ভবব্যাধির কারণ যায় না; সুতরাং এরূপ সমাধি জ্ঞানীর অভিমত নয়। জ্ঞানীর যাহা অভিপ্রেত তাহা “চৈতন্যসমাধি।” “দৃশ্যপ্রপঞ্চকের সাক্ষী চৈতন্যরূপে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে যথার্থরূপে সমাহিত বা স্থাপিত করার নামই সমাধি। যখন দ্রষ্টা সাক্ষি চৈতন্য ও দৃশ্য (জগৎ) এতদুভয়ের একতা সম্পাদক জ্ঞান দৃঢ় হয়, তখন জীব জ্ঞানস্বরূপে সমাহিত হইয়া বিশ্রাম লাভ করে।”—যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ।

এই আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠারূপ উপায়কেই যথার্থ সমাধি কহে। যিনি আপনাকে সর্ব্ববিধ দৃশ্যপদার্থের অতীত অথচ সর্ব্বময় নিরীক্ষণ করেন; রাগ-দ্বেষাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যিনি অন্তরে বিরাট্‌রূপ ধারণ করিয়াছেন অথবা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন, সমুদয় ভাবাভাব যাঁহারা জ্ঞানে সমান হইয়া যায়, তিনিই সমাহিত। যখন দেখা যায়, যোগীর ভোগবাসনা বিদূরিত হইয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, নিখিল দৃশ্য নীরস বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তিনি একমাত্র ধ্যানে তৎপর হইয়া অবিচ্ছেদে পরমাত্মায় রমণ করিতেছেন, তখন চিত্তবৃত্তির লেশ না থাকায় সমাধি তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া থাকে।

“যিনি আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হন নাই, তিনি বদ্ধপদ্মাসন হইয়া পরব্রহ্মের উদ্দেশে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেও সমাহিত পদবাচ্য হইতে পারেন না। যখন তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সকলপ্রকার বাসনা বা সঙ্কল্প একেবারে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন ধ্যানমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। যতদিন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হয়, পরমপদে বিশ্রাম লাভ না হয়, ততদিন মন বিষয়ানুসন্ধান করে; ধ্যান বা সমাধি লাভ করিতে পারে না।” সমাধিস্থ হওয়া আর স্বরূপে অবস্থান করা একই কথা এবং এই অবস্থাই মোক্ষাবস্থা।

আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব। এই স্বভাব প্রাপ্তিকেই আমরা ধর্ম্মলাভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তনই আত্মার মুক্তি বা বন্ধনমোচন। স্বভাবে বা স্বরূপে বিশ্রান্ত সাধকের নিকট এই জগৎ অদৃশ্য; স্বভাব বিলোকন পূর্ব্বক আত্মানন্দে অবস্থিত হইতে পারিলে স্বাদু রসায়নও বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি জাগ্রৎ অবস্থায়ও বাসনাহীন ও বিষয়রাগশূন্য হইয়া সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করেন। “যখন সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প প্রশান্ত হইয়া যায়, জাড্য-নিদ্রা যখন থাকে না, তখন যে নিশ্চল ভাবে অবস্থান, তাহাই স্বরূপস্থিতি নামে অভিহিত হয়। অন্তরে আমিত্ব অংশ বা বাহিরে ভেদবুদ্ধি যখন একেবারে প্রশান্ত হইয়া যায় অর্থাৎ সমস্তই নিঃস্পন্দ হইয়া যায়, তখন জাড্যদোষরহিত যে চিৎ স্বপ্রকাশমান থাকেন, তাঁহাকেই স্বরূপ বলা হয়।” এই

স্বরূপে অবস্থানই ধর্ম্মসাধনের চরম লক্ষ্য মোক্ষলাভ।

জড় উন্মত্ত পিশাচবৎ ত্রিবিধ অবস্থায়ই মুক্তকে দেখা যায়। স্বপ্নদৃষ্ট সুখভোগ যেমন স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান হইলে তাহাতে কাহারও স্পৃহা থাকে না, এই বিষয়ভোগ তেমনি প্রবুদ্ধ ব্যক্তির রুচিকর হয় না। স্বভাবতঃ ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিহারই জীবন্মুক্তের প্রধান লক্ষণ। জীবন্মুক্তগণ অর্দ্ধসুপ্ত অর্দ্ধপ্রবুদ্ধের ন্যায় শূন্যহৃদয় হইয়া যথাস্থিতভাবে অবস্থান করেন এবং যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মের আচরণ করেন; সেই কর্ম্মও এত অনবহিত হইয়া করেন যে, পরক্ষণেই করেন নাই বলিয়া বোধ করেন। বাহ্যকর্ম্মকরণ সময়ে মনোগতি স্থির থাকে বলিয়া মন কিছুই জানিতে পারে না যে তিনি কি করিলেন। চিত্তের চিত্তদশা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া কোন কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান জন্মে না।

ব্যবহারিক কার্য্যে অজ্ঞও যে প্রকার, জ্ঞানীও সেইরূপ; তবে বাসনার বিভিন্নতায় এক জন বদ্ধ, অপর জন মুক্ত। যিনি বাসনা ছেদন পূর্ব্বক জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ থাকিলেও বিমুক্ত; আর যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আবদ্ধ, কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতে বিমুক্ত হইলেও তিনি বদ্ধ। অজ্ঞ ব্যক্তির বুদ্ধি দৃশ্যবস্তুর সম্বন্ধমাত্রই গাঢ়রূপে রঞ্জিত হয়; এইজন্যই দৃশ্যবস্তুর অভাবকালেও সেই রঞ্জিতভাব অর্থাৎ সুখ দুঃখ দূর হয় না। স্ফটিকে যেমন পদ্মরাগ ইন্দ্রনীলমণি প্রভৃতির বর্ণ প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু সংলগ্ন হয় না, তত্ত্বজ্ঞের হৃদয় সেইরূপ সুখ দুঃখ সম্পৃক্ত হয় না। বীতরাগ মানব ব্যবহারী হইলেও কদাচ সুখ-দুঃখ রূপ রজ্জুদ্বারা আকৃষ্ট হয় না।

আত্মতত্ত্ব বোধ মাত্রেই ভোগবাসনার ক্ষয় হইয়া থাকে; স্বাত্মতত্ত্ব অপেক্ষা ভোগ সমূহ জীবন্মুক্তের অভিমত নহে। সুস্বাদু খাদ্যভোজনে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া কোন্ ব্যক্তি কদন্নভোজনে আকাঙ্ক্ষা করে? তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পর যদি কখনও যোগী সাংসারিক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়েন, তাহা হইলেও সেই বিক্ষেপ বিলয়ে আবার তিনি তত্ত্বসাক্ষাৎকারেই ধাবিত হয়েন। তাঁহার হৃদয় সদাই শান্তিসুখে পরিতৃপ্ত থাকে; কোন বিক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলে বিক্ষুব্ধ ভাব আপাতদৃশ্য মাত্র।

নির্ব্বিকল্প, স্বপ্রকাশ, নিরতিশয় আনন্দই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ; সেই ব্রহ্মরূপে অবস্থিতিই মুক্তি আর উহার অভাবকে অর্থাৎ অতদ্ভাবকে বন্ধন কহে। জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, আর সত্য স্বরূপবোধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা একই কথা। সত্যবোধ ও মোক্ষ এক পর্য্যায়।

যাবৎকাল শরীর, তাবৎকাল বিষয়াসক্তিবিহীন ধীর ব্যক্তিরাও বিষয়াসক্তের ন্যায় সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন; ইহা তাঁহাদিগের ব্যবহারিক ভাব—আন্তরিক নহে। যেমন সূর্য্যের সলিলস্থ প্রতিবিম্বই চঞ্চল হইয়া থাকে, কিন্তু গগনসূর্য্য কখনও সেরূপ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানিগণও লৌকিক নিয়মের বাধ্য হইয়া বাহ্য শরীরের চঞ্চলতা দেখাইয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের বিজ্ঞানদেহ সতত একভাবাপন্ন। তত্ত্ববিদের যে কখন কখন মোহ দেখা যায়, উহা অজ্ঞচেষ্টার অনুকরণ মাত্র, বাস্তবিক নহে। বিষয়রসবোধ জীবন্মুক্তিকালেও থাকে না; নির্ব্বাণমুক্তিকালেও থাকে না।

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

* * *

ভাবের অঙ্কুর

—:{*}:—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

সন্নিকর্ষে প্রীতি

নবম ভাবাঙ্কুর—"প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।" শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি।" ভাবের ইহাই শেষ অভিব্যক্তি।

আস্বাদনের ভূমিকাস্বরূপে একটী কথা আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ভাবের বস্তু হইতে আমরা যতক্ষণ দূরে থাকি, সাধ্য সাধন রূপ দ্বৈতগর্ভ সংস্কার ততক্ষণ আমাদের প্রবল থাকে। তখন সাধনকে আশ্রয় করিয়া আমরা সাধ্যবস্তুকে উদ্দেশ করি। তটস্থলক্ষণের মননে বিশ্লেষণে ও অনুশীলনে তখন স্বরূপজ্ঞান হইয়া থাকে। সাধনার জগতে ইহাও যেমন সত্য,—তেমনি বাধাবন্ধহারা হইয়া একেবারেই সাধ্য বস্তুর মাঝে কি এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণে আমরা তন্ময় হইয়া যাই, ইহাও সত্যের আর এক দিক। যতদিন আমার জীবভাব প্রবল, ততদিন ভগবান্ সাধনের ধন। সে সাধনায় তাঁহাকে পাওয়া যায় কি না, তাহা জানি না, তবে আকুলতা যে বাড়ায় তাহা মানি। এই জীবভাবের কলুষ কাটিয়া গেলে বুঝি, তিনি অসাধনের ধন—তাঁহাকে না চাহিতেই পাওয়া যায় এবং না চাহিলেই পাওয়া যায়, কেননা তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ যে নিত্যসম্বন্ধ। এই নিত্যসম্বন্ধই প্রীতি—উহা সাধ্য সাধনার বাহিরে। শেষের এই কয়েকটী ভাবাঙ্কুর এমনি অসাধনেরই সঙ্কেত। ইহারা চিত্তে আপনি ফুটিয়া ওঠে,—সহজ আনন্দের স্রোতে ভাবুককে ভাসাইয়া নেয়। কাজেই ইহাদের সাধনোপায় নির্দ্দেশের চেষ্টা অনর্থক; ইহারা কেবল আস্বাদনের বস্তু।

নামে রুচি, গুণাখ্যানে আসক্তি, আর সন্নিকর্ষে প্রীতি—এই তিনটী বিভাব লক্ষ্য করিলে দেখি, একটী আর একটীকে যেন ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। রুচি, আসক্তি, প্রীতি—এই তিনটী কথাই তাহার প্রমাণ। মূলে ভাব সেই একই, কিন্তু তাহারি গাঢ়তার তারতম্য আছে। রুচিতে চিত্ত উন্মুখ হয়, আসক্তিতে উন্মুখ চিত্তকে ফিরাইয়া আনিবার ক্ষমতা রহিত হয়, আর প্রীতিতে অবশচিত্ত ইষ্টবস্তুতে তন্ময় হইয়া যায়।

আগে নাম শুনিয়া পাগল হইয়াছিলাম; তার পর সেই নামই যেন তাহার অনন্তগুণের দ্যোতনা লইয়া হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। এমন কি কাহারও হয় না? আমার তো মনে হয়, যেখানে ভালবাসা আছে, সেখানে এমনটীই হয়—প্রিয়জনের নাম শুধু অক্ষরসমষ্টি নয়—সে যে মধুর, সে যে চতুর, সে যে রসিক, তা তার সেই নামেই যেন বলিয়া দেয়। হয়ত বা তাহার গুণের কথা অন্যের কাছেও শুনি, অথবা আপনিই হয়ত ভাবাবেশে আঁচিয়া লই; কিন্তু কেহ বলিয়া দিবার না থাকিলেও শুধু তাহার নামটী শুনিয়াও কি ইষ্টগুণের সংযোগে তাহার মূর্ত্তিটী গড়িয়া তুলি না? যাহার নামটী আমার কাছে এমন মধুর লাগিয়াছে,

সে যে আমার মনের মত না হইলে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাই দেখি, তাহার মধুর নামই কি এক অনির্ব্বচনীয় মায়ার বলে তাহার মধুর গুণাবলীর সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু মাধুর্য্যের বিলাস তো এখানেই শেষ হইল না। নাম যদি গুণ আনিয়াছে, তবে সেই গুণ এবার আনিবে রূপ। নাম যেন আদি কারণ বা নিমিত্ত, গুণ যেন সূক্ষ্মের আভাস—অবশেষে রূপে তাহার স্থূল অভিব্যক্তি। এইখানে সাধকের উপযোগী একটা কথা বলিয়া রাখি। রূপের পিপাসা সকলের মাঝেই, ইষ্ট বস্তুকে সবাই দেখিতে চায়, কিন্তু পায় না। দেখিবার উপায়—নাম। নাম কর, তাহার অনির্ব্বচনীয় গুণরাশি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে এবং সেই গুণ ঘনীভূত হইয়া রূপে অভিব্যক্ত হইবে—চোখে দেখার সাধ সেদিন মিটিবে। নামের এই অতর্ক্য শক্তি আছে—গুণসংগ্রহণে তাহার আশ্চর্য্য পটুত্ব। দার্শনিকও জানেন, সৃষ্টির আদিম ক্ষণে মহাকাশ স্পন্দিত হইয়া নামের অভিব্যক্তি হইল, সেই নাম ধরিয়া ধাতার মানস পটে গুণরূপে বস্তুর সূক্ষ্মসত্তা জাগিয়া উঠিল এবং পরিশেষে তাহা রূপে পরিণত হইল। আদি স্পন্দনের মূলে ভাব, রূপে তাহার চরম পরিণতি বা ঘনীভাব। বাস্তব জগতেও ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি আমাদের জীবনে ঘটিতেছে। সমাহিত হইয়া ধারণা করিতে পারিলে এ রহস্যের সন্ধান পাইবে।

রূপের প্রয়োজন আসঙ্গ। এই আসঙ্গ পিপাসা যে দিন চরিতার্থ হইবে, সেইদিনই জীবন সার্থক, রতির পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। কিন্তু সে হইল শেষের কথা। ভাবে আসঙ্গের লালসা জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তৃপ্তি এখনও হয় নাই। ভাবের মাঝে সর্ব্বত্রই বিচ্ছেদের বেদনা, বিরহের উৎকণ্ঠা রহিয়া গিয়াছে। ভাবের লক্ষণ বিচারেই ইহা পাওয়া যায়। ইষ্টবস্তু আর আমি, একই পদার্থ—মাঝে শুধু স্পন্দমান আমার চিত্তটী। চিত্ত উজ্জ্বল ও মসৃণ হইলে যে ইষ্টসমাগমের আভাসযুক্ত আনন্দের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহাই ভাব। সুতরাং এখানে মিলন সম্পূর্ণ নয়। তাহাকে পাই, অথচ পাই না—এই লুকোচুরী লইয়াই ভাব। তাই সে নামী, সে গুণী, সে রূপী—ইহা ভাবরূঢ় চিত্তের গাঢ় অভিনিবেশেরই ফল। এই জন্যই ভাবুকের কাছে রূপও অপেক্ষিত।

তাঁহাকে পাইয়াও পাই না—এই যে মনোব্যাকুলতা, ইহাই অজ্ঞাতসারে আমাকে তিনি যেখানে আছেন বা ছিলেন, সেখানে টানিয়া লইয়া যায়। সেখানে গিয়া কিছু লাভ আছে কি? তাহা জানি না, কিন্তু বিন্দুমাত্র আসঙ্গের সম্ভাবনা যেখানে আছে, বাঁশীর সুরে মুগ্ধ কুরঙ্গিণীর মত অবশ চিত্ত সেইখানেই ছুটিয়া যায়। এই আসঙ্গলিপ্সা কোথা হইতে আসে? আমাকে আমি যে আকারে পাইয়াছি, ইষ্টজনকেও সেই আকারে পাইতে চাই—ইহাই আসঙ্গের মূল। চাহিয়া দেখ, জগৎ জুড়িয়া এই আসঙ্গের লীলা দেখিতে পাইবে। শুধু মনের মতন নয়, সবাই নিজের মতন ইষ্টজনকে বাছিয়া লইয়াছে। যেখানে বিন্দুমাত্র বৈষম্য রহিয়াছে, সেইখানেই ভাব মূর্চ্ছিত, প্রীতি অভিশপ্ত। সমান রূপ, সমান গুণ, সমান বয়স—এই তো প্রীতির নিদান। সবাই ইষ্টজনকে ঠিক আপনার মত করিয়াই চায়, তাই কোনও ন্যূনতাতেই অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয় না।

আমি রূপী, আমি বিশিষ্ট;—আমার ইষ্টজন, তিনি জ্ঞানাভিমানীর কাছে যত বড়ই

হউন না কেন, আমার তাহাতে মন মজিবে কেন? আমিও চাই, আমার আপন যে, সে আমার মতই হইয়া রূপ ধরিয়া দেখা দিক্। তুমি বল, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতে রহিয়াছেন। সে কথা জানি, কিন্তু তাহাতে আমার সুখ হয় না। আমি চাই, সে আমার আঙ্গিনায় আসিয়া মোহন ভঙ্গীতে দাঁড়াক্, আমার কোল জুড়িয়া আমার বুক ভরিয়া থাকুক। এই জন্যই যদি শুনি, কোথায়ও সে ভাবুকের আবদার রাখিতে গিয়া এমনি করিয়া রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল, হাসিয়াছিল, মানুষের সঙ্গে মানুষ হইয়া খেলিয়াছিল ;—তবে সে স্থানটীর প্রতি আমার বড় লোভ হয়, আমার ইচ্ছা হয়, তার পায়ের ধূলায় পুণ্য সে স্থানে গড়াইয়া লই, স্পর্শরসের আভাস একটু হয়ত পাইব ; প্রাণ ভরিয়া সে স্থানের বাতাস বুকের মাঝে টানিয়া লই—তার সুতনুর সৌরভ একটু বুঝি বা পাইব। শুধু তাই নয় ; আমার মন যাহাকে তাহার আপন জন বলে, এমন মানুষ যেখানে পাওয়া যায়, ইচ্ছা হয়, সব ফেলিয়া সেখানেই চলিয়া যাই—কবির ভাষায় বলি—

যারে দেখলে প্রাণে ঢেউ ওঠে—
যারে দেখলে মন নেচে ওঠে—
হরি নাম আপনি ফোটে—
এমন মনের মানুষ মিলে কই ?
পাই যদি সে মনের মানুষ,
পরশেতে তার সোণা হই—
তার শীতল বুকের ছায়া লই—
কোল দিয়ে তারে বুকে লই !

হয়ত বা চুপি চুপি আমার মন বলে, এই বুঝি সে—জন্ম জন্ম ধরিয়া যাহাকে খুঁজিয়াছ, অরূপ অগম ভাবিয়া দিবানিশি যাহার জন্য ঝুরিয়া মরিয়াছ। মন-ভোলানো সে কথায় যদি আমার মন মজে, বাস্তবিকই আমার চঞ্চল আঁখিতারার কালো নিকষে কষিয়া যদি সে সোণার পুতুলীকে চিনিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমি কি মন্দ করিলাম ?

অভিমানী পণ্ডিত বলিবেন, এইখানে তুমি ভুল করিলে। এই যে সজাতীয়ের আকর্ষণের কথা তুমি বলিলে, এ আর নূতন কি ? জগৎ জুড়িয়াই তো এই আসঙ্গের লীলা দেখিতেছি—আকীট পশুপক্ষী পর্য্যন্ত। তারা সবাই কি ভাবুক ? বিশিষ্টের সহিত বিশিষ্টের বন্ধনেই কি রসের স্ফূর্ত্তি হয় ? যাহা মনোবাণীর অতীত ছিল, তাহাকে তোমার চিত্তের বেড়াজালে বন্দী করিয়া নামাইয়া আনিয়া তুমি এমন কি পুরুষার্থ করিলে ? আমি বলিব, ভাই, রাগ করিও না। একবার ভাল করিয়া আমার দিকে চাহিয়া দেখ, আমার অবস্থা বুঝিয়া দেখ। যে অরূপ ও অগম বস্তুর কথা তুমি বলিতেছ, তাহাকে কি আমি খুঁজি নাই মনে করিয়াছ ? সেই বস্তুর সন্ধানেই তো ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলাম। যোগ, জপ, তপ, কৃচ্ছ্রসাধনের যত কিছু উপায়, কোনটাই তো চুঁড়িতে বাকী রাখি নাই। আজ যে রসের পিপাসায় আমার কণ্ঠ জ্বলিয়া গেল, সে তো এই সাধনার আগুন বুকে পুরিয়া বেড়াইয়াছি বলিয়া। কিন্তু সব পথ খুঁজিয়া দেখিয়া অবশেষে আবার সেই সহজ পথই ধরিয়াছি—যেখান হইতে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, আবার সেইখান হইতেই সুরু করিয়াছি। মানুষ হইয়া অমানুষের পথে চলিয়াছিলাম মনের মানুষ পাইব বলিয়া ; কিন্তু অবশেষে দেখি, এই মানুষের মাঝেই যে সেই মানুষ লুকাইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমাকেও যে আবার সহজ মানুষের পথই ধরিতে হইল।

কিন্তু এই যে সহজ, এ হইল বিপরীত দিকের সহজ। তুমি মাটীর টানে মাটীর সঙ্গে বাঁধা, আকাশে উড়িতে পার না, তাই পাখীর গতি তোমার পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু কোন কৌশলে মাটীর আকর্ষণ কাটাইয়া যাও, দেখিবে, আকাশে ওড়াই তোমার পক্ষে সহজ। ভাবের মানুষ যে মাটীতে পা রাখে না, সে যে আকাশে উড়িয়া চলিয়াছে—সাধারণে তাহা বুঝিবে কি করিয়া? সে ভাবে, আমি যেমন, ও-ও তেমন। তাই সে অবাক্ হইয়া ভাবে, অরূপ ছাড়িয়া রূপের ভজন যদি রসের সাধন হইল, তাহা হইলে আমরা আর কি দোষ করিলাম? ভাবুক বলেন, হাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু তোমার পথ কত কঠিন—নহিলে অত মাথা কুটিয়াও তো রূপ নিঙড়াইয়া এক ফোঁটা রস বাহির করিতে পারিলে না। কঠিন পথ ছাড়িয়া আমার মত সহজ হও, তুমিও রূপে রসের সন্ধান পাইবে। প্রাকৃত বুদ্ধিতে এ রহস্য ধারণা হয় না, তাহারা শুধু অবাক্ হইয়া ভাবে, এ-ও একটা সাধন?

শ্রুতি যাঁহাকে সর্ব্বগত সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বলিতেছেন, ভাবুক আবার বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার প্রিয় এবং রম্য একটী বসতি আবিষ্কার করিয়াছেন—সেই বসতিস্থলের প্রতি তাঁহার বড় প্রীতি। এই যে প্রাকৃতজনের মত সকল বিভাব হইতে বাছিয়া বিশেষ গুণে, বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে চিত্তকে আবদ্ধ করা, ইহা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হইলেও সাধনার বিশেষ পরিপাকে ইহারও একটা অপেক্ষা আছে। যাহা সত্য, তাহা সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ। প্রাকৃত জগৎকে তুমি হাজার মিথ্যা বলিয়াও উড়াইয়া দিতে পারিবে না। ধর, সুন্দর দেখিয়া তোমার আঁখি মজে, সুস্বরে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়; তুমি বিশ্লেষণ করিয়া চক্ষু-কর্ণের যান্ত্রিক-বিধানের তত্ত্ব বুঝিলে, দৃশ্য ও শ্রব্য বস্তুর ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলে, তোমার জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটিল, তুমি কৃতার্থম্মন্য হইয়া বলিলে, "ওঃ, বুঝিয়াছি, এই হইতে এই হয়!" কিন্তু তাহা হইলেই কি দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের সংযোগে যে আনন্দের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা হইয়া গেল? কিসে হইতে কি হয় বুঝিয়া সজাতীয় সমস্ত বস্তুকে এক পর্য্যায়ে ফেলিতে পারিলেই আর কাহারও সুন্দর দেখিয়া মুগ্ধ হইবার বা সুস্বর শুনিয়া আকুল হইবার প্রয়োজন থাকিবে না?

তাই বলি তত্ত্ববিচারে যাহা নির্ণীত হয়, তাহা যদি সত্যের এক দিক হয়, তাহা হইলে আনন্দের আস্বাদনে যাহা নিরূপিত হইবে, তাহাও সত্যের আর এক দিক। তাহাকে বর্জ্জন করিলে তো তোমার সত্যানুসন্ধিৎসা পূর্ণ হইবে না। যাঁহারা অনুভবে রসিক, তাঁহারা জানেন, সত্যের এই দুইটী কোটীর একান্ত মিলনে স্বভাবের স্ফূর্ত্তি—তাই অরূপে-রূপে নির্গুণে সগুণে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে—ভাবুক এক একবার এই কূল হইতে সাঁৎরাইয়া ওই কূলে যাইতেছেন, আবার ওই কূল হইতে সাঁৎরাইয়া এ কূলে আসিতেছেন।

বড় সঙ্কোচের সহিত একটা কথা বলিতে হইতেছে। এই যে রূপরসের জগৎ, যাহার প্রতি প্রাকৃতজনের এত প্রীতি, তাহাকে মুমুক্ষুর নিকট বিভীষিকা বলিয়া বর্ণনা করিতে চিরদিন শুনিয়া আসিয়াছি। কথাটা যে নিতান্তই অসার, তাহা কিছুতেই বলিতে পারি না। কিন্তু ব্যক্ত জগতে থাকিয়া মানুষ যখন অব্যক্তের দিকে হাত বাড়ায়—সেখানেও যে জয়ের

কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে, এ কথাটা বোধ হয় সে ততটা খেয়ালে আনে না। হয়ত মনে করে, কোনও রকমে এই স্বপ্নদৃষ্ট বিভীষিকার হাত হইতে বাঁচিতে পারিলেই বুঝি পরম-পুরুষার্থ লাভ হইল। কিন্তু নিঃস্বপ্নের রাজ্যেও যে গুরুতর বিভীষিকা থাকিবার সম্ভাবনা আছে, সেখানেও যে ভুল হইবার, বিপাকে পড়িবার বহু অবকাশ রহিয়াছে, তাহা হয়ত সে জানে না। শ্রুতিতে, স্মৃতিতে এই বিভীষিকার কথা স্থানে স্থানে আছে। অব্যক্তের সাধকদের মতবাদ আলোচনা করিয়াও অনেক সময় পরমার্থের অসম্যকজ্ঞান হেতু তাঁহাদের একদেশদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। অতল গহ্বরের সীমানায় পতনোন্মুখ হইয়া বসিয়া তাঁহারা হয়ত ভাবে, বেশ নিশ্চিন্ত আছি।

আমার এই কথা গুলি বলার তাৎপর্য্য কোনও পথকে ছোট প্রতিপন্ন করা নয়। আমি বলি, দ্বন্দ্ব মিটিয়া যাউক; ব্যক্ত আর অব্যক্তে যে আনন্দময় সন্ধি রহিয়াছে, সেই মধুর মিলনরসে তোমাদের চিত্ত রসিয়া যাউক। স্বভাবের প্রেরণায় যখন যেদিকে তোমাদের আকর্ষণ গুরুতর বলিয়া বোধ হয়, সেই পথেই চল, কিন্তু অপর পথের অমর্য্যাদা করিও না বা তাহাকে ভুলিয়া থাকিও না। যদি অব্যক্তের পথে তোমার গতি হয়, তবে কেন্দ্রহারা অসীম পরিধির পরিকল্পনায় উধাও হইয়া যাইও না; আমিত্বের স্থিরতর বিন্দুতে নিজকে ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে, নতুবা শক্তিবশ্যতা দূর হইবে না, এই কথাটী মনে রাখিও। আবার ব্যক্তের মাধুরীলীলা আস্বাদন করিবার ব্যগ্রতা যাহার মাঝে, তাহাকেও বলি— একেবারে অব্যক্তের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিও না। অব্যক্ত অরূপ হইলেও সকল রূপের প্রস্রবণ, প্রাকৃতরস বর্জ্জিত হইয়াও সর্ব্বরসাধার। অব্যক্তে নিষ্ঠা না রাখিলে দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবে না।

সার কথা, অভাববোধ থাকিতে ভাবের ভজন হইতে পারে না। আর স্বভাববোধ যাহার না হইয়াছে, তাহার অভাব দূর হইবে কি করিয়া? যাহাকে আনন্দরসচিন্ময়তনু বলিতেছ, তাহাকে পাইতে হইলে এই অভাবের লালসায় জর্জ্জরিত তনুমনকে যে একান্তভাবেই নিরস্ত করিতে হইবে। তাই তপস্যা সকলের মূলে; বৈরাগ্য সকল পথের পরম প্রয়োজন। বৈরাগ্য বলিতে বুঝি চিত্তের কষায়িত ভাব দূর করা—বিষয়ের ধ্বংস সাধন নয়, কেননা তাহা অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন। তবে অবস্থা বুঝিয়া বিষয়-সন্নিকর্ষ বর্জ্জন করিতে হইবে বই কি। প্রাকৃত জনের মাঝেও ভাবুকতা আছে, নহিলে সংসারে সে আনন্দ পাইত কোথা হইতে? কিন্তু সেই আনন্দকে নিরালম্ব করিয়া তোলাই ভাবের সাধনা। এই জন্য আনন্দের প্রাকৃত আশ্রয়গুলিকে একটু একটু করিয়া সরাইয়া নিতে হয়, অথচ আনন্দের ব্যঞ্জনাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইতে হয়। ভাবাঙ্কুরের প্রথম ছয়টী বিভাবে ইহারই সাধনা; এই ছয়টী আয়ত্ত হইলে নিরালম্ব আনন্দের দ্যোতনা আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিবে—তখনই ভাবের বিলাস আরম্ভ হইবে। ব্যক্তে অব্যক্তে, রূপে অরূপে তখন সন্ধি হইবে—জীবন কৃতার্থ হইবে। ওঁ শান্তিঃ। (সমাপ্ত)



স্বামী রামতীর্থ

—:{*}:—

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যথোপযুক্ত পারিপার্শ্বিকের অভাবে ভারতীয় ছাত্রজীবনের সনাতন আদর্শ তীর্থরামের জীবনে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ পায় নাই এবং ইহা হইতেই তাঁহার জীবনে দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হই য়াছে। ইহা হইতে এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে আদর্শের বীজ তাঁহার মাঝে নিহিত ছিল, এসম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই, নতুবা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাঁহার লড়াই করিবার কোনও প্রয়োজন হইত না। এই আদর্শটী কি আমরা সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে দেখিতে পাই, শিক্ষা শুধু একটা উপলক্ষ্য মাত্র নহে, সাধনরূপে উহা জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নির্দ্দিষ্ট বয়সে গুরু সকাশে উপনীত হইয়া শিক্ষার্থী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া বেদাধ্যয়নে রত হইত। এই ব্যবস্থার মধ্যে মনুষ্যজীবনের সার্ব্বভৌম শিক্ষা ও জাতীয় জীবনের বিশিষ্ট শিক্ষা—উভয়েরই সুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতিই যুগব্যাপী অনুশীলনের ফলে কতকগুলি বিশিষ্ট সম্পদের অধিকারী হইয়া থাকে। পুরুষ পরম্পরায় সন্তানসন্ততির মধ্যে সেগুলি সঞ্চারিত করা জাতীয় জীবনের একটী অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত জীবনের আদি মুহূর্ত্তে শিক্ষাব্যপদেশে কোনও জাতি যদি এই প্রকার জ্ঞানসঞ্চারণের ব্যবস্থা করে, তবেই তাহার শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা বলিতে পারি। কি প্রাচীন কালে, কি আধুনিক কালের সুসভ্য দেশসমূহে, এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালীতে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অনুবর্ত্তন আমরা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। কেবল দেখি না আমাদের এই ভারতবর্ষে। প্রাচীন গ্রীস, রোম সাধনা করিয়া যাহা পাইয়াছিল, সন্তানকে তাহা শিখাইতে ত্রুটী করে নাই; বর্ত্তমান ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান সাধনা দ্বারা যাহা অর্জ্জন করিতেছে, তাহা পুরুষানুক্রমে সন্তানসন্ততিতে সংক্রামিত করিবার যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছে। কেবল আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে দেখিতে পাই—আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে, আমাদের সমাজের অন্তঃস্থলে, আমাদের পল্লীসমাজে, আমাদের পারিবারিক জীবনের মর্ম্মদেশে যে সমস্ত জ্ঞান আবহমান কাল হইতে অনুশীলিত ও সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, শিক্ষাক্ষেত্রে গিয়া তাহার কোনওটারই সাক্ষাৎ মিলে না। ফলে শিক্ষার মন্দিরে দেখি ছাত্রের এক রূপ, আবার সমাজে দেখি তাহার আর এক রূপ; তাহার ছাত্রজীবনে এক কৃত্রিম আদর্শ, আবার পরবর্ত্তী সংসার জীবনে বাস্তবের পীড়নে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত এক আদর্শ। শিক্ষাজনিত এই বৈষম্যে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে যে কত অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এই তো গেল জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক ব্যবস্থার ভেদ। আবার সমগ্র মানবজীবনের লক্ষ্য হিসাবে বিচার করিলে

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর ত্রুটী দেখিতে পাই। মানুষের জীবনের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, সাধনার তারতম্য ও জ্ঞানের গভীরতা অনুযায়ী সে সম্বন্ধে মতভেদ অবশ্যই হইবে। শুধু ইহকালব্যাপী একটা জীবনকে লক্ষ্য করিয়াই ভারতবর্ষ শিক্ষার বনিয়াদ গড়ে নাই; সাধন দ্বারা সে বুঝিয়াছে, মানবজীবনের চরম নিয়তি মুক্তিলাভ এবং তাহা জন্মজন্মান্তরের সাধন-সাপেক্ষ। অল্প কথায় বলিতে গেলে ইহকাল এবং পরকাল, ইহজন্ম এবং জন্মান্তর এই লইয়াই ভারতীয় আদর্শের সহিত অন্যান্য দেশের আদর্শের ভেদ। নিয়তিকে যে শুধু এক জন্মের কর্ম্মফলের মাঝেই আবদ্ধ রাখে, সে শুধু সেই জন্মের উপযোগী উপকরণের আয়োজন সংগ্রহ করিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যে জানে, ভোগ করিবার জন্য শুধু এই একটী জন্মমাত্রই পাওয়া যাইবে, সংযম সম্বন্ধে যে তাহার শৈথিল্য উপস্থিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। তাহার সংযম শুধু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংহতির জন্য প্রয়োজন—উহার আধ্যাত্মিক সার্থকতা তাহার কাছে তত সুস্পষ্ট নহে; এমন কি অনন্ত স্বর্গের প্রলোভন এবং অনন্ত নরকের বিভীষিকাও কখনো তাহার জীবনে সংযমকে স্বভাবসঙ্গত করিয়া তুলিতে পারিবে না। এইপ্রকার আদর্শের সহিত ভারতীয় আদর্শের তুলনা করিয়া দেখিলে শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিরোধের মূল সূত্রটী আবিষ্কৃত হইবে। ভারতবর্ষ সংযম শিক্ষাকেই শিক্ষার মূলসূত্র বলিয়া নিরূপণ করিয়াছে—ইহাই ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত। তাহার উদ্দেশ্য, মোক্ষানুকূল সংস্কারকে জীবনের প্রথম দশাতেই সুস্পষ্ট করিয়া তোলা—কেননা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, মোক্ষই মানবাত্মার চরম নিয়তি। সংযমকে যাহারা নীরস ও কঠোর বলিয়া মনে করে, তাহারা শুধু একটা জন্ম ধরিয়াই তাহার প্রয়োজনীয়তা বিচার করে, জন্মজন্মান্তরের ব্যবধানবর্ত্তী চরম নিয়তিকে লক্ষ্য করিয়া ইহজীবনের নিয়ন্ত্রণও যে শিক্ষার অঙ্গ হইতে পারে, এ কথাটা হয়ত তাহারা খেয়াল করে না। বাস্তবিক যদি সংযমে কোন কঠোরতা থাকে,—তবে সুদূরবর্ত্তী লক্ষ্যের বিচারে যে তাহা সুসহ হইতে পারে, একথা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। কিন্তু এই সংযম যে শাস্ত্রবিহিত কাঠোর নয় এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তাতেই যে ইহার সার্থকতা, ভারতীয় সনাতন শিক্ষাপদ্ধতিও তাহা যুগে যুগে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে সংযম যত কাঠিন্যের সৃষ্টি করুক না কেন, অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট উহা সম্পূর্ণ স্বভাবানুকূল ও সপ্রয়োজন বলিয়া প্রতিভাত হয় কিনা, তাহা সাধকমাত্রেই অবগত আছেন। শুধু তাহাই নহে; আমি যাহাকে স্বভাবানুকূল বলিয়া অনুভব করিতেছি, শক্তি থাকিলে আমার সাহচর্য্য দ্বারা অপরকেও আমি তাহা অনুভব করাইতে পারি—এই সত্যের উপর ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। আর আত্মোন্নতিকে লক্ষ্য করিয়া সংযম প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া কি সমাজে, কি পরিবারে, কি রাষ্ট্রে, অতি সহজভাবে আমরা ইহার প্রভাব অনুভব করিয়া থাকি, সংযমের সাধনাকে সেখানে কোনও কৃত্রিম প্রয়োজনের অধীন হইতে হয় না।

সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে আমরা সংযমের কোনও উপসর্গ দেখিতে পাই না—এক কথায় উহাকে উচ্ছৃঙ্খলই বলিতে হয়। জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ এই ভাবে অপব্যয়িত হইলে পরবর্ত্তী

জীবনে তাহার ফল যে কখনও মধুময় হয় না, ইহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। আজকাল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষা ও নীতিশিক্ষার কথা প্রায়শঃই শুনিতে পাই। কিন্তু যে ভাবে এই বিষয়টী সচরাচর আলোচিত হইয়া থাকে, তাহাতে মনে হয়, জীবনে বিদ্যা, শিল্প, কলা, ইত্যাদির প্রয়োজনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ধর্ম্ম ও নীতি অবান্তর প্রয়োজনমাত্র—ইহার জন্য দুই চারিটী "মরাল ক্লাস" ও "মরাল ক্লাস বুকে"র ব্যবস্থা হইলেই যথেষ্ট হইল। ধর্ম্ম ও নীতিই যে শিক্ষার মূল এবং বিশেষ করিয়া ইহাই যে ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রাণ, একথা সাহস করিয়া কেহ বলিতে ভরসা পান না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—গুরুগৃহবাস, বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত—এই তিনটীই হইল ভারতীয় শিক্ষার উপজীব্য। ইহার মধ্যে গুরুগৃহবাস ও গুরুসেবাকে অধ্যাত্মসাধনার প্রতীক ও বেদাধ্যয়ন এবং ব্রহ্মচর্য্যকে যথাক্রমে ধর্ম্ম ও নীতির প্রতীকরূপে গ্রহণ করিতে পারি। বর্ত্তমানে আমরা ছাত্রদিগকে যাহাই শিখাই, যাহাই করাই না কেন, উপরোক্ত তিনটী ব্যবস্থার অভাবে সকল শিক্ষাপ্রণালীকেই আমরা বিজাতীয় ও অঙ্গহীন বলিয়া মনে করি। শিক্ষা ও সাধনা জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়া চাই এবং গুরুশক্তিতেই ইহাদের মাঝে রাসায়নিক সম্মেলন সম্ভব—শিক্ষাকে যাঁহারা এই ভাবে না দেখিয়াছেন, তাঁহারা যতই আড়ম্বর করুন না কেন, মানব প্রকৃতির মূল রহস্য সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিলেই আমাদের মোটামোটী বক্তব্য শেষ হইবে। ধর্ম্ম, নীতি ও তাহার সাধনা—ইহা ছাড়া আর কোনও অবান্তর বিষয় শিক্ষার যে প্রয়োজন নাই, একথা বলা কখনই আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা বলিতে চাহি, জীবনের সার্থকতার পক্ষে যাহা অবান্তর, তাহা অবান্তররূপেই শিক্ষণীয়; তাহা যদি জীবনে মুখ্যস্থান অধিকার করিতে যায়, তাহা হইলে আমাদের দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। হইয়াছেও তাহাই। অবান্তর বিষয়ের এই অতিপ্রসঙ্গ নিবারণের দুইটী পন্থা আছে। প্রথমতঃ জীবনকে যথা সম্ভব সরল ও প্রকৃতির অনুকূল করা। জীবন যাত্রায় যতই বাহুল্য বর্জ্জন করা হইবে, উপকরণ সঞ্চয়ের স্পৃহা ততই কমিয়া যাইবে এবং অবান্তর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ততই স্বল্প হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। প্রাচীন কালের শিক্ষাজীবনে আমরা এই নিয়মই দেখিতে পাই। অবশ্য এ স্থলে একথাও বলা উচিত যে, উপকরণ সঞ্চয়ের স্পৃহাকে মনুষ্যসমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করা কখনও সম্ভবপর নয়, এবং তাহাতে প্রকৃত কল্যাণও হইতে পারে না। কিন্তু ইহারও একটা নির্দ্ধারিত সীমা থাকা উচিত। উপকরণ সঞ্চয় দ্বারা ভোগপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়া সমাজকে বাহ্যশ্রীতে মণ্ডিত করা সকলের কর্ত্তব্য নহে; এবং যাহাদের পক্ষে তাহা দূষণীয় নহে, তাহাদের ক্ষেত্রেও উহা নিজের সীমা লঙ্ঘন করিলে সমাজকেই বিনষ্ট করিবে। এই স্থলেই আমরা বর্ণাশ্রমভেদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি। ব্রাহ্মণের আদর্শ ত্যাগ, ইহা তাঁহার জীবনব্যাপী আদর্শ। ব্রাহ্মণেতরের ভোগে অধিকার থাকিলেও শিক্ষার সময়ে সকলকেই ব্রাহ্মণের ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ত্যাগের বর্ম্মে আপনাকে আবৃত করিয়া তবে ভোগের রণক্ষেত্রে নামিতে হইবে। ইহাই

ছিল সনাতন শিক্ষারীতি। এখনকার মত শৈশব শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তখন ভোগের চর্চ্চা সুরু হইত না। এই দিক হইতেই আমরা বলি, উপকরণ সঞ্চয়ের স্পৃহাকে সংযত করিয়া অবান্তর শিক্ষার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করা শিক্ষার্থীর প্রধান কর্ত্তব্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে সকলকেই ব্রাহ্মণ হইতে হইবে —ইহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালীন সত্য।

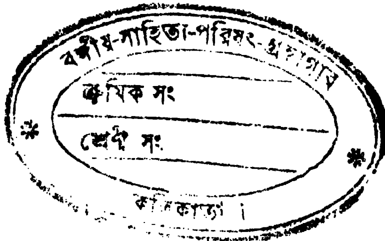
এই হইল প্রাচীন আদর্শের কথা। অবান্তর শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করার পক্ষে আর একটা আপত্তি উঠিতে পারে—তাহা আমাদের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিচার করিয়া। পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় পন্থাটী এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ঠিক প্রাচীনকালের মত জীবনকে সরল ও বাহুল্যবর্জ্জিত করা এক্ষণে আর সম্ভবপর নয়। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের যুগে দেশ ও কালের ব্যবধান হ্রাস হওয়াতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আরও জটিল ও নিবিড় হইয়াছে। ইহাতে কতকগুলি অবান্তর বিষয়ের চর্চ্চা আমাদিগকে বাধ্য হইয়া করিতে হয়—নহিলে বর্ত্তমানে সম্বন্ধবহুল ও জটিল সামাজিক জীবন যাপন করা সম্ভবপর হয় না। এরূপ স্থলে প্রাচীন সরল জীবন যাপনের কল্পনা কেবল অসম্ভব নয়, অনিষ্টকরও বটে।

ইহাদের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, সামাজিক বিবর্ত্তন অনুযায়ী শিক্ষার আদর্শে অল্পাধিক পরিবর্ত্তন হইবেই, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন অবান্তর ক্ষেত্রেই হইবে, মূলে নয়—এ বিষয়ে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তারপর অবান্তর প্রয়োজনগুলির বিচার করিলে দেখিতে পাই, যে কোনও মনুষ্যসমাজে এখনও বোধ হয় বারো আনা লোকই সেই আদিমকালের সরলজীবনই যাপন করিতেছে—ভোগবিলাস-দ্বারা অবান্তরকে প্রধান করিয়া তুলিবার সুযোগ ও অবসর বোধ হয় তাহাদের কোনও কালেই হইবে না। মানবসমাজের বাহুজীবনের আদর্শ নিরূপণ করিতে হইলে এই সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দরিদ্রসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে তাহা বিচার করাই কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? সমগ্র মানবজাতিকে সমষ্টিভাবে যিনি দেখিতে শিখিয়াছেন, তিনি সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিতে আবদ্ধ ও উপচিত বিলাসসম্ভারকে সমাজদেহের বিকার বলিয়াই গণ্য করিবেন, ইহাকে অস্বাভাবিক বলিবেন। এই দিক হইতেই প্রমাণ হয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে অবান্তর বাহুল্যবর্জ্জিত সরলজীবনের শিক্ষাই মনুষ্য সমাজের পক্ষে এখন পর্য্যন্তও সমধিক হিতকারী।

তারপর যে অবান্তর প্রসঙ্গ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে, তাহাকেও ধর্ম্ম ও নীতি রূপ শিক্ষার অন্তরঙ্গ প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইবে—ইহাই আমাদের শেষ বক্তব্য। ইহাতে সমস্যা জটিল হইবে, তাহা জানি। কিন্তু এই জটিল সমস্যার সমাধানই আমাদের পুরুষার্থ। বর্ত্তমান সভ্যজীবনের অনুকূল হইয়া আমাদিগকে চলিতে হইবে, অথচ অন্তরে সত্যের দীপশিখাটী অনুক্ষণ প্রোজ্জ্বল রাখিতে হইবে—ইহাই আমাদের নিয়তি। যদি কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে অলঙ্কারবাহুল্যকেই আমরা প্রত্যাখ্যান করিব, কেননা আমরা জানি, আভূষণ রহিত সৌন্দর্য্যই সত্যের সৌন্দর্য্য।

তীর্থরামের ছাত্রজীবনে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে প্রাচীন আদর্শ ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অবান্তর

বিষয়ের চর্চ্চা তাঁহাকে অনেক করিতে হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও সভ্যতার প্রচারের ফল। ইহা এক প্রকার তাঁহার পক্ষে অপরিহার্যই ছিল, যদিও আমরা বিশ্বাস করি, ইহা অপেক্ষাও অনুকূল পরিস্থিতি একেবারে অসম্ভব নহে এবং এখনই দেশে তদনুরূপ প্রচেষ্টাও আমরা কোথায় কোথায়ও দেখিতে পাইতেছি। অবান্তর বিষয়ের চর্চ্চার সহিত সংগ্রাম করিয়া কিরূপে তিনি অনুক্ষণ অন্তরের সত্তাকে, ছাত্রজীবনের অন্তরঙ্গ আদর্শকে অম্লান রাখিয়াছেন, আমাদের তাহাই আলোচ্য। আমরা মনে করি, ছাত্র তীর্থরামের ইহাই বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক ছাত্রদিগের পক্ষে তাঁহার চরিত্র এই দিক হইতেই অনুকরণীয়। ইতিপূর্ব্বে অবান্তর শিক্ষার সঙ্কোচ প্রসঙ্গে যে দ্বিতীয় পন্থার উল্লেখ করিয়াছি, তীর্থরামের ছাত্রজীবন বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাহার প্রচুর প্রয়োগস্থল দেখিতে পাইব। একটী একটী আমরা তাহারই বিচার করিব। (ক্রমশঃ)



অন্তঃসংজ্ঞা

আমাদের মাঝে কত কিছুই আসে—কিন্তু আমরা তার বুঝি কতটা? দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিকশিত না হওয়া পর্য্যন্ত হৃদয়ভরা ভগবানের সমস্ত দান কখনো অনুভব করতে পারি না। কাম-ক্রোধ, জ্ঞান-শান্তি পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়—তখন সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে কামনাকেই শুধু দেখতে পাই, ক্রোধে দৃষ্টি আরো অন্ধ করি। কিন্তু এতে তো তাঁকে পাওয়া হল না। নিজেই তো অল্প নিয়ে ঠকে গেলাম।

তিনি শুধু একাংশের কখনোই নন। তাঁরই একাংশে জগৎ স্থিত। তাঁর ভাব একাংশেও যেমন, সহস্রাংশেও তেমন—ছোটর কাছে যেমন, বড়র কাছেও তেমন; মোট কথা, যখন যেমন তখন তেমন, কেননা তিনি সর্ব্বসমঞ্জস, অতএব পূর্ণ এবং স্বাধীন। পূর্ণতা এমনি মজার—সে শিশুর কাছে শিশু, আবার বৃদ্ধের কাছে বৃদ্ধ। পূর্ণতা ভাবসিদ্ধ—ভাবের তো অগম্য স্থান নাই। কাজেই যিনি পূর্ণ, তিনি সকলের প্রাণেই প্রবেশ করতে পারেন; সকলেই তাঁর কাছে প্রাণ খুলে দিতে বাধ্য হয়—যে না দেয়, সে ঠকে যায়।

তিনি একাংশের যখন নন, আবার তাঁর একাংশেও তিনি যখন পূর্ণ, তখন হৃদয়ের যে কোন ভাবকেই তো তাঁর বলে বুঝতে পারি—যখনি বুঝতে না পারব তখনি মনে করব, সমগ্রভাবে তাঁকে ধরতে চাচ্ছি না। কামুক কামেই মত্ত, লোভী লোভেই মত্ত—তার মাঝে তিনি কোথায়, সে সন্দেহই তার মনে আসে না—তাই সে অল্প নিয়েই তৃপ্ত হতে চায়। কিন্তু তা যে অসম্ভব। দুদিন

পরেই যে তার মন হাঁপিয়ে উঠ্‌বে—এইটুকুর মাঝেই তো সব নয়, আরো কি জানি কোথায় আছে বলে সে পাগল হবে।

সব ভাবের মাঝেই অনুসন্ধান করে তাঁকে পেতে হবে—হোক না তা মন্দ! মন্দকে মন্দ বললেই তার হাত এড়ানো যায়? জগতে নিছক ভাল আর নিছক মন্দ কোথাও থাকতে পারে না। ভাল মন্দ সমস্ত চিন্তার মাঝেই তাঁকে অনুসন্ধান কর, নিদানপক্ষে তাঁর নাম জপ কর—মন্দ তা আপনি খসে যাবে। মন্দ চিন্তায় তাঁকে বুঝতে বাধা দিয়েই থাকে। কিন্তু মন্দ চিন্তার মাঝেও মূলে যে তিনি আছেন, এতে ভুল নাই। প্রত্যেকটা পাপ নিয়ে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে তাঁকে পাওয়া যায়। তাই যদি না হত, তবে পাপী কোনো দিন ভগবান্ পেত না। পাপী ভাল হয় কি করে?—নিজের মাঝে যখন সে তলিয়ে যায়, তখন তার উন্নতি সুরু হয়।

ধর, তোমার মাঝে স্বভাববশেই হোক বা সংস্কারবশেই হোক, একটা দোষ আছে; তা বলে কি তলিয়েই গেলে একেবারে—তাঁর কথা কি মনে একটুও দাগ দেবে না?

এ কখনো হতে পারে না। ভাল-মন্দ সকলেরই চরম তিনি—মন্দেরও প্রাণ তিনি। নইলে প্রবৃত্তিতে এই দুর্ব্বার শক্তি এল কোথা থেকে? মানবের প্রতি দেব দানব দুয়ের আকর্ষণই আছে—দুয়েরই মূল শক্তি তিনি। কাজেই স্বভাববশে কোন দানবী বৃত্তি যদি আমার মাঝে থেকে থাকে, তবে তার মাঝ দিয়েও শ্রেয়োলাভ করতে হলে আমাকে তারি মূলানুসন্ধান করতে হবে। মন্দ চিন্তা বা সেই দানবী বৃত্তি যখনই আমাকে আকর্ষণ করবে, তখনই আমার পল্লবগ্রাহী মনকে নিয়মিত করে মূলের অনুসন্ধান তৎপর করতে হবে।

সকলেরই মূল তিনি। কাজেই পাপের ছায়াপাত মাত্রেই তাঁর ধ্যান কর, ধ্যান না জান, নাম কর। ভিতরে যাই আসুক না কেন, তার বাহ্য চাক্‌চিক্যে মুগ্ধ না হয়ে যদি মূল সেই পরমাধার বস্তুটীকে স্মরণে রাখি, তবে পরিণামে মূলই টিকবে—ভালমন্দের বালাই তোমায় বেড়ে থাকবে না।

মনের একটা কিছু অবলম্বন চাই। নইলে সে থাকতে পারে না। ভাল-মন্দ এ সব যে আস্‌ছে, মন তাদের আকর্ষণ করছে বলেই। ভিতরে যাই আসুক, তার উদ্দেশ্য মনকে আশ্রয় দেওয়া, টিকে থাকা। যাদের আশ্রয়ে চিরদিন থাকতে পারি না, তারা মনকে আশ্রয় দিতে আসে কেন?—

এ বিচারটুকু করতে হবে মানুষকে। এই বিচার হতেই মানুষ বুদ্ধির নাগাল পায়—বুদ্ধির পরেই বিবেককে উপলব্ধি করে। মন যা পাবে, তাকেই আশ্রয় কর্‌বে—যথাযথ জিনিষটী হাতের কাছে এগিয়ে না দিলে সে নিতে জানে না, এই তার স্বভাব। প্রত্যেক জিনিষেরই মূলে একটা সত্তা আছে। মনকে যদি সেই সত্তার সন্ধান দেওয়া যায়, সমস্ত সংস্কারের আবরণ দূর করে দিয়ে তাকে যদি চরম বস্তুর আস্বাদ একবার দেওয়া যায়, তবে সে তাকেই আশ্রয় কর্‌বে।

মূল বস্তুকে ধর্‌তে পারার যে শক্তি, তার নাম বিবেক বা প্রজ্ঞা। ইন্দ্রিয়কে অন্তরাবৃত্ত করলে তখন মনের যে পূর্ণপ্রস্ফুটিত অবস্থা, প্রজ্ঞা তারই নিদান। স্বভাবতঃ মন ইন্দ্রিয়-সহায়ে বা ইন্দ্রিয়াবলম্বনে বহির্ম্মুখী; মনের ধর্ম্ম আশ্রয় খোঁজা—ইন্দ্রিয়ভোগ্য জিনিষকে প্রলুব্ধ হয়ে সে আশ্রয় করে। প্রজ্ঞা যে পিছনে আছে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে প্রলুব্ধ হচ্ছে

এ বোধ থাকে না, কাজেই মূলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তখন বাইরে বাইরেই মন ছুটে বেড়ায়—যথার্থ আশ্রয় পায় না বলেই তৃপ্ত হতে পারে না। পরিবর্ত্তনে তৃপ্তি নাই—কেন পরিবর্ত্তন হল সে রহস্য যদি না জানি। জগতের মূল সত্তাটী ছাড়া আর সকলেরই মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তন ঘটছে। কাজেই মূল রহস্য না জেনে বাইরে বাইরে যে ছিটকিয়ে বেড়ানো—স্বভাবতঃ পল্লবগ্রাহী মনের পক্ষেও তা কখনো তৃপ্তিকর হতে পারে না।

এই অতৃপ্তির উষ্মায় যখন আমাদের বুক শুষে নেয়, তখনি প্রজ্ঞা এসে মনকে আশ্রয় দিতে পারে। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রয়োজন ছিল মনকে অতৃপ্ত করা—তা মিটে গিয়েছে, এখন ইন্দ্রিয় থাক্ ইন্দ্রিয়ের ভাবে; মনকে ভিতরে টেনে আন, সে মূলানুসন্ধিৎসু হোক। এই হচ্ছে প্রজ্ঞা। "ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্বশঃ নিগৃহীতানি" করা—এই হল প্রজ্ঞানুভবের সাধনা বা মূলানুসন্ধিৎসা। এই সাধনা অহরহঃ মনকে করতে হবে।

ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে ভাল মন্দ নানান্ বিষয়ে মনকে ছুটিয়ে দিয়ে দেখেছি—তৃপ্তি পাইনি। তা থেকেই বুঝেছি, মূলকে না জানলে রহস্য ভেদ হয় না, রহস্যভেদ না করতে পারলে অজ্ঞানজনিত ভোগ দুর্ভোগই হয় কেবল। দুর্ভোগের পাঁকে পচে মরতে তো আসিনি! এবার ভিতরের দিকে চলতে হবে—প্রত্যেক ব্যাপারেই গভীরভাবে মনকে ডুবিয়ে দিয়ে মূলের অনুসন্ধান করতে হবে। এই আমাদের সাধনা।

যখন "নিমিষে নিমিষে নয়ন বচনে—সকল কর্ম্মে সকল মননে" মূল সত্তাটীকে মঙ্গলময়রূপে বিরাজিত দেখতে পাব, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে প্রলোভন-আকর্ষণ যখন থাকবে না, তখনই মন আমাদের জগদ্ব্যাপারের অন্তঃসঞ্চাররস আস্বাদন করে যথার্থই তৃপ্ত হবে—তখনই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠালাভ না করা পর্য্যন্ত অন্তরের অপূর্ণতা দূর হয় না। তাই গীতা বলছেন—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥"

হৃদয় জুড়ে যে কামনার বিক্ষোভ, এর অন্তরালে এমন একটী ধ্রুবসত্য অনুভবক্ষেত্র রয়েছে—যা নিত্যপূর্ণ, সর্ব্বাবস্থায় অটল অচল, অথচ নিখিল ভাবস্পন্দনের একমাত্র আশ্রয়।

এই তো তাঁর স্বরূপ: পাপে-পুণ্যে, ভালয় মন্দে কি আসে যায়? পাপীর কি আর পথ নাই? পাপ-পুণ্য, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, সমস্তের মূলেই সেই এক শক্তি। বিনা যুদ্ধে তাঁকে পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যেখানে ঘটতে দেখা যায়, সেখানে বুঝতে হবে, জন্মজন্মের সাধনার ফল সঙ্গে নিয়ে শুধু পাবার জন্যই এবার জন্ম নিয়েছে সে!

আমার মাঝে পাপ আছে তাতে বাধা কি ভাই! আমি পাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে পাব—প্রলোভনে মজলে তো চলবে না! ভিতরে ভাল মন্দ যে বৃত্তিই থাক, শুধু তাদিকেই চিত্তের চরমাশ্রয় মনে করলে ভুল হবে। দুঃখে উদ্বেগ, সুখে স্পৃহা এই ভুল থেকেই জন্মায়। মূল হচ্ছেন তিনি। পাপের অন্ধকারের মাঝেও জ্ঞানের আলোক ফুটে উঠবে—মূল জিনিষটীর অনুসন্ধান যদি করি। "মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং"—আমার এই স্বরূপকে তাঁর মাঝ দিয়ে পেতে হবে—এখন আমি পাপীই হই, আর পুণ্যবানই হই।

—✱—

সিন্ধুতীরে

—*—

দুই শক্তিতে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে—একটী আকর্ষণ অন্যটী বিকর্ষণ। সমুদ্রে যে ঢেউ দেখ, তা ঐ বিকর্ষণ শক্তির ফলে। আবার আর একটী শক্তি, যাকে 'আণ্ডার্ কারেণ্ট' বলে, তাই আকর্ষণ। এই দুইটী শক্তির একটী ব্রহ্ম থেকে বেরিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিকীর্ণ হচ্ছে, আবার অন্য শক্তিটী সংহরণ করে বা সংকর্ষণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মে নিয়ে পৌঁছাচ্ছে। একটীর নাম অবিদ্যা, অন্যটীর নাম বিদ্যা। দুই শক্তির নাম মায়া-শক্তি। মা=বিকিরণী, য়া=সংহরণী শক্তি। ঐ যে সমুদ্রের ঢেউ দেখ্‌ছো, যদি সংকর্ষণী শক্তি না থাকতো, তাহলে সমুদ্র পৃথিবীকে গ্রাস ক'রে ফেল্‌তো। প্রলয়ে যে পৃথিবী একার্ণবে পরিণত হয়, তখন এই সংহরণী শক্তি ক্রিয়া করে না, সুতরাং সমুদ্র অসংযত হয়ে উঠে—স্থলদেশ জলে প্লাবিত করে দেয়। সৃষ্ট পদার্থ, জীব, চেতন, অচেতন সবের মধ্যে ঐ দুই শক্তির ক্রিয়া সব সময়েই হচ্ছে। তবে বৃহতের মধ্যে ক্রিয়াটা কিছু স্পষ্ট দেখা যায়।

সূর্য্যেও ঠিক ঐ ক্রিয়া হচ্ছে। এক শক্তির ফলে সূর্য্য হতে কত পদার্থ পৃথিবীতে বিতরিত হচ্ছে, আবার সেই সূর্য্য পৃথিবী হতে কত কি নিয়ে সূর্য্যমণ্ডলে পৌঁছাচ্ছে।

এই জৈব দেহেও ঠিক ঐ দুই শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে। শ্বাস ত্যাগের সময় আমি বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছি, আবার শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি আমায় সংহৃত করে নিয়ে আস্‌ছে।

এই মানব শরীরবিজ্ঞান আলোচনা কর্‌তেই কত আনন্দ পাওয়া যায়। অনেক সময় এতে বিহ্বল করে দেয়। আহা, এর মধ্যে কি না শিল্পকুশলতা রয়েছে! এতে কত যে নিপুণতা, তা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। এর কোনটীও বৃথা নয়, যেখানে যা দরকার তাই দেওয়া হয়েছে। আমরা শরীরের অংশ-বিশেষকে অনেকসময় অনাবশ্যকীয় বলে ভাবি। কিন্তু আমরা অনভিজ্ঞ; জানি না বলেই অমন মনে করি। কোনও কিছুই বৃথা নয়—সবই অত্যাবশ্যকীয়।

ভিতরের কাজের কিই বা সুশৃঙ্খলা!—কেমন নির্ব্বিবাদে স্বভাববশে হয়ে যাচ্ছে—একটু চিন্তা করে দেখ্‌তে গেলে মোহিত না হয়ে থাকা যায় না। একটী সাধারণ কথায় বলি, এই যে শরীরে রক্ত চলাচল হচ্ছে—এ কেমন জান?—ঠিক যেমন ফেরিওয়ালার ফেরি করা; যে গৃহস্থের যা দরকার, তাই সে দেয়। তেমনি ঐ সংকর্ষণ বিকর্ষণ নিয়মক্রমে হৃদয়মধ্যে অবিশুদ্ধ রক্ত নাড়ীপথে হৃদয়ে সংহৃত হচ্ছে, আবার সেথা হতে ধমনীপথে বিকীর্ণ হচ্ছে। তখন ঐ বিশুদ্ধ রক্ত যেন প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট ডেকে ডেকে যাচ্ছে—চাই আলু, চাই পটোল, চাই লেবু, চাই সন্দেশ ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যে যে যন্ত্রের যা দরকার, সে তার কাছ থেকে তাই নিয়ে নিচ্ছে। কি সুন্দর ব্যবস্থা! যে যার কাজেই ব্যস্ত, কারু সঙ্গে কারু দ্বন্দ্বমাত্র নাই, সকলেই কর্ত্তব্যপরায়ণ একনিষ্ঠ। কেমন বিধানের বশবর্ত্তী!

বিধির বিধানে দ্বন্দ্ব কোথায়ও নাই। ব্যবহারিক জ্ঞানে যে দ্বন্দ্ব দেখ্‌তে পাওয়া যায়; তা দ্বন্দ্বই নয়—সাম্যেরই রূপান্তর। কেমন নিঃশব্দে অবিচলিত ও অচঞ্চল থেকে যে যার কাজ করে যাচ্ছে। যেমন এই ক্ষুদ্র দেহে দেখ্‌ছো, তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও এক বিধির বশে অবশ হয়ে সব চল্‌ছে। নিজের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, সেই অনন্ত শাস্তার—সেই বিধির ইচ্ছাতেই সব চল্‌ছে। সকলেই তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ করে চলেছে। আমরাও তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌তে নিজের ইচ্ছা চালাতে চাইছি—তাই তো এত দুঃখকষ্ট!

—————*—————

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৯।৩

সারাদিনের কাজের মাঝে গলদ ঘটালে রাতের বাসরে তাঁর কাছে যেতে সঙ্কোচ হবে না? জানি, শত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁর ঐ মধুর চাহনি আমার সমস্ত কলঙ্ক সুধা দিয়ে প্লাবিত করবে; তবু নিষ্কলঙ্ক হয়ে যেতে পারলে যে আনন্দ, তার স্বাদ তো মিল্‌ল না। সে যে আরও মধুর। প্রত্যেকটী দিন সম্বন্ধে যেমন এমনি গোটা জীবন সম্বন্ধেও ওই একই কথা।

*

বিপাকে যখন মন ঘুলিয়ে যায়, ভালমন্দ বিচার সুষ্ঠু হয়ে ওঠে না, তখন প্রাণপণে ক্ষণেকের তরেও একবার মূলবস্তুর অনুসন্ধান কর। এই যে দুঃস্থ ও স্বস্থ অবস্থা, এর মাঝে সমান ভাবে যিনি রয়েছেন, তিনিই তো মূল—তাঁরই বিভাব এসব। এখন তাঁর সেই সর্ব্বাবগাহী দৃষ্টি দিয়ে তোমার অবস্থা দর্শন কর। দেখবে, যুগপৎ কত জীবন উঠছে, নাবছে বা চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, তারি মাঝে কত ক্ষুদ্র চিন্তা নিয়ে তুমিই আছ। এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে তোমার যত অন্তহীন ভাবনার কুহেলিকা, এক মহান্ জ্যোতির সংস্পর্শে আলোময় হয়ে উঠছে। তখনই জীবন শান্তি ও আনন্দময় বলে অনুভব হবে। এই হচ্ছে দ্রষ্টার দ্রষ্টৃত্ব ও তজ্জনিত আনন্দ।

*

প্রত্যেকটী দিন নিষ্কলুষ ভাবে কাটিয়ে কার্য্যশেষে রাত্রিবেলা যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, সে কি শুধু স্থূলেই আবদ্ধ থাকে? তা যে আত্মার প্রসাদ দান—আমার সমস্ত দেহে ও মনে তাঁর সেই প্রসন্নতা যে আনন্দহিল্লোলে বয়ে যায়! এমনি আনন্দময় দিবসের সমষ্টিগত যে জীবন, তা না জানি কত মধুর। তার আস্বাদনের জন্যই তো এত সাধনা। যত সব তপস্যা, শুধু এই অব্যক্ত আনন্দের জন্যই।

আমাদের যদি আর কোনও দিকে কোনও অধিকার বা যোগ্যতা না থাকে, তবু জানতে হবে যে একদিক দিয়ে আমাদের তিনি সংগ্রামের অধিকার ও যোগ্যতা তো দিয়েছেন। সব গেলেও এ অধিকার আমাদের আছে। আর একে জয়ী করতে পারলেই শ্রেষ্ঠ জয় লাভ

*

তোমার আমার যে বিচার বুদ্ধি, তা যতদিন আমাদের এই ক্ষুদ্র আধারের পরিবেষ্টনে রয়েছি, ততদিন এমনি ক্ষুদ্র পরিধিতেই যাতায়াত করব। তাই এই ক্ষুদ্র মন বুদ্ধি কোনও উদারভূমিতে নিয়ে ফেলা প্রয়োজন। শ্রীগুরুই সেই উদারভূমি। জীবনে কখনও যদি আমার এই ক্ষুদ্র অহংটী নিয়ে তাঁর চরণে নিঃশেষে সঁপে দিতে না পারি, তবে কেমন করে এ স্বল্প পরিসরক্ষেত্রে মহাবস্তুর আবির্ভাব হবে? তাঁকে সঁপে দিলে তিনি আপন খুশীমত আধার তৈরী করে নেবেন। আর তা না করে একে এঁটে ধরে থাকলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সে তো সঙ্কুচিত হবেই।

*

জীবনকে প্রসারিত করে দিতেই হবে। এখন সে ভক্তির দিক দিয়ে একজনকে কেন্দ্র করেই হোক্, অথবা ক্ষুদ্র আমিত্বের বিস্তার করে বিরাটসত্তার অনুভূতি দিয়েই হোক্। যেটুকু গণ্ডী এখন রেখেছি, তাতেই নিবিষ্ট হয়ে থাকা কিছুতেই চলবে না। কেন না আমাদের স্বরূপ যে আত্মা, তিনি মহান্। এত ব্যাপক হয়ে কি করে তিনি অতটুকু সীমার মাঝে আবদ্ধ থাকেন? তাই তাঁর অহরহ চেষ্টা—প্রসারিত হওয়ার দিকে। তিনি যে এক থেকেই "বহুস্যাম্" বলে নিজের মাঝে সৃষ্টির প্রেরণা এনেছিলেন। এই সৃষ্টিপ্রবাহ তো নিরোধ হয় নাই। তবে কেমন করে তিনি ক্ষুদ্র হয়ে থাকেন? তাই দিকে দিকে চায় মানুষ বড় হতে। স্বার্থের অতি নীচভূমি হতে আরম্ভ করে বিরাটব্রহ্মে লীন হওয়া পর্য্যন্ত অহরহ সর্ব্বত্র আমরা তাই বড় হতে চাই। কিন্তু এই বড় হওয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধিতে নয়; স্বার্থত্যাগ দ্বারা স্বকেই বৃহৎ করে বিশ্বময়রূপে ছড়িয়ে পড়াই প্রকৃত বড় হওয়া। বৈদান্তিক তাই করেন—ভক্তও তাই করেন; মাত্র পথের তারতম্য দু'জনার মধ্যে।

*

যাঁর চিত্ত যত স্থির জগতের প্রত্যেকটি ঘটনার ছাপ তাঁর ভিতর তত অধিক প্রতিফলিত হয়। তাই তিনি সেই পরিমাণে ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানবিৎ। যে পরিমাণে চিত্ত স্থির হবে, অপরের চিত্ত সম্বন্ধে জ্ঞানও তত সুপরিস্ফুট হবে। তাই পরচিত্ত জ্ঞান যোগের একটী বিভূতি। কিন্তু এই যোগশক্তি আমাদের দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে মনের উপর খাটাতে পারি। অভ্যাসে মন যত স্থির হয়ে আসবে, ততই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে।

*

জীবন চাই গম্ভীর ভাবে পূর্ণ, কর্ম্মে সমুজ্জ্বল ও প্রশান্ত আনন্দে সমাহিত। আর ঠিক জানি তেমন করে চাইলে এ পাওয়া যায়। এ চাওয়া শুধু ক্ষণিকের প্রার্থনা নয়। প্রাণ যখন সময় সময় দ্রব হয়ে তাঁর চরণতলে নিজের সবটুকু দুর্ব্বলতা নিবেদন করে শক্তি প্রার্থনা করে, তখনকার মত একদিকে অমনি করুণ সুকোমল, অপরদিকে

আবার বজ্রের মত দৃঢ় মন নিয়ে চল্‌তে হবে। ভবিষ্যৎ তো একেবারে অবিদিত নয়—প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন করছি। প্রত্যেকের লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট রয়েছে, তাঁর চিন্তার ধারা অলক্ষ্যে সেই নির্দ্ধারিত বিন্দুর দিকে পরিচালিত হচ্ছে। চুপ করে থাকার যো নাই, প্রকৃতি যেন নিজের গরজে সকলকে টেনে নিয়ে চল্‌ছে। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলেই আমরা কর্ম্ম করছি। কিন্তু সমস্ত কর্ম্মের মূল বাসনায় বাসিত চিত্তটীকে যদি তাঁর করে দিতে পারি, তাহলে তখন তা দিয়ে যা হবে, তাই সুন্দর হবে, অথচ কোন আঘাত আমাদের গায়ে লাগবে না।

*

একটুখানি প্রশংসা যেখানে উচ্ছ্বসিত করে প্রচুর [illegible], একটুখানি নিন্দাও আবার সেখানে মনকে নরম করে তোলে। যে জীবনে প্রচুর কাজ নয়, ভাবের ভাবটি উচ্চ আদর্শকে যে জীবনে প্রতিনিয়ত স্বভাবগত করতে চেষ্টা করছে, তাকে গভীরভাবে আপনাকে বিশ্লেষণ করে ভাবতে শিখতে হবে। চিত্তের গভীরতাই স্বভাবকে গম্ভীর ও রসপূর্ণ করে। হাল্কা চিত্তের সুখ দুঃখ উভয়ই ক্ষণস্থায়ী অথচ চিরদিন অতৃপ্তির যন্ত্রণা দিতে থাকে। শুষ্ক বাক্যে ও হাল্কা চিন্তার ঔষধ জপ। জপে অশক্তাবস্থায় উচ্চ ও সংযত চিন্তাই জীবনে একমাত্র রসের প্রস্রবণ। মনকে সরস করতে হলেই সংযমের প্রয়োজন। সংযমের দরুণ আকুলতা চাই। আকুলতা হতাশ করে দেবে না, পথের দীর্ঘত্ব হ্রাস করবে।

*

কাজ নষ্ট হোক্‌, কিন্তু তার মূল প্রাণ বা ভাব যেন নষ্ট না হয়। কাজ নষ্ট হলে করা যাবে, কিন্তু ভাব দুষ্ট হলে সংশোধন কঠিন। ভাব বজায় থাকলে সুযোগ এসে একদিনে কাজ ঘটিয়ে দেবে।

*

দৃষ্টিকে বদ্‌লে ফেলতে হবে। এখন যে সুখ দুঃখ আসছে এদের যেন আমার বলে অতি বিশিষ্ট করে আঁকড়ে ধরছি। তাই তো এত জ্বালা। কিন্তু আমার মতন প্রত্যেক জীবের সুখ দুঃখ নিয়ে সমষ্টি জগতের সুখ দুঃখ যদি এক সঙ্গে অনুভব করতে পারি, তাহলে সেটা তখন লীলা বলে প্রত্যক্ষ হবে। প্রতি মুহূর্ত্তে যা ঘটছে, তা পৃথক রূপে আমাদের দৃষ্টিকে খণ্ডিত করে দেয়। কিন্তু উপর থেকে যদি এক সঙ্গে জগৎটা দেখতে পাই, তাহলে দেখব, এসব এক সত্তারই পরিণতি। সংহত থেকে যেন সুখ হলো না, তাই ব্যষ্টিতে বিভক্ত হয়ে জগৎটা যেন তিনি ভোগ করছেন। এই যে তোমার আমার ভোগ, এই সমস্ত নিয়ে সমষ্টি হয়েও তিনি—আবার ব্যষ্টি হয়েও তিনিই ভোগ করছেন। এই হচ্ছে সত্য। তুমি আমি বলে ছাপ দিচ্ছি কাকে?

*

সময় ও অধিকারী ভেদে জগতের বিষও অমৃত হয়, আবার অমৃতও বিষ হয়ে পড়ে। কাজেই কাকে বাদ দিয়ে কাকে নেবে? নীলকণ্ঠ আশুতোষের মত সব নাও। ভস্ম ও মহাবিষেও তাঁর বিরাগ হল না। অমৃত ছাড়া যখন সবাই আর কিছু নিতে চাইলে না, তখন তিনি অবশিষ্ট বিষই নিলেন। আর তাই না তাঁর অমন উদাস দৃষ্টিতে এক-

টুকু আবেশ আনবার আশায় জগৎরাণী উমার এত তীব্র তপস্যা!

*

সৈনিককে কেবল আজ্ঞা পালনই করে যেতে হবে, তাতে তার কথা কইবার অধিকার নাই। সেনাপতি তাকে যে ভাবে চালান, তাকে সেই ভাবেই চলতে হয়। তা না হলে পার্থিব বা পারমার্থিক জগতের সংগ্রামে জয়লাভ করা কঠিন। যার যার ব্যক্তিগত মত নিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করতে যাওয়া অসম্ভব। তোমার মাঝেও দশ ইন্দ্রিয়ের দশটি প্রবৃত্তি শত্রুরূপে বিরাজমান। সুযোগ পেলেই তারা তাদের রাজ্য বিস্তার করতে চাইবে। তাই বলি সাবধান, গুরুরূপ সেনাপতির আদেশ ভিন্ন এক পা-ও অগ্রসর হয়ো না। শ্রীগুরুতে সম্পূর্ণ নির্ভর করে চল, দেখবে জীবন কেমন মধুময় হয়ে দাঁড়ায়। তোমার মাথা ঘামাবার দরকার কি? যার উপর নির্ভর করেছ, তিনিই তো সব ভার নেবেন। গুরু উপদিষ্ট আদিষ্ট কাজ করে যাও, "কেন" প্রশ্ন করবার তোমার অধিকার নাই। স্মরণ রেখো, কর্ম্মে তোমার অধিকার—ফলে নয়। আর একটি কথা, আপনাকে বিশ্বাস রেখে চলো। প্রবল বিশ্বাসই মহৎ কার্য্যের জনক। দৃঢ় ভাবে কার্য্যে করে যাও, অনিশ্চিত অধ্যবসায়শীল হও ও প্রভুতে সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস রেখে চল।

দানপ্রাপ্তি

সারস্বত মঠে —

শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর বরুয়া, নাজিরা ২৲, " জীউরাম চুটীয়াল, নাজিরাবাজার ২৲, " ভগেশ্বর গোস্বামী, নাজিরা ২৲, " লক্ষ্মীনাথ বরঠাকুর, রাজাপুল ২৲, " প্রসাদচন্দ্র বরদলৈ, সঃ এঃ সার্জ্জন, বামুনপুখুরী টী ইষ্টেট্ ২৲, " নবীনচন্দ্র শর্ম্মা বামুনপুখুরী টী ইষ্টেট ২৲, " দেবেশ্বর শর্ম্মা, লক্ষ্মীজান টী ইষ্টেট ২৲, " জয়পুর গগৈ, বিহুবর টী ইষ্টেট ২৲, " বদ্রীনাথ শর্ম্মা ফুকন বিহুবর টী ইষ্টেট ৫৲, " চন্দ্রনাথ শর্ম্মা, গেলেকি ২৲, " মুরলীধর মহাজন আটখেল টি, ইষ্টেট ২৲," দুর্গেশ্বর শর্ম্মা ই এ সি, শিবসাগর ৩৲ " ,ভুপেন্দ্রনাথ ঘোষ উকীল, ঐ ২৲, " রামকুমার বরুয়া উকীল, ঐ ৩৷৹, " হরিমোহন সিং, ঐ ২৲, জনৈক ভদ্রলোক ২৲, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ঠিকাদার এস, কে, রেলওয়ে, ডিমাপুর ৫৲, " রত্নধর দাস, খারজান টী ইষ্টেট ২৲।

সংগৃহীত নাজিরা ২॥৹, চনতক ২॥৹, বামুনপুখুরী ২॥৹, লক্ষ্মীজান ও বিহুবর ১॥৹, গেলেকি ৸৵৹, আটখেল ৸৹, দেওপানী টিপুক ১৵৹, বড়চোলা ৸৹, নামতিআলী ॥৹, শিবসাগর ৩৲, ডিসাই এস, কে, রেলওয়ে কনসট্রাকসন ওয়ার্কস ।৹, শিবসাগর ঐ কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতে ॥/৹, বেজবরুয়া হাইস্কুলের শিক্ষকগণ ২৲, অন্যান্য স্থান হইতে ২৷/১৫, " ডাক্তার দ্বারিকানাথ কর ৬/৹, " উপেন্দ্রনাথ শর্ম্মা পেস্কার ১॥৹, "গিরীশচন্দ্র বরদলৈ ই, এ, সি, ১॥৹।

১৲ টাকা করিয়া—

আজিরা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার, " ভোলানাথ শর্ম্মা পূজারী, " কেশবনাথ শর্ম্মা ফুকন, " কেদারেশ্বর দাস, " সুরেন্দ্রকুমার দাস সঃ ইঃ, " কৃষ্ণমোহন শর্ম্মা হাতীকাকতী, " কুলধর ফুকন, " গঙ্গাধর রায় বরুয়া, " ব্রহ্মানন্দ বরুয়া। চনতক—শ্রীযুক্ত দামোদর বরুয়া, " দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য, " ভুবনেশ্বর বরঠাকুর। বামনপুখুরী শ্রীযুক্ত খাঙ্কনাথ গোঁহাই, " নবীনচন্দ্র গগৈ। লক্ষ্মীজান—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বরুয়া, " কমলানন্দ বরুয়া, " লক্ষেশ্বর গগৈ, " কালীনাথ গগৈ। মেকিপুর—শ্রীযুক্ত শিবধর শইকীয়া, " ফণিধর বরগোঁহাই, " গদরাম গগৈ, " রামকানাই দাস, " দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা " সেখ মুরুদ্দিন আহম্মদ। গেলেকি—শ্রীযুক্ত বংশীবদন শর্ম্মা, " ভরথচন্দ্র দাস সঃ এঃ সার্জ্জন। আতিখেল—শ্রীযুক্ত দীননাথ শর্ম্মা, " জীবেশ্বর শর্ম্মা ভট্টাচার্য্য। দেওপানী—শ্রীজানীরাম মদনগোপাল, বড়চোলা—শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মা পাঠক " দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা পাঠক, " লক্ষ্মীনাথ বরুয়া, " মুক্তেশ্বর বরপাত্র, " যদুনন্দন গগৈ, " আনন্দরাম বরুয়া, " উমাকান্ত গগৈ; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোঁহাই, নামতী আলি। শিবসাগর—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বরা," কেদারনাথ শর্ম্মা ভট্টাচার্য্য, " আনন্দরাম দাস শিক্ষক, " যোগেশচন্দ্র নন্দী বি ই, " আনন্দিরাম দত্ত, " দুলালচন্দ্র বরুয়া, " হিমকান্ত বরুয়া, " কালীকুমার শর্ম্মা, " মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, " টঙ্কেশ্বর ঠাকুর, " ফুলচাঁদ আগরওয়ালা, " লক্ষ্মীকান্ত বরুয়া উকীল, " ডম্বরুধর খাউন্দ শিক্ষক শিবসাগর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল, " পরেশ চন্দ্র চন্দ উকিল, " রমেশ চন্দ্র চৌধুরী ডাক্তার, " নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, " কামাল উদ্দীন আহম্মদ ইনচার্জ্জ অফিসর শিবসাগর থানা, " সুরেন্দ্রনাথ পরামাণিক " সুরেন্দ্রনাথ গুহ একাউণ্টেণ্ট এস্ কে, রেল " জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী হেডক্লার্ক ঐ, জনৈক ভদ্রলোক, " রাজেন্দ্রনাথ বরুয়া বি টি শিক্ষক শিবসাগর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ শর্ম্মা বরঠাকুর, দিহুবর বাগান। শ্রীযুক্ত চিনিরাম চেতিয়া পাত্র, থাবজান টি, ইষ্টেট। ডিসাঙ্গ—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দাস এস্, ডি, সি, এস্, কে রেল, " রেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী, " জ্যোতীন্দ্রমোহন মুখটী, ওভারসিয়ার এস, কে, রেল।

খড়কুশমা সারস্বত-আশ্রমে—

কোতাইগড় হইতে সংগৃহীত—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্ট ২৲, শ্রীহেমাঙ্গকুমার মহাপাত্র ২৲, শ্রীদ্বারকানাথ পাত্র ২৲, শ্রীবিধুমুখী ভাজরা ১৲, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মহাপাত্র ১৲, শ্রীযদুনাথ রাউৎ ১৲, শ্রীধরণীধর পাত্র ১৲।

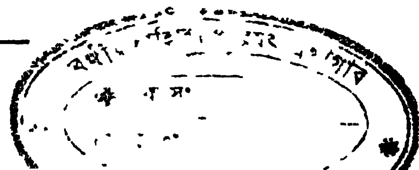
(।৹ আনা করিয়া)

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, শ্রীদীননাথ মাইতি, শ্রীরজনীকান্ত পাত্রীয়ালী, শ্রীদুর্গাসুন্দরী দেবী, শ্রীরামচরণ দাস, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বেরা, শ্রীভুবনচন্দ্র মির্দ্ধা, শ্রীদ্রুপদকুমারী দাসী, শ্রীশ্রীনিবাস দাস, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনিমাই প্রধান, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কোলে, শ্রীক্ষীরোদকুমারী মান্না, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র কোলে, শ্রীকামিনীকুমার মান্না, শ্রীভুবনচন্দ্র অটা, শ্রীযতীন্দ্রকুমার চন্দ, শ্রীকৃষ্ণকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীইন্দ্র দে, শ্রীগুরুচরণ ঘোষ, শ্রীগোবিন্দরাম ঘোষ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মহাপাত্র, শ্রীরাধাগোবিন্দ মণ্ডল, শ্রীতরঙ্গিণী ঘোষ, শ্রীদিবাকর মহাপাত্র, শ্রীরাখালকুমার পাল।



আশ্রম-সংবাদ—মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমান মাসে পুরীধামেই অবস্থিতি করিতেছেন।

—:{*}:—





আর্য্য-দর্পণ

(সনাতন ধর্ম্মের মুখপত্র)

১৮শ বর্ষ } চৈত্র { ১২শ সংখ্যা

আনন্দলহরী

—*—

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য]

—*—

মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো
হকারার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ধরমহিষি তে মন্মথকলাম্।
স সদ্যঃ সংক্ষোভং নয়তি বনিতা ইত্যাতিলঘু
ত্রিলোকীমপ্যাশু ভ্রময়তি রবীন্দুস্তনযুগাম্।

কিরন্তীমঙ্গেভ্যঃ কিরণনিকুরম্বামৃতরসং
হৃদি ত্বামাধত্তে হিমকরশিলামূর্ত্তিমিব যঃ।
স সর্পাণাং দর্প শময়তি শকুন্তাধিপ ইব
জ্বরপ্লুষ্টং দৃষ্ট্যা সুখয়তি সুধাসারশিরয়া॥

তড়িল্লেখাতন্বীং তপনশশিবৈশ্বানরময়ীং
নিষণ্ণাং ষণ্ণামপ্যুপরি কমলানাং তব কলাম্।
মহাপদ্মাটব্যাং মৃদিতমলমায়েন মনসা
মহান্তঃ পশ্যন্তো দধতি পরমাহ্লাদলহরীম্॥

ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণা-
মিতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ
তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাম্ ॥

বিন্দু-মুখ, শিবরাণী, স্তন দুটী শোভে নিম্নে তার,
হকারার্দ্ধে কামকলা, হেন রূপ ধ্যানে ফোটে যার—
সে যে নারীমনচোরা, বল মাগো, সে কি কথা আর—
রবিশশিপয়োধরা বিশ্বরাণী দোলে গলে তার!

কিরণ অমিয়ধারা অঙ্গ হতে পড়ে উপচিয়া,—
জোছনা-জমিয়া-গড়া মূর্ত্তি যার আলো করে হিয়া—
ভুজগের দর্প হরে দৃষ্টি তার খগপতি হেন,
স্নিগ্ধ করে জ্বরাতুরে দুটী আঁখি সুধাসারে যেন!

বিজলীর রেখা সম তন্বী তব শোভে কামকলা,
ছয়টী কমল পরে, ইন্দু-রবি-হুতাশনজ্বালা—
সহস্রার-পদ্মবনে যবে তারে হেরে মহাজন,
আনন্দলহরী-ভঙ্গে দোলে তার মায়াহীন মন।

"হে ভবানি, দাস আমি, করুণায় চাহ আঁখি তুলি"
এত ভাবি "হে ভবানি" বলিতেই উঠে যে আকুলি,
তখনি সাযুজ্যপদ তুমি তারে কর বিতরণ—
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-দেবরাজ মুকুটেতে দীপিত চরণ!



মন্ত্র ও মন্ত্রচৈতন্য

"মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ।"—যা মনন করলে এই ভবজ্বালা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাই মন্ত্র। প্রত্যেক দেবতার এক একটী মন্ত্র আছে—তাকে বলে বীজমন্ত্র। সিদ্ধ জীবন্মুক্ত মুনি-ঋষিরা সমাধি অবস্থায় এই সব মন্ত্র উদ্ধার করে গেছেন। দেবতামাত্রেই ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ। গুণ এবং ভাবের তারতম্যে দেবতাদের নাম বিভিন্ন হয়েছে। যেমন রাধাকৃষ্ণের মূর্তিতে প্রেম ও মধুর ভাব উজ্জ্বলরূপে ফুটে উঠেছে, আবার শিবশক্তিতে সংহারিণী ও পালনী শক্তির বিশেষ বিকাশ।

মানুষের একটী রাশ নাম থাকে, আবার মা-বাপের দেওয়া একটী ডাক নামও থাকে; কিন্তু সাধারণতঃ লোকে এই ডাক-নামেই পরিচিত হয়, রাশ নামটী গোপনীয়ই থেকে যায়। শাস্ত্রীয় কোন কাজকর্ম—যথা যাগযজ্ঞ, বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন আদি কর্মের সময়ই ঐ নামের আবশ্যকতা দেখা যায় এবং ঐরূপ বিশেষ বিশেষ কাজের সময়ই ঐ নাম ব্যবহার করা হয়।

তেমনি রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীরও এক একটী গুহ্য নাম থাকে—ওরই নাম বীজমন্ত্র। শ্রীগুরুসন্নিধানে ঐ বীজমন্ত্র লাভ করে তাঁর নির্দেশ অনুসারে সাধন করতে করতে তাঁরই কৃপায় মন্ত্রসিদ্ধি হয় অর্থাৎ সাধ্যবস্তু লাভ হয়। মন্ত্র সিদ্ধ হলেই সব হয়ে যায়। যাঁর ইষ্টমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হয়েছে, তাঁকেই মহাপুরুষ বলা হয়। তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষও হয়ে যেতে পারেন। মন্ত্র-সিদ্ধি শুধু জপের দ্বারাই হয়। কিন্তু মন্ত্রের অর্থবোধ ও মন্ত্রচৈতন্য করা না হলে তা অসম্ভব। মন্ত্রার্থ না জেনে বা মন্ত্র চৈতন্য না করে শুধু জপ করলে কোটীকাল করলেও সিদ্ধিলাভ হয় না। এখন মন্ত্রার্থ কি, তাই বুঝতে হবে।

মন্ত্র এবং মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতায় যে অভেদ জ্ঞান, তারই নাম মন্ত্রার্থ। যেমন বীজ ও বৃক্ষ। বীজের মধ্যে বৃক্ষ নিহিত থাকে, তা জানা যায় না; কিন্তু উপযুক্ত জল, বায়ু ও তাপ সংযুক্ত হলে সেই বীজ হতেই বৃক্ষের অঙ্কুর উদগত হয় এবং যত্ন ও চেষ্টার ফলে কালক্রমে সেই অঙ্কুর মহামহীরুহে পরিণত হয়। পূর্বেই বলেছি, গুরু যে মন্ত্র দেন, তাকে বীজমন্ত্র বলে। তোমার একটী আম-গাছের আবশ্যক। আমার একটী ফলন্ত গাছ আছে। তুমি এসে প্রার্থী হলে। আমি তোমায় গাছটী দিতে পারি না; আর গাছটী দিলেও প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে তাকে নিয়ে অন্যত্র লাগালে সে কিছু বাঁচবে না এবং তোমার পক্ষে ফলদায়ী হবে না। সুতরাং তোমাকে আমার ঐ গাছেরই একটী বীজ দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে যে প্রণালীতে ঐ বীজকে অঙ্কুরিত করতে হবে অর্থাৎ যে প্রকার যত্ন ও সংরক্ষণ করতে হবে, তা আমায় বলে দিতে হবে। তুমি আমার উপদেশমত কার্য্যকারী হলে তখন ঐ বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হবে। গুরু ইষ্টদেবের বীজমন্ত্রটী শিষ্যকে/

দিয়ে দেন, দিয়ে তাকে সেই বীজ মন্ত্রটী কি প্রকারে চৈতন্য করে জপ করতে হয়, তার প্রণালীটীও বলে ও দেখিয়ে দেন। শিষ্য গুরুর উপদেশ মত কার্য্যকারী হলে এবং রীতিমত যত্ন ও চেষ্টা করলে তখন ঐ বীজ হতে ইষ্টরূপের স্ফুরণ হয়।

যোনিমুদ্রাযোগে জপের নামই মন্ত্র চৈতন্য করা। কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগরিত করে অর্থাৎ মূলাধার হতে উত্থাপিত করে হৃৎপদ্মে স্থির আসনে বসিয়ে মন্ত্র জপ করার প্রণালীকেই মন্ত্রচৈতন্য বলে। কেন্দ্রীভূত শক্তির নামই কুলকুণ্ডলিনীশক্তি। যোগশাস্ত্রে যাকে মূলাধার পদ্ম বলে, সেই মূলাধারই হচ্ছে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির স্থান। আর সহস্রার হচ্ছে পরমশিবের স্থান। শিব বললে সাম্প্রদায়িকতা দোষ বর্ত্তাতে পারে। বেদান্তে ঐ স্থানকে পরমগুরুর বা চৈতন্যের স্থান বলা হয়েছে। পাতঞ্জল মতে সহস্রার পুরুষের স্থান। এই কুণ্ডলিনীশক্তিই সাংখ্যের প্রকৃতি।

শাস্ত্রগ্রন্থে কুণ্ডলিনী শক্তিকে নিদ্রিতা বলা হয়। ওটা রূপক। নিদ্রিতা অর্থে তিনি তাঁর স্বরূপচ্যুতা অর্থাৎ অজ্ঞানে আবরিতা। তিনি চৈতন্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। জড় এবং চৈতন্যের মিলনে তবে উভয়ের অস্তিত্ববোধ এনে দেয়। এই যে আমাদের শরীর, এতে চৈতন্য এবং শক্তি উভয়ই বিরাজিত রয়েছেন, তবু আমাদের সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে না, কেন ? শক্তি এবং চৈতন্যের বিচ্ছেদ হেতুই উঁহাদের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় না। আবার চৈতন্য ও শক্তির মিলন ঘটাতে পারলেই অর্থাৎ অজ্ঞান আবরিত শক্তি জ্ঞানের সহিত মিলিত হলেই তিনি তাঁর স্বরূপে ফিরে আসেন, আর তখনই চৈতন্য এবং শক্তি উভয়েরই অস্তিত্ব বোধ হয়।

এটা বেশ বোঝান যেতে পারে সূর্য্যরশ্মি দিয়ে। ধর, এই ঘরের মধ্যে জানালার ছিদ্র দিয়ে সূর্য্যের একটা ক্ষীণ রশ্মি এসে পড়েছে। (সূর্য্যরশ্মি যদিও জড় তবু সূক্ষ্মত্বের তারতম্যানুসারে ওকে অন্য পদার্থ হতে অধিকতর সূক্ষ্ম ধরা যেতে পারে।) কিন্তু ওর রশ্মিরেখা দেখা যাচ্ছে না—যেখানে স্থূল অর্থাৎ মাটীতে রশ্মির সংযোগ ঘটছে, সেইখানেই একটী ক্ষুদ্র বৃত্তাকার আলোকচ্ছটা দেখা যাচ্ছে মাত্র। তারপর ঘরের মাঝে একটু ধুঁয়া করা হল ; অমনি তাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু যখন এসে ঐ রশ্মিরেখার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, তখনি সুদীর্ঘ একটী ধুঁয়ার রেখাও দেখা যাচ্ছে। ঐ রশ্মি ঐ রূপেই এ ঘরের ভিতর ছিল, কিন্তু তা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না ; ধুঁয়াও ঘরে ছিল, তাও দেখা যাচ্ছিল না। যেমনি ধুঁয়ায় আর রশ্মিতে যোগ ঘটল, অমনি উভয়েরই অস্তিত্ববোধ এসে পড়্‌ল। তেমনি প্রকৃতি বা শক্তি, পুরুষ বা চৈতন্য উভয়ের সান্নিধ্য ঘটলে তবে উভয়ের অস্তিত্ববোধ জাগে। জড়ের সংযোগেই চৈতন্যের অস্তিত্ববোধ।

প্রকৃতি বা শক্তি পরিণামী। পরিণামী বল্‌তে কি রকম বোঝায়, যেমন দুধের পরিণামে দধি, ঘোল, সর, মাখন, ছানা, ক্ষীর, ইত্যাদি। তেমনি প্রকৃতি বা শক্তির পরিণামেই জগতে যা কিছু দেখ্‌ছ সব। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই প্রকৃতির পরিণাম ফল। মূল পরিণাম সাতটী, তা থেকে অনন্তকোটী পরিণাম হয়েছে। মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব আর পঞ্চ তন্মাত্রতত্ত্ব, এই হচ্ছে মূলতঃ সাতটী পরিণাম। এ থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়েছে। মূলা

প্রকৃতি ক্ষোভ প্রাপ্ত হলে তার পরিণাম ঘটে। এই দেহেও তিনি ঐরূপ পরিণামপ্রাপ্ত হয়ে রয়েছেন। প্রকৃতি পরম পুরুষ হতে বিচ্যুত হয়ে ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, ও পৃথ্বীতত্ত্বে পর্য্যবসিতা। সূক্ষ্ম হতে ক্রমে স্থূলতম পৃথ্বীতত্ত্বে তিনি পরিণমিতা হয়ে এই শরীরের স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্বপ্রকার কার্য্য বিধান করছেন। মূলাধারই হচ্ছে পৃথ্বীতত্ত্বের স্থান। ঐ স্থানেই সমস্ত শক্তির আধার। সহস্রারে চৈতন্যের স্থান। শক্তি সেখান হতে বিচ্যুতা হয়ে মূলাধারে এসে কেন্দ্রীভূতা হয়ে রয়েছেন। এখান থেকে বিপরীতক্রমে উত্থাপন করে তাঁকে নিয়ে সহস্রারে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত করলে জীবের আবরণ ক্ষয়। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকেই তার জন্য জাগরিত করে, চৈতন্য-যুক্ত করে তবে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হয়। জপের সময় বাচ্যবাচক সম্বন্ধে বীজ ও ইষ্টদেবের অভেদজ্ঞান অটুট রাখতে হয়। মন্ত্র সিদ্ধি হলে জীবের ত্রিতাপ দূরীভূত হয়। তখন সে শক্তিকে বশ করে চিন্ময় পুরুষ হয়ে যায়।

ধর্ম্মসাধন



[শ্রী জগচ্চন্দ্র দাস, বি, এ, ই, এ, সি]

"ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ" সাধনচতুষ্টয়ের একটি মুখ্য অঙ্গ। ইহার ব্যাখ্যা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আত্মানাত্ম-বিবেক গ্রন্থে যেরূপ দেখা যায়, তাহা এই—

ইহলোকে শরীর ধারণ ব্যতিরিক্ত যে বিষয়—মালাচন্দন স্ত্রীসম্ভোগাদি তাহাতে, বমনান্ন মূত্রবিষ্ঠাদিতে যেরূপ অস্পৃহা বা বিরাগ তাদৃশ ইচ্ছার নিবৃত্তি, তাহার নাম ইহলোকে ফলভোগ-বিরাগ।

পরলোকে, স্বর্গলোক অবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকললোকে অপ্সরাসম্ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্বোক্তের ন্যায় যে ইচ্ছার নিবৃত্তি, তাহার নাম পরলোকে ফলভোগ বিরাগ।

বিষয় বৈরাগ্য, উহা এই বৈরাগ্যেরই পরাকাষ্ঠা। স্বর্গাদি সুখভোগ কামনাও প্রকৃত মুমুক্ষুর জ্ঞানের চতুঃসীমার মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইতে পারিবে না; জ্ঞানের এবম্বিধ বিষয়ত্যাগ উপস্থিত না হইলে সাধকের তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার জন্মে না।

এতদ্দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, সাধনার কোনও বিষয় নাই। কোন বিষয়লক্ষ্যে ধর্ম্মসাধন নয়। বিষয়জ্ঞান ধর্ম্ম-

সাধনের অন্তরায়। ঐশ্বর্য্যলাভ, ব্রহ্মদর্শন, (?) স্বর্গপ্রাপ্তি প্রভৃতিও মোক্ষপথের বিঘ্ন। এ জন্য বলা যায়, সাধনার উদ্দেশ্য সর্ব্বত্যাগ বা সন্ন্যাস। আমরা নিত্যকর্ম্মে ঔদাসীন্য বা কর্ম্মবিমুখতাকে সন্ন্যাস বলি না; গীতাকার এবম্বিধ কর্ম্মসন্ন্যাসীকে—"বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার" বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন (৩য় অধ্যায় ৬ শ্লোক)। সমুদয় কর্ম্মফলত্যাগ—এমন কি কর্ম্মত্যাগেও কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারিবে না, এবম্বিধ ত্যাগই সর্ব্বত্যাগ নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

জ্ঞানের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অবস্থা বা চিত্তের পরিহারদ্বারাই এই সর্ব্বত্যাগ বা সন্ন্যাস সাধিত হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শিখিধ্বজ-চূড়ালা নামক কোন রাজদম্পতীর একটি মনোহর উপাখ্যান আছে, উহা হইতে আমরা সর্ব্বত্যাগের অর্থ অবধারণ করিতে পারি। আখ্যায়িকাটি এই—

ভোগ সম্ভোগে যৌবন বিগলিত হইয়া দেহ যখন শিথিল হইবার উপক্রম হইল, তখন রাজদম্পতী শিখিধ্বজ-চূড়ালার হৃদয়ে জরা ও মৃত্যুর চিন্তা উপস্থিত হইল; তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন, আয়ুক্ষয় হইতেছে, দেহের বিনাশ অনিবার্য্য, তথাপি ভোগতৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। অধ্যাত্মশাস্ত্রই সংসারব্যাধির ভেষজ, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা দীর্ঘকাল শাস্ত্রবিচারে কর্ত্তন করিলেন। রাজমহিষী তত্ত্বদর্শিগণের মুখ হইতে উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন; পরন্তু শিখিধ্বজের অন্তঃকরণ তত্ত্বজ্ঞানবিহনে দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল; তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইল; তিনি অতুল বিভবকে বিষোপম জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি একদিন চূড়ালাকে বলিলেন—"আমি বহুকাল রাজ্যভোগ করিলাম, এখন আমি সেই সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়াছি। ইচ্ছা করিতেছি বনগমন করিব।" ভার্য্যা, অমাত্যবর্গ ও প্রজাগণ বিরোধী হইল; কিন্তু কাহারও অনুরোধ না শুনিয়া তিনি বনগমন করিলেন।

বনে গমনকরতঃ "কোন এক সমতল, সলিলপূর্ণ, শাদ্বলশ্যামল শীতল স্নিগ্ধ সফল-বৃক্ষরাজিসঙ্কুল পবিত্র প্রদেশে মঞ্জরীশোভিত লতাদ্বারা এক নিজের আবাস পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। নৃপতি শিখিধ্বজ সেই মঠিকা মন্দিরে মসৃণ বেণুদণ্ড, ফল ভাজন ভাজন, পুষ্প ভাণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষমালা, অর্ঘ্যপাত্র, শীত নিবারণের কন্থা, বসিবার কুশাসন ও মৃগচর্ম্ম এ সকল সংগ্রহ করিয়া তথায় স্থাপন করিলেন।" তথায় তিনি দিবসের প্রথম প্রহরে সন্ধ্যা করিয়া জপ করিতেন। দ্বিতীয় প্রহরে পুষ্পচয়ন ও ফলমূল কুশকাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতেন, তৃতীয় প্রহরে স্নান ও দেবার্চ্চনা করিতেন; পরে কিঞ্চিৎ বনফল কন্দমৃণালাদি ভোজন করিয়া জপপরায়ণ সেই জিতেন্দ্রিয় শিখিধ্বজ রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শিখিধ্বজের অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইল; এক্ষণে তিনি জরাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তদীয় মহিষী চূড়ালা পতির অবস্থা অবগত হইবার জন্য উৎসুক হইলেন, এবং কুম্ভনামক দেবতনয়ের দেহ পরিগ্রহণ করিয়া তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন। শিখিধ্বজ কুম্ভমুখনিঃসৃত জ্ঞানগর্ভবাক্য শ্রবণ করিতে করিতে সাতিশয় চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করিলেন, এবং উভয়ে উভয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শিখিধ্বজ বলিলেন

লাগিলেন—"আমি সংসারভয়ে ভীত হইয়াই অরণ্য মধ্যে বাস করিতেছি, আমি শিখিধ্বজ নামে রাজা। যে ব্যক্তি ভাগ্যদোষে দরিদ্র, তাহার পক্ষে যেমন একটী নিধিও পাওয়া দুর্ঘট, কঠোর তপস্যাসাধন করিয়াও আমার পক্ষে সেইরূপ বিশ্রান্তি লাভ দুর্ঘট হইয়াছে। আমার সমুদয় প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, কোন ফলই লাভ করিতে পারিতেছি না। রাজ্যে অবস্থানকালে যে সৎসঙ্গ লাভ করিতাম, এক্ষণে আর তাহা ঘটে না, অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। এই বনমধ্যে কীটদষ্ট বৃক্ষের ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইতেছি। আমি সম্যকরূপে তপস্যা করিতে থাকিলেও কেবল দুঃখের উপর দুঃখ রাশিয়ারা আকুল হইতেছি। অমৃত আমার নিকট গরলে পরিণত হইয়াছে।"

কুম্ভরূপধারিণী চূড়ালা তখন বলিলেন—হে, রাজন্, দারাপুত্র বন্ধুবান্ধবসহ রাজ্যত্যাগ করিয়া মনে করিতেছ সর্ব্বত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু অহং অভিমান এখনও পরিত্যাগ করিতে পার নাই। ভবৎকৃত এই সর্ব্বত্যাগ মহান্ অভ্যুদয়রূপী পরমানন্দ নহে। সে পরমানন্দ এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ, তাহা বহুদিনের বহু আয়াস সাধ্য। প্রবল বাত্যায় যেমন কানন-স্পন্দ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভাবনা বলে যখন তোমার সঙ্কল্প আবার ক্রমে বর্দ্ধিত হইবে, তখন তোমার এই সর্ব্বত্যাগ কোথায় উড়িয়া যাইবে! যে ব্যক্তি হৃদয়ে অণুমাত্রও চিন্তাকে স্থান দেয়, তাহার সর্ব্বত্যাগিতা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? পণ্ডিতগণ চিন্তাকে চিত্ত শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, সঙ্কল্প উহার আর একটি পর্য্যায়; সেই চিন্তা যতক্ষণ স্ফুরিত হইতে থাকিবে, ততক্ষণ চিত্তত্যাগ কিরূপে সম্ভবে? তুমি যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগকে আনিলে, কিন্তু নিশ্চিন্ততা দ্বারা তাহার সমাদর করিলে না; সুতরাং সে থাকিবে কেন? তোমার সেই সর্ব্বত্যাগরূপ চিন্তামণি চলিয়া গিয়াছে; তুমি এক্ষণে সঙ্কল্পনেত্রে তপস্যারূপ কাচমণিকেই উপাদেয়বোধে নিরীক্ষণ করিতেছ। তুমি প্রথমে বাসনাশূন্য অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বত্যাগ লাভ করিবার উপক্রম করিয়াও পরে বাসনাময়ী বৃথা তপস্যাদ্বারা কেবল দুঃখের পথই পরিষ্কার করিতে বসিয়াছ। হে সাধো! তুমি বহুদুঃখপূর্ণ রাজ্যবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও বনবাসনাত্মক দৃঢ়বন্ধনে আবার বদ্ধ হইতেছ; তোমার রাজ্যে যে চিন্তা ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষাও শীতবাতাতপাদি ক্লেশচিন্তা বেশী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা বনবাসক্লেশ অনুভব করে নাই, তাহাদের পক্ষে বনবাসক্লেশ সংসারবন্ধনক্লেশ অপেক্ষাও অধিক বলিয়া বিবেচনা করি।"

রাজা শিখিধ্বজ এই সকল জ্ঞানগর্ভ কথাতে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—

"আমি কলত্র, বিত্ত, রাজ্য দেশ সমস্তই ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি আমার সর্ব্বত্যাগ করা হয় নাই বলিতেছেন কেন?" তদুত্তরে ছদ্মবেশী চূড়ালা বলিলেন, "রাজন্, দারা, গৃহ, ধন, রাজ্য, ভূমি, রাজচ্ছত্র এ সমুদয় ত তোমার নয়, তবে তোমার এই সমুদয়ের আবার ত্যাগ কি? তোমার এখনও সর্ব্বত্যাগ হয় নাই, কেননা সর্ব্বোত্তম বিষয়রাগ তোমার এখনও অপরিত্যক্ত রহিয়াছে, সেই বিষয় ত্যাগ করিতে পারিলে তবে বিশেষপদ প্রাপ্ত হইবে।" অতঃপর শিখিধ্বজ কহিলেন,

"যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই কুটীর ও কুটীরের পত্রভিত্তি এবং কুটীরের দ্রব্য অজিন প্রভৃতি এ সমস্তও আমার নহে, তাহাও আমি ত্যাগ করিলাম।" এই বলিয়া রাজা আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং নিজের যাবতীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভার আশ্রম হইতে বাহির করিয়া একত্র জড় করিলেন এবং তাহাতে অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। অক্ষমালা, মৃগচর্ম্ম, কমণ্ডলু, আসন বসনভূষণ ভোজনপাত্রাদি সমস্ত অগ্নিতে ক্ষণকালমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গেল। নগ্নদেহ রাজা তখন কুম্ভকে বলিলেন, "দেবতনয়, আমি এ সমুদয়ের প্রতি বাসনা ত্যাগ করিয়াছি, আমি এক্ষণে সর্ব্বত্যাগ করিয়াছি। আমি এক্ষণে দিগম্বর, দিগ্ভবন ও দিকের সমান শূন্য হইয়াছি। দেবপুত্র, আমার এই মহাত্যাগের আর অবশিষ্ট কি আছে?"

তখনও কুম্ভ কহিলেন "হে রাজন্, তোমার এখনও সর্ব্বত্যাগ করা হয় নাই; তুমি সর্ব্বত্যাগজনিত পরমানন্দের অভিমান করিও না। তোমার এখনও সর্ব্বোত্তম রাগ (বাসনা) অপরিত্যক্ত রহিয়াছে। সেই রাগ ত্যাগ করিলে তবে তুমি পরমবিশোকপদ প্রাপ্ত হইবে।" এই কথা শুনিয়া রাজা শিখিধ্বজ বলিলেন—"এক্ষণে আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়বর্গে পূরিত রক্তমাংসময় দেহমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব এই উচ্চদেশ হইতে নিম্নে পড়িয়া দেহ বিনষ্ট করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বত্যাগী হইব।" এই বলিয়া সেই রাজা সমীপস্থ গহ্বরে দেহত্যাগ করিতে গাত্রোত্থান করিলেন।

অমনি কুম্ভ বলিলেন, "হে রাজন্, তুমি নিরপরাধ দেহকে কি জন্য মহাগর্ত্তে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছ? এই দেহ সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া অপরাধী নহে। দেহ অপরের দ্বারাই সুখ দুখাদির আস্পদ হয়, সুতরাং তাহার দোষ কি? যদি তুমি শরীর ত্যাগ কর, তবু তোমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইবে না। তোমার এইরূপ দেহত্যাগে দেহের পীড়নকারীর ত্যাগ করা হইবে না; সে থাকিবেই। যে তোমার এই দেহকে নিগ্রহ করিতেছে, সেই পাপীকে যদি ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে বাস্তবিক তুমি মহাত্যাগী হইবে। নতুবা দেহাদি বারংবার পরিত্যাগ করিলেও আবার বারংবার উৎপন্ন হইবে।"

অনন্তর শিখিধ্বজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুব্রত, কাহাকে ত্যাগ করিলে সমস্ত ত্যাগ করা হইবে, তাহা আমাকে বলুন।" কুম্ভ উত্তর করিলেন, "হে রাজন্, যাহা হইতে এই দেহ, এই রাজ্য, এই পর্ণশালাদি উৎপন্ন, সেই সর্ব্বময় বস্তুটী পরিত্যাগ করিলেই সর্ব্বত্যাগ হইবে। হে সাধো, আমি চিত্তকেই সেই সর্ব্বগত সর্ব্বময় বস্তু বলিয়াছি। এই চিত্তই সর্ব্ববস্তুতে সম্বন্ধ; তুমি জানিও চিত্তই মনুষ্য, চিত্তই জগজ্জাল। তুমি চিত্তকেই রাজ্য, দেহ আশ্রম প্রভৃতি সকলেরই বীজ বলিয়া জানিবে; সকলের মূলীভূত এই চিত্তকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে সমস্তই ত্যাগ করা হয়। চিত্তত্যাগকেই বুধগণ সর্ব্বত্যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাসনা চিত্তের বা মনের স্বরূপ জানিবে; চিত্ত শব্দ বাসনারই নামান্তর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই চিত্ত অহংভাব অর্থাৎ আত্মস্বরূপের অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন; এই চিত্তবৃক্ষের বাসনারূপিণী জগত্রয়ে যত স্পন্দমান যে শাখা আছে, বিচারজ্ঞানবলে আসক্তিত্যাগ

পূর্ব্বক তৎসমুদয়ের ভাবনা ত্যাগ করিতে পারিলেই উহা ছেদিত হইয়া যায়। আত্ম-বিচাররূপ অগ্নিই চিত্তবৃক্ষের বীজ দগ্ধ করিতে পারে।"

ব্রহ্মানন্দকে দ্বন্দ্বাতীত, ভাবাতীত প্রভৃতি বিশেষণদ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। তদবস্থায় জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্ব নাই; কোন ভাবাভাবও নাই। বিষয়ানুভূতিই ভাব। আত্মা বা জ্ঞান কোনমতেই স্ব স্বরূপে অবস্থান করিয়া বিষয়ানুভব করিতে পারে না; বিষয়ানুভূতি আসিলেই স্ব স্বরূপের চ্যুতি ঘটে। উহা জ্ঞান বা গুরুর নিরেট অদ্বয় অবস্থা নহে।

আত্মাকে বুঝিতে গেলেই রূপ আসে। অর্থাৎ 'এইরূপ' 'ঐরূপ' অথবা "এইরূপ নয়, ঐরূপ নয়" ইত্যাদি সঙ্কল্পবিকল্প উপস্থিত হয়; রূপবিমুক্ত করিয়া বুঝা যায় না অর্থাৎ ভাবাতীত হওয়া যায় না। রূপ থাকিলেই স্বীকার্য্য যে, রূপের দ্রষ্টা আছে; রূপ দৃশ্যে, কিন্তু দ্রষ্টায় নহে, দ্রষ্টা রূপাতীত। আত্মার স্বরূপতঃ কোন রূপ নাই; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞান হইতে বিষয়াকার নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বরূপ আত্মজ্ঞানলাভের উপায় নাই। বিষয়াকারে আকারিত হইয়াই আত্মার রূপ দৃশ্য হয়; বিষয়-সংযোগ ভিন্ন বর্ত্তমান আমিরও কোন আত্মজ্ঞান নিষ্পন্ন হয় না।

এই বিষয়াভিমুখ্য নিবারণ জন্যই যোগশাস্ত্র বলিতেছেন, চিত্তবৃত্তি নিরোধই স্বরূপাবস্থানের উপায়। জ্ঞানের বিষয়াকার বর্জ্জনই প্রকৃত সাধনা। বিষয়প্রবণতা অথবা বিষয়ের দিকে চিত্তের অনুধাবনকেই কল্পনা বলা যায় এবং বাহ্যাভিনিবেশ ত্যাগই কল্পনাত্যাগ। বৈরাগ্যের সহিত বিচার বদ্ধমূল হইলেই এই কল্পনাত্যাগ সম্ভবপর হয়। বস্তুর স্বরূপ দর্শন হইলেই আর বাসনা প্রকাশ পায় না; তখন জীব অনাসক্ত ব্যবহারী ও সাংসারিক মনোরথবিহীন হইয়া পড়ে। ইহাই সন্ন্যাস; এই সন্ন্যাসে যতির ন্যায় গৃহস্থেরও তুল্য অধিকার আছে।

যোগ ও জ্ঞান এই দুইটিকেই চিত্তনাশের উপায় বলা যায়। উক্ত দ্বিবিধ উপায়ই যোগ শব্দে অভিহিত হয়; কেননা "এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার যে যুক্তি অর্থাৎ উপায়, তাহাকে যোগ বলা হয়। যদিও উক্ত দ্বিবিধ উপায়ই যোগ শব্দে অভিহিত, তথাপি যোগ শব্দ প্রাণস্পন্দরোধরূপ উপায়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কাহারো নিকট জ্ঞানযোগ দুঃসাধ্য; এবং কাহারো নিকট যোগ-যাগ বা হঠযোগ দুঃসাধ্য। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, জ্ঞানযোগই তাঁহার মতে সুকর উপায়, যাহা একমাত্র বিবেকলাভে লব্ধ হইয়া থাকে।

জ্ঞানযোগে ক্রিয়াদি অভ্যাসের ব্যবস্থা থাকিলেও বিচারই প্রধান অবলম্বন। বিচার দ্বারা জ্ঞানের বর্ত্তমান স্বরূপ পরিবর্ত্তন করাই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য। "ইহা আমার, ইহা আমার নহে" ইত্যাকার জ্ঞানের ভ্রান্তি হইতেই যখন সংসার বন্ধন, তখন "আমি কিছুই নই" আমার কিছুই নাই" ইত্যাকার ভাবনা দ্বারাই উক্ত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইবে। কল্পনাবলে দৃশ্যমান জগতের বস্তুসত্তায় দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, প্রতিকল্পনাবলে তেমনি উহার বাস্তবতা বিদূরিত হইয়া যাইবে। এজন্য যাবৎকাল কল্পনার বিনাশ না হয়, তাবৎকাল গুরু-সন্নিধানে বিচার সহকারে প্রতিকল্পনায় রত থাকিতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণ কল্পনাবর্জ্জনের

দ্বিতীয় একটী সহকারী উপায় যাহা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা ইন্দ্রিয় স্বারূপ্য সাধন। প্রসঙ্গান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করা গিয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপতঃ আরও কিছু বলা যাইতেছে। বর্ত্তমান রূপমোহান্ধ জীবের পক্ষে রূপ-স্বারূপ্য সাধনই প্রকৃষ্ট; এজন্য নিভৃত স্থানে গমনপূর্ব্বক পাহাড়-পর্ব্বত, উচ্চ তরু অথবা নক্ষত্রাদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অবিক্ষুব্ধ চিত্তে অবস্থান করিতে অভ্যাস করা উচিত। "আমি"র কল্পনা হইতে নিস্তার পাইবার জন্যই এই সকল নৈসর্গিক পদার্থের অবলম্বন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চিত্তের বিক্ষোভ না জন্মিবার উপায়—"অ-উ-ম্" এই মন্ত্রটী মুখব্যাদান করিয়া জপ করিতে অভ্যাস করিলে আশু ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা। পুরুষ প্রযত্ন সহকারে দীর্ঘকাল ইহা অভ্যাস করিলে, কল্পনাত্যাগ অবশ্যম্ভাবী হইবে। এই রূপ-স্বারূপ্যের অবস্থায় যাহা থাকে, তাহা একটা প্রতিবিম্ব মাত্র—স্পর্শরসগন্ধাদি বিবর্জ্জিত ছায়াকার মাত্র। ছায়া কখনও কোন বস্তুর সম্পূর্ণ আবরক হয় না; এ জন্য জ্ঞানের স্বরূপ ভাসিয়া উঠে। এই যবনিকা একবার উত্তোলিত হইলে প্রাণ আর কিছুতেই বিষয়-সঙ্গে রসবোধ করিতে পারে না; গুরু বা জ্ঞানের স্বরূপই আকর্ষণের বস্তু হইয়া পড়ে। সেই আকর্ষণে যোগ দিয়া থাকিতেই আত্মারাম তৃপ্তিবোধ করে; তখন আর বিষয়রঙ্গে অবতরণ করিয়া ধরণীর ধূলায় লুটাইতে ইচ্ছা হয় না, বরং ক্লেশই বোধ করে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে— "জ্ঞান হইলে জ্ঞানী কি রূপ দেখেন না? তাঁহার কি মনের ক্রিয়া হয় না? তিনি সবই করেন, তাঁহার সবই হয়; কিন্তু জ্ঞান তাহাকে উপাদেয় বোধ করে না; তাই সেই দর্শনাদিতে জ্ঞানীর কর্ত্তৃতা নাই। জ্ঞানী ভাবেন না যে ইহা আমারই; সংসারে যাহা উপাদেয়বোধে গ্রহণ করিবে, তাহাই তোমার দুঃখের, কিন্তু আপাত সুখের হইবে। এ সংসারে অনুপাদেয় বোধে বস্তু গ্রহণ করা বড়ই কঠিন; কিন্তু যদি কেহ তাহা পারে, তবে তাহার সে বিষয় গ্রহণ সুখেরও নহে, দুঃখেরও নহে।"

আমরা এই প্রবন্ধে এমন অনেক সংজ্ঞা-শব্দের প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছি, যদ্দ্বারা অনেকের ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতে পারে; এ জন্য একটু সাবধানতা প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বপ্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছি, "বিচার হইতে উৎপন্ন আত্মবিজ্ঞানই জ্ঞান; উহা যাহা আছে—তাহাই অভ্রান্তরূপে দেখায়, নূতন কিছুই প্রসব করে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে, সাধনা দ্বারা যেমন দর্শন করিবার, প্রাপ্ত হইবার কিছু নাই, তেমনি বুঝিবার বা জানিবারও কিছু নাই। জ্ঞানের নিরবলম্ব, নিঃসঙ্গ নির্ব্বিষয় ভাব আনয়নই সাধনার লক্ষ্য। আমরা যে যে স্থলে বলিয়াছি, জ্ঞানের পরিবর্ত্তনই সাধনা, সেই সেই স্থলে বুঝিতে হইবে, জ্ঞানের ভ্রান্তি পরিহারই সাধনা। জ্ঞান নিত্য পদার্থ, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন বা বিকার সম্ভবপর নয়। তাহার পক্ষে গ্রহণ বা ত্যাগ কিছুই সম্ভবপর নয়। তাহার যে বিষয়াকার, উহাও ভ্রান্তির কার্য্য; তাহাতে বিষয়াকার নাই ইহাই সম্যক জ্ঞান। বাক্যভাষা ভ্রান্তিকল্পনা, ভ্রান্তিরাজ্যের অবলম্বন। ভ্রান্তকে বুঝাইতে বাক্য-ভাষা ভিন্ন বুঝান যাইতে পারে না। অজ্ঞানের বোধোপযোগী করিবার জন্য জ্ঞানের ভ্রান্তি, বিকারাদি কল্পনা করিয়া তদনুযায়ী বাক্যভাষা অবলম্বন করিতে হয়। অদ্বৈতজ্ঞানে ভাষা নাই, বাক্য নাই, প্রশ্ন নাই, প্রষ্টা নাই, উপ-

দেষ্টা নাই। সেই স্থানে গিয়া কিছু জানিবার থাকে না; সে জন্য কোন প্রয়াসও হয় না। এরূপ কোন বাক্যই নাই, যাহাতে ভ্রমকলঙ্ক অবিদ্যমান। যাবৎকাল তত্ত্বজ্ঞানোদয় না হয়, তাবৎকাল অজ্ঞানবশতঃই পরমবস্তুকে বাক্যের বিষয় ও জ্ঞানোদয় হইলেই বাক্যের অগোচর বোধ হয়। এস্থলে এরূপ বুঝা সঙ্গত হইবে না যে, বাক্যভাষাদি যখন অসত্য, তখন উপদেশাদিও অসত্য এবং ব্রহ্মোপদেশের আর উপায় নাই। অসত্য, সত্যাশ্রয়েই সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়; কিন্তু সত্যের একদা অপলাপ করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ বিষদ্বারাই বিষনাশ করা যায়, সেইরূপ কল্পনাদ্বারাই কল্পনার বিনাশ সাধন করা যায়। কল্পনার স্বরূপ (মিথ্যাত্ব) প্রতিভাত হইলেই অর্থাৎ "নায়ং সর্পঃ" এই জ্ঞান প্রতিভাত হইলেই রজ্জুস্বরূপ স্থির হইয়া যায়। ভ্রান্তি, অবিদ্যা, কল্পনা প্রভৃতি সাময়িকভাবে যাদুকরের যাদুর ন্যায় জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে, উহাদের বিনাশে বস্তুর স্বরূপ স্বতঃই বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য কিছুই করিতে হয় না।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন না এবং আপনি যাহা জানি তাহাই প্রমাণ, ইহা স্বীকার করিয়া তন্নিরপেক্ষ আর কোন প্রমাণ নাই বলিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মে যে অবিদ্যা আরোপ হইয়াছে তাহাই দূরীকরণ করা কর্ত্তব্য, ব্রহ্মবিজ্ঞানে যত্ন করা কর্ত্তব্য নহে ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রায়। কেননা, ব্রহ্মবিজ্ঞান অতি প্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বতঃ প্রতিভাত। অবিবেকিগণের বুদ্ধি অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপের বিশেষাকার বিশিষ্ট, সুতরাং নামরূপ তাহাদিগের নিকটে অতি প্রসিদ্ধ, সুবিজ্ঞেয় এবং নিকটতর—আত্মতত্ত্ব অপ্রসিদ্ধ, দুর্বিজ্ঞেয়, অতি দূর অপর কিছু, এইরূপ প্রতিভাত হয়। "যাঁহাদিগের বুদ্ধি হইতে বাহ্যাকার নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে এবং গুরু ও আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগের নিকটে আত্মতত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই এমন সুখকর, সুপ্রসিদ্ধ, সুবিজ্ঞেয় এবং নিকটতর নাই।" এই জন্যই উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্ম প্রত্যক্ষজ্ঞান।



প্রথম আমরা ব্রহ্মত্ব লাভ করি আইস, পরে অপরকে ব্রহ্ম হইতে সাহায্য করিব। 'আপনি সিদ্ধ হইয়া অপরকে সিদ্ধ হইতে সহায়তা কর,' ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হউক। মানুষকে পাপী বলিও না। তাহাকে বল, তুমি ব্রহ্ম। যদিও শয়তান কেহ থাকে, তথাপি আমাদের ব্রহ্মকেই স্মরণ করা কর্ত্তব্য—শয়তানকে নহে। যদি গৃহ অন্ধকার থাকে, তবে সর্ব্বদা অন্ধকার অন্ধকার বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে অন্ধকার দূর হইবে না। আলো লইয়া আইস, অন্ধকার আপনি চলিয়া যাইবে। (বিবেকানন্দ)

হিমালয়ের পত্র

—ঃ{*}ঃ—

[শ্রীমৎ স্বামী রামতীর্থ]

গঙ্গোত্রী
সেপ্টেম্বর, ১৯০১

সুরধুনীর বুঝি রামের বিরহ আর সহ্য হল না। তাই প্রায় মাস খানেকের অদর্শনের পর রামকে সে তার বুকের কাছে টেনে এনেছে। লোকে তাকে জ্ঞানপ্রবাহা বলে বটে, কিন্তু রামকে দেখে সে আনন্দের অশ্রু-বর্ষণে আকুল হল যে! গঙ্গোত্রীতে তার যে অপরূপ মাধুর্য্য আর উচ্ছল ক্রীড়াচাতুরী, তার বর্ণনা করে কার সাধ্য? তার সঙ্গী হল তুষার-শৃঙ্গ আর শুভ্র দেওদার শ্রেণী—তাদের ঋজু প্রকৃতির প্রশস্তিই বা কে গাইবে? দেওদারের দীর্ঘ তনু পারস্যকবির প্রিয়ার কথা মনে জাগিয়ে দেয়—তাদের সুগন্ধি নিশ্বাসে দেহ মন তেজস্বী, আনন্দে উচ্ছ্বসিত ও সমুন্নত হয়।

এখানে এলেই ঠিক বুঝতে পারি, "ভগবান্ কেমন করে পাথরে ঘুমিয়ে আছেন, তরুলতায় নিঃশ্বসিত হচ্ছেন, জীবে গতিশীল হয়েছেন, আর মানুষের মাঝে চেতনায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন!"

যমুনোত্রী ছেড়ে গঙ্গোত্রী আসতে যাত্রীদের কম পক্ষেও দশদিন লাগে। যমুনোত্রী ছেড়ে তিন দিনে রাম গঙ্গোত্রী এলেন। তিনি যে রাস্তায় এলেন, ও দেশের লোক সে পথে এখনও পা দেয়নি। পাহাড়ীরা ওকে ছাঁয়া পথ বলে। পর পর তিন রাত্রি নির্জ্জন গিরিগুহায় কাটল। রাস্তায় আমরা ঘরদোর বা বস্তি পাইনি। সারা পথে মানুষের মুখ দেখিনি।

সমস্ত পথটাই ছায়াশীতল বলে ওকে ছায়া-পথ বলে। মনে করেছ বুঝি গাছের ছায়া? তা নয়। অমন ধূ-ধূ উঁচুতে আর অমন কন্‌-কনে ঠাণ্ডার মাঝে গাছ গজাবে কিসের গরজে? প্রায় সবটা পথই মেঘে ঢাকা। যমুনোত্রী আর গঙ্গোত্রীর আশপাশের গ্রামের রাখালেরা পশু চরাবার সময় প্রায় দু তিন মাস বনে জঙ্গলেই কাটিয়ে দেয়। বান্দরপুছ আর হনুমানমুখ নামে দুটো তুষার শৃঙ্গ রয়েছে, তার কাছে এসে দু'দল রাখালের দেখা হয়; প্রসিদ্ধ নদী দুটীর মূল ধারাকে এরা সংযুক্ত করেছে। এমনি করে এই পথটা আবিষ্কার হয়। পুষ্পোচ্ছ্বাসে সমস্তটা পথ ছেয়ে ফেলেছে—দেখে মনে হয় যেন জরীর কাপড় বিছানো রয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে এত হলদে, নীল, লাল ফুল ফুটে রয়েছে, লিলি, ভায়োলেট, ডেইজী, নানা-রকমের টিউলিপ; গুগগুল, ধূপ, মমীরা, মিঠা-তেলিয়া, শালবমিশ্রী—আরও কত বিচিত্র রঙীন গাছগাছড়া; জাফরাণ, ইত্রাসু প্রভৃতি নানারকমের সুগন্ধি গাছ; ভেরগন্দা, ব্রহ্ম কনোয়াল, তাদের গর্ভে বিন্দু বিন্দু তুষার জমাট বেঁধে রয়েছে;—এই সব দেখলে মনে হয়, স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিধাতা যিনি, তাঁর উপযুক্ত বিলাসো-পবনই বটে।

প্রেমের অন্তহীন উচ্ছ্বাস তুমি, ওগো রঙের অপ্সরী! তোমার বিশ্ববাণীর ছন্দে তুমি বিশ্বের

সকল ঐশ্বর্য্যকে বন্দী করে রেখেছে। সৃষ্টি-ছাড়া কীর্ত্তি তোমার ;—তোমার এই বর্ণ সুষমার মহারাগে ভগবানের অব্যক্ত আনন্দ বুঝি ব্যক্ত সুরে ফুটে ওঠে।"

গোলাপী যৌবন সব ঠাঁই উচ্ছ্বসিত হয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। চারদিকে মলয় বাতাসের মুক্ত হিল্লোল, সে যাকে পাচ্ছে, তাকেই চুমো খাচ্ছে—বিশেষতঃ যেসমস্ত ফুলে রঙের বাহার। বায়ুতরঙ্গে সৌরভের যে কম্পমান আভাস, তা বাঁশীর সুরের মত যেন রামের মন ভুলালো। এখানকার হাওয়ায় যে সুবাসের প্রাচুর্য্য ভেসে আসে, তা যেমনি মধুর, তেমনি কোমল ; দুটী বঁধুর মিলনবেলার হাসির মত মধুর—আবার তাদের বিদায়ক্ষণের অশ্রুর মত কোমল। তুঙ্গগিরিশৃঙ্গে এই অপরূপ প্রান্তর সজ্জা যেন বিচিত্র মছলন্দের মত বিছানো রয়েছে। একি দেবতাদের ভোগের ঘর, না নাটের মঞ্চ ? এমন পরীস্থানে আবার ঝরণার কুলুকুলু বা প্রপাতের বজ্রগর্জ্জনেরও অভাব নাই। কোনও কোনও শৃঙ্গে উঠলে দৃষ্টি আর কোথায়ও বাধে না—নির্ব্বাধে তা চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে—মাঝে কোনও পাহাড়ের ব্যবধান নাই বা কুপিত বলাহকের ভ্রূকুটী নাই।

উচ্চশির পর্ব্বতমালার সুগম্ভীর ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা করতে করতে আবার উষার শিশির কণিকার মণিময় দ্যুতির ঝিকিমিকিটুকু যেন আমরা ভুলে না যাই। পথের শোভা সেই কি কম বাড়িয়েছে! পদ্মপত্রে ক্ষণস্থায়ী শিশির বিন্দুর রূপকে জীবকে কি অপরূপ ভঙ্গীতেই না চিত্রিত করা হয়েছে। হাঁ, সে ক্ষণিক বটে, বিন্দু বটে—কিন্তু কি তার শুচিতা, কি তার দ্যুতি! অনন্তজ্যোতির প্রস্রবণ আত্মসূর্য্যের দ্যুতি যে তার বুকে ঝলমল করছে। হে মানব, তুমি কি ওই ক্ষুদ্র কণিকা, না আকাশে অনন্ত জ্যোতির মণিকা ? সত্য বলছি, তুমি সেই জ্যোতিঃর জ্যোতিঃ, তুচ্ছ কণামাত্র তো নও! বেদ বলছেন, 'রাম বলছেন—অকুণ্ঠ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছেন, এই যে নন্দনকাননের শোভা—তোমার সর্ব্বতোবিচ্ছুরিত মহিমাই তার উৎস। ঊর্দ্ধে, অধেঃ, সর্ব্বত্রই তোমারই জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ। পরিমাণ যে শক্তির কাছে পরাহত, পূর্ণকে এবং অংশকে নির্ব্বিচারে যে শক্তি বাহন করেছে, তুমিই যে সেই শক্তি! উষার মুখের হাসি তো তুমিই ফুটিয়ে তুলছ—গোলাপের কপোল লজ্জায় অরুণ করছ!

নিশীথে গ্রহমণ্ডলীর জ্যোতিতে বা প্রভাতের শিশিরকণার দ্যুতিতে তোমাকেই তো দেখ্‌তে পাচ্ছ। যা কিছু সুন্দর, সব তোমারই প্রতিবিম্ব। তারকাখচিত চন্দ্রিকারজনী, গোধূলির কোমল আভা, শিশিরসিক্ত প্রভাত—এ তো তোমারই লীলা। যা কিছু উজ্জ্বল, যা কিছু সুন্দর—সে তো তোমারই হাতে সাজানো। তোমার মহিমাই সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করছে—সর্ব্বত্রই শুধু এই গুঞ্জরণ—"ভগবান্ যে এখানে!"

মাখনচোরা গোপীর মাখন চুরী করে পেট ভরে তা খেয়ে নিত আর বাছুরের মুখে একটু আধটু মাখিয়ে রাখ্‌ত—এই ছিল তার নষ্টামী। গোপীরা তো আর তা জানে না—তারা এসে ওই বেচারীদের ঠেঙ্গাতো, গালাগাল করতো, আর চোরের শিরোমণি সেই দুষ্টুটী থাকত পালিয়ে। যিনি সবার প্রাণের প্রাণ, আপন খুশীমত তাঁর খেলা তিনি খেলছেন,—বাস্তবিক এই বাজিকর রামেরই কারসাজি সব; কিন্তু কি তার অপরূপ

মায়া, সব দায় সে চাপিয়েছে মিথ্যা অহং এর উপর। ওই মাখনচোরা ঠাকুরটীকে শিষ্টই বল, আর দুষ্টই বল, ওগো পাঠক, সে যে গো তুমি! হোক্ সে ঐন্দ্রজালিক, হোক্ সে বাজীকর—রামই যে তোমার পরমাত্মা। যা কিছু আছে, তোমাতেই আছে, তুমিই সকলকে ধারণ করে আছ। এই ক্ষুদ্র দেহের নীরস চড়ায় তুমি বন্দী নও তো। অপরাধী অহং তোমার স্বরূপ কখনই নয়। তুচ্ছ বিন্দু তুমি নও, তুমি যে মহাসিন্ধু গো!

বাইরের রূপে যার আঁখি মজে, তাকে বল্‌ছি। রাম এখন যেখানে আছেন, সেটী একটী নিরালা কুটীর, দূরে তার গিরিশ্রেণীর উচ্চপ্রাচীর, চারিদিকে শ্যামল উপত্যকা—আর সম্মুখেই গঙ্গার অপরূপ শোভা। নারায়ণ আর তুলারাম অন্য জায়গায় থাকে। এখানে এত রামবুটী ধরে! সারাদিন পাখীর অবিশ্রান্ত আনন্দকূজন। হাওয়াতে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। গঙ্গার কুলুকুলু আর পাখীর চহ্‌কারে সারাদিন যেন বেহস্তের গুল্‌জারী! গঙ্গার উপত্যকা এখানে খুব প্রশস্ত। গঙ্গা যেন একটা বিরাট প্রান্তরের মাঝে বয়ে চলছে। খরস্রোত—কিন্তু রাম কতবার হেঁটে পার হয়েছেন। কেদার আর বদ্রী বার বার রাম বাদশাকে সস্নেহে আমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু বিচ্ছেদের কথা শুনতেই যে গঙ্গারাণীর মুখ আঁধার হয়ে যায়; আর তাকে নারাজ কিম্বা বেজার দেখ্‌লে রামের ভারী দিল দুখায়।

সুমেরু দর্শনে

রাম যতদিন যমুনোত্রী গুহায় ছিলেন, ততদিন তাঁর খাদ্য ছিল দিনের মাঝে একবার আলু আর লঙ্কা। শেষে ওতে পেটের অসুখ হয়ে গেল। তিন দিন ধরে সাতবার করে দাস্ত হতে লাগ্‌ল। চারদিনের দিন, অসুস্থ শরীরেই রাম ভোরবেলায় উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করে সুমেরু বলে যাত্রা সুরু করলেন—পরণে শুধু একখানা কৌপীন, জুতা নেই, ছাতা নেই, পাগড়ী নেই। গরম পোষাক গায়ে পাঁচজন শক্ত পাহাড়ী তাঁর সঙ্গে চল্‌ল। নারায়ণ আর তুলারামকে ধরশালীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথমেই শিশু যমুনাকে তিন চারবার পার হতে হল। তারপর যমুনার উপত্যকা—প্রায় ৪৫ গজ উঁচু আর পোয়া মাইল লম্বা একটা বিরাট হিমশিলাতে রুদ্ধ হয়ে আছে। দুধারে খাড়া দেওয়ালের মত দু'ধার পাহাড় সদর্পে দণ্ডায়মান। রাম বাদশাকে আর এগুতে দেবে না বলে তারা ষড়্‌যন্ত্র করেছে? তাই নাকি? বজ্রকঠিন ইচ্ছার সামনে সব বাধা ফুৎকারে উড়ে যাবে না! পশ্চিমের পাহাড়ী দেয়াল বেয়ে উঠ্‌তে সুরু করলাম। কখনো কখনো পা রাখবার কিছুই অবলম্বন পাই না—সুগন্ধি কাঁটাঝোড় ধরে কোনও রকমে দেহভার রক্ষা করতে হয়, কখনো 'চা' নামে পাহাড়ী ঘাসের কোমল শিষে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল জড়িয়ে খাড়া থাকতে হয়। মাঝে মাঝে নিশ্চিত মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে হয়। কোথাও গভীর গহ্বর, যমুনা গর্ভের বরফে পূর্ণ —কবরের মত হাঁ করে রয়েছে, যেন কারু পা একটুখানি ফস্‌কে গেলেই মরণ আদরে তাকে জড়িয়ে ধরবে বলে অপেক্ষা করে আছে। বহু নীচে যমুনার অস্পষ্ট মৃদু কুলুকুলুধ্বনি—মৃত্যুর অনতিব্যক্ত দুন্দুভিনাদের মত কাণে আস্‌ছে। এমন করে মৃত্যুর কবলে প্রায় তিন কোয়ার্টার আমাদের চল্‌তে হল। অদ্ভুত অবস্থা তখন আমাদের; একদিকে মৃত্যুর নিমেষনিহত একান্ত দৃষ্টি,

আর একদিকে সৌরভে মাতাল বিভোল বাতাসের হল্কা।

এমনি করে বিপদের ঘুরণপাকের মধ্য দিয়ে অবশেষে ভয়ানক একটা হিমশিলার সামনে এসে পৌঁছলাম যমুনা সেখানটা ছেড়ে গেছে। সবাই একটা খাড়া পাহাড়ে চড়্‌লাম। পথ তো ছিলই না, পগ্‌ডাণ্ডিও ছিল না। একটা গভীর বন পার হতে হল, গাছের গা পর্য্যন্ত সেখানে দেখ্‌তে পেলাম না। রামের গা কয়েক জায়গায় ছড়ে গেল। এমনি করে ওক্ আর ভূর্জ্জগাছের জঙ্গলের সঙ্গে ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি করে অবশেষে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়লাম—সেখানে সব ছোট ছোট জঙ্গল। বাতাস সেখানে মনোরম সুগন্ধে ভরপূর—একেবারে যেন থম্‌থম্ করছে। চড়াইয়ে পাহাড়ীরা একেবারে হাঁপিয়ে পড়ল। এমন কি রামের কাছেও বেশ একটু শক্ত কসরত বলেই মনে হল। ৮০ ডিগ্রী কিম্বা তার চেয়ে বেশী খাড়াই পর্য্যন্ত উঠ্‌তে হয়েছে। প্রায় সবটাই পিছল। কিন্তু চারিদিকে বিশাল প্রান্তর, ফুলের ঐশ্বর্য্য আর শ্যামল পল্লবের প্রাচুর্য্য পথের দুঃখ কিছুই মনে হয় না। ইউরোপীয় বাগানীরা সাধারণতঃ এই সব জায়গা থেকে ফুলের বীজ নিয়ে ভারতে কোম্পানীর বাগান সাজায়, আর অজ্ঞ ইংরেজীশিক্ষিতেরা তাকে বিলাতী ফুল বলে। কিন্তু এই সমস্ত ফুলের এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব এই যে, অপর জায়গায় লাগালে তাদের গন্ধ থাকে না, তবে আদত রঙটা বজায় থাকে।

বিলাতী শিক্ষায় ফেঁপে-ওঠা আমাদের দেশের যুবকেরা বিলাতী পণ্ডিতদের লেখার মাঝে যখন ভারতের বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি শুন্‌তে পায়, তখন তারা সেগুলো বিলাতী ভাব মনে করেই প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। তারা জানে না, যে ভাবকুসুমকে তারা এমন আদরের দৃষ্টিতে দেখছে, তাঁদের জন্মভূমি থেকেই বিলাতে ওগুলোর রপ্তানী হয়েছিল—এখন উভয়ের মাঝে বিশেষ পার্থক্য দাঁড়িয়েছে এই যে, বিলাতী মালীর হাতে পড়ে এই সব ফুলের মাঝে আর বৈরাগ্যের সৌরভ খুঁজে পাওয়া যায় না। ইউরোপীয়েরা বেদান্তকে যে আকারে প্রচার করছে, তাতে দর্শনের রঙ্‌ আর রূপ রয়েছে বটে, কিন্তু অনুভূতির সৌরভ তাতে মোটেই নাই। আকাশকুসুমে ফুলের রঙ্‌ আছে বটে, কিন্তু গন্ধ নাই।

রামের যা অসুখ করেছিল, তার কি হল? তিনি একদিনেই ভাল হয়ে গিয়েছেন, কোনও ব্যাধি নাই, ক্লান্তি নাই, কোনও বিকৃত নাই। পাহাড়ীরা তাঁকে ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। কেবল চড়াই করতে করতে শেষ কালে সবারই ভারী ক্ষুধা পেয়ে গেল। ততক্ষণে আমরা এমন একটা জায়গায় এসেছি, যেখানে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু অজস্র তুষারপাত হয়ে থাকে।

এই সব ন্যাড়ামুড়ো জায়গায় গাছপালার নাম গন্ধও নেই। আমরা পৌঁছবার একটু পূর্ব্বেই এক পশলা বরফ পড়েছে।

একটা বড় পাথরের ওপর কম্বল বিছিয়ে রামের জন্য আসন দেওয়া হল। আগের রাত্রের আলুসিদ্ধ ছিল, তাই দিয়ে তাঁর ভোগ দেওয়া হল। সঙ্গীরাও এই সাদাসিধে খাবার কৃতজ্ঞ চিত্তেই গ্রহণ করল।

মুঠো মুঠো বরফ চিবিয়ে জল খাওয়ার বিলাস সারা হল। খেয়েদেয়েই আমরা আবার উঠে পড়লাম। দৃঢ় মন্থর গতিতে আমরা বহু

পরিশ্রমে ক্রমে এগিয়ে উঠতে লাগলাম। সঙ্গী একটী যুবক অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল! তার হাত পা সরছে না—দমেও কুলাচ্ছে না—বললে মাথা ঘুরছে। আপাতত তাকে সেখানেই একা ছেড়ে আমরা এগোতে লাগলাম। আর কিছুদূর যেতেই আর একটী সঙ্গী অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সেও বললে, "মাথা যেন বন্ বন্ করে ঘুরছে।" তখনকার মত তাকেও ছেড়ে আসা গেল। আর সবাই চলছে। কিছুক্ষণ পরে তৃতীয় একটী লোক পড়ে গেল—তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। রাম এখন দুজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে এগুতে লাগলেন।

তিনটী পাহাড়ী "বরার" সাঁ করে ছুটে পেরিয়ে গেল—ভারী সুন্দর লাগল দেখতে। চতুর্থ লোকটী ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগল। অবশেষে বরফঢাকা পাথরের ওপর সে শুয়েই পড়ল। কোথায়ও তরল জল ছিল না,—কিন্তু লোকটা যেখানে শুলো, সেখানে পাথরের নীচ থেকে একটা গম্ভীর গল্ গল্ শব্দ শোনা যেতে লাগল। একটী ব্রাহ্মণ তখনও রামের সঙ্গী—সেই লাল কম্বলটা, একটা দূরবীণ, এক জোড়া চস্‌মা আর একখানা কুঠার সে বয়ে নিচ্ছে। বাতাস ক্রমে ভারী লঘু হয়ে এসেছে—আর টানা যায় না। আশ্চর্য্য, দুটো গরুড় আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। একটা ঢালু চড়াই করতে হবে—ছাতাপড়া পুরাণো নীল বরফের উপর দিয়ে। সঙ্গীটি পিছল বরফের উপর কুঠার দিয়ে ধাপ কাটতে লাগল—পা ধরবার জন্য। কিন্তু বরফের চাঁইটা এত পুরাণো যে কুঠার ভেঙ্গে গেল। ঠিক তখনি একটা বরফঝড়ের খপ্পরে আমরা পড়ে গেলাম। সঙ্গীটীর মন দমে গেল—রাম তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে বিধাতা ভালর জন্য এই বিপদ জুটিয়ে দিয়েছেন, আমাদের অনিষ্ট করতে নয়। বাস্তবিক হলও তাই। ঝড়ে বরফ পড়ে আমাদের চলবারই সুবিধা হল! চোখা আল্পেন্‌ষ্টকে ভর দিয়ে আমরা সেই ঢালটা চড়াই করলাম। তারপর—আ মরি মরি! মাইলের পর মাইল জুড়ে বরফের বিশাল মাঠ—ঝক ঝক করছে! চারদিকেই তুষারোজ্জ্বল অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় প্রাসাদ কুট্টিম। কি আনন্দ, কি আনন্দ! এ যেন জ্যোতির্ম্ময় ক্ষীরোদ সমুদ্র—কি তার ঐশ্বর্য্য, কি তার গাম্ভীর্য্য—অপরূপ, অতি অপরূপ! রামের আনন্দের আর সীমা নাই। কম্বলখানা কাঁধে ফেলে ক্যাম্বিশের জুতো পায়ে তিনি বরফের উপর প্রাণভরে ছুটাছুটী করতে লাগলেন। এখন আর কেউ তাঁর সঙ্গী রইল না।

প্রায় তিন মাইল ধরে তিনি বরফের উপর দিয়ে চলছেন। কখনও কখনও পা বসে যাচ্ছে—তাকে আবার তুলতেও কম বেগ পেতে হচ্ছে না। শেষকালে একটা বরফের চট্টানের উপর কম্বল বিছানো গেল। রাম তার উপর বসলেন—নিঃসঙ্গ—জগতের কোলাহলের বহু ঊর্দ্ধে—জনসঙ্ঘের ধূমায়িত উত্তেজনার পর পারে। এখানে সব নীরব নিস্তব্ধ—কি শান্তি! আনন্দের গুঞ্জরণ ছাড়া আর কোনও শব্দই আসছে না এখানে। অতি প্রশান্ত, আনন্দময় নিস্তব্ধতার রাজ্য।

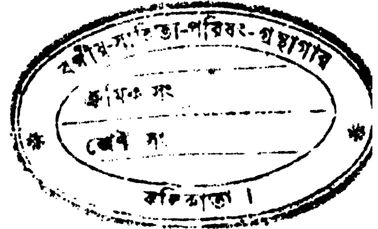
মেঘের আবরণ একটু লঘু হয়ে এল। হাল্কা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যের কিরণ যখন গলে পড়ল, তখন রূপালী বরফ সোণা হয়ে জ্বলে উঠল। একে যে সুবর্ণপর্ব্বত বা সুমেরু বলে—সে কথা যথার্থ।

হে সংসারী, শোন আমার কথা! এই

সুমেরুতে যে অলৌকিক ইন্দ্রজাল ও অপরূপ সম্মোহন দেখতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে নারীর গোলাপী কপোলের রক্তিমোচ্ছ্বাস বা মণিরত্নের অলঙ্কার বা সুবিশাল হর্ম্ম্যরাজির শোভার কোনও তুলনাই হতে পারে না। যদি একবার আত্মাকে অনুভব করতে পার, তাহলে এমন অগণিত সুমেরু তোমার মাঝেই দেখতে পাবে। সমস্ত প্রকৃতি তোমার চরণে নুয়ে পড়বে—মেঘ হতে মেঘে, সুনীল আকাশ হতে শ্যামা ধরিত্রীতে সর্ব্বত্র তোমার জয়গান মুখরিত হয়ে উঠবে। তোমাকে লঙ্ঘন করবে, এমন দেবলোকেই বা কে আছে?

হে আকাশ, নির্ম্মল হও। হে মেঘমণ্ডল, অবিদ্যার আঁধারে ভারতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—নির্ম্মুক্ত হও। এ পুণ্য ভূমির ওপর আর তোমাদের স্বচ্ছন্দবিহার চলবে না। হে হিমগিরি, তোমার শুচিতা ও সত্যানুরক্তি অটুট থাক্—আলো তোমার বুকে চির উজ্জ্বল হয়ে থাক! দ্বৈতমিশ্র জলধারা নিম্নভূমিতে আর প্রেরণ করো না তুমি।

মেঘমালা বিদীর্ণ বিকীর্ণ হয়ে গেল। তুষাররাশি গৈরিকে রঞ্জিত হয়ে উঠল। গিরি-শ্রেণী কি সন্ন্যাসী হল? তারা রামেরই উর্দ্দী পরেছে, দেখতে পাচ্ছি! কি আশ্চর্য্য! তুষার রাশি বিনীত উৎসুক দৃষ্টিতে যেন রামের দিকে তাকিয়ে বলছে—"হাজির!" ওম্! (ক্রমশঃ)



স্বামী রামতীর্থ

—*—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইষ্টানিষ্ট সকলের জীবনেই আছে—ছাত্র-জীবনেও আছে। ইষ্টের গ্রহণ এবং অনিষ্টের পরিহার, ইহা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের জীবন কেবলমাত্র পাশববৃত্তির গণ্ডীর মাঝে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বভাবের প্রেরণাতেই আমরা ইষ্টানিষ্টের গ্রহণ-বর্জ্জন করিয়া থাকি। কিন্তু মনুষ্য জীবনের প্রথম স্তরে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইষ্টানিষ্ট বিবেক করিবার জন্য বিচার প্রয়োজন হয়—তখন আর বলা চলে না যে, যাহা ইষ্ট, তাহাতেই আমার স্বাভাবিক রতি আছে কিম্বা অনিষ্ট হইতে আমি স্বভাবতঃই বিরত। বিচার পূর্ব্বক ইষ্টানিষ্ট বিবেক করিতে হয় বলিয়া মানুষের জীবন শুধু প্রকৃতির একটা অন্ধ নিয়মপরম্পরা নয়—উহা লক্ষ্যোদ্দিষ্ট সাধনা। যে অন্তরঙ্গ শক্তির বলে মানুষ বিবেকপূর্ব্বক অনিষ্টকে পরিহার করিতে শিখে, তাহাকেই আমরা বলি সংযম; আর যাহা তাহাকে বাধা-বিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া ইষ্টসংগ্রহণে তৎপর করে, তাহাই তপস্যা। সংযম ও তপস্যা মনুষ্যজীবনে নিঃশ্রেয়সলাভের সোপান, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ছাত্রজীবন যদি

আদর্শ মানবজীবনের ভূমিকা হয়, তাহা হইলে সংযম ও তপস্যা যে তাহার প্রাণ হইবে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ।

আমরা অতঃপর তীর্থগ্রামের ছাত্রজীবনে এই সংযম ও তপস্যার জ্বলন্ত প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব। তাহার তুলনায় বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে এই শক্তিদ্বয়ের যে কি শোচনীয় অভাব, তাহাও এই প্রসঙ্গে পরিস্ফুট হইবে। প্রথমতঃ আহার বিহার সম্বন্ধে সংযমের কথাই আলোচিত হউক।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথা বলিতে পারিব না, কিন্তু বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, রসনাকে সরস করিতে এই জাতির আশ্চর্য্য নৈপুণ্য আছে। আহারে এত বিচিত্র বিলাস বোধ হয় আর কেহ করিতে জানে না—রোগেও বোধ হয় এত ভুগিতে আর কেহ পারে না। শুধু আধুনিক কাল বলিয়া নয়, বাঙ্গালীর প্রাচীন কাব্যগ্রন্থেও আহার্য্যের এত সুদীর্ঘ তালিকা ও সরস বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে বোধ হয় অন্য কোনও দেশের কবি এই ব্যাপারে এত উৎসাহ ও রচনাচাতুর্য্য দেখাইতে পারিতেন না। যোগবাহী বস্তুর মত বাঙ্গালী আত্মসংস্পৃষ্ট সকলের ভিতর হইতে সারটুকু গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে এবং সেই শক্তির বিশেষ অনুশীলন করিয়াছে বিভিন্ন জাতির ভোজনাদর্শ গ্রহণে। একে তো জলবায়ুর গুণে আমিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ খাদ্য গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী জাতি একদেশদর্শিতার অপবাদ হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহার উপর আবার যখন যে জাতি আসিয়া এ দেশে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছে, রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ বাঙ্গালী তাহারই খানা খাইতে শিখিয়াছে। আজ সম্পন্ন বাঙ্গালীর ঘরে ফার্সী ইংরেজী খানারও অসদ্ভাব নাই। পল্লীগ্রামে উপযুক্ত আদর্শের অভাবে ভোজন লালসা অনেকটা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে বটে, কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সহরে বাজারে এই লালসার রূপ দিন দিন উৎকট হইয়া দেখা দিতেছে।

আজকাল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র নগরেই স্থাপিত। শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থায় পল্লীতে কাহারও জীবন কাটিলেও, উচ্চশিক্ষার জন্য আজকাল অধিকাংশ ছাত্রকেই নিতান্ত অপরিণত বয়সে নানা প্রলোভনপূর্ণ সহরে আসিয়া বাস করিতে হয়। সেখানে কেহ তাহার অভিভাবক থাকে না—স্বচ্ছন্দ আহার বিহারে বাধা দিবার কেহ থাকে না। সরকারী শিক্ষাবিভাগ হইতে ছাত্রদের চরিত্র রক্ষা করিবার জন্য ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করিয়া নানা আইনকানুন রচা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে আইনে যে কত ফাঁক রহিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। তাহা ছাড়া কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত ব্যবস্থাও মোটেই সংযমানুকূল নহে। এক একটী মেস্ বা হোস্টেলের সংলগ্ন খাবারের দোকানের দিকে তাকাইলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। ইহা ছাড়া সহরে রেস্তোরাঁ, চা-পানাগার ইত্যাদির তো অভাবই নাই। ছেলেদিগকে ভবিষ্যতে আদর্শ গৃহস্থ করিয়া তুলিবার জন্যই বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনে কমিটী গঠন করিয়া "মেসিং সিষ্টেম্" প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সেখানে টাকা পয়সার যে কি অপব্যবহার আর রসনাতৃপ্তির আয়োজনে যে কি বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, তাহার হিসাব কেহ সম্ভবতঃ গ্রহণ করেন না। এইরূপ অদূরদর্শিতা ও অসংযম ছাত্রদের নৈতিক জীবনে ভবিষ্যতে কিরূপ বিষময় ফল প্রসব করিবে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখেন

কি? শিক্ষাবিভাগের মেসে-হোস্‌টেলে যে সমস্ত ছাত্র বাস করে, তাহাদের অধিকাংশই দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। একটী ছেলের মাসিক পড়ার খরচ জুটাইতে পিতা মাতাকে যে কতখানি বেগ পাইতে হয়, তাহা ছেলেদের বাড়ী হইতে যে চিঠীপত্র আসে, তাহা পড়িলেই কর্ত্তৃপক্ষেরা বুঝিতে পারিতেন। অথচ এই কষ্টপ্রদত্ত অর্থের অধিকাংশ যখন কেবলমাত্র রসনা-পরিতৃপ্তি ও সাজসজ্জার পারিপাট্যে ব্যয়িত হয়, তখন অনুভবযুক্ত কোনও ব্যক্তির প্রাণে তাহা সহ্য হয় কি? অথচ এই কাণ্ড অহরহঃ ঘটিতেছে। যাহার ঘরে একমুষ্টি অন্নের সংস্থান নাই, মেসের জীবনে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা রাখিবার জন্য সে-ও জমীদারের ছেলের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলে। ইহাই কি শিক্ষার আদর্শ?

শিক্ষার আদর্শটা আমরা যে দেশ হইতে আমদানী করিয়াছি, এই সমস্ত অসংযত বিলাসিতাও সেখানকারই আপদ। কিন্তু গরীবের ঘোড়ারোগ হইলে তাহা ধাতে সহিবে কেন? তাহা ছাড়া, আমরা বলি, আমাদের জাতীয় শিক্ষার আদর্শ তো এই শিক্ষানীতির সম্পূর্ণই বিপরীত—মূলতঃ ভাবেই যে উভয়ের মাঝে বিরোধ। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির কর্ত্তারা বলিবেন, ছেলেদের আহার-বিহারের ব্যবস্থা এমন করিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যামন্দিরে আসিয়া ধনীর ছেলেরও আয়েসের কোনও ব্যাঘাত না হয়—সকলেরই চাল বজায় থাকে। এখন ধনীর সহিত সাম্য ঘটাইতে গিয়া যদি গরীবের প্রাণান্ত হয়, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূক্ষেপ নাই, যদিও তাঁহারা জানেন, এই গরীবদেশের অধিকাংশ বিদ্যার্থীর গরীব হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। যে শিক্ষানীতির মূলে এই আদর্শ, তাহার সহিত আমাদের বিরোধ পদে পদে। প্রথমতঃ গরীবকে এইরূপে অন্যায়ভাবে প্রলুব্ধ করিয়া নিষ্পেষিত করাটাই তো একটা পাপ। তার পর জীবনে খাওয়া-পরার আদর্শটা (standard of living) উঁচু করিয়া ধরাই কি পুরুষার্থ হইল? গরীবের ছেলেকে ধনীর খোরাক হজম করিতে শিখানোটাই কি একটা শিক্ষা? সাম্য ঘটাইতে গিয়ে উপরের দিকে নজর না দিয়া নীচের দিকেই তো নজর দেওয়া বেশী উচিত ছিল। ধনী, গরীব সকল ছাত্রের অবস্থা লইয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা ল, সা, গু, কষিয়া তাহাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন—অথচ তাঁহাদের উচিত ছিল গ, সা, গু, কসা। সনাতন ভারতবর্ষে রাজার ছেলে গুরুগৃহে আসিয়া কাঁচাকলা সিদ্ধ খাইয়া গরু চরাইত, তাহাতে তার মান যাইত না—বরং তাহার মনুষ্যত্ব উদ্বুদ্ধ হইত, উপাধি ছাড়িয়া দিলে আসল মানুষটার কতটুকু কদর, তাহা বুঝিবার অবকাশ তাহার ঘটিত—গরীবকে ভাই বলিয়া মমতা করিতে, বিত্তহীন প্রতিভা ও তপশ্চর্য্যাকে নমস্ক বলিয়া জানিতে সে শিক্ষা করিত।

আজকালকার বিচারে এই সব চিন্তার ধারা একেবারেই উল্‌টাইয়া গিয়াছে। আরামের ব্যাঘাত করিয়া বা কৃচ্ছ্রতাসাধন দ্বারা বিদ্যালাভ হয়, এ কথা আমরা ভাবিতেই চাহি না। ফলে শিক্ষার নমুনা এই দেখি—পল্লীগ্রামে সরল জীবন যাপন করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যার্থী যখন প্রথম সহরে আসিল, তখন প্রথমতঃ তাহার সহরে সতীর্থগণের মার্জ্জিত রুচির নিকট সে "পাড়াগেঁয়ে ভূত" আখ্যায় আপ্যায়িত হইল এবং দুইদিনের মধ্যেই আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এই অজ্ঞান্ত

অপবাদ মোচনে যথারীতি উৎসাহী হইয়া উঠিল। ছয়মাস পরেই হয়ত আর তাহাকে চিনিতে পারা যাইবে না—উচ্চশিক্ষার কল্যাণে তাহার ভূতযোনি হইতে মুক্তিলাভ হইয়া গিয়াছে! সে যে উচ্চাঙ্গবিদ্যার একজন বিদ্যার্থী, ইহা তাহার জামার কলারের উচ্চতা, টেড়ির উচ্চতা এবং চালচলন বুলির উচ্চতা হইতে সহজেই প্রমাণিত হইবে—এখন ভিতরে যাহাই থাকুক না কেন!

সহরে-বাজারে ছাত্রজীবনের এই শোচনীয় দুর্গতি, এই বিচার-বিবেকহীন বহির্মুখীনতা দেখিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়। এত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা কে আমাদের শিখাইল? যে শিখাইল, সে কি যথার্থই আমাদের বন্ধু? এ কথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর কি কাহারও হয় না? প্রজাপতির মত রঙ্গীন পাখা উড়াইয়া ছাত্রজীবনটা বিলাসের মত্ততায় কাটিয়া যায়—তার পর বাস্তবজীবনের মধ্যাহ্নরবির খরতাপে প্রজাপতির দুলালী পাখা ঝলসিয়া গিয়া বেচারী যখন ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে, তখন তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিবার কেহই থাকে না। চোখের সম্মুখে এই দৃশ্যের মুহুর্মুহুঃ পুনরাবৃত্তি দেখিয়াও তো আমাদের চৈতন্য হইতেছে না।

শুধু পানাহার বলিয়া নয়—বেশভূষায় আচার ব্যবহারে সর্ব্বত্রই আমরা দেখিতে পাই, বর্ত্তমান ছাত্রজীবন অতি উচ্ছৃঙ্খল। একটা কথা আছে, "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ।" এই তপস্যার আদর্শ কি আমাদের কোথায়ও চোখে পড়ে? এ জন্য শুধু বৈদেশিক আদর্শকে দায়ী করিলেও চলিবে না। ইহার মাঝে আমাদের প্রবৃত্তিরও যে সায় রহিয়াছে, সে কথাটাও তলাইয়া দেখিতে হইবে। রাজা যেখানে বিদেশী ও বিধর্ম্মী, সেখানে বিজাতীয় রীতিনীতির আবির্ভাব অসম্ভব নয়। বিদেশীর সঙ্গে কারবারও আমাদের নূতন নয়। কিন্তু এই কারবারে দিন দিন আমরা যেরূপ দেউলিয়া হইয়া যাইতেছি, তাহা সামাজিক ইতিহাস যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। সেক্ষেত্রে দোষটা কি কেবল বিদেশেরই? বরং আমরা বলি, দোষ পূর্ণমাত্রায় আমাদের মাঝেই—আমরা প্রবৃত্তির দাস বলিয়াই দিন দিন পরাধীন হইতেছি এবং দেশের আশা ভরসাস্থল সন্তানগণকে ঘরের কড়ি খরচ করিয়া এই প্রবৃত্তিসঙ্কুল পরাধীনতার পাঠই পড়াইতেছি।

যাঁহারা তীর্থরামের ছাত্রজীবনের দিনলিপিগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে গলদ কোথায় এবং ছাত্রহিসাবে ব্যসনবর্জ্জনে তীর্থরামের কৃতিত্ব আদর্শস্থানীয়ই বা হয় কেন। আমাদের ছাত্রদের মাঝে প্রথমতঃই চোখে পড়ে, জীবনের লক্ষ্যহীনতা ও ধর্ম্মবোধের অভাব। অবশ্য অর্থোপার্জ্জন বা উদরপোষণকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া বুঝি না। আজকাল এ কথায় উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিবার লোক অনেক আছেন জানি এবং অন্নসমস্যার সমাধানও যে জীবনের অন্যতম কর্ত্তব্য, তাহা খুবই মানি। কিন্তু জীবনের আর সকল প্রকার চরিতার্থতাকে ছাপাইয়া এইটাকেই বড় করিয়া দেখানোতে যে মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধি পায়, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারি না।

এক কথায় এইরূপ জীবনকে বলিতে পারি, ইহসর্ব্বস্ব। ইন্দ্রিয়প্রীতিই ইহার লক্ষ্য। এই ইন্দ্রিয়প্রীতির আকর্ষণ কি ভয়াবহ ও জঘন্য

ভাবে ছাত্রসমাজকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহা ভিতরের খবর যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের বুঝিতে বাকী নাই। এরূপ স্থলে তপশ্চর্য্যার আশা আমরা কোথা হইতে করিব? আর এমন আশাই বা কি করিয়া করিব যে এই বিলাসব্যসন ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজর্জ্জরিত মেরুদণ্ডহীন ছাত্রসম্প্রদায় দ্বারা ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে?

ইহার সঙ্গে তীর্থরামের ছাত্রজীবন তুলনা করিয়া দেখা যাউক। আমাদের বক্তব্য বলিবার পূর্ব্বে শ্রীমৎ পূরণ সিং এর সংক্ষিপ্ত উক্তিটী উদ্ধার করিয়া দিই।—"পাঞ্জাবের এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি শিল্পীর মত অসীম ধৈর্য্যে তাঁহার শৈশবকে যৌবনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। একটু একটু করিয়া পলে পলে, দিনে দিনে তিনি নিজকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মনে হয়, তাঁহার ভবিষ্যৎজীবনের পরিপূর্ণ আলেখ্যখানি পূর্ব্বাহ্ণেই তাঁহার মনশ্চক্ষে চিত্রিত হইয়াছিল, কেননা বাল্যকাল হইতেই তিনি যেন সচেতন ও অবিচলভাবে একটা নিরূপিত আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করিতেন। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণবালক কোনও অবস্থাতেই বিচলিত হন নাই, কোনও বিপত্তিতেই শঙ্কিত হন নাই—তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে পরিণত চিত্তের অমোঘ সঙ্কল্পের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি ছিলেন আদর্শ ছাত্র—সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তাঁর অধ্যয়ন নয়; প্রতি প্রভাতে যে অদম্য জ্ঞানপিপাসা তাঁহার চিত্তে নূতন করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, তাহার পরিতৃপ্তিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার দৈনন্দিন অধ্যয়ন, জীবনের হবনকুণ্ডে আহুতি মাত্র।

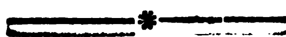
"রাত্রে পড়িবার দরুণ তৈলসংগ্রহ করিবার জন্য কাপড়ের খরচ বা খাওয়ার খরচ হইতে কিম্বা কখনও কখনও উপবাস করিয়া তিনি পয়সা বাঁচাইতেন ছাত্রজীবনে প্রায়ই তিনি সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকিতেন। জ্ঞানস্পৃহা তাঁহার চিত্তকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিত যে ছাত্রজীবনের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য বা দৈহিক প্রয়োজনের কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া যাইতেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা বা শীতগ্রীষ্ম তাঁহার এই অপরিমেয় জিজ্ঞাসাকে দমিত রাখিতে পারিত না। এখনও গুজরাণওয়ালা ও লাহোরে তাঁহার ছাত্রজীবনের সাক্ষী অনেকেই আছেন; তাঁহারা বলেন, এই দেবচরিত্র বালকটী দিনরাত্রি নিরন্ন ও একাকী থাকিয়া জীবনের সঙ্গে যুঝিয়াছে—অবসন্ন হইয়া পড়িলেও সে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয় নাই। যে দেশে দানধর্ম্মের এত মহিমা কীর্ত্তন করা হয়, সেখানেও এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালককে কত দিন অনাহারে কাটাইতে হইয়াছে—অথচ ইহাতেও তাঁহার মুখে তৃপ্তি ও আনন্দের জ্যোতিঃ বিন্দুমাত্রও নিষ্প্রভ হয় নাই।

"যে জ্ঞানভাণ্ডার পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহার প্রচার কার্য্যের সহায় হইয়াছিল, তাহা তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করিতে তাঁহাকে কঠিন তপস্যা করিতে হইয়াছে। যখন মনে করি, কি অপরিসীম দুঃখ-দারিদ্র্যে সঙ্গে যুঝিয়া, কত কণ্টক পায়ে দলিয়া তবে তিনি কবি, দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ পণ্ডিত হইতে পারিয়াছিলেন, তখন তাঁহার এই তপস্যার বেদনায় আমাদের হৃদয় গলিয়া যায়। লাহোর কলেজের অধ্যক্ষ যখন প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের তালিকায় তাঁহার নাম দিতে চাহিলেন, রাম তখন নত মস্তকে সাশ্রুনয়নে বলিলেন,

এত কষ্টে যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা বেচিবেন না—বিলাইয়া দিবেন। তাই সরকারী চাকর হওয়ার চেয়ে দরিদ্র শিক্ষক হওয়াই তাঁহার অধিকতর মনঃপূত।

"ছাত্র জীবনেও তিনি ভাবের রাজ্যে সম্পূর্ণ একক ছিলেন। শুধু গ্রন্থের ভিতর দিয়া জগতের মহামনিষীদিগের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। অত্যুচ্চ লক্ষ্যের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—চারিদিকে তাকাইয়া দেখিবার অবসর ছিল কোথায়? আদর্শের সঙ্গে তাঁহার জীবন একসুরে বাঁধা ছিল। ছাত্রজীবনে তাঁহার সঙ্গে যাহারই পরিচয় হইয়াছে, সেই তাঁহার শুদ্ধ চরিত্রের স্বচ্ছ শুচিতা ও অন্তর্মুখীনতাকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে নাই। ছাত্রজীবনে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনই পরিপুষ্ট হইতেছিল। জীবনকে পুনঃ পুনঃ ছাঁচে ঢালিয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন। কল্যাণ হইতে অধিকতর কল্যাণে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাঁহার নিজের সঙ্গেই যেন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গণিতের অধ্যাপক হইয়া তিনি "গণিতাধ্যয়নের বিধি" নামে একখানা পুস্তিকা রচনা করেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'অধিক স্নেহযুক্ত সুরসাল খাদ্য আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করিলে মেধাবী ছাত্রেরও মেধা নিষ্প্রভ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে লঘু আহারে মস্তিষ্ক অক্ষুণ্ণ থাকে—ছাত্রজীবনে সিদ্ধির ইহাই নিদান। কর্ম্মে চিত্ত সমাহিত করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধি নিতান্তই আবশ্যক। একবার চিত্তশুদ্ধির অভাব ঘটিলে ছাত্রের চিত্ত আর কিছুতেই বশ মানিতে চাহিবে না।'

"উপরিউক্ত পুস্তিকাতে এইরূপ সরল ভাবে তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু লেখার খাতিরে লেখা বা বলার খাতিরে বলা তাঁহার স্বভাব ছিল না—দিবার মত কিছু থাকিলেই তিনি লিখিতেন বা বলিতেন।" (ক্রমশঃ)



দেশের ও দশের কথা

—:{*}:—

সুখেদুঃখে এক বৎসর কাটিয়া গেল। এখন বৎসরের হিসাব চুকাইয়া পুরাতনকে বিদায় দিয়া নূতনকে অভিনন্দন করিবার সময়। যাহা নূতন, তাহার সবটুকু আমরা জানি না, কিন্তু কল্পনা দিয়া তাহাকে মনোরম করিয়া সাজাইতে ভালবাসি, কেননা চিরসৌন্দর্য্যের পিপাসু অমর শিল্পী যে আমাদের বুকের মাঝে রহিয়াছেন, অসুন্দরকে নিরাকরণ করিয়া সুন্দরের প্রতিষ্ঠাই যে তাঁহার আনন্দ। এই জন্য নূতনের সম্মোহনে মুগ্ধ হইয়া আমরা জীর্ণশীর্ণ পুরাতনকে অনাদরের দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকি, তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নূতনের অভিষেক করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠি। মুগ্ধজীবের ইহাই স্বভাব, অথবা এইটুকু বুঝি প্রকৃতির লীলাচাতুরী। তিনি নিত্যপরিণামশালিনী, চিরযৌবনের অভিষেকে বিশ্বের প্রাণকে মুঞ্জরিত রাখিতে

চাহিতেছেন। এই চিরযৌবনার বিলোল-বিলাসে মুগ্ধহৃদয় ভুলিবে না কেন? কিন্তু তবুও বুঝি বিবেকীর দৃষ্টিতে এই ছলনাটুকু ধরা পড়িয়া যায়; তিনি জানেন, কৈশোর যাহাকে আশ্রয় করিয়া কিসলয়িত হইয়া উঠিল, যৌবন স্তবকে স্তবকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—তাহার সত্যরূপ মরণের রূপ—কঙ্কালের রূপ। প্রকৃতির দেওয়া বসন্তকুসুমের রঙ্গীন মালা শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু কালসাক্ষী পুরাণ পুরুষ যে মহাশঙ্খের শুভ্র হার প্রকৃতির বুকে দোলাইয়া দিলেন, তাহা তো শুধু দুদিনের শোভা নয়—শীর্ণ শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িবার নয়। উপনিষদ্ কাহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" বলিয়া স-সাধ্বস শ্রদ্ধায় আরতি করিয়াছেন? সে এই পুরাতনকেই। কাহাকে আবার আনন্দের সেতুরূপে ইহলোক পরলোকের অসম্ভেদের হেতু বলিয়াছেন? তাহাও এই গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ পুরাণকেই। সত্যের রূপ চিরপুরাতন—অথবা পুরাণপুরুষই সত্যস্বরূপ। আজ যৌবনে ঢলঢল নবীনকে অভিনন্দিত করিতে গিয়াও তো পুরাতনকে ভুলিতে পারিতেছি না—কেননা সুখে দুঃখে, তিক্তমধুরে সে যে আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে জড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মাঝে আশার মোহন স্বপ্ন নাই, আশঙ্কার বিভীষিকাও নাই—অথচ সে যে একেবারে নাই, তাহাও বলিতে পারি না। নিষ্ঠুর সত্যরূপে, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে, নিয়তিরূপে, সংস্কারের বজ্রলেপ হইয়া যে সে আমাদের প্রাণে প্রাণে আঁটিয়া রহিয়াছে—যাও বলিলেই কি সে চলিয়া যাইবে? নবীন অভ্যাগত, অপরিচিত—তাহার সমাদর কর, দেখিও আতিথ্যের যেন ত্রুটী না হয়; তাহার কল্যাণে উৎসব কর। কিন্তু পুরাতনকে ভুলিও না—সে তোমার গৃহপতি—উৎসবের অতর্কিত উল্লাস তাহার নয়—সে তোমার নিত্যপ্রণতির, নিত্যসেবার ও গভীর শ্রদ্ধার বস্তু—সে তোমার গুরু।

*

আজ চারিদিকে যেন জাতীয়-জীবনের ভাটা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। দেশ তোলপাড় করা যাইতে পারে, ঘন ঘন মিটিং করিয়া বক্তৃতার আতসবাজী ছাড়া যাইতে পারে, এমন একটা অকাণ্ডও আজ কতদিনের মধ্যে দেশে ঘটিতেছে না। পত্রিকার পৃষ্ঠা খুলিলেই দেখা যায়, বড় বড় টাইপের হেডিং লইয়া হৈ হৈ রৈ-রৈ কাণ্ডের সমাচার নাই; কলাম পুরিবার জন্য সম্পাদককে জর্ম্মাণ সম্রাটের রোজনামচা বা আয়র্লণ্ডের আলুর চাষ নিয়া গভীর গবেষণা করিতে হইতেছে। ইহা যে নিতান্তই পরিতাপের বিষয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। জীবনস্রোতের এই মন্দাগতি দেখিয়া ইতিমধ্যেই অনেকে ভারী দুর্ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছেন; অন্ততঃ এই ব্যাপারটাকে একটা বক্তৃতার বিষয় করিয়া কিছু ধূমোদ্গার করা যাইতে পারে কিনা, সে সম্বন্ধে বিশষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়ার কথা হইতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, হুজুগে না চেতাইলে চেতিবার মত সুবুদ্ধি এখনও আমাদের বুঝি হয় নাই—উত্তেজনার ষ্টিমের ঠেলা না পাইলে জাতীয়জীবনরূপী ইঞ্জিনের চাকা আর কিছুতেই ঘুরিতে চাহে না। যদি বাস্তবিক কিছু দুঃখের থাকে, তবে তাহা এই যে, যাঁহারা আমাদের নেতা হইবেন, নেশার ঝোঁক না হইলে তাঁহারা কাজ করিতে পারেন না, আর উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের সম্মুখে তাঁহারা এই নেশা করার শিক্ষাটাই তুলিয়া ধরেন। এটা কর্ম্মযুগের হুযুগ, এ কথা সকলেই স্বীকার

করেন ; সকলেই বলিবেন, কায়মনোবাক্যে কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই যুগধর্ম্ম। কিন্তু এ যাবৎ শ্রমবিভাগনীতি অনুযায়ী নেতৃবৃন্দ বাক্যে কর্ম্ম করিবার ভারটুকুই কেবল লইয়া আসিয়াছেন—মন এবং কায় আয়েসে বিশ্রাম করিতেছে, এমন কি, প্রচুর পরিমাণে বাক্যবাণ বর্ষণ না করিলে সে কুম্ভকর্ণদের ঘুম ভাঙ্গিবে কি না সন্দেহ! আমরা বলি, ইহাই যদি তাঁহাদের স্বধর্ম্ম হয় বা পূর্ব্বপুরুষের প্রসাদ লব্ধ মৌতাত হয়, তাঁহারা তাই নিয়াই থাকুক না কেন! তাঁহারা বাক্যদ্বারাই দেশের হিত করুন ; কিন্তু তাঁহাদের মনঃকল্পিত বিভীষিকা দ্বারা দেশের তরুণ চিত্তকে হতাশ, নিরুদ্যম ও কল্পনাপ্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন?

*

ভয়ের যে কিছু নাই, তাহা আমরা বলিতেছি না। মানুষের আদর্শ কতখানি মহৎ হইতে পারে, ইহা যিনি অন্তরে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া সেই লোকাতীত আদর্শকে সমাজের বুকে নামাইয়া আনিতে চাহেন, তিনি বেশ বোঝেন, যথার্থ সুদিন আসিতে এখনও বহু বিলম্ব। কিন্তু উষার অরুণ রাগকে কি তাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি কখনও ভুল বুঝিতে পারে? মশালের আলোতে রাতকে দিন করিবার বৃথা চেষ্টায় যাহারা চেঁচামিচি করিয়াছে, প্রভাতের অরুণ আভাসে আজ উপর হইতে মশাল নিভাইবার হুকুম আসিয়াছে শুনিয়া তাহারা তো ত্রস্ত হইবেই—কেন না তাহারা যে প্রমত্ত, দাম্ভিক ও অবিশ্বাসী। আজ দেশে কর্ম্মের দুইটী ধারা দেখিতে পাইতেছি—একটী দেশ উদ্ধারের আস্ফালন, অপরটী আত্মোন্নতির নীরব প্রচেষ্টা। ইহার মাঝে পূর্ব্বের ধারাটী যদি ক্ষীণ হইয়া গিয়া থাকে, তাহাতে আমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই। প্রকৃতির পরাবর্ত্তনেও একটা ছন্দ আছে, ঋতুপর্য্যায় আছে। সোরগোল হইলে ঘুমন্ত মানুষ জাগিয়া ওঠে ; কিন্তু চোখ মেলিয়া সে-ও যদি না বুঝিয়া-শুনিয়া চীৎকার করিতে সুরু করে, তাহা হইলে কেহ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করে না। জাগিয়া উঠিয়া যে প্রথমে নিজকে সামলাইয়া নেয়, তারপর ডাকহাঁকের অর্থ বুঝিয়া নীরবে কাজে লাগিয়া যায়, সেই যথার্থ বুদ্ধিমান্। আমরা দেখিতে পাইতেছি, দেশে এইপ্রকার বুদ্ধিমানের সংখ্যাই বাড়িতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায় দেশ উদ্ধারের বাহানা ধরিয়া উপদেশ চাহিত ; আজ তাহারা আত্মোদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছে। ইহাতে দেশোদ্ধারের চেষ্টাতে মন্দা পড়িতে পারে, এ কথা যাহারা বলে, তাহাদের দেশহিতৈষণাও একটা রিপুর তাড়না মাত্র। বালকপাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, "আত্মোন্নতিই দেশোন্নতির প্রথম সোপান।" স্বল্পাক্ষরে নিবদ্ধ অনেক বৃহৎ সত্যের মত এই কথাটাও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ভুলিয়া গিয়াছি বলাও ঠিক নয়—আমরা ইহার তাৎপর্য্যই বুঝিতে পারি নাই। মনের অপরিণত অবস্থায় মানুষকে কিছু বুঝাইতে হইলে বাগ্‌বাহুল্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অপর পক্ষের শব্দাড়ম্বর যতই বহুল হউক না কেন, বুঝিবার সময় হইলে একটী মাত্র কথা মানুষের মর্ম্মে তীরের মত বিঁধিয়া যায়, তখন বুকের রক্ত ঝরাইয়া বেদনা দিয়া মানুষ সত্যকে বুঝিয়া লয়। এইরূপে মর্ম্মে আঘাত লাগিলেই মন জাগে ; তখন একটী কথার মননে, একটী মাত্র সহজ কর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠায় মানুষ কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়। আজ দেশে মানুষের এই গভীর মনটী জাগিয়া উঠিতেছে দেখিতে

পাইতেছি; আড়ম্বরহীন বলিয়া এই জাগরণকে অবিশ্বাস করিব?

*

আত্মার জাগরণে দেশের জাগরণ—এ কথা মিথ্যা হইবার নয়, কেননা ইহা বৈদান্তিকের কথা—ইহা এ দেশের বহু যুগব্যাপী সাধনলব্ধ সত্য। সনাতন ভারতবর্ষের সাধনার ধারা অনুসরণ করিয়া যাহারা আত্মপ্রবোধনে সচেষ্ট হইবে, দেশহিত যে তাহাদের সাধনার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকিবে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—অহং ব্রহ্মাস্মি"—ইহা বৈদান্তিকের আত্মপরিচয়; "বাসুদেবই সব, এবং সেই বাসুদেব আমার"—ইহা ভক্তিরসিকের আত্মপরিচয়; "লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান, বসন্তবৎ লোকহিতের আচরণ"—ইহা কর্ম্মযোগীর আত্মপরিচয়। ভারতীয় সাধনার এই তিনটী ধারাই সেই একই সত্যকে লক্ষ্য করিতেছে। যদি আত্মোন্নতি করিতে চাও, জগৎকে এই ভাবে না বুঝিলে তাহা অসম্ভব; আবার যদি জগতের হিত করিতে চাও, আত্মাকে তাহার সঙ্গে অন্বিত না জানিলে তাহাও পণ্ডশ্রম। আধ্যাত্মিকতায় ঐহিক প্রচেষ্টার ক্ষতি হয়, ইহা অপরিণতবয়স্ক বিজাতীয় সভ্যতার কথা। ভারতবর্ষকে তাহার অভিজ্ঞতালব্ধ সনাতন পথেই চালতে হইবে, এবং জগৎকেও এই পথের পথিক করিতে হইবে।

*

নাড়ীর গতি যখন উদ্দাম হইয়া উঠে, তখন তাহাকে কেহ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে না। যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মাঝে বৈদেশিক সভ্যতার উত্তাপে এতদিন সামাজিক নাড়ী অতিদ্রুত স্পন্দিত হইতে দেখা গিয়াছে, তাহাকে দেশের স্বাস্থ্যের প্রতিরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। যাঁহারা কোনও ক্রমে জনসাধারণ হইতে একটু উঁচাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, দেশকে পরিচালিত করিবার একচেটিয়া অধিকার বুঝি তাঁহারাই পাইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুর বিরাট সমাজ কোনও দিনই কাহারও হুমকি শুনিয়া বিচলিত হয় নাই। ধীর মন্থর গতিতে সে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে চলিয়াছে—কাহারও খেয়ালে উত্তেজিত হয় নাই। হিন্দুসমাজের এই প্রশান্ত পরিণামিতা লক্ষ্য না করিয়া ক্ষণিকের উত্তেজনায় যিনিই ইহাকে মাতাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারই পরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে, তিনিই বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে ষোল আনা দোষ দেশের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। এক মাত্র আত্মদর্শী স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ছাড়া ভারতবর্ষ আর কাহারও আদেশ শোনে নাই। আমরা জানি, যে আদেশের মাঝে বাগাড়ম্বর নাই, সভাসমিতি-কমিটি-রিজলিউশান নাই—বসন্ত সমীরণের মত তাহা দেশের সঙ্কুচিত প্রাণকে নীরবে স্পর্শ করিয়া মুঞ্জরিত করিয়া তুলিতেছে। এ দেশে সাধনাকে গোপন রাখার জন্য, অজ্ঞের বুদ্ধিকে অনুত্তেজিত রাখিবার জন্য শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত আদেশের মাঝেই এ দেশে সত্যপ্রচার ও সত্যগ্রহণের সনাতন রীতির আমরা সন্ধান পাই। যাঁহারা দেশের যথার্থ হিত করিতে চাহেন, খ্যাতি প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিয়া, ফাঁকা উত্তেজনায় অস্থির না হইয়া, আত্মদর্শীর অনুচ্ছ্বসিত অথচ অকুন্ঠিত প্রেরণা লইয়া অজ্ঞ-জনসাধারণের মাঝে তাঁহারা নিঃশব্দে নামিয়া যান—তাঁহাদের দ্বারা ঠিক ঠিক কাজ হইতেছে কি না, তাহা কোনও কমিটিতে নিরূপিত হইবে না, তাঁহাদের অন্তর্য্যামীই তাহা বলিয়া দিবেন।

আরণ্যক

—*—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্ তামম্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্ ॥"

—ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৭১।৩

যোদ্ধা কখনও যুদ্ধের নামে ভয় পায় না, রণবাদ্য শুনে তাদের প্রাণ নেচে উঠে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রাণপণে যুদ্ধ করে জীবনবিসর্জ্জনেই তাদের আনন্দ। সাধক আর যোদ্ধা সমান। জীবনসমস্যার জটিলতায় বা বিপদের উগ্র-মূর্ত্তি দর্শনে ভীত হলে সাধকের চলবে না। বিপদকে ভগবানের পরীক্ষা ভেবে তার ভিতরেও নিশ্চলক্ষ্য ঠিক রেখে অগ্রসর হতে হবে। "কল্পান্তপবনা বান্তু যান্তু চৈকত্বমর্ণবাঃ। তপন্তু দ্বাদশাদিত্যা নাস্তি নির্মনসঃ ক্ষতিঃ"—এই হচ্ছে আত্মস্থ সাধকের অটলতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী।

*

ভালবাসা আত্মার ধর্ম্ম। রাগদ্বেষাদি মানসিক বৃত্তি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে আমাদের ভালবাসারূপ স্বভাব প্রকাশ হতে পায় না। রাগাদি বৃত্তি যত কম হবে, ততই ভালবাসা হৃদয় অধিকার করে বসবে। ভালবাসা কাহারও নিকট শিখতে হয় না। শুদ্ধসত্ত্ব হৃদয়ে স্বতঃই ইহার স্ফুরণ হয়ে থাকে।

*

অনন্তবৈচিত্র্যপূর্ণ এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, এর তত্ত্বনির্ণয় করতে হলে যদি এক একটি বস্তু ধরে বাহির হতে বিচার কর, তা হলে কোন কালেও এর অন্ত মিলবে না। কিন্তু আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী হয়ে নিজের মাঝে সন্ধান করলে দেখবে, একসূত্রে জগতের তাবৎ বস্তু গ্রথিত রয়েছে। সে সূত্র হচ্ছে তোমার আত্মা যা আসলে তুমি—আর তাহাই জগতের আত্মা। এক দুধের বিকারেই যেমন বহু প্রকার খাদ্য-বস্তু প্রস্তুত হয়, সেইরূপ এক আত্মা হইতেই অনন্ত প্রকার বস্তু সৃষ্টি হয়েছে।

*

আর্য্যানুশাসন মেনে চল, আর্য্যেরা জীবনকে যে ভাবে দেখেছিলেন, যে ভাবে বুঝেছিলেন, সেই ভাবে জীবনকে দেখতে বুঝতে শিখ, তাহলে দেখবে এ জীবন বৃথা নয়, —দুঃখময় নয়, স্বপ্ন নয়—এ যেন আনন্দের টুকরা—অমৃতের উৎস—মধুর ভাণ্ডার। অনন্ত জীবন প্রবাহের সঙ্গে নিজের খণ্ড জীবনের যোগ উপলব্ধি করতে পারলে দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না। আনন্দ তোমার মধ্য হতে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠে সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করবে। হৃদয় তোমার প্রাচীন ঋষির সহিত একবাক্যে গেয়ে উঠবে— "শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাঃ— বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

*

ব্রহ্মানন্দরসে জগৎ ডুবে আছে কিন্তু মায়ায় আবৃত হয়ে তা বুঝতে পারছ না। তাই ঋষি বাক্যে অটল বিশ্বাস রেখে এ ধ্রুব সত্যকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করবার চেষ্টা করতে।

হবে। তা হলেই সমস্ত অভাব দূর হয়ে যাবে। যত অভাব সব আমাদের অজ্ঞানাবৃত মনে। এই মনকে ফিরিয়ে পূর্ণত্বের ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাও—ভাব তুমি পূর্ণসত্য—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাতেই আনন্দ পাবে, জ্ঞান তোমার ভিতর ফুটে উঠবে। এই হচ্ছে পন্থা—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

*

নিজকে দীনহীন কাঙ্গাল ভেবে এ মর জগতে তুচ্ছ রূপরসের দিকে কেন ছুটে যাচ্ছ ভাই? তুমি যে অনন্ত রূপের আকর—অনন্ত রসের উৎস। জগতের যা কিছু রূপ রস, এ তো তোমা হতেই বয়ে আসছে। একবার আত্মকেন্দ্রে ফিরে যাও, তাহলে দেখবে বাহিরের সমস্ত ত্যাগ করেও তোমার কিছুরই অভাব হয় না। সান্তকে, ক্ষুদ্রকে, তুচ্ছকে ত্যাগ করে তুমি অনন্তকে, মহানকে গৌরবকে হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছ, এই তো উপনিষদ্—একে পাবার জন্যই ঋষি মূঢ়জীবকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করে বলছেন—"মাভৈঃ, মাভৈঃ, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

*

প্রকৃতপক্ষে কাজ কাকে বলব? জগতে কাজ ত সবাই করে, কিন্তু সবাই কি ঠিক ঠিক করছে? কেউ যাগ যজ্ঞ করছে, কেউ ধ্যান ধারণা, আবার কেউ বা নিজ পরিবার পালনের জন্য হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মরছে। এর মধ্যে কার ঠিক কাজ হচ্ছে? কথা হচ্ছে, কাজ দেখে কে মানুষ ঠিক করা যায় না, যার যেমন লক্ষ্য তার সেইরূপ ফল হয়। এক রকম কাজ করে একজন সংসার জালে জড়িয়ে পড়তে পারে, আবার সেই কাজ দ্বারাই আর একজন মায়ামোহজাল কাটিয়ে মুক্তি পথের পথিক হতে পারে। অহং বুদ্ধি নিয়ে সকাম হয়ে কাজ করলে কাজের দ্বারা সংসারে জড়িয়ে পড়বে, আবার নিরভিমান হয়ে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে কাজ করলে সংসারের পরম কাম্য মোক্ষ লাভ করতে পারবে। যাগ যজ্ঞই কর আর পরিবার পালনের জন্যই খাট, ফল ভগবানে সমর্পণ কর, তবেই ঠিক কর্ম্ম করা হবে। কাজ করে যদি কাজ শেষ না করতে পারলে, তাহলে আর কি করে কাজ করা হল বলব? এমনভাবে কাজ কর, যেন আর কাজ করতে না হয়, তবে ত তোমায় খাঁটী কর্ম্মী বলব।

*

বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়া কাজের গুরুত্ব বুঝা যায় না—ভাবই কাজের প্রাণ—কি ভাবে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া কাজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির এত বড় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন, কিন্তু তাহা উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের ছাতুদান অপেক্ষা গৌরবজনক হয় নাই।

*

জগৎকর্ত্তার সহিত যোগ না রেখে চোরের মত জগতের জিনিষগুলো ভোগ দখল করতে গেলে পদে পদে ঠকতে হবে; তাতে স্বস্তিও হবে না, আনন্দও পাবে না। বিশ্বেশ্বরের সহিত যোগ না রাখলে ভোগ সার্থক হবে না। জিনিষের দিকে মন না দিয়ে জিনিষের মালিকের সঙ্গে যোগ রাখ, তাহলে জিনিষের অভাব হবে না।



দানপ্রাপ্তি-স্বীকার

—*—

ঢাকা মধ্য-বাঙ্গালা-সারস্বত-আশ্রমে—

ফরিদপুর—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় চৌধুরী ২৲, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ২৲, শ্রীপ্রিয়মোহন মহলানবিশ ২৲, মিঃ এইচ্ গাঙ্গুলী ২৲, ফতেপটীতে সংগৃহীত ১২।৶০, সরিঙ্গাবাদে সংগৃহীত ৫৲, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কুণ্ডু ২৲, সংগৃহীত ১৲, সফরদি ১৪।০, ভাঙ্গা ৫।৶০, ফরিদপুর সহর ৫৲। **ময়মনসিংহ**—শ্রীহরিচৈতন্য দাস, উকীল ২৲, টাঙ্গাইল মোক্তার লাইব্রেরী ৫৲, শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ ২৲, জাহ্নবী হাইস্কুলের শিক্ষকগণ ২৲, শ্রীহেরম্বচন্দ্র চৌধুরী ১০৲, সংগৃহীত—টাঙ্গাইল ৩৲, ছয়আনীতরফে ২৲, আটিলসাকান্দায় ৫৲, হেমনগরে ১৲। **পাবনা**—সিরাজগঞ্জ ২০৲। **ত্রিপুরা**—নবীনগর, শ্রীজতেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, শ্রীনিশিকান্ত দত্ত ২৲ শ্রীগিরীশচন্দ্র ভদ্র ২৲, শ্রীযুক্ত মুন্সী আফ্তাব্ উদ্দীন চৌধুরী ২৲, সংগৃহীত ১৬৲; ব্রাহ্মণবাড়িয়া, শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী ২৲, সংগৃহীত ১৩৲। **মেদিনীপুর**—খড়কুসুমা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ২৲। **রংপুর**—ছারাটী, শ্রীচিন্তামোহন সরকার ২৲, হরিণচড়া, শ্রীমহানন্দ সিংহ ২৲, শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী ২৲; (এক টাকা করিয়া) শ্রীনবীনচন্দ্র সরকার, আটবিন, শ্রীচন্দ্রমোহন বর্ম্মা, মধুরাম, শ্রীআশুতোষ বর্ম্মা, মধুরাম, শ্রীকালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, তিস্তা, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, খোলাইঘাট, শ্রীহরিপ্রসাদ সরকার, হরিণচড়া, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দে, আদিতমারী ষ্টেশন, শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত, লালমনিরহাট ষ্টেশন; সংগৃহীত ৫৲। **দিনাজপুর**—দিনাজপুর রাজবাড়ী ৫, রায় শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়বাহাদুর ২৲, দিনাজপুর জিলা স্কুল ৩৲, সংগৃহীত ১০৲; (এক টাকা করিয়া) শ্রীহৃষীকেশ বানার্জ্জী ম্যানেজার রাজবাড়ী, শ্রীকান্তিচন্দ্র সিংহ রায় রাজবাড়ী, শ্রীকৃষ্ণনাথ সেন জমিদার, শ্রীজয়কৃষ্ণ গুপ্ত সিভিল সার্জ্জন, শ্রীসুরেশ্বর সেন হেড্ মাষ্টার, শ্রীহরিপদ মজুমদার সব্ জজ্, শ্রীউমেশচন্দ্র খাসনবীশ উকীল, শ্রীজীবিতনাথ দাস মোক্তার, শ্রীজানকীনাথ মজুমদার জমিদার, " দয়ালচন্দ্র দাস, " অনাদিলাল বিশ্বাস মোক্তার, " হরিশ্চন্দ্র দাস বর্ম্মা, " ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ, " দক্ষিণারঞ্জন দাসগুপ্ত, " অবিনাশচন্দ্র সেন উকীল।

দক্ষিণ-বাঙ্গালা-সারস্বত-আশ্রমে—

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩০৲, শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৲, শ্রীসূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীরঘুবীর সর্দ্দার ১০৲, শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ৫৲, শ্রীশরচ্চন্দ্র নন্দী ৫৲, শ্রীরামজী সর্দ্দার ৫৲, শ্রীবংশী সর্দ্দার ৫৲, শ্রীহাসমত উল্লা ৫৲, শ্রীজগন্নাথ ঘোষ ৫৲, শ্রীবুধীরাম সর্দ্দার ৫৲, শ্রীকবীর উদ্দীন ৫৲, শ্রীহরিহর শেঠ ৪৲, শ্রীবেচু সর্দ্দার ২৲, শ্রীকাশী সর্দ্দার ২৲, শ্রীবিপিনবিহারী নন্দী ২৲, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৲, শ্রীমতী শৈলবালা দাসী ২৲, শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত ২৲, শ্রীমতী কুলীনবালা দাসী ২৲, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

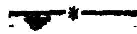
শ্রীকানাইলাল শেঠ ২৲, শ্রীজয়কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, শ্রীনলিনীবিহারী মুখোপাধ্যায় ২৲।

(এক টাকা করিয়া)—শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীচন্দ্রভূষণ দত্ত, শ্রীভোলানাথ নন্দী, শ্রীমতী মনোরমা দাসী, শ্রীপঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচরণদাস নন্দী, শ্রীহরি ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীসত্যকিঙ্কর বসু, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীনিধানকুমার রায়, জনৈক ব্যক্তি, শ্রীচিত্তোর মুখোপাধ্যায়, জনৈক ব্যক্তি, শ্রীযুক্ত শ্যামশুল হক, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীআশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

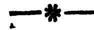
শ্রীশৈলেন্দ্র রায় ও শ্রীপঞ্চানন রায় ॥০, শ্রীযদুকৃষ্ণ রায় ॥০, জনৈক কৃষ্ণনগরবাসী ॥০, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ॥০, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে ॥০, জনৈক কৃষ্ণনগরবাসী ।০।

ভিক্ষালব্ধ—শ্রীঅমূল্যকুমার দাস মাঃ ৯১৫, চন্দননগরে ৪৮/৫, হালিসহরে ১৬/০ নগদ ও চাউল ১০৮/৫, শ্রীজানকীজীবন চক্রবর্ত্তী মাঃ ৭৲, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দে মাঃ ৬৲, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাঃ ২৮০, শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মাঃ ৩৭৲, শ্রীকুমুদিনীকান্ত সাহা মাঃ ৬৲, শ্রীনলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মাঃ ৩০।০, শ্রীচরণদাস নন্দী মাঃ ১০৲, শ্রীঅমূল্য মোদক মাঃ ৩॥০, শ্রীতারাপদ রায় মাঃ ৯৲।

(ক্রমশঃ)



সংবাদ ও মন্তব্য



আশ্রম-সংবাদ

মঠাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেব বর্ত্তমানে পুরীধামে অবস্থান করিতেছেন।

প্রচার সংবাদ

অত্রত্য সারস্বত মঠান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবাশ্রমের পক্ষ হইতে শ্রীমৎ কুমার চৈতন্য ব্রহ্মচারী একজন সেবকসহ প্রচারোদ্দেশ্যে গৌহাটী, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। হালিসহর—দক্ষিণবাঙ্গলা সারস্বত আশ্রম হইতে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও শ্রীমৎ গোপাল ব্রহ্মচারী ব্রহ্মদেশে প্রচারোপলক্ষ্যে যাত্রা করিয়াছেন। ঢাকা—মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম হইতে শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমৎ রমেশ ব্রহ্মচারী প্রচারোদ্দেশ্যে বিহার প্রদেশে গিয়া সম্প্রতি পাটনায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কুমিল্লা—পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত আশ্রম হইতে শ্রীমৎ কুমারানন্দ ব্রহ্মচারীও একই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ভক্তসম্মিলনী

গত হালিসহর সারস্বত আশ্রমের ভক্তসম্মিলনীতে যে পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে, ভক্তগণ হইতে তাহা অপেক্ষা প্রায় ১২৫৲ কম

উঠিয়াছে। সুতরাং এই টাকা ঋণ করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে হইয়াছে। ভক্তসম্মিলনী ভক্তগণেরই হিতকল্পে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; সুতরাং উহাতে সর্ব্বসাধারণে সাহায্য না করিলেও ভক্তগণকেই উহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এই শিশু আশ্রমটীকে প্রথমেই ঋণভারে আক্রান্ত করিলে উহার অনুষ্ঠেয় কার্য্যাবলীতে প্রারম্ভেই বাধা প্রদান করা হইবে। আশ্রমের শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণের ইহা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় হইবে না। অতএব প্রত্যেক বিভাগের বিভাগীয় সভ্য ও ভক্তগণ এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া ভক্তগণের ভিতর হইতে টাকা উঠাইয়া খরচের টাকা পূরণ করিতে চেষ্টা করিবেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের ভক্তগণ অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক অর্থ প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং এই বিভাগ হইতে পুনরায় টাকা উঠান সম্ভবপর হইবে না। অতএব বর্দ্ধমান, রাজসাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা এই চারি বিভাগ হইতেই উক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ হইতে সাহায্যের পরিমাণ অতি সামান্যই হইয়াছে—সুতরাং আশা করা যাইতে পারে, উক্ত বিভাগের ভক্তেরা কর্ত্তব্যবোধে এই ন্যূনতা পূরণের জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হইবেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া আশা করি বিভাগীয় সভ্য ও ভক্তগণ সকলে একযোগে কার্য্য করিয়া আশ্রমের ঋণভার মোচনকল্পে যত্নবান হইবেন।

গ্রন্থপরিচয়

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বামৃতসিন্ধু—

শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় সঙ্কলিত,—মূল্য ৸৹ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—ডাক্তার শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র রায়, উয়ারী, ঢাকা। ইহাতে মানুষগুরুর প্রয়োজনীয়তা, গুরুতত্ত্বের ভিত্তি, গুরুকরণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা, মানুষগুরু সেবার শ্রেষ্ঠত্ব, সদ্‌গুরু কাহাকে বলে, সদ্‌গুরুর বিশেষত্ব, সদ্‌গুরুর লক্ষণ, আশ্রমোচিত গুরুকরণ, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু, মানুষগুরুর শরণাগতি, গুরুভক্তের উপাখ্যান ও গুরুভজনমাহাত্ম্য —এই বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশে পুস্তকখানিকে মনের মত করিয়া সাজাইয়াছেন। গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা উভয়ই আমাদের দেশে বর্ত্তমান। অথচ সর্ব্বদেশে গুরুকরণ সর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তি। এই পুস্তকপাঠে যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও তত্ত্বান্বেষী, তাঁহারা তো আনন্দ পাইবেনই, ইদানীন্তন যাঁহারা আধ্যাত্মিক দাম্ভিকতায় পূর্ণ হইয়া প্রাচীন সত্যকে ব্যঙ্গ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাও বুঝিবার ও ভাবিবার বহু বিষয় ইহাতে পাইবেন।

দ্বারকা সারদাপীঠে উৎসব

দ্বারকা হইতে সারদামঠ মহোৎসব কমিটীর সেক্রেটারী স্বামী প্রেমপুরী তারযোগে জানাইয়াছেন—দ্বারকা সারদামঠের মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রথম মহারুদ্র যজ্ঞ আরম্ভ হয়, তাহার পর ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য শান্তানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে কাশীর পরিব্রাজক মহামণ্ডলের সভা হয়। মহারাজজী পরিব্রাজকদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বক্তৃতা করেন। প্রস্তাবে পুরীর শঙ্করাচার্য্য, কাশ্মীর ও গোয়ালিয়রের মহারাজ এবং কালী কম্‌লী রামনাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। যাঁহারা পীঠ ও মঠ লইয়া মামলা করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য্যের নিন্দা করিয়া দ্বিতীয় প্রস্তাব গৃহীত

হয়। তৃতীয় প্রস্তাবে হিন্দু মহাসভার সকল নেতাকে সনাতন ভ্রাতৃত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রচারকার্য্য চালাইতে বলা হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে উপদেশক ও প্রচারক প্রস্তুতের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা হয়।

আদি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠোপলক্ষ্যে সারদাপীঠের শঙ্করাচার্য্য বিরাট সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী সভা হইয়া গিয়াছে এবং বরোদার মহারাজা গাইকোয়াড় তথায় উপস্থিত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য শ্রীমৎ সত্যানন্দ তীর্থ অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া দ্বারভাঙ্গার মহারাজকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। মহারাজা দ্বারকার প্রাচীন ইতিহাস ও সনাতন ধর্ম্মের গৌরবের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলেন—সনাতন ধর্ম্মকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে, বিধর্ম্মীরা দিন দিন সনাতন ধর্ম্মের উপর যে আক্রমণ করিতেছে, সেই আক্রমণ হইতে আমাদের ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হইবে। হিন্দু বালকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের জন্য প্রত্যেক মঠ ও মন্দিরে সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিতে হইবে। প্রচারক নিয়োগ, মহাবীর দল ও সেবাসমিতি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্ম নিন্দিত হইতেছে। কাজেই সনাতনীদিগকে কাউন্সিলে প্রেরণ করা বিশেষ প্রয়োজন।



বর্ষশেষে নিবেদন

—ঃ{*}ঃ—

শ্রীগুরুর কৃপায় "আর্য্যদর্পণের" ১৮শ বর্ষ শেষ হইল। আগামী বৈশাখ মাস হইতে আর্য্যদর্পণ ১৯শ বর্ষে পদার্পণ করিবে। বর্ত্তমান বৎসরের পত্রিকা বর্ষশেষ হইবার বহু পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকদিগের আনুকুল্যে "আর্য্যদর্পণ" ধীরে ধীরে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে—ইহা শ্রীগুরুরই কল্যাণময় আশীর্ব্বাদের ফল। আগামী বর্ষের পত্রিকা আমরা আরও অধিক সংখ্যায় মুদ্রিত করিব, স্থির করিয়াছি। যাঁহারা এ বৎসর গ্রাহক থাকিয়া সনাতন ধর্ম্মপ্রচারে আমাদিগের সহায়তা করিয়াছেন, আশা করি, তাঁহারা আগামী বর্ষেও গ্রাহক থাকিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। সজ্ঘস্থিত ভক্ত-শিষ্যগণও পত্রিকার প্রচারকল্পে অধিকতর উৎসাহী ও মনোযোগী হইবেন, ইহাও আশা করিতেছি।

গ্রাহকগণের আগ্রহে প্রোৎসাহিত হইয়া আমরা **আগামীবর্ষের পত্রিকা আরও এক ফর্ম্মা বাড়াইয়া দিব মনে করিয়াছি।** অথচ পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি করা হইবে না। আসামদেশে সনাতনধর্ম্মের আদর্শ প্রচারকল্পে ও অসমীয়া ভদ্রমহোদয়গণের বিশিষ্ট অনুরোধে আমরা আগামী বর্ষ হইতে অসমীয়া ভাষারও দুই একটী প্রবন্ধ মধ্যে মধ্যে পত্রিকায় পত্রস্থ করিব। আসামজননী বহু বঙ্গসন্তানের ধাত্রী;

উভয়দেশ পরস্পরের প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হউক, ইহাও আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

এ বৎসর প্রায় প্রতিমাসে পত্রিকা নিয়মিতভাবেই বাহির হইয়াছে। আমরা সুদূর আসামের মফঃস্বল হইতে পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকি; গ্রাহকগণের মাঝে অনেকেই বাঙ্গালা ও আসামের পল্লীবাসী। ইহাতে পত্রিকা বিলির সময় গোলমাল হওয়া খুবই সম্ভব। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমরা প্রতিমাসে বিশেষ যত্নসহকারে পরিদর্শন করিয়া গ্রাহকদিগের নিকট পত্রিকা পাঠাইয়া থাকি; কেহ পত্রিকার অপ্রাপ্তিসংবাদ নির্দ্ধারিত সময়ের পরে জানাইলেও বহুক্ষেত্রে আমরা পুনরায় পত্রিকা পাঠাইয়াছি। তাহা সত্ত্বেও কেহ কেহ আমাদের প্রচারক ও সেবকদিগের মারফতে পত্রিকার অপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অনুযোগ করিয়াছেন। আমরা প্রতি মাসে যথাসম্ভব সতর্কতা সহকারে পত্রিকা পাঠাইয়া থাকি, ইহা ছাড়া আমাদের এ বিষয়ে আর কোনও বক্তব্য নাই। তথাপি গ্রাহকদিগের নিকট বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা পত্রিকার অপ্রাপ্তিসংবাদ যেন দয়া করিয়া **মাসের মধ্যেই পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষকে** চিঠি লিখিয়া জানান এবং স্থানীয় ডাকঘরেও সবিশেষ অনুসন্ধান করেন। পত্রিকাপ্রেরণ সম্বন্ধে আমাদের যথাসাধ্য অবধানতার কোনও ত্রুটী হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু জানাইতে হইলে অনেকেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করেন না। গ্রাহক নম্বর না দিলে আমাদের তথ্যনির্ণয়ে বড়ই অসুবিধা হয় এবং সে জন্য সকল ক্ষেত্রে আমরা সময়মত পোষ্টাল তদন্তও করিতে পারি না। এ বিষয়ে গ্রাহকগণ অবহিত হইলে বাধিত হইব।

যাঁহারা আগামী বর্ষে পত্রিকা লইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মনিঅর্ডারযোগে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধা, নতুবা ভিঃ পিঃতে পত্রিকা পাইতে বিলম্ব হইবে এবং খরচও বেশী পড়িবে। ১৫ই বৈশাখের মধ্যে পত্রিকার মূল্য অথবা নিষেধসূচক পত্রাদি না পাইলে আগামী বর্ষের পত্রিকা বৈশাখের চতুর্থ সপ্তাহে গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিবেন না, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ১৫ই বৈশাখের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন। গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ভিঃ পিঃ ফেরত আসিলে তাঁহাদিগের কোনও ক্ষতিই হয় না; কিন্তু আমাদিগকে নিরর্থক ডাকখরচ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং যাতায়াতে পত্রিকাখানিও নষ্ট হইয়া যায়। গ্রাহকদিগের অনবধানতায় পত্রিকা ফেরত আসিলে আমাদিগকে কতখানি ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া অনিচ্ছুক গ্রাহকগণ যেন অনুগ্রহ করিয়া পূর্ব্বেই একখানা কার্ড লিখিয়া আমাদিগকে পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করেন। ভরসা আছে, আমাদের এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।